

# গল্পসমগ্র

২

নবনীতা দেবসেন

সুপ্রবন্ধিনী

৮ বি, কলেজ রো, কলিকতা-৯

প্রকাশক  
শ্রীবিষ্ণুনাথ মৈত্র  
৮ বি, কলেজ রো,  
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রণে  
নিউ মহারাষ্ট্র প্রেস  
৬৫/৭ কংক্রিট,  
কলিকাতা ৭০০০৭৩







## সূ চি

### নাট্যাবস্ত

মধ্যবাত্তেব ভয়ঙ্কৰ	৩
অজ্ঞাচাব	১৩
বনলতাব পুষ্টি	২৯
চাঁদগডাব কাবিগব	৩৬
ক্ষণপ্রভা	৫১
প্ৰেগচাঁদিনি	৬৭
আবাব এসেছে আষাঢ়	৭৫
নাট্যাবস্ত	৮৮

### বসনমামা ও অন্যান্য গল্প

স্পটলেস স্পটেড ডিয়াব	১২১
মেহেবুব টেলার্স (ক্যালকাটা নাইন)	১২৮
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ	১৩৩
মূলতানী কামধেনু	১৩৭
ডিভাইন পাওয়াব অব এটর্নী বা যোগবিভূতি	১৪৪
দি নেস্ট	১৫০
গুনিয়া ভাই	১৫৪
ইয়াং সায়েবেব গাডি	১৬০
চোর-চোব	১৬৬
মেজকাকিমাব গল্প	১৭২
মেজদিব কেচ্ছা	১৮২
মেসোমশায়েব কন্যাদায়	১৯০

## সীতা থেকে শুরু

পর্ব এক : পৌরাণিকী

মূল-বামাযণ	২১১
বাজকুমারী কামবল্লী	২১৯
অমবত্বেব ফাঁদে	২৩০
সীতার পাতাল প্রবেশ	২৩৭
অন্নোপাখ্যান	২৪৯
অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম	২৫৯

পর্ব দুই : মাতৃয়ার্কি

মাতৃয়ার্কি (অর্থাৎ বন্দে মাতবম।)	২৬৬
-----------------------------------	-----

স্কেচ : এক—বারো

পর্ব তিন : আধুনিকী

এলিজাবেথান সিস্টেম	৩১২
পবভুৎ	৩১৮
প্রোপ্রাইটাব	৩২২
মুখব নৈঃশব্দ্য	৩২৮

নাট্যরস্তু



## মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর

মা বললেন, “খুকু, এ জিনিস চলতে পারে না। তুমি কিনা তোমাব মেয়েকে খুন কববার সব ব্যবস্থা কবে দিলে। কেন, চাব চাকা চালালে কী দোষ ছিল?”

মেয়েকে তো লাইসেন্স কবিয়ে দিয়েছি সেই কবেই। সে কিছুতেই চাবচাকা ছোঁবে না, তো আমি কী কবতে পাবি? আব মোপেড কি তাকে আমি কিনে দিয়েছি? একুশ হয়েছে, অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেই টাকাটা তুলে কিনে ফেলেছে, বলেছে চাকবি কবে শোধ কবে দেবে, একদিন না একদিন। আবে, আমাবই কি ইচ্ছে মেয়ে খুন কবি? মাব ধাবণা আমি যেমন মাব সব কথা শুনে চলি, আমাব মেয়েও বৃদ্ধি তাব মায়েব কথায় তেমনি ওঠে-বসে। আবে জমানা বদল গয়া—এখন আমিই যে দুজনেব কথাতেই উঠি-বসি। একবাব আমাব মায়েব কথায়, আবেকবাব আমাব মেয়েব কথায়, তা মা বঝেও বুঝতে চান না। আসলে আমাব বড় মেয়েটি প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী। তাকে বকুনি দিতে আমাব প্রবলা গর্ভধাবিণীও সাহস পান না, তাই ঝিকে বকে নাতনিকে শিক্ষা দেবাব চেষ্টা। ওদিকে ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটিতে আমাব বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। কাক-চিলেও ঠুকবে যায় সুযোগ পেলে, মা জননী, কন্যাকুমারী এদেব তো কথাই নেই।

“কী বলে এই ডেঞ্জাবাস রিস্ক তুমি নিলে? বাস্তবঘাটে গাড়িব ছড়াছড়ি। লাইসেন্স সব নামেমাত্র, ঘুষ খাইয়ে বেব কবা। কেউই আব জানে না গাড়ি চালানোব প্রকৃত আইনকানুন। যাব যেমন খুশি চালাচ্ছে—তাবই মধ্যে এই কচি মেয়েটাকে তুমি একা ছেড়ে দিলে—গাড়িঘোড়াব এই অরণোব মধ্যে। অবণ্যেও তবু আইনকানুন আছে, বন্যপশুও কিছু কিছু নিয়ম মানে—কলকাতাব গাড়িঘোড়া কোনো নিয়মই মানে না।—সাইকেল যে কিছুতেই কিনে দিইনি তোমাকে ছেলেবেলায়, সে শুধু এইজন্যে আব তুমিই কি না আমাব অমতে—” মাব বকুনি চলতেই থাকে। আমি বীতিমতো গাঢ় অভিমান বোধ কবি। এ কী অন্যায় বলো দিকি, আমি যা করিনি, যে ঘটনাব দায় কোনোমতেই আমার নয়—তাব জন্যেও আমাকেই মা বকবেন। উন্টোদিকে মন ধাইতে শুরু। অতএব:

—“এমন কি আর ডেঞ্জাবাস, মা? কত ছেলেমেয়েই তো মোপেড চালাচ্ছে। স্কুটার, সাইকেল, মোপেড এসব কি লোকে চালাচ্ছে না? আমি তো ভাবছি, পেট্রলের

যা দাম বাড়ছে দিনকে দিন, এবার থেকে ওব মোপেডটা করেই কলেজে যাবো। মাত্র একজন লোকের জন্য গাড়িটা চালানো বেশি বেশি এক্সপেনসিভ হয়ে যাচ্ছে।”

মার মুখে অভাবনীয় এক স্বর্গীয় আহ্বাদের বিচ্ছুরণ ঘটে—“তুমি? তুমি চালাবে মোপেড? নাঃ, তুমি চালালে ভালোই চালাবে—রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানো তোমার অভ্যাস আছে—সেই ভালো। মেয়েকে বরং গাড়িটা দাও, তুমিই মোপেড নাও। মেয়েটা ছেলেমানুষ, গাড়ি বডসড জিনিস, চাব দেয়ালে ঘেবা থাকবে, সাবধান থাকবে। মোপেড বড্ডই খোলামেলা, কোনো আগল-বাঁধন নেই, ধাক্কা একবার লাগল তো গেল।”

অর্থাৎ আমি গেলে মার আপত্তি নেই তত, নাতনি না গেলেই হলো। গাড়ি বেশ বন্ধ দুর্গেব মতো। আব মোপেড যেন অস্বাভাবিক। অরক্ষিত।

“মা? মা চালাবেন মোপেড?”

“হ্যাঁ। আব তুমি চালাবে মা’ব গাড়িটা।” দিম্মার সাত্বনা মোটেই পছন্দ হলো না মেয়েব। “না, আমার গাড়ি চালাতে ভালো লাগে না দিম্মা। গাড়ি আমার চাই না। তবে মা যদি চান মাঝে মাঝে আমার মোপেডটা ওঁকে ধার দিতে আমার আপত্তি নেই, প্রোভাইডেড উনি ওটা নিয়ে কলেজে না যান।”

“কেন? কলেজে যাবে না কেন? কলেজেই তো যাবে। পেট্রল খরচা কমানোব জন্যে।”

“আচ্ছা দিম্মা—কী যে বলো না তুমি?” নাতনি হেসেই আকুল। “এখান থেকে যাদবপুর কতটা পেট্রল লাগে? আব এখান থেকে সেই সেন্ট্রাল এভিনিউ কতটা? আমাকে যে গাড়ি নিতে বলছিলে, তাব পেট্রল খবচটা কি ভেবেছিলে?”

—দিম্মা তাতেও অপ্রতিহত। “তুমি তাহলে মিনিবাসে যাবে। আর মা মোপেডে। আব যখন সবাই মিলে বেকবে, তখন গাড়িও বেকবে।”

—“বাবে, বাঃ। আমি বলে এত কষ্ট কবে মোপেড কিনলুম, হেলমেট কিনলুম, শাডি-গার্ড লাগালুম, সব মিনিবাসে কবে যাবো বলে। না। মোটেই না।” এবারে আমাকে প্রবেশ কবতেই হয়।

—“আবে বাবা, আমি আগে চালাতে শিখি! আমি তো মোপেড কখনও চড়িইনি, চালানো দ্বের কথা। চালাতে যদি পারি তবে তা নিয়ে বেকবো। কিন্তু কলেজে কেন যাওয়া বাবণ সেটা শুনি?”

“কেননা আমার বন্ধুবা হাসবে।”

“হাসুক গে তোমাব বন্ধুবা, লোকে অমন কত হাসে! কোনো ভালো কাজই কবা যায় না লোকে কী বলবে ভাবলে। মোপেড যদি চালাতে পারি, তবে সর্বত্র যাবো কিন্তু।”

“পারবে না কেন? না পারার কী আছে? খুব সোজা। অতি সহজ। গাড়ি

চালানোব মতন নয়। অতরকম হাতেপায়ে বিভিন্ন ধবনের কাজকর্ম একসঙ্গে কসবত কবতে হয় না সাবাক্ষণ, নাচ শেখাব মতন। স্টাটিংটাই কাযদা লাগে কেবল, একবাব স্টাট কবলে, চলতেই থাকে। প্যাডলও কবতে হয় না। সাইকেলেব চেয়েও সোজা। তুমি একবাব দেখে নিলেই শিখে যাবে, মা। কিন্তু শিখে ফেলেই আমার গাড়িটা মোনোপলাইজ কোব না বাপু। মাঝে মাঝে চডতে চেয়ে নিও।”

এই চেয়ে নেবার ব্যাপাবটা আমার মনের মতো হলো না। কিন্তু আমি বললুম শুধু, “আগে তো শিখি।”

“চলো না, শিখবে? এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি।” মেয়ে উদার সুবে আহ্বান জানায়। কিন্তু আমি কোথায় একপায়ে বাজি থাকব তা নয়, আমার মুখ দিয়ে বেবিযে এল। “না, না। এখন থাক। এখন নয়। এখন ভব দুপুরবেলা, চান্দিকে লোকজন। সবাই দেখবে। বাত্তিরবেলা বাস্ত্রঘাট ফাঁকা থাকবে, তখন সেফটিও বেশি। তখন শিখব। লোকে দেখলে কী ভাববে।”

“এই না বলছিলে, লোকেব কথা ভাবলে জীবনে কোনো বড কাজই কবা যায় না?”

“এটা তো তেমন কিছু বড কাজ নয়, তুচ্ছ কাজ, এব জন্য লোকেব কথা ফেস কুবাটা নট ওয়ার্থ ইট। বাত্তিরে হবে এখন।”

হায়। বাত্তিব তো হবেই। কখনও না কখনও। হলোও। মা বললেন—“খুক্, এই তো দিবা বাস্ত্রঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়েব কাছে চট কবে মোপেড চালানোটা শিখে নে ববং।” আমারও পছন্দ হলো কথাটা। বয়েস হয়ে, মা দিনে ঘুমোন, বাতে জাগেন। মায়েব সঙ্গে সঙ্গে আমবাও অনেক বাত্তিব অবধি জেগে জেগে গুলতানি কবি। বাত তখন সাডে এগাবোটা বেজে গেছে। পথঘাট সঁতা ফাঁকা। বাড়িবাড়ি আলোও নিবে গেছে। প্রতিবেশীবা নিশ্চিত নিদ্রায়। কাককে বিব্রত কবাব ভয় নেই। নিচে নামলুম। সঙ্গে দুই কন্যা ও কানাই। ঝকঝকে কালো ঘোড়াব মতো নতুন তেজী মোপেড দ্যাবে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো মেয়ে সাইকেল দিবা চালায়, কিন্তু মোপেডে নিকংসহ। (“ওবে কবাবা ও আমি পাবব না।”) বড মেয়ে বলল—“এই দ্যাখো হ্যান্ডেল। এই হচ্ছে অ্যাকসেলাবেটব, এই ব্রেক। দটোই হাতে, পায়ের কিছুই নেই এতে। শুধু স্টাটিটা পায়ে কবে। ওদিকে ঘোবালে অ্যাকসেলাবেট কববে, এদিকে ঘোবালেই বন্ধ। এটা হচ্ছে ব্রেক। দেখে নাও। আব এই পায়ের কাছে এইভাবে এটাতে ঝাকি মেবে আব হাতে এইটে টিপে এই যে দেখে নাও, স্টাট কবতে হবে। এটা কিন্তু শব্দ। ভালো কবে দেখেছ?”

“গীয়াব-টিয়াব? কোনদিকে?”

“নেই। এটা গাড়ি নয়। এটা আসলে সাইকেলই। কেবল মোটবে চলে। প্যাডলও আছে, তেল ফুবোলে প্যাডল কবে চলে। তবে একটু ভাবী লাগে। এই যা। নাও এদিকে দ্যাখো—কী দেখছে। অন্যমনস্ক হয়ে? এদিকে তাকাও।”

“ওদের বাড়িতে একটা আলো জ্বলছে।”

“জ্বলুক, ওটা তো বোজই জ্বলে। ওটা ওদের সিঁড়ি আলো। স্টার্ট দেবাব পবে, স্ট্যাণ্ডটাকে এই যে, এই জিনিসটা, আগে নামিয়ে দেবে। এমনি কবে। এবার গাড়িটা চলবাব উপযুক্ত হলো। প্রথমেই স্টার্ট দেবে, এমনি কবে, বুঝেছো? তাবপব—আমি আগে চালিয়ে দেখিয়ে দিই ববং—তুমি দেখে শিখে নাও। দ্যাখো এইভাবে চড়ে বসবে—” মেয়ে তো ব্লু জিনস পবা. লাফিয়ে উঠে বসলো। আমি যতই উচ্ছে তুলি না কেন শাড়িটা, কক্ষনো ওভাবে উঠে বসতে পাবব না।

“স্টার্ট দেবাব পবে গাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে নামিয়ে সিটে বসবে, একটু পবে উঠতে হয় এতে বুঝলে? গাড়িব মতো নয়, আগে উঠে বসে পবে স্টার্ট দেয় না—এমনি কবে অ্যাকসেলাবেট...” মেয়েব গলা আব শোনা গেল না। প্রবল ভট-ভট শব্দেব মধ্যে দূবে মিলিয়ে গেল। দ্যাখ না দ্যাখ ঐ মোডেব কাছে পৌঁছে গিয়ে বাই কবে ঘুবে আসছে। ফিবে এসে স্পীড কমিয়ে—“এই দ্যাখো, মা, এইভাবে ব্রেক কষছি—” বলতে বলতে মেয়ে আস্তে কবে থেমে গেল। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা গেল না। কেমনভাবেই বা সে স্টার্ট কবেছিল ঐ গাড়ি, কেমনভাবেই বা সে অ্যাকসেলাবেট কবল, আব কেমনভাবেই ব্রেক কষেছে। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার কবতে আমাব বাধলো। ইতিমধ্যে আমাদেব বাড়িব বকে বোজ শুয়ে থাকে একটা বিটাযার্ড ঠিকে কাজেব মেয়ে, বানী, সে মহা উৎসাহে উঠে এসেছে। আব উন্টোদিকেব টিউবওয়েলে জল খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ভিখারি—হাতে বাটি, লাঠি, বগলে পুঁটলি। তিনিও এসে কানাইযেব সঙ্গে বাতচিত শুক কবেছেন। দুর্গা বলে এগিয়ে যাই। প্রথমে আমি মেয়েব দেখাদেখি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা কবি, কিছুতেই হয় না। মেয়েই স্টার্ট দিসে দিল। তাবপব প্রায় হাঁটু অবধি শাড়ি উঠিয়ে “যা থাকে কপালে” বাঘেব পিঠে জগদ্ধাত্রীব মতো তো অধিষ্ঠিত হলাম পাদপীঠে। পা বাস্তায়। ছোট মেয়েটা ভীত। সব গলায় “ওমা? মা? পড়ে যাবে না তো?” বলে উঠল। বডটি সাহসিকা—‘চুপ্চুপ তো। পড়বেন কেন? মা তো সাইকেল চালাতেন কলেজে। সাইকেল প্রতিযোগিতাব তিন-তিনটে মেডেল আছে না।”

“হ্যাঁ তা থাক, কিন্তু শান্তিনিকেতনেই সেবাব তো সাইকেলে চডতে গিয়ে ধাই কবে মা পড়ে গিয়েছিলেন, মনে নেই?”

ছোট মেয়েব দ্বন্দ্ব ঘুচতে চায় না।

“সে অনভ্যাসেব দকন। সাঁতাব আব সাইকেল কেউ ভোলে না। জানিস?”

“—জানি। কিন্তু মা যে আলাদা। মা তো সেবার মহালয়ায় সাঁতার কাটতে গিয়ে গল্গায় ডুবেও যাচ্ছিলেন; আমরা স্রচক্ষে দেখেছিলাম না? অথচ মাব তো লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট আছে দিম্মাব আলমাবিতে। আছে না?”



আমি আর পারি না। “যায্যাঃ—যন্তোসব বাজে কথা। হঠাৎ ডুবব কেন? শাড়িতে পা জড়িয়ে ধরেছিল তাই। আর সাইকেল যে আজকাল চডতে পারি না সেটা তো কেমব্রিজে সেই অ্যাক্সিডেন্টের পরে, সাইকেলজিকাল ব্লক থেকে।”

“কী অ্যাক্সিডেন্ট, মা?” দুজনেই ব্যাকুল।

“ঐ যে, টিউটবেব কাছে যাচ্ছিলাম তো, অন্যমনস্ক হয়ে চালাচ্ছি, হঠাৎ একটা পার্কড ভিহিকলের সঙ্গে একটা থেমে থাকা লাল, দোতলা বাসেব সঙ্গে, ধাক্কা লেগে বাস্তব পড়ে গেলুম। আব ঠিক সেইখানেই পুলিশ ব্যাটা ডিউটি দিচ্ছিল।...সেই থেকে কেমন ভয় ধবে গেছে। চলে আসাব সময়ে আমার লাল টুকটুকে সাইকেলটা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পার্থ দাশগুপ্তকে দিয়ে এসেছিলুম। সে তখন ট্রিনিটিতে আগুবগ্রাজুয়েট ছাত্র। দেখা হলে জিগ্যেন্স কবিস।”

“খুব হয়েছে। এখন এটা চালাও দিকি।”

“এই তো? এমনি কবে তো? বেশ, একটু ঠেলে দে আগে, নইলে এগুবো কী কবে?”

—“ঠেলবো কি গো? নিজে নিজে যাবে। স্টাট তো দিয়েই দিয়েছি, এবাব দু'পাশে পা বাখো, হ্যাঁ...ব্যাকটা তুলে নাও...হ্যাঁ...বাঃ। এবাবে অ্যাকসেলাবেট...”

বলতে না বলতেই গাড়ি তীববেগে বেবিবে যায়। আমি সমেত। দু'পাশে দুই কন্যা প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে পিছনে কানাই, তাব পিছনে বাটি লাঠি পুঁটলি বগলে বৃদ্ধ ভিখিবি, তিনিও খুবই জড়িয়ে পড়েছেন এই এক্সপেরিমেন্টে। আব বানী আমাদের বাড়িব সামনে বাস্তব ওপবে কোমবে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিবে চৈচিয়ে টীযাব-গার্লবে কর্তব্য পালন কবছে। চৈচাচ্ছি অবশ্য আমবা সকলেই, কিন্তু ঠিক ঐকতানে নয়। যে যাব স্বকীয়তা বজায় বেখে। একেই কি বলে হামনি?

বড কন্যা—“ঠিক হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে, চলতে থাকে!”—

ছোট কন্যা—“ওবেব্বাবা মাগো পড়ে যেযো না যেন—দেখো বাবা। ওগো, মাগো, যেন পোডো না”—

কানাই—“অ দিদি। অ দিদি। অত জোবে ন-য—আন্তে কব্বন, আন্তে কব্বন—”

ভিখিবি বৃদ্ধ—“ওগো তোমবা সবাই থামো না একটু।—তোমবা একটু থামো দিকিনি —আমাব বৌদিদি ঠিকই চলে যাবে এখন দুগগাঃ দুগগাঃ—অত কথা বললে কি আব মাথাব ঠিক থাকে কাউব”—

বানী—“ও মাগো, কী হবে গো? এ কী কাণ্ড গো? বাড়িব গিন্নি যে মপেটও চালাচ্ছে গো”—

মোপেড—“ভটব ভটব ভাট ভাট ভাট ভাট”—

আমি—(মনে মনে ইষ্টমন্ত্র, আব মুখে)

—“ওবে ওবে নামবো যে বে—ওবে নামবো—ওবে থামবো কী কবে—ওবে এটা যে থামছে না বে”—

ছুটতে ছুটতে মোপেড-শিক্ষিকা দ্রুত ইস্ট্রাকশন দিতে থাকেন—

—“স্পীড কমিয়ে দাও, স্পীড কমিয়ে দাও, পা মাটিতে, পা মাটিতে ঠেকিয়ে দাও, মাটিতে পা ঠেকিয়ে—”

ছুটতে ছুটতে কঁাদো কঁাদো ছোট মেয়ে—“পা মাটিতে পা মাটিতে, অমা গো, পা মাটিতে মা—”

ছুটতে ছুটতে কানাই—

—“দিদি, দাঁইডে পড়ুন—পা মাটিতে নাবিয়ে ফেলুন, দাঁইডে পড়েন—নাবিয়ে দ্যান-পা-টা”

ছুটন্ত ভিকিবি—“বৌদিদি আপনিই লেবে পড়বে—তোমরা আব ওকে ঘাবড়ে দিওনি—বৌদিদি আপনিই লেবে যাবে খনি—তোমরা চোঁচানি থামালিই উনি লেবে পড়বে—”

উচ্চকিত বানী—“আব উদিগে যেয়ে কাজ নি গো দিদিমুনি—ঢেব হয়েচে—উদিগপানে আব যেযোনি—উদিগে গরু—গুতিয়ে দিবে, উদিগে গরু”—

...আব ‘যেযোনি’। হাঁ। যেয়ে তো পড়েইছি। এক্কেবারে খাটালের সামনে। ফুটপাতেব ওপবে গোল হয়ে বসে নিবীহ বিহারী গয়লাবা ঢোলক বাজিয়ে গলা ছেড়ে ভোজপুৰী বামাহো গাইছিল:

—“বোয়ি বোয়ি পাতিয়া—লিখলবা বজমোতিয়া—আববে বোয়ি বোয়ি”—তাবা প্রাণের আনন্দে আব ঢোলেব শব্দে আমার প্রাণঘাতী ভ্যাট ভ্যাট শুনতে পাযনি। সহসা উদিত হয়ে তাদেব জলসা থেকে ইক্ষিখানেক দূবে ঠাশ কবে গাড়িটাকে ফেলে দিয়েই সার্কাসেব কায়দায় সাড়ে তিন হাত লম্ফ দিয়ে ওদেব উল্টোদিকে নেবে পড়লুম। সেও চমৎকাব স্পেস সেলেব প্রমাণ দিয়ে, গোববগাদা থেকে আধ মিলিটাৰ তফাতে। গাড়ি পপাত, গয়লাবা অনাহত, আমিও অনাহত। সবাই ঠিকঠাক। শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলুম—“অনেকটা সাইকেলেব মতোই”—ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাব বেজিমেন্ট এসে পড়েছে। বীবগর্বে বলি—“বেশ সোজা। ঠিকই বলেছিলি, অনেকটা সাইকেলেব মতোই।”

বড মেয়ে (সয়েহে)—“দেখলে তো? এই তো বেশ চডতে পেবে গেলেও গুড!”

বুদ্ধ ভিকিবি—“কিস্ত বৌদিদি অতো ডাইনে-বাঁয়ে প্যাচ কৰছিলেন ক্যানে? সিধে যেতে পাবেন নাকো? সিধে যাওয়াই তো ভালো।”

কানাই, (সগর্বে)—“আব একটু প্র্যাকটিস কল্লিই সিধে যেতে পাববেন—ব্যালাস্টটা এসে যাবে—প্রথমবারেই দিদি প্রায়ই শিখেই ফেলেছেন”—

ছোট মেয়ে, (সভয়ে)—“থাক, আব শিখে কাজ নেই। এই পর্যন্তই থাক। মা আব একটু হলেই গয়লাদেব চাপা দিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজেও গোববগাদাতে পড়ে যাচ্ছিলেন, অল্প একটুব জলো, নেহাৎ বাই চাস—”

বানী (দূব থেকে, অদৃশ্য দেবতাদের নমস্কার কবে)–

–“দুগ্ধা–দুগ্ধাঃ! অ বর্ডদিদি ছোডদিদি, তোমাদের মা জননীকে এবাব ডাকো  
–ভালোয় ভালোয় ঘবে ফিইবে নে এসো বাছাবা–আব মপেট চালিয়ে কাজ নি  
গো মায়েব–ঈ কী পেহাড”–

বাইবে রাজ্যজযেব মতো মুখেব ভাব হলেও আমাব বৃকেব ভিতব দুক-দুক।  
সই যে দোলনচাঁপাব ক্ষুদ্রে ছেলেটি বদ্বৈতে একটা সৰু সঁকো পাব হতে হতে  
গলেছিলো না,—“আই অ্যাম নট অ্যাট অল আফ্রেইড,—কিন্তু মনে মনে বিসোন  
ভয়—” ঠিক সেই অবস্থা।

গয়লাবা তো গানবাজনা বন্ধ কবে প্রাণভয়ে, “হায় বাম!” বলে ঢোল ফেলে  
উঠে দাঁড়িয়েছে। গরুগুলো নেহাত খেঁটায় বাঁধা, কিন্তু তাবা বহুদ্রষ্টা প্রাণী, ঠিকই  
বুঝেছে একটা কিছু ভয়ংকর কাণ্ডকাবখানা সংঘটিত হতে চলেছে। একটা বেয়াডা  
গছুব ভয় পেয়ে গিয়ে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে কেঁদেই উঠলো—“হান্‌-উ-উ”...কী  
লক্ষণে গরু বে বাবা।

নাঃ! এদিকটাতে সতিই আব প্র্যাকটিস কবা যাবে না দেখছি। ইতিমধ্যে  
আমাদের দলে বাস্তা থেকে আবও একজন কর্তব্যাক্তি এ-পাড়াব প্রহরী সাবমেয়টি,  
এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি সবলে সৰু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি  
আত্মস্থ পদক্ষেপে, স্থিতধী-স্টাইলে মোপেডটি হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছি, সঙ্গী  
সাবমেয়ও ধীবপদে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছেন, মহাপ্রস্থানের স্মৃতি মনে না পড়ে  
উপায় নেই।

সে যাই হোক, এদিকটায় আব নয়। এবাব ববং পূর্বদিকে, মাননীয় জ্যোতিবাবুব  
বাড়িব ওদিকটায় যাই। ওখানটায় খাটাল নেই, গয়লা নেই, গোবব নেই, গরু নেই,  
বাছুব নেই। শুধু ঘুমন্ত পুলিশ আছে কিছু। কেননা ওখানে জ্যোতিবাবুও নেই।

মের্মনি ভাবনা তেমনি কাজ। আমাদের বাড়িটা যেহেতু তিনমাথাব মোড়ে, তাই  
ভাবনা বহুমুখী। পশ্চিমে আব নয়, এবাব পূব-দক্ষিণে। ও মোড়ে পৌছেই, হ-  
ট-শ—সামনে টানা ফাঁকা বাস্তা...চালাও পানসি বেলঘবিয়া। স্টীয়াবিং হ্যান্ডেল এবাব  
এইনে-বাঁয়ে নয়, নাকেব সিধে। এবাবেই পাবফেকশানে পৌছে যাবো। চমৎকাব  
গাস্ত। একদম ফাঁকা।

কিন্তু এ কী হলো হঠাৎ? বাপবে মবে গেলুম, মবে গেলুম। ছাঁক কবে পায়েব  
মে একটা গবম আগুনের ছ্যাকা কে যেন লাগিয়ে দিলে। ওমন আপনা আপনি  
হাত কেঁপে উঠে অ্যাকসেলাবেটব ঘুরিয়ে ফেলেছি ছাঁকাব চোটে। সঙ্গে সঙ্গে দয়ংক্রিয়  
বাবটেব স্টাইলে লাম্ফিয়ে উঠে জ্যামুন্ড তীবের মতো নাকেব সোজা ছুটলো আমাব  
সপ্ত-ঘোড়াব বাহন, একেবাবে পুষ্পকবথেব মতো—মাটিতে না আকাশপথে তাও  
ঠিক বুঝতে পারছি না—কানে এলো পবিত্রাহি চীৎকাব—সবাব ওপবে আমাবই গলা:  
আমি—“আমি নামবোঁ, ওবে আমি নামবোঁ”...

ছুটন্ত বড় কন্যা—“ব্ৰেক, ব্ৰেক, সপ্তে সপ্তে আকসেলাৰেটৰটা উল্টোদিকে ঘোৰাও—ব্ৰেক, ব্ৰেক।”

ছুটন্ত ছোট কন্যা—“অ মা মাগো, নেমে পড়ো মা, ব্ৰেক দিযে দাও মা, ব্ৰেক—মা গো অ মা”—

ছুটন্ত কানাই—“ব্ৰেক ডান হাতে, অ দিদি, ব্ৰেকটা ডান হাতে, দিদি, ব্ৰেক ডান হাতে”—

ছুটন্ত ভিকিবি—“ওবে মুখপোডা তুই থাম না বে, বৌদিদি ঠিকঠাক বেবেক মাৰবে, তোবা থামলিই বেৰেক মাৰবে. তোদেবকে চেঁচাতে হবে নে ব্যাটাৰা”—

বাড়িৰ সামনে দণ্ডায়মান বানী—“হায় হায় হায়—হুয়ে গেল! এইবাব ঠিক সন্ধানশ হবে গো—হে মা দুগগা—হে মা দুগগতি নাশিনি—বক্ষ কবো মা—”

ছুটন্ত কুকুৰ—“ঘৌ ঘৌ ঘৌ ভৌ ভৌ ছৌ ছৌ ছোঃ ছোঃ”

উডন্ত আমি—“ওবে এয়ে থামচেঁনাৰে—ওবে এয়ে থামচেঁই না—”

ছোট কন্যা—“হে ভগবান”—

ভগবান গুনতে পেলেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীৰ বাড়ি ‘ইলাবাস’ আব শিল্পী সুনীলমাধব সেনেৰ বাড়িৰ মাঝবৰাবৰ ভগবান প্রচুব বালি ঢেলে বেখেছিলেন। যেন আমাবই প্রতীক্ষায়। পাখিৰ মতো উড়ে গিয়ে আমাব মোপেড সেই ঐশ্বৰিক বালুকাবেলায় সজোৰে ঢুকে পড়লো। মোপেডসুদ্ধ আমি বালিৰ মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম। চমৎকাৰ চাঁদনি রাত। বালিতে শুয়ে শুয়ে মাথাৰ ওপৰ চেয়ে দেখলুম, চাঁদেৰ মুখানা হাসি হাসি। নক্ষত্ৰেৰ শ’য়ে শ’য়ে চোখ টিপুনি। কী গো? কেমন হলো? লাগলো কেমন? বেশ ভাই!

ততক্ষণে পাডাব সবগুলো বাবান্দাতেই আলো জ্বলছে। একটা অডিয়েন্স তৈৰি হয়ে গেছে। প্রতিবেশীৰা সবাই বাইবে। শুধু পুলিশেৰা ভিতৰে। সার্কাস দেখাব উদ্ভেজনা বাতাসে খেলে বেডাচ্ছে। প্রত্যেকেই উত্তপ্ত, প্রত্যেকেই বিজড়িত, প্রত্যেকেই একটা পয়েন্ট-অফ-ভিউ আছে। দীপকবটা থাকলে একটা ওপিনিয়ন পোল নিয়ে নিতো—ভাগিস সে ব্যাটা অনুপস্থিত। পডশীৰা সকলে যাব যতোটুকুন সাধা উদ্দীপনা যোগাচ্ছেন—সেই যখন একটী ছেলে ওই কেয়াতলাৰ মোড়ে সাত-দিন টানা সাইকেল চালাবে বলে ঘোষণা কৰে তিনদিন একটানা সাইকেল চালিয়েছিলো—ঠিক তেমনি টেনস আবহাওয়া তৈৰি হয়েছো। উদ্ভেজনাৰ উলটো সিগাৰেট ধনিয়ে সামনেৰ বাড়িৰ দাদা বলছেন—“পিকো, তোব মাকে চাব চাবাতেই মানায় ভালো”—নাইটিৰ ওপৰ হাউসকেট চড়িয়ে বৌদি বলছেন, “টুম্পা। মোপেডটা মাকে ধৰতেই দিস না।” বালি ঝাডতে ঝাডতে উঠে দাঁডাই। চতুৰ্দ্দিক সহানুভূতি চাঁদেৰ আলোৰ মতো বয়ে যেতে থাকে।

“কী থকুভাই? লেগেছে নাকি?”

—“একটু আধটু না পড়লে হয়? জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতৰ সাইকেল শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড”...

—“ঘাবডাস না বে খুকু, আব ক’টা দিন প্র্যাকটিস কবলেই তুই ঠিক তোব মেয়েব মতন চালাতে পাববি—”

“ও কিছু না, লেগেছে ভাবলেই লাগবে—মনে কব পডিসনি।” কুকুবকপী মহাত্মা বললেন—

“নাবদ নাবদ লাগলাগ দূব দূব ভাগ ভাগ ভৌ ওউ যাও যাও ঘবেব মেয়ে ঘবে আও।” লাঠি-বাটি-পুটুলি সামলে সমানেই কানাইয়েব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছেন বৃদ্ধ ভিকিবি। আমাব এই পাবলিক বথসঙ্ঘলনে তিনি যাবপবনাই বিমর্ষ। আমাব মোপেড প্রশিক্ষণেব যৌথ পবিশ্রম তো কম ক্লাস্তিকব ছিল না। তিনি এখন কানাইকে ডেকে বলছেন—“ভাইটি একটু টিউকলটা পাম্প কবে দেবে? টুকুনি জল খাবো।” দিদিব কীর্তিতে সলজ্জ, নির্বাক কানাই, হাটু অবধি প্যান্ট গুটোনো। আমাব মেয়েব মোপেড ঠেলে নিয়ে আসছে। দুই মেয়ে দুই পাশে ঘন হয়ে লেপ্টে এসে দুই কানে গুনগুন কবে বলছে “বেশি লাগেনি তো? মাগো? বেশি লাগেনি তো?” আমি প্রাণপণে চেষ্টা কবছি না খুঁড়িয়ে সহজভাবে, এবং গ্রেসফুলি হেঁটে বাড়িতে ঢুকে পডতে। কপিলদেব ক্যাচ লুফে আউট কবে দেবাব পবে ইমবান খান যেভাবে আস্তে হেঁটে সেদিন প্যাভিলিয়নের দিকে আসছিলেন, (আহা আউট হয়েও কী গ্রেস, কী পযেজ)—অনেকটা সেইভাবে একদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে স্টাইলিশভাবে পা ফেলবাব চেষ্টা কবছি—পথেব দু’পাশে চেনা-অচেনা উৎসাহী দর্শককুলেব গার্ড অব অনাবেব মাঝখান দিয়ে। কিছু সদ্যোন্নত বিকশোওয়ালাব পাশাপাশি গয়লাবাও ও-মোড থেকে হেঁটে এ-মোডে চলে এসেছে, তামাশা দেখতে। এমনকী মহামানা পুলিশবাও আডমোডা ভেঙে উঠে এসেছেন। কেবল গকগুলোই যা খোঁটা উপড়ে ছুটে আসতে পাবেনি।

কান গবম, পা জুলে যাচ্ছে, কোনোবকমে যেন কিছুই হয়নি ভাব কবে বাড়িতে এসে পৌছেই কাতবে উঠলুম—“বার্নল। বার্নল। আমাব পা পুড়ে গেছে।”

—“পা পুড়ে গেছে? সেকি? বাত দুপূবেও বালিটা গবম ছিলো নাকি?”

—“কেটেকুটে যায়নি। পুড়ে গেল? সে আবাব কি?” বানী কপাল চাপড়ে বললো—“পুডবেনি? পুডবেই তো। কলিকাল। দিনে দিনে আবো কতো কী চোক্ষে দেখবো কে জানে?”

কানাই বড শাস্ত ছেলে। ইতিমধ্যে গাড়িটি পরীক্ষা কবে খুব গবম একটা জায়গা বেব কবেছে যেটা চামডাতে ঠেকলে ছাাকা লাগবেই লাগবে। কিন্তু সেখানটা মোটেই চামডাতে ঠেকাব কথা নয়। আমাব চডাব গুণেই ঠেকে গেছে। কানাইয়েবও কখনো ছাাকা লাগেনি, পিকোবও নয়। ওবা তো দিবি নিবাপদে চালিয়েছে। ওদেব নিঃশব্দ হাস্য আগ্রাহ্য কবে মাব কাছে চলে এলুম। খোঁডাতে খোঁডাতে। মা ঘববন্দী মানুষ। বাবান্দায় বেরুতে পাবেন না। ওদিকে বাস্তায় যে কীদৃশ নৈশবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে মা কিছুই টেব পাননি। এক মুখ উজ্জ্বল হেসে মা আমাকে বিসিভ কবলেন।

—“আয়। বোস। হলো শেখা?”

—“ওই একবকম।”

—“পাবলি চালাতে?”

ঠিক এমন সময়ে কানাই এসে বললো:

—“দিদি, বার্নল।”

—“বার্নল? কেন বে, বার্নল কী হবে?”

—“পা পুড়ে গেছে দিদিব।”

—“খুব লেগেছে, না মা? দেখি দেখি—”

—“আশ্চর্য। আমবাও চডি, কখনো পা পোড়ে না, তুমি পোড়ালে কেমন কবে বলো তো?”

—“পা পোড়ালি কি না গাড়ি চালাতে গিয়ে? একি বান্নাবান্না? আশ্চর্য মেসে বাপু।”

—“ওই মোপেডেব এগজস্ট পাইপে ছাঁকা খেয়ে গেছেন।”

—“সেকি বে? খুকু? সত্যি।” কন্যাব গাড়ি চালানোব চমৎকাবিত্বে অপবিসীম বিশ্বাসী মা-বেচাবীব দুই চোখে বিশ্বয় বিস্ফাবিত বেদনা। অর্থাৎ মাব চোখ বলছে—  
—“আদ্দিন কলকাতা শহবে গাড়ি চালিয়ে শেষে কিনা এ-ই?” গাড়িব এগজস্ট পাইপ থেকে যে পায়ে ছাঁকা লাগতে পাবে না মাকে সে ব্যাপাবটা বোঝাই কী কবে?

—“বেশি লাগেনি। একটুখানি ফোস্কা।” লজ্জিতভাবে বলি।

—“দেখি, দেখি? ও কবাব। এ যে অনে—কখানি বে?” মা কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চূপ কবে থাকেন। মেয়েবা সযত্নে বার্নল লাগিয়ে দেয়। মা দ্যাখেন। ফার্স্ট এড শেষ হল, মা ফোঁস কবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাডেন। আমি তাডাতাড়ি বলি—  
“ফোস্কাটা সেবে গেলেই আবাব”—

—“থাকগে, যাকগে। ও আব হলো না। তোমাব আব মোপেড চালিয়ে কাজ নেই মা, তুমি তোমাব চাব চাকাব যত্নব নিয়েই থাকো। পিকো যোটা পাবে, তুমিও সেটা পাববে, আমি এইটে ভেবেছিলুম।” মা মর্মহত। অক্ষম সন্তানব উচিত সঙ্কোচেই আমি অনেকখানি মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে চূপ কবে থাকি। সত্যিই তো। পাবিনি। মোপেড আমি চালাতে পাবিনি। তবু সাহস কবে বলে ফেলি:

—“পায়ে ছাঁকাটা যদি না লাগতো মা—”

—“পিকোব কি ছাঁকা লেগেছিলো?”

—“ও তো জিনস পবে।”

—“তোমাকে জীনস পবতে কে বাবণ কবেছিলো? যে দেবতার যা মন্তব।”

—“যাঃ বাবা। মোপেডেব জন্যে জীনস পবে শেষে যাদবপূরে? থাক মা, আমাব ভাঙাচোবা গাড়িটাই ভালো।”

পবদিন কলেজে যাবো, গাড়ি বেব কবছি। বানী বকে বসে মূড়ি খাচ্ছে। আমাকে দেখে হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বললে:

—“এই তো, দিব্বি মাইনেচে এবাবে। বলি। পায়েব সেই ফোঙ্কাটা আজগে আছে কেমনি? বইলেনি গা দিদিমনি, ঝাব কস্মো তাবে সাজে অন্যঝনের নাটি বাজে। বো বয়সেব ঝা।”

## অজাচার

### প্রথম দৃশ্য

দাদামণিব শোবাব ঘব। ঢুকেই দেখলুম গলায় একটা মটকাব চাদব ঝুলিয়ে আয়না-আলমাবিব সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি কবে হেসে হেসে চোখ ঘুবিযে দাদামণি—“এসো দাদু? এসো দাদু?” বলছেন। আমাকে আয়নায দেখতে পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসে—“এই যে খুকু, আয় আয়। আমি কি বলে, ওই দাদুগিবিটা একটুখানি প্র্যাকটিস কবে নিচ্ছিলুম আব কি। টুলুবা এক্সুনি এসে পডবে কিনা। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি নাতিবাবুকে আনতে। দাদুগিবিটা, বুঝলি খুকু, ঠিক যেন যুৎসই হচ্ছে না—”

—“যুৎসই আব হবে কি কবে? সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছবেব ছেলেবা এখনো বোববাব সকালে হাণ্ডাটি পবে বাস্তায় ক্রিকেট খেলে বেড়াচ্ছে। আব তুমি সাত তাডাতাডি নাতি-টাতি ম্যানুফ্যাকচাব কবে ফেলে আহ্বাদে গদগদ। কৈগো বৌদি, এককাপ চা।”

—“আই আম অলওয়েজ আহেড অফ মাই টাইমস”, দাদামণি বললেন, “কিন্তু নাতি বানানোব ক্রেডিটটা আমাব নয়, মেয়ে-জামাইযেব। তবে নাতিটা একটা দাকগ জিনিস হয়েছে। যাই বলিস। টুলু-বুলু কিন্তু এমন ট্যালেন্টেড ছিল না।”

—“তিন মাসেই ট্যালেন্টের এত কী দেখলে?”

—“বাঃ, ট্যালেন্ট নেই? আমাদের প্রত্যেকের মুখ চেনে। ফ্যাবেক্স খায় না। চাঁপাকলা খায় না। থু থু করে ফেলে দেয়। সববিকলা খায়। মুসুসিব বস খায় না। কমলালেবু বস চেটেপুটে খেয়ে নেয়। এব মধোই মায়েব দুধেব সঙ্গে বোতলেব দুধ খাচ্ছে। ট্যালেন্ট নেই?”

—“টুলু-বুলুও যথেষ্ট বুদ্ধিমান, ব্রাইট ছেলে-মেয়ে।”

—“কোথায়? জানিস খুকু—বুলু আজ আমাকে কী অপমান করেছে? নাতিবাবুব মুখে বোতল ধরাটা একটু প্র্যাকটিস কববো বলে হর্লিস্কের বোতলে জল ভবে বুলুকে যেই না ডেকেছি, আফটাৰ অল ওই তো কোলের সন্তান—‘বুলা আয় তো বাবু, একটু শো তো দেখি আমার কোলে এসে’—অমনি কি বলবো, খুকু, যেন পেট্রল-বন্স বাস্ট করলো।—কী বললো জানিস? বললে:—‘ডোস্ট টক ননসেন্স, বাবা! কী, হচ্ছেটা কী? এখন আমি পডছি। আমাকে ডিস্টার্ব কোবো না, বলে দিলাম!’ এমনিতে তো কখনোই “আমি পডছি” এই সেন্টেন্সের কনস্ট্রাকশন হতে দেখি না বাড়িতে। ভাবতে পারিস তোর মেয়েবা তোকে এবকম বলছে?”

—“খুব পাবি। বাবাব কোলে শুয়ে ক্লাস নাইনেব ছেলে হর্লিস্কের বোতলে কবে জল খেতে বাজী হয়নি কেন,—এ নিয়ে অভিযোগ ত্রিভুবনে একমাত্র তুমিই কবতে পাবো দাদামণি।”

এমন সময়ে বৌদি ঘবে এলেন। সৰু কোমবে লাল ডুবে শাড়িৰ আঁচল জড়ানো। কাঁধেৰ ওপৰ দিয়ে মোটা কালো বেগীটা সামনে এসে পড়েছে, কপালের সিঁদুরটিপ ঘামে লেপটে মুখখানা আবো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আবো নবম। মুখেৰ চাবপাশে উডো চুল, হাতে দু’কাপ ধোঁয়ানো চা। সাজলে গুজলে বিয়েবাড়িতে বৌদিকে নতুন বউ বলে ভুল করতেই পারে লোকে। মেয়েৰ বিয়েতেও এমনিই বিনুণী বুলিয়ে মাকড়ি দুলিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছেন, এখন দিদিমা হয়েও নো চেঞ্জ। বেয়াল্লিশেই থার্ড জেনারেশনে উন্নীত হয়ে বৌদিৰ বেশ অহংকাৰ হয়েছে মনে হয়। এখনো বৌদি নিজের মেয়েৰ সঙ্গে শাড়ি-ব্লাউজ বদলা-বদলি কবে পবেন, ছেলে-মেয়েৰ বন্ধুদেব সঙ্গে দল বেঁধে হিন্দি ছবি দেখে, ফুচকা খেয়ে বেড়ান। বৌদিকে ঢুকতে দেখেই নাদামণি বললেন—“ওকি? ডুবে শাড়িটা ছেড়ে ফ্যালো। এখন থেকে তুমি শাদা জামা শাদা শাড়ি পরবে। আব আমাকে কেবল শাদা শাদা আদিব পাঞ্জাবী কবিয়ে দেবে। আবও একটা জববি কথা। বিনা চাদবে কিন্তু বাস্তায় বেববে না।”

—“চাদর?” —বৌদি তো অবাক। মানে অ—বাক। তাবপর বলেন—“কেন? চাদব কী হবে? এখন তো গ্রীষ্মকাল।”

—“শীত-গ্রীষ্মেৰ কথা হচ্ছে না। যে বয়েসের যা। পাবলিক প্লেসে ঠাকুমাদিদিমাদেব গায়ে চাদব মুড়ি না দিলে মোটে মানায় না। বুঝেছ? বি সেনসিবল।”

—“সেনসিবল? এই গবমে চাদর মুড়ি দেওয়াটা সেনসিবল?” বৌদিৰ চোখ কপালে উঠলো। মেজাজও। খুব শাস্ত গলায় বহ্লন, “তোমাকে না মানায়, তুমি ববং চাদর জড়িয়ে মানানসই হও গে যাও, আমাব অত মানিয়ে কাজ নেই—আমি যেমন আছি তেমনই থাকবো।”

ঠক কবে টেবিলে দু’কাপ চা নামিয়ে রেখে বৌদি বেবিয়ে যান।

আমাদেব জন্য কাঁকড়া বাঁধতেই গেলেন নিশ্চয়। ছুটির দিনে দাদামণিৰ বাড়ি



যাবাব প্রধান কারণ বৌদিব বান্না। বান্নাঘব থেকে এবাব বৌদিব গলা শোনা যায়—“বাপ বে বাপ। নাতি যেন জগতে আব কাকুর হয়নি, ওঁবই প্রথম।”

## দ্বিতীয় দৃশ্য

দাদামণিব বৈঠকখানা ঘর। দাদামণি কোলে ভোয়ালে পেতে, বোতল ধরে নাতিকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। বৌদি বান্নাঘবে। টুলুবলুকে নিয়ে জামাইবাবাজী মর্নিং-শোতে সিনেমা দেখতে গেছে। আমি মনে মনে ধাই-মাব ভূমিকায দাদামণিব উৎকর্ষ বিচাব কবছি। আর বান্নাঘবেব চমৎকাব সব উড়ে-আসা গন্ধে আমোদিত হচ্ছি। বেকর্ডে মেহেদী হাসানেব গজল, শুনতে শুনতে নাতি দুধ খাচ্ছে।—“মেহেদী হাসানটা ওব খুব পছন্দ বুঝলি? বুলা ইংবিজি পপ-সং লাগালেই ও ডুকবে কেঁদে ওঠে। শালাব কিন্তু খানদানি টেস্ট আছে।” দাদামণি সগর্বে বলছেন, এমন সময়ে হস্তদন্ত বসনমামাব প্রবেশ। গায়ে কালো কোট, হাতে শোলাব হ্যাট, পায়ে বুটজুতো।

—“আবে সূট, শোনলাম তব নাকি নাতি হইসে? হেইয়া নাকি নাতি? বাঃ বাঃ গ্র্যাণ্ড। টুলুব পোলাখান ত দেহি টুলুব ববেব থিক্যাও হ্যাণ্ডসাম হইসে। হেল্লো, জেস্টেলম্যান। হাউ ডয় ডু? তা—ভূমি খাও কী? কী খাওয়াইতাসো বটলে কইব্যা? সূট? বটলে কী বস্তু? বেবিফুড না তো?”

—“বেবিফুড না তো কী? বেবি বেবিফুড খাবে না তো কি শাম্পেন-কাভিয়াব খাবে, বসনমামা?” শুনে বসনমামা চমকে ওঠেন। দাদামণিব শ্লেষ-টেশ গায়েই মাখেন না।

—“সর্বনাশ। কও কি? পইজনন...। পইজন-ন...। খাইসে, কি গেসে। ইংবাজী পত্রিকা-ঠত্রিকাগুলাব কিসুই আব পড়স না তবা। হেই দিনকাইল কি আব আছে বে? যে বেবিফুড খাইয়া ভীমভবানীব লাহান মাসকিউলার বডি হইবো? অহন তো সবই অ্যাডালটাবেইটেড। সব ভেজাল, সব নকল। হেইয়াও জানস না? তেতুলেব বাঁচি আব ধতুবা ফলেব গুডাব ফাইন মিকশাব। তিন বৎসব থিক্যা চশমা। গ্যালপিং মাইওপিয়া। বিশ বৎসবে ছানি। শ্লে পইজনিং কিনা? পচিশে টোটাল ব্লাইনডনেস। ত্রিশে পক্ষাঘাত অর্থাৎ পেবালিসিস। চল্লিশে শায্য। অথবা সিনাইল। একিউট প্রোটিন ডেফিশিয়েনসি হইয়া ব্রেইন ফাংশনিংডা নষ্ট কইবা দেয। আব এডিশনাল কমপ্লিকেশনস তো আছেই—আট থিক্যা দশে গেন্ড্রিক ট্রাবুলস বিগিন কববো, বিটুইন টেন টু ফোবটিন হবমোনাল কমপ্লিকেশনস—আব—”

—“এ মা গো! কী হবে তাহলে? এসব কী বলছেন গো বসনমামা?” আর্ডনাদ কবে বৌদি ছুটে এসেছেন বান্নাঘব থেকে। হাতে খুস্তি। দাদামণিও ভয় পেয়েছেন। নাতিব মুখ থেকে বোতল সবিয়ে নিয়েছেন। নাতি বেগেমেগে বুথ সাহেবেব বাচ্চা হয়ে গিয়েছে। মেহেদী হাসানকে গ্রাহ্য না কবে পেল্লায় চোঁচাচ্ছে। একমাত্র ভীষ্মলোচন

শর্মা ছাড়া তাকে আব কেউ এঁটে উঠতে পাববে না এখন। সেই চিংকাব শুনে কেঁপে উঠে অগত্যা বসনমামা বললেন, “দিয়া দে। দিয়া দে সুটু! এই টাইমের লেইগ্যা বটলটা দিয়াই দে। বাপস। নাতির লাংস দুইখান কী।”

—কিস্ত দে বললেই তো দেওয়া যায় না। দাদামণিব বোতল ধবা হাত আব ওঠে না নাতির মুখে। বেগে নাতি পা ছুঁড়েছে। দাদামণিবই নাতি বলে এখন বেশ তাকে চেনা যাচ্ছে। আব দাদামণিব মুখের দিকে একপলক চেয়েই তাঁব মনেব কথাগুলো আমি স্পষ্ট বুঝতে পাবছি। বিশেষ ছানি? বলে কি? চল্লিশে শেষ? দাদামণি নিজেই তো আটচল্লিশ। দিবা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে হ হ করে উন্নতি কবছেন। আজ জাপান কাল আলজিবিয়া পবন্ত কামচকাটকা—তবে কি একেই বলে সেনিলিটি? ...অবশেষে দাদামণিব বাক্য ফুটলো—

—“বসনমামাব এই প্যানিক সৃষ্টি কবাব স্ভাবটা আব গেল না। দূব দূর। প্রতিমা, তুমি যা কবছিলে, কবো গে যাও।” বৌদি গেলেন না। বললেন—“ভয় দেখিয়ে বসনমামাব লাভ? শুধু শুধু ভয়ই বা দেখাবেন কেন?”

—“আমাদের মামাকে তুমি বেশি চেনো? না আমি?”

—দাদামণিব এহেন দুর্বল বিতর্কে কান না দিয়ে বৌদি আকাশ থেকে পড়লেন:

—“তাহলে কী হবে মামাবাবু? মাযেব তো দুধে কুলোবে না? নাতিবাবু খাবে কী?” বসনমানাব উত্তর বেড়ি ছিল:

—“ক্যান? দুধ? হক্কলে যা খায়। গোদুগ্ধডা অহনই দিয়া কাজ নাই, গুরুপাক। অবশ্য গোদুগ্ধ নামে যা মাল বাজাবে পাওয়া যায়, হেইয়া গুরুপাকও না, লঘুপাকও না। প্রপাব মিক্কই না—গরু ভইস পাইডাব মিক্ক সবকিছু গঙ্গাজলে মিশাইয়া, ঘ্যাট পাকাইয়া গো-দুগ্ধ বইল্যা বিকায়। ছাগদুগ্ধডাই যা আন-অ্যাডালটাবেইটেড আছে। ছাগদুগ্ধ পানে অমৃতপানেব ফল হয়।”

—“ছাগলেব দুধ? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে ল্যাকটোজেনটা নাকি ছাগলেব দুধেব বেসিক কম্পোজিশনেব মতো কবেই তৈরি হয়—”

—“মতো কইবা হইলে কি হইবে? হেইয়া তো কালাবাজাবে অ্যাডালটাবেইটেড হইয়া তবে তোমাগো হাতে আসে। ফ্রেশ ছাগদুগ্ধ সংগ্রহ কর সুটু। ছাগদুগ্ধ হাড় শব্দ কবে, ব্রেইন শার্প কবে, কোষ্ঠ পবিকার কবে। ছাগদুগ্ধেব গুণেব সীমা নাই—পিত্তকফেব কোপ নিবসন কবে। হজমশক্তি বর্ধন করে। বোঝালা বৌমা? ছাগদুগ্ধ দৃষ্টি, শ্রুতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, বলবর্ধক। যক্ষ্মাকাশ, হাঁপকাশ, হৃদবোগ অবশ্য নিবাময় কবে—”

—“আব ক্যানসাব সাবায় না? কুষ্ঠরোগ নিবাময় কবে না?”—দাদামণিব বিদূপ গ্রাহ্য না কবে বসনমামা কনটিনিউ কবেন—

—“শুন, বৌমা, ছাগদুগ্ধেব লাহান এমুন উপকারী বস্তু শিশুদেব পক্ষে আর কিসুই নাই। গাঙ্কাজীর কথাডাই মনে কইবা দেখ—তিনি কী কইতেন? কইতেন

—‘আমাগো জীবনই আমাগো বাণী।’ আমিও হেইডাই স্মরণ কবাইয়া দিতাসি। ওনাব সাথে সাথে একপাল দুন্ধবতী ছাগ সর্বত্র ট্রাভেল কইবা বেডাইত, মনে নাই? বিনা ছাগলে উনি জাতিব জনক হইতেন কিনা সন্দেহ আছে! আমি বাবা বেইল কম্পানিব লোক, আমি সব জানি।’ বসনমামা হাসলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। —“বেঙলাবলি ঐ ছাগদুন্ধা খাইতেন বইলাই গান্ধীজী ক্যাবল কৌপিন পইবা শীতে-গ্রীষ্মে ঝাড়া অশিডা বৎসব দিব্য বাইচ্যা আছিলেন। মাথাডা ঠাণ্ডা বাইখ্যা ইংবাজেব বিকন্ধে ঠাণ্ডা লডাই চলাইতে পাবছিলেন। বোঝলা বৌমা?” বসনমামা টুপিটা টেবিলে বেখে বসলেন এতক্ষণে। বৃট খুলতে খুলতে বললেন—“ছাগদুন্ধের সান্ত্বিক গুণ অসামান্য। প্যাট, মাথা, শবীল শীতল বাখে। এই গবম দ্যাশে যেইডা কিনা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ এসেইনশিয়াল। গান্ধীজী হইলেন গিয়া হেইয়াব বেইস্ট এগজামপুল। কুল ট্যাম্পাব, ক্যালকুলেটেড ওয়ার্ডস—অমন ফাইন সেন্স, অমন ধীর বুদ্ধি পলিটিকসে আব তো কারোবই দেখি নাই। মৃত্যুব মুহূর্তে পর্যন্ত ওনাব মাথা কী ঠাণ্ডা—খুনীডাবে ফার্স্ট গালি দিতেই নিসিলেন, কিন্তু নেক্সট মোমেন্টে পাবলিকের কথা স্মরণ কইবা, বাস —বাস—ক্যাবল ‘হাবাম’টুক কইয়াই চুপ। এক্কেবে ফুলস্টপ!! ঈশ—দেখ দেখি, কী সেইলফ কনট্রোল। কী লাস্ট মোমেন্ট ক্যালকুলেশন। ‘হাবাম—’ ছিল ইনকমপ্লিট অ্যাডজেকটিভ হইয়া গেল গিয়া ‘হা—বাম’ কমপ্লিট ইন্টারজেকশন। এই উপস্থিত বুদ্ধিব মূলে কী? না,—ছাগদুন্ধ।”—বসনমামা নস্যিব কৌটো বেব কবলেন।

বৌদিব চোখেমুখে ততক্ষণে গভীর শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। দাদামণি নাতি কোলে বাবান্দায় পায়চাবি কবতে গেছেন বলে মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

—“কিন্তু মামাবাব, ছাগলেব দুধ এখন পাই কোথায়?”

—“বাজভবেন।” বৌদিব প্রশ্নেব উত্তরে বারান্দা থেকে দাদামণিব গলা আসে। —“মেড ইন আফগানিস্তান। দেড লক্ষ টাকা দামেব ফবেন ছাগল পাবে। একটা চুবি গেছে—কিন্তু আবেকটা আছে। একটা ফোন কবে দ্যাখো না বাজাপালকে, তোমাকে দুধ বেচবেন কিনা।”

—“তোমাব সবটোহেই ঠাট্টা। যোগাড কবতে পাববে না তাই বলে দাও না?”

—“পাববে না? কে না জানে কলকাতা শহবে টাকা ফেললে বাঘেব দুধ পাওয়া যায়, আব ছাগলেব দুধ পাওয়া যাবে না? কী যে ছেলেমানুষী কথা বলো না তুমি, প্রতিমা।” দাদামণি অনামনস্ক হয়ে নাতিব মুখে বোতলটা কখন ফেব গুঁজে ফেলেছেন। সেও শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে এসে নাতিকে খাটের ওপৰ সাবধানে নামিয়ে বেখে দাদামণি বৌদিকে বললেন:—“কবে চাই?” বসনমামা এটাতেও ইমপ্রেসড না হয়ে প্রশ্নটা অগ্রাহ্য কবে বললেন—“বৌমা, তোমাগো এবিয়ায় ইশে নাই? আই মীন ছাগলওয়ালা? আলি মবনিঙে বাস্ত্য টুং-টাং টুং-টাং ঘণ্টিব শব্দ পাও না?”

—“আছে! আছে।” বৌদি নেচে ওঠেন। “মনে নেই গো? টুলবুলুবা ভোরবেলা কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরুলেই বাজা কী ভয়ানক তাড়া লাগায় ওই ছাগলগুলোকে? ছাগলওলাটা তো বেগেমেগে ছিড়ি নিয়ে টুলবুলুকেই তেড়ে আসে—” দু’হাত শূন্যে তুলে বসনমামা নেচে ওঠেন—“বাস। হেইডাই হইল তোমাগো এরিয়ার ছাগলওয়ালা। তুমি অবেই কণ্ট্রাস্ত কর। মান্থলি কণ্ট্রাস্ত কইব্যা, মাইপ্যা দুধ নিবা। জ্বাল দিয়া, এটুক পানি, ব্যাস। হইয়া গেল বটলে ভর্তি, দীর্ঘজীবন সুখ, শান্তি।”

### তৃতীয় দৃশ্য

আমাদের বাড়ির বাবান্দা। তখনো ভালো কবে ভোব ফোটেনি। কাকপক্ষীও ঘুম ভাঙেনি ঠিক ভালোমতন। সূর্যঠাকুরেবও খোঁয়াড়ি কাটেনি। আধো ঘুমে মনে হলো যেন পথ দিয়ে কারা চমৎকাব ভজন গাইতে গাইতে যাচ্ছে। তাই আবছা আধো-জাগরণেব অবস্থাতেই বাবান্দায় বেবিযে এলুম স্পন্ন না সত্যি জানতে। চমৎকাব দৃশ্য। ঠাণ্ডা নীলচে গোলাপী বাতাসে একদল মাঝবয়সী স্ত্রী-পুরুষ মিছিল কবে ভজন গাইতে গাইতে পথপবিক্রমা করছেন। একেই বোধহয় ব্রাহ্মমূহূর্ত বলে। গানে লীড দিচ্ছেন একটি মোটা দক্ষিণী মহিলা, আমাব চশমাবিহীন নজবে যাকে আশা ভোঁসলে বলে মনে হলো। গলাটিও খুব মিষ্টি। হঠাৎ দেখি মিছিলেব পেছ পেছ আপনমনে ছুটন্ত ও কে? দাদামণি না? দাদামণি তো।—“ও দাদামণি। দাদামণি! কোথায় চললে এত ভাবে?” দাদামণি ছুটতে ছুটতে বললেন—“গুড মর্নিং।”

—“তুমিও এই গুরুব শিষ্য হয়েছো নাকি?”

চশমাব ফাঁকে, দাদামণি তাঁব বড বড চোখ তুলে মৃদু হেসে বলেন—“পা—গল। দি গ্রেটেষ্ট টাট সাউথ অফ দি হিমালয়াজ—” দৌড় কিন্তু বন্ধ হয় না।

—“তবে?”

পবনে শাদা শটস, শাদা গেঞ্জি ভুঁড়িব সঙ্গে ঘামে এঁটে আছে, পায়ে ধবধবে মোজা। কেডস জুতো। মুষ্টিযোদ্ধাদের স্টাইলে হাতদুটো মুঠো বেঁধে, কোমবেব কাছে কনুই থেকে ভাঁজ কবে বেখেছেন। ছন্দে ছন্দে পা ফেলে ছোটোর মতন ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটছেন দাদামণি, তালে তালে কনুইসুদ্ধ হাতদুটি এগুচ্ছে পেছচ্ছে। একটা মুঠোয় একটা ঠোঙা। ঠোঙায় কোন খাদ্যবস্তু তা বোঝা যাচ্ছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে দাদামণি উত্তব দেন—“একা একাই জগিং করতে যাচ্ছিলুম—ওদেব পেয়ে জুটে গেছি—যা ছিনতাই,—দিনকাল ভালো না—বুঝলি তো?”

—“তোমাব কাছে ছিনতাইযেব মতো কী আছে? হাতে তো ঘড়ি নেই?”

—“পকেটে আছে। প্যান্টেব পকেটে। পার্সও আছে।” ছুটতে ছুটতে দাদামণি চোঁচিয়ে বলেন—মিছিল সেহেতু ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, তাই বেশ জোবেই বলতে হয়। আবো জোবে চোঁচিয়ে যোগ দেন—“পার্সে দু’শো টাকাও আছে।”—একেই গান

চলছে, তায় দূরত্ব। না চেষ্টাশে শোনা যাবে না, তাই আমিও চেষ্টাই—

—“ভোববেলা এত টাকা দিয়ে কী কববে?”

—“দিনটা ভালো,—বায়না দিতে যাচ্ছি—”

—“কিসের বায়না?” মিছিল মোড ঘুবছে। চাঁৎকাব কবে উত্তব দেয় দাদামণি—

—“ছা—গ—লে—এ—এ—ব...”

## চতুর্থ দৃশ্য

মাসখানেক পবেব কথা। বাজাব। হঠাৎ বৌদিব সঙ্গে দেখা। বৌদিব হাতে একঠোঙা ভিজ়ে ছোলা। মুখেও নিশ্চয় চিবোচ্ছেন দু'চাবটি, কেননা চোয়াল নডছে। তাঁব সামনে এক বুক পর্যন্ত গেঞ্জী গোটানো ছাগলওয়ালা, এবং অনেকগুলি ছাগল। ছাগলওয়ালার মুখে যেমন দাড়ি, তাব ছাগলগুলোবও ঠিক তেমনি দাড়ি। কে যে কাব সঙ্গে ম্যাচ কবে বেখেছে, দেখে বোঝাব উপায় নেই। বৌদি নিচু হয়ে একটি বিশিষ্ট ছাগলকে ছোলাব ঠোঙাটা অফাব কবলেন। ছাগলটি টুঁ মেবে ঠোঙা ফুটো কবে ছোলাগুলো বাস্ত্য ছিটিয়ে ফেলে শূন্য ঠোঙাটায় মনোনিবেশ কবলো। অন্যান্য ছাগলেবা মাটিতে ছড়ানো ভিজ়ে ছোলা খেতে বাস্ত্য হয়ে পড়ে। বৌদি বললেন:—“দূর দূর। এই বোকা ছাগলে চলবে না।”

—“ছাগল দিয়ে কী কববে, বৌদি?” যেন আমাকে দেখে খানিকটা ভবসা পেলেন বৌদি।

—“এই যে খুক। দ্যাখ তো, ছাগলটা কী স্টুপিড?”

—“ছাগল তো স্টুপিডই হবে। তা ছাগলেব বুদ্ধি দিয়ে তোমারই বা দবকাব কী?”

—“আমাব কেন হবে—তোমাব দাদামণিব খেয়াল? উনি ওঁব নাড়িকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ছাগলেব দুধ। এ-বাড়িতে বাজকুমাবই নিয়মিত দুধ দিয়ে এসেছে”, আমি মাঝখানে প্রশ্ন, “বাজকুমাব কে?”

—“বাজকুমাব মানে এই ছাগলওয়ালাটি। ওব কিন্তু শেয়ালদায় আমেব গুদোমও আছে— জানিস তো? মডলোক আসলে— চেহাবা দেখে যা ভাবছিস তা নয়—যা হোক এতদিন তো দুধেব ব্যবস্থাটা এখানেই হচ্ছিল, এবাব নাতি বাপেব বাড়ি ফিবে যাবে। উনি তাই সঙ্গে ছাগলসুদ্ধ দিয়ে দিতে চান—নাতিব যাতে দুধ খেতে অসুবিধে না হয়—”

—“নাতিব যাতে দুধ খেতে অসুবিধে না হয়, তাই ছাগলসুদ্ধ উপহাব? বাঃ। এ যে দেখছি সেই সাবেকী স্টাইলেব দাদামশাই-দিদিমার মতো কাণ্ডকাবখানা কবছো তোমরা। চমৎকার তো?” মুখে চমৎকাব বললেও মনে মনে বলি দাদামণিটাব সবটাতেই যেন বাড়াবাড়ি। নাতি যেন কাকব হয় না। সতাবো বছবে মেযেব বিয়ে

দিলে আঠারোয় তার বাচ্চা হতেই পারে এবং সেক্ষেত্রে অমন যুবতী দিদিমা সমেত ষণ্ডাশুণ্ডা দাদামশাই হওয়াটা বিচিত্র কিছুই নয়। দাদামণিব ভাবটা যেন ওঁব আগে ত্রিভুবনে কোনো দাদামশাই জন্মায়নি। তবে একথা ঠিক, বৌদির ব্যাপারটা একটু আলাদা। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে, কানে মারুড়ি দুলিয়ে ক'জন তরুণী দিদিমা ভিজে ছোলা খেতে খেতে ঠোঙটা অফাব কবতে পাবে বামছাগলকে?

—“বেজায় বোকা বাপু তোমাব এই ছাগলটা, বাজকুমাব।” গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বৌদি বলেন— “এটাকে দিয়ে সত্যিই চলবে না। ছোলা ফেলে দিয়ে ঠোঙা চিবোয়। ওব দুধ খেলে আমাব নাতিবাবুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কি বলিস খুকু? ঠিক বলিনি?”

—“বাস বাস। উসকো ছোড দিজিয়ে মাঈজী। উও বৃদ্ধুসে আপকা ক্যা কাম? মোঁ আপকো মেরী মুন্সিকো দে দুংগা। মুন্সি, মুন্সি, মুন্সিবান্দি সবসে আচ্ছী মুন্সিবান্দি—” হঠাৎ ‘দেশ হামারা হিন্দুস্তানে’ব সুবে ছাগলওয়ালা গান জুড়ে দেয়—আব সঙ্গে সঙ্গেই “ম্যাঁ এঁ এঁ এঁ” কবে বেশ কচি কচি মিষ্টি গলায় একটা ধূয়ো শুনতে পেলুম। বৌদি অমনি খিলখিল কবে হেসে ওঠেন। কথায় কথায় হেসে ফেলায় তাঁব জুড়ি নেই। বাজকুমাবের গোঁপদাড়িব ফাঁকে চোখদুটি গৌববে জ্বল জ্বল কবে ওঠে — “দেখিয়ে মাইজি দেখিয়ে, কায়সী প্যারী। আদত। মেবি মুন্সিকি আওয়াজ শুনিয়ে, কিতনী মিঠি বোলি! মেবে সাথ হববন্ড বাত কব লেতী হ্যায মুন্সি।”

বৌদি মুগ্ধ নেত্রে একমনে রাজকুমারের বক্তৃতা এবং ছাগলের মিঠি বোলি শুনছেন। এদিকে আমাব কলেজের দেবি হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা পবম গুণবতী ছাগলগণ এবং তাদের গদগদ গার্জনের হাতে বৌদিকে একা ফেলে বেখে বাজাব কবতে এগোই। একবার তাকিয়ে দেখে নিই, গলাটা অত কচি হলে কি হবে, জব্বব দাড়ি আছে মুন্সিবান্দিবেব। আব গায়েব বঙটি তো একদম দাদামণিব ফেভারিট ব্রাণ্ড— “ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট।”

### পঞ্চম দৃশ্য

কয়েকদিন পবে। বাস্তব। দুপূর্ববেলায় ঠুনঠুন কবে ঘন্টি বাজিয়ে একটা রিকশা যাচ্ছে। তাতে দিবি আয়েশ কবে বসে আছে চেক লুপ্সি আর সানগ্লাস পবা সেই বাজকুমার ছাগলওলা, আব তাবই পাশে। জডোসডো হয়ে, নাকে কমাল চেপে ধবে, নাক মুখ সিটকে এক কোণে সবে বসে আছেন বৌদি। পায়ের কাছে গম্ভীর, উদাস এবং বাশভারি এক ছাগল। সেই দাড়িওলা ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইট, মুন্সি। দাড়ি নাড়তে নাড়তে নিবিষ্টচিন্তে কলকাতার দোকানপাট দেখতে দেখতে যাচ্ছে। নাকে কমাল ধবা অবস্থাতেই বৌদি আমাকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে হাত নেড়ে দিলেন।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

ফেব বাস্তা। আৰো ক'দিন পৰে। ভোববেলা। দাদামণি আজ একাই জগিং কৰছেন। পবনে সেই গেঞ্জী আৰ হাফপ্যান্ট, পায়ে সেই মোজা আৰ কেডস। তেমনি ভুঁড়িৰ দু'পাশে দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত গুটিয়ে ছন্দে ছন্দে ছুটছেন। খুব সিৰিয়াসলি। চোখে চশমা নেই। আমি বাবান্দায় ঝুকে ডাক পাডি:

- “আই দাদামণি, কোথায় যাচ্ছে?”
  - “টুলুৰ বাড়িতে।” ছুটন্ত উত্তৰ পাই।
  - “এভাবে হাফপ্যান্ট পৰে বেগাইবাডি যাবে?”
  - “ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ প্লে”—
  - “পায়ে হেঁটেই নিউ আলিপুৰ অন্দি যাবে?”
  - “নিউ আলিপুৰ ইজ নট ওভারসীজ—”
- দাদামণি মোড ঘূৰে যান।

## সপ্তম দৃশ্য

বিবিবাৰ। দাদামণিৰ বাড়িতে খেতে বসেছি। ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বৌদি বললেন—

- “সেদিন টুলুৰ বাড়িতে যাচ্ছিলুম বে, ছাগল পৌছে দিতে।”
- “সে তো বুঝেছি। তা, দুধ-টুধ দিচ্ছে সব ঠিকঠাক?”
- “দিচ্ছিল। তবে এখন একটু গোলমাল হয়েছে।”
- “আবাব কি হলো?”
- “প্রথম প্রথম তো? বাজকুমাৰকে ছেড়ে তো আগে কখনো থাকেনি? তাই মুন্নি সাবাবান্তিৰ কঁাদছিল। তাতে টুলুৰ শশুবমশায়েৰ ভয়ানক হাই প্ৰেশাব হয়ে শবীৰটবিৰ খাবাপ হয়ে গিয়েছিল। এইসা কৰুণসুৰে ব্যা ব্যা কৰে ডাকতো যে উনি ঘুমোতে পাবতেন না। ছাগল থাকে সিডিৰ তলাৰ কুঠিৰিতে আৰ শশুবমশাই থাকেন ঠিক তাৰ সামনেৰ বড় ঘৰে। বোঝা কী ঝামেলা।”

—“তাবপৰ?”

—“তারপৰ ইনি গিয়ে বললেন ছাগলেৰ তো খোলামেলায় থাকা অভ্যাস ছিল, এই চোবাকুঠিৰিতে এসে নিশ্চয় ওৰ গবম হচ্ছে। শেষে টুলু মোডায় বসে বসে ছাগলকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস কৰতে—তবেই সে থামলো।”

—“ছাগলকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস? কী আবস্ত কৰেছো তোমবা বৌদি?”

—“ছাগল না থামলে যে শশুব যায় যায়? তাই ছাগলকে তো সেবা কৰতেই হবে। তাবপৰ বোঝা গেল যে শুধু গবমই নয়, মশা। মশাৰ কামড়ে মুন্নিৰ সাবা

গা-টা দাকড়া দাকড়া ফুলে গেল। তোমাৰ দাদামণি তক্ষুনি অৰ্দ্ধাৰ দিয়ে নেটের মশাবি কবিয়ে দিলেন, চাৰিপাশে ইট চাপা দিয়ে তাকে মেঝেৰ ওপৰ স্বস্থানে এঁটে বাখাব সুব্যৱস্থাও হলো। কদিন দিবা ছিল। তারপর একদিন মুন্নি কী ভেবে আখখানা মশাবিহী চিবিযে খেয়ে ফেললে। পণ্ডিত সাধে বলেছে, ছাগলেৰ বুদ্ধি !”

—“তাহলে, এখন ?”

—“তাবপৰ ওডোমস। সেও চলল না। দিনে এক ছাগলে দু’ টিউব খবচা হয়ে যায়। কত আব ওডোমস লাগাবে ? এবাবে আমিহী বুদ্ধি দিলুম গোয়ালেৰ মতন ধুনো জ্বলে সন্ধে দিতে, আব কচ্ছপধূপ জ্বালাতে। খুব কাজ দিলে। তাব চৈচানি বন্ধ হলো। কিন্তু দুধও।”

—“তাহলে ? দুধ বন্ধ হলে কী কববে ? কী খাওয়াবে ?”

—“বন্ধ কেন হবে ? ছাগলকে আবেকবাব পাল খাওয়াতে হবে—তাহলেই দুধ দেবে।”

—“কী খাওয়াতে হবে ? পাল ? কেন, ছোলাটোলা আব খাচ্ছে না বুদ্ধি ?

—“পাল খাওয়ানো জানিস না ?” বৌদিব জোড়াভুরু কপালে ওঠে। গলা থেকে হতাশাব নায়েগা বহে পড়ে।

—“এত লেখাপড়া শিখেছিস, পাল খাওয়ানো মানে জানিস না ?”

বাধ্য হয়ে স্বীকাৰ কৰি—“নাঃ, ঠিক জানি না—মানে—জিনিসটা কী ?”

—“শহুৰে মানুষ, জানবিহী বা কেমন কবে ? কিছুই তো দেখিস না, কিছুই শুনিস না।” —খুব ওপৰ থেকে দয়াময়ীৰ মতো বলেন বৌদি। নিজে যেন অজ পাড়াগাব এক বিজ্ঞ ব্যক্তি, সবই জানেন, সবই শুনেছেন, এবাবেৰ মতো শহুৰে অজ্ঞতাৰ সকল দৈন্যকে মাৰ্জনা কৰে দিচ্ছেন এমন গলায় বৌদি জানান—

—“পাল খাওয়ানো মানে হলো গৰু ছাগলেৰ বাঁটে যাতে দুধ আসে তাব বন্দোবস্ত কৰা। বুঝলেন মেমসাহেব ? যাতে তাবা মা হতে পাবে, সেই ঘটকালি কৰাকে বলে পাল খাওয়ানো।”

—“অ।” একটু লজ্জা পাই। ব্যাপাবটা জানা উচিত ছিল।

—“কিন্তু তুমিহী বা এতসব জানলে কি কৰে বৌদি ?”

আমিও ছেঁড়ে কথা কইবাব পাত্রী নই।

—“বাজকুমাৰ বলেছে।” কিপিং লজ্জা বৌদিব গলায়।

—“তাই বনো। এ। সেসব ঘটবে কী উপায়ে ? ঘটক কৈ ? তোমাকে এখন ছাগলেৰ জন্মে পাত্র খজতে হবে নাকি ? সন্দেহ চাইলে বোববাবেৰ আনন্দবাজবটা বেস্ত। অনেক পাত্র পাবো। বিজ্ঞাপন দিগে দাও।”

—“অত বসিকতায় আব কাজ নেই। নিজের দ’ দুটো মেয়ে পাব কবতে হবে মনে বেখা। এখন তাবা ছোটো বটে, কিন্তু ভূমিসাৎ পড়ে আছে।” বৌদি ভয় দাখান। “ছাগলেৰ ব্যবস্থা ছাগলওলাই কবেছে। তোমাৰ ভাবতে হবে না। তুমি তোমাবটা ভাবো।”



—“ও, এইসব কারণেই তাহলে গেল হস্তায় দাদামণিকে দেখলুম ভোরবেলা গেঞ্জি গায়ে ছুটতে ছুটতে নিউ আলিপূব যাচ্ছেন। বেয়াইবাড়ি কেউ অমন ড্রেসে যায়? তুমি বাবণ কর না কেন?”

—“তোমার দাদা যান। আমার বাবণ উনি শুনবেন?”

—“আচ্ছা জ্বালা হয়েছে তো ছাগল নিয়ে?” —“জ্বালা বলে জ্বালা? প্রাণাত্মকব পরিশ্রম হচ্ছে। তোমার দাদাকে তো প্রায়ই এখন নিউ আলিপূবে যেতে হয় ছাগলের জন্যে। ভোবের সময়টাই সুবিধে।”

—“দুধ কেনই বা দিচ্ছে না? প্রথমে তো দিচ্ছিল?”

—“তা দিচ্ছিল। তাবপব বন্ধ করল। লোকে বললে বোজ যে লোক দোষায়। সেই লোক না দুইলে অনেক সময় নতুন হাতে গরু ছাগলে দুধ দিতে চায় না। তাবপব অনেক সাধ্যসাধনা কবে বাজকুমারকেই ট্রাম ভাড়া দিয়ে প্রত্যেকদিন পাঠানো হতো, ভোবের ট্রামে নিউ আলিপূব গিয়ে দুধ দুয়ে দিয়ে আসার জন্যে। সে গিয়ে আদরটা দব কবে দুধ দুইতে চেষ্টা কবতো। প্রথম প্রথম তাতে কাজও হয়েছিল।”

—“তাবপব?”

—“তাবপব আব কি, তবুও বন্ধ কবলে। ছাগলের ডান্ডাব দেখানোর বাবস্থা কবেছিলুম, কিন্তু তাব আব দবকাব হলো না। বাজকুমার কী উপায়ে যেন ছাগল নাদি-টাড়ি পরীক্ষা কবে, নিজেই বোগ আবিষ্কার কবেছে। বলছে নতুন কবে পাল না খাওয়ালে সে ছাগল আব দুধ দেবে না। এখন তো সেইজন্যে ছাগল নিয়ে গেছে। বোজ দুধ দিয়ে আসছে অবশ্য নাতিবাবুকে।”

—“পাল খাওয়াতে পয়সা লাগে?”

—“তা তো লাগবেই। কিন্তু খবচ আমবা দিচ্ছি না, বাজকুমারই দিচ্ছে। ও কিন্তু অসম্ভব সং প্রকৃতির গয়লা। মুন্নিব এমন অদ্ভুত দূর্বাবহাবে ও নিজেও খুব লজ্জিত। বলছে বদলে অন্য ছাগল এনে দেবে এবারে।”

## অষ্টম দৃশ্য

দাদামণিব বাড়িতে টুল এসেছে। জামাই এবং নাতিবাবু সমেত। দাদামণি আপনমনে টাইপবাইটাবে কমনিমগ্ন, কিছুতেই টুলব বন্ধবা কানে শুনছেন না। শেষে টুল চেঁচায় —“নতুন ছাগলটাও ভয়ংকব ঝামেলা কবছে বাবা,—এই ছাগলটাকে হাতে কবে গরস পাকিয়ে পান্ডাভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে, শুনছ। এটাও অসম্ভব স্প্যেলট ছাগল। মুন্নিবেটিকে তো সাবাবাত হাওয়া কবতে হয়েছিল মশা তাড়াতে? এটারও সুখের শরীব। শব্দ মেঝেয় চট বিছিয়ে দিলে শোয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচায়। খড়ফড় দিয়ে গদি বানিয়ে তাব ওপরে চট পেতে বিছানা হয়েছে। তবে ছাগল ঘুমিয়েছেন। ভাবতে পাবো? সেটাতো মশারী চিবিযে খেয়েছিল? এটা কিছুই খায় না। আমি

শশুবমশাইকে ভাত খাইয়ে দিই, তিনি কগীমানুষ। আমি ছেলেকেও খাইয়ে দিই, তিনিও অকর্মণ্য ভূত, আবাব ছাগলকেও আমাকে খাইয়ে দিতে হবে? চাই না আমার অমন ছাগল। তুমি এক্ষুনি ফিবিয়ে নিয়ে এসো বাবা। আমাব শশুবমশাই খুব বিরক্ত হচ্ছেন কিন্তু। ছাগলকে এত টাইম এবং অ্যাটেনশন দেওয়া তাঁব একদম পছন্দ হচ্ছে না। হাতে গবস কবে ছাগলকে ভাত খাওয়াই বলে সাতবার করে ডেটলে হাত ধুয়ে তবে ছেলেকে আব শশুবকে খাওয়াতে হচ্ছে—”

“কেন, যে ভিটামিন ড্রপটা দিলেন ডক্টর সেন সেটা খাওয়াসনি?”

—দাদামণিব শাস্ত উত্তর।—“তাতে তো ছাগলের খিদেটা বাড়বে বলেছিলেন।”

—“ওঃ হ্যাঁ। সে তো ভুলেই গেছি। কেলেংকাবি কাণ্ড। ভিটামিন ড্রপস বন্ধ কবতে হয়েছে। সেসব খেয়ে তাব ভাতে তো মোটেই কচি বাড়লো না, উলটে এমন দুষ্টমিথিদে হলো, যে ঘবেব কোণে বাখা সমস্ত পূবনো স্টেটসম্যানগুলো আর কিছু পূবনো জুতো খেয়ে ফেললে। কেবল শিশিবোতলগুলো যা খেতে পাবেনি। ওঃ, কি ভয়ংকর ছাগল। তাছাড়া বাড়িতে ঢুকেই বোটকা গন্ধে প্রাণ বেবিযে যায়। কেউ আব আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে না, বাবা।”

—“কেন, বেস্পতিবাবে? শনিবাবে?”

—“তাও না। ওবা সবাই এখন মিলুবৌদিদেব বাড়ি টিভি নেখতে যায়। টিভি তো থাকে বড দালানে। বড দালানে বসবে কাব সাধা? এক আমরাই কেবল পারি, কেননা আমাদের নাকে দুর্গন্ধটা অভোস হয়ে গেছে। ঝিও থাকতে চাইছে না, সিঁড়িব তলাব ঘব পবিল্লাব কববাব জন্যে তাকে দশটাকা মাইনে বাড়াতে হবে বলছে। সে কেন ছাগলনাদি বোজ বোজ ফেলবে? জমাদাবকে তো মোটে এদিকে আসতেই দেবে না পিসিমা—সে খিডকি দিয়ে চোবের মতন যায়-আসে, তাব পক্ষে এখানটা পবিল্লাব কবাই সম্ভব নয়। ফলে আমাকেই ছাগলেব আয়া, ছাগলেব জমাদার, এইসব হতে হচ্ছে। তুমি কি এইজন্যে আমাকে ছাগল প্রেজেন্ট কবেছো?” টুলুব এবাব স্পষ্টই চোখ হলহল কবে ওঠে। সর্বদাই হাসিখুসিতে ঢলঢল কবছে কচি মুখখানা, দুষ্ট বুদ্ধিতে চঞ্চল চোখদুটো চকচকে, বিযেব দিনেও যে-টুলু সকলেব সঙ্গে ঠাট্টাইয়ার্কি কবছিল,—সেই মেয়েকে প্রায় কাঁদিয়ে দিয়েছে ছাগলে। এবাবে ‘আমিও বলি—“না, না দাদামণি, এ হয় না। তুমি বসনমামাব কথায় নেচে উঠে কী ভুলটাই যে কবেছো। ভাবতবর্ষসুদ্ধ মানুষ কি বিশেষ অন্ধ ত্রিশে প্যাভালাইসড আব চল্লিশে সিনাইল হয়ে মবে যাচ্ছে? যত ভুলভাল খবব। এক্ষুনি ছাগলটা ফেবৎ দিয়ে দাও বাজকুমাবকে।” টাইপরাইটার থেকে চোখ তুলে, চশমাব কাচেব ওপব দিয়ে তাকিয়ে দাদামণি গম্ভীবভাবে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বললেন—“সে হয় না। আমাব একটা প্রেস্টিজ নেই ওব কাছে? কী যে তুই বলিস? শোনো টুলুমা, এই নাও দশটাকা। এবাব থেকে ঝিব দশটাকা বাড়তি মাইনেটা আমিই দেবো। তুমি কেন ছাগলনাদি সাফ কববে? আব গরস পাকিয়ে খাওয়ানোব ব্যাপারটা কী

কবে হ্যান্ডল কৰা যায় সেটাও ডক্টৰ সেনকে জিজ্ঞেস কৰে দেখি। ডোণ্ট ওয়াৰি মাই ডিযাৰ, বিশ্ৰুজগতেৰ সমস্যাগুলিৰ তুলনায় তোমাৰ ছাগলেৰ প্ৰবলেম কিছুই নয়। থিংক অফ আফগানিস্তান। থিংক অফ আলস্টাৰ। তুচ্ছ ব্যাপাবে মন খাবাপ কৰতে নেই। এভবিথিং উইল বি অলৰাইট। ঝিকেই আৰ দৰ্শটা টাকা দিয়ে দ্যাখো না, সেই ছাগলকে খাইয়ে দিতে বাজী হতে পাবে। হোয়াৰ দেয়াৰ ইজ আ উইল দেয়াৰ ইজ আ ওয়ে।”

### নবম দৃশ্য

সবে কলেজ থেকে ফিবে চা খাচ্ছি, উদভ্ৰান্ত মূৰ্তিতে বৌদি এসে উপস্থিত। সঙ্গে বুলু।

—“খুকু, তোৰ দাদাব জনো কি আমি গলায় দডি দেবো?”

—“কখনই না। কিন্তু হয়েছোটা কী?”

—“কী হয়নি তাই বল। সেই ছাগুলে কাণ্ডৰ চূড়ান্ত কেলিংকাৰি হয়েছে। এখন জামাই স্নায় কুকুৰেৰ চেন বেঁধে ছাগল নিয়ে এসে হাজিৰ।”

—“জামাইবাবুৰ পিসিমা তাডিয়ে দিগেছেন ছাগলটাকে। জামাইবাবুৰ কী দোষ?” বুলু বলে, —“অতি নচ্ছাব, ইমপসিবল ছাগল একটা। যা কবেছে না—”

—“কী কবেছে কী? আৰাব স্টেটসম্যান খেয়েছে?”

—“তাব চেয়েও বেশি। যে দডিটা দিয়ে খোঁটায় বাঁধা ছিল, সেই দডিটা চিবিযে খেয়ে ফেলে পালিয়ে গেছে।”

—“বাঁচা গেছে। আৰ খুঁজিসনি ওটাকে। যাক চলে।”

—“খুঁজবে কি, সে তো বাড়িতেই ছিল। দডি-ফডি কেটে, সিঁড়ি দিয়ে স্টেট দোতলায় উঠে গেছে, গিয়ে সামনেই পিসিমাৰ পূজোৰ ঘৰটা পেয়েছে। সেখানে ঢুকে সমস্ত ফুল, কলা, বাতাসা খেয়ে ফেলেছে, লক্ষ্মীৰ লালশাড়িটা পৰ্যন্ত আধখানা চিবিযেছে, পিসিমাৰ পূজোৰ কঙ্গলেৰ আসনটা খানিকটা খেয়েছে—তাবপৰ দিদিব শোৰাব ঘৰে গিয়ে বেঁটে আলমাৰিটায় চড়েছে। সেখানে বাচ্চাব কাঁথা ভাঁজ কৰা ছিল, সেগুলো চিবিযে নষ্ট কবেছে, দেয়াল থেকে সাঁইবাবা ক্যালেন্ডাৰটা টেনে খেয়েছে, সেখান থেকে আলমাৰিৰ মাথায় চড়ে, ভেণ্টিলেটৰ থেকে চড়াইপাখিৰ বাসাব খডগুলো টেনে টেনে আৰাম কৰে খাচ্ছিল। আৰ নামতে পাবেনি। পিসিমা ওপৰে এসে পূজোৰ ঘৰে ছাগলনাদি দেখেই তো খেপে পাগল। তাবপৰ দ্যাখেন ফুল খেয়ে গেছে, প্ৰসাদ খেয়ে গেছে, আসন খেয়ে ফেলেছে, লক্ষ্মীৰ কাপড়টা পৰ্যন্ত খুলে নিয়েছে—বাস,...তাবপৰেই বাড়িসুদ্ধ হলস্থল! ছাগল কৈ? ছাগল কৈ? দিদিটাও এমনই কুন্তকৰ্ণ, ওই ঘৰেই বাচ্চা নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু জানতেই পাবেনি। ছাগল কৈ—হৈ ইউগোলে ঘুম ভেঙে উঠেই দ্যাখে সামনে গডৰেজ আলমাৰিৰ

মাথায় দাঁড়িয়ে ছাগলমশাই খড চিবোচ্ছেন। দেখে দিদি তো হেসেই কুটিপাটি। তাতে পিসিমা আবোই খেপচুবিয়াস। শেষে জামাইবাবু নিজে এসে রাজকুমারকে ডেকে নিয়ে গেছেন। কুকুবের চেন কিনে, তাই দিয়ে ছাগলকে বেঁধে জববদস্তি বাজকুমারের সঙ্গে বিকশা কবে জামাইবাবুকে দিয়ে ছাগল ফেবৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন পিসিমা।”

—“অমন অলুক্ষণে ছাগল বাড়িতে ঢুকতেই দেবেন না উনি আব। বলেই দিয়েছেন ফাইনালি।” বৌদি কাতব গলায় বলে ওঠেন।

—“তাতে তোমাব গলায় দডি দেবাব কী হলো?”

—“তোমাব দাদামণি বলছেন, তাহলে আমবাই—”

—“ওঃ নো। আমবা মানে? ছাগলটাকে কি পুষতে চাইছেন নাকি দাদামণি?”

—“ঠিক তাই। উনি ছাগলটাকে পুষতে চাইছেন। একেই বাড়িতে অ্যানসেশিয়ান কুকুব, তাব ওপব যদি বামছাগল আনেন—”

—“চাঁদ আব পুষব কথাটা ভুলো না?” বলু মনে কবিয়ে দেয়। বৌদিব আদবেব হলো আব পুষি। তাদের বছবে চাববাব কবে ফ্যামিলি বৃদ্ধি হয়।

—“ছাগলটা এখন কোথায়? বাজকুমাবই নিয়ে গেছে? না বেখে গেছে?”

—“বেখে গেছে। গ্যাবাজে বাঁধা আছে। উনি যে ছাড়ছেন না। বাজকুমাব তো বাজীই ছিল ফিবিয়ে নিতে।”

—“চলো। একটা বিকশা ডাক বুল। এক্ষুণি চলো, দেখি, ছাগল নিয়ে বাজকুমারের ডেবায় যাই। দাদামণিব পাগলামি সত্যি সীমা ছাড়াচ্ছে।” বৌদি নিশ্চিত হয়ে হাঁপ ছাড়েন।

“তাই চল খুকু। উনি এখনো ফেবেননি। এই বেলা দিয়ে আসি। একলা ঠিক মনেবজোবটা পাচ্ছিলুম না। তাছাড়া ধেডে ছাগলটাব গায়েও খুব শক্তি আছে।” “আচ্ছা বৌদি, ছাগলটা গডরেজের মাথায় চডল কেমন কবে?”

—“ওবা পাবে। পাহাড়ী ছাগল তো। বেঁটে আলমাবী থেকে বইয়ের ব্যাক, বইয়ের ব্যাক থেকে গডবেজ। সিম্পল কাজ।” বলতে বলতেই হেসে গডায় বুল, “ওব নাম দেওয়া উচিত স্যাব এডমানড হিলাবী। ব্যাটাব যা স্ট্যামিনা, খুকুপিসি।”

## দশম দৃশ্য

দাদামণি বাড়িতে। গেলাসে কবে দুধ খাচ্ছেন দাদামণি। আগে কোনোদিন দেখিনি।

—“কী খাচ্ছে, দুধ?”

—“ছাগলের দুধ।”

—“ভূমিও?”

—“আমিই। দিনে একসেব। সঙ্গে জেলুসিল চাবটে।”

—“কেন, হঠাৎ?”

—“নইলে টাকা শোধ হবে না যে—”

—“কিসেব টাকা?”

—“তোমাব ছাগল ফেবতেব। বাজকুমাব বলেছে নগদ টাকা ফেবৎ দিতে পাববে না, দুধ দিয়ে শোধ কববে। সকালে নাতিবাবুকে দিয়ে আসে একসেব। টুলুব শব্দব কিছুতেই দু’সেব নিলেন না। একদম ফ্রী পাচ্ছেন তবুও নয়। কোনো বিজনেস সেস নেই লোকটা। ইস্কুলমাস্টাব ছিলেন তো? আমায় বল্লেন—আপনাব নাতিকে খাওয়াচ্ছেন খাওয়ান। কিন্তু আমবা কেন মশাই আপনাব পয়সায় দুধ খাবো?”

—“সে তো ঠিকই বলেছেন।”

—“বেশ, ঐ ঠিক বলাব ফলে আমাকেই খেতে হচ্ছে। বলাও খাবে না, প্রতিমাও না। ওদেব নাকি গন্ধে গা গুলিয়ে আসে। টাকাটা উশুল কবতে হবে তো?”

—“কত কবে উশুল হচ্ছে?”

—“আটটাকা কবে কিলো। দু’কিলো পাব ডে। হিসেব কব। এখনো আবো পাচশো টাকা শুধতে হবে ওকে। আবও ক’দিন লাগবে? এই একমাসে আমাব ওজন বেড়েছে তিন কিলো। পুরো ন’মাস জগিং কবলে তবে কমবে।”

—“নিউ আলিপুবে দুধ পৌছে দিচ্ছে কে? বাজকুমাব নিজেই যাচ্ছে?”

—“নাঃ। এ-বাড়িতেই দু’সেব দিয়ে যায়। জঙকে দিসে বোজ ও-বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। নো প্রবলেম। ডেলি ট্রামভাডা চল্লিশ পয়সা। তাব বৌদি তো ক্লেপে লাল। বসনমামাকে দেখলেই অন্য ঘবে চলে যায় বানাৎ কবে চাবি বাজিয়ে।”

—“মোটাই না।” বানাৎ কবে চাবি অন্তবালে বেজে ওঠে। আলনা গোছাতে গোছাতে বৌদি বলেন—“বসনমামাব কোনো দোষ নেই। তিনি তো একবাবও ছাগল কিনতে বলেননি? সেবাবে বঙ্গনদেব গকু কিনিযেই তাঁব খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। এটা একা তোমাব দোষ। তুমি বললে নিউ আলিপুবে ছাগল নেই, বডলে’কদেব পাডা। বসনমামা তো বললেন সব পাডাতেই ‘লোকাল গোট মিল্ক’ পাওয়া যায়। ছাগল নেই এমন কোনো মিউনিসিপাল এবিয়াই নেই কলকাতাতে। তুমি কি শুনলে? ছাগল-টাগল কিনে অধিখোতা শুক কবে দিয়ে—এখন আব শেষবক্ষে কবতে পাবছো না।” —শন্য দুধেব গেলাসটি নামিয়ে বেখে দাদামণি নিবাত-নিঃস্প। নিঃশব্দ।

—“সতি, খুক, একটু বামেলা বাধাতে তোমাব দাদামণিব জুড়ি নেই। ওঃ। আমাকে তো সাবাজীবনই জ্বালাচ্ছেন, এবাব মেয়েজামাইকেও জ্বালাতে শুক কবেছেন।”

—“যাকগে যাক, ওসব কথা থাক। বৌদিভাই, এবাব এককাপ চা কবোতো —ছাগলেব দুধ দিয়ে, দেখি খেয়ে।”

## একাদশ দৃশ্য

দাদামণিব বাড়িতে সানাই বাজছে। ভিয়েন বসেছে। লোকে লোকাবণ। বৌদি

বিনুনি নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। দাদাব গলায় মটকাব চাদব। ছাদে মস্ত ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে।

নাতিবাবুব আজ অন্ত্রপ্রাশন।

টুলু লাফাতে লাফাতে এসে বলল— “আঃ। কী আনন্দ আজ বলো তো খুকুপিসি? ফ্রীডম। মুক্তি।”

—“কিসের ফ্রীডম আবাব?”

—“বা বে? বুবাই না আজ থেকে ভাত মাছ গরুব দুধ খাবে? আব ওকে ছাগলেব দুধ খাওয়াতে হবে না। বাববাঃ। আমাব শ্বশুরেরও শরীবটা সাববে এবাব। উঃ। একটা ফাঁড়া কেটে গেল।”

—“কেন? ফাঁড়া কিসের?”

—“ফাঁড়া নয়? একেই ব্লাডপ্রেশাবে প্যাভালাইজড কণী, তায় দিনবাত ছাগল ছাগল কবে বেগে কাঁই হয়ে থাকছিলেন—শরীব খাবাপ হয়ে যাচ্ছিল শ্বশুরমশায়েব। উনি নেতাজীর সঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন কি না? ওই ছাগলদুগ্ধটুকু ওঁব দুচক্ষের বিষ।” টুলু চোখ গোলগোল কবে বললো—“আমাকে দিনবাত্তিব কী বলেন জানো তো? গান্ধীজীব ফ্যামিলি লাইফ হ্যাপি ছিল না। গান্ধীজী কি সাথে অহিংস, ওঁব ভিবিলিটি ছিল না, গান্ধীজীব মাথাজোড়া চকচকে টাক ছিল—সেইসব। উনি মোটেই চান না নাতি গান্ধীজীব মতো হয়।”

—“তা কেনই বা হবে? এমন মনেই বা কববেন কেন? আচ্ছালোক তো তোব শ্বশুর? ছাগলেব দুধ খেলেই যদি লোকে গান্ধীজী হয়ে যেতো।—হঁ। আবসার্ড!”

—“কিন্তু বুবাইয়েরও যে মাথাজোড়া চকচকে টাক? একদম গান্ধীজীব মতোই। শ্বশুরমশাই বলেন এসব ছাগদুগ্ধের ফল। বুবাইয়েব যে একদমই চুল গজাচ্ছে না খুকুপিসি? এবপব যদি ওব ভিবিলিটিও না গজায়?” কাতবভাবে সরল চোখদুটো মেলে ধবে টুলু।

—“চোপ।” ওপাশ থেকে চাদব গলায় দাদামণি আচমকা ধমকে ওঠেন—“কাঁথায় শুয়ে ফ্যাশিস্ট কথাবার্তা বলতে বারণ কববি তোর শ্বশুরকে—ছাগদুগ্ধের ফল।—গান্ধীজীব জীবনের কী জানেন উনি? গান্ধীজী তোর শ্বশুরেব কাছে মৃত্যুব আগে কনফেশন কবে গেছেন? যতো ফ্যাশিস্ট কথা! ভিবিলিটি ছিল না। অহিংসা বিকোয়ার্স মোব ভিবিলিটি—বুমলি?—বলবি তোব শ্বশুরকে। বুমলি খুকু, এই যে আমি বেগুলাবলি ছাগলেব দুধ খাচ্ছি, বেশ টের পাচ্ছি গান্ধীজীব ইনাব স্ট্রিংথেব সোসটা কোথায় ছিল।” বসনমামা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন—

—“হকল বেপাররে পলিটিকাল কালাব দিতে নাই সুটু, বয়স হইতাসে, এটু নিউট্রাল হইতে শিখবা। বৌমাকে কও গা পাতা লাগাইতে, বেলা দুইডা বাইজা যায়।”

খেতে গিয়ে দেখি দাড়িওলা বাজকুমার বসে আছে, টেবিলিনের শাট প্যান্ট পরে। হাতে ঘড়ি। বৌদি ফিসফিস করে বললেন—“দেখেছিস খুকু, বাজকুমার নাতিবাবুকে কী প্রেজেন্ট কবেছে? স্টিলের কাপডিস। ওগুলো দিয়ে ‘দুধুয়া ছোডকে আব তো চায় পী লো’—বললো। সত্যি, ওবও কি কম ঝঙ্কাট গেল। বোচাবী।”

## বনলতার পুঁথি

বনলতা মানুষের চেয়ে জীবজন্তুর কাছেই বেশি সহজ। কবিদের ভাষায়, ‘এই পৃথিবী এক আজব চিড়িয়াখানা’। জগতে অনেকেই ‘কুকুর-বেড়ালের মতো বাঁচতে বাধ্য হয়’, বনলতার বেলায় মানেটা সেবকম বাঞ্জনাপূর্ণ নয়। ভাইবোন নেই বলে সে সত্যি-সত্যি একগাদা জন্তু-জানোয়ার ঘেঁটে বড় হয়েছে। তাব বাবাব আবাব মাঝে মাঝেই দেওয়ালকে নানাবকম কথাবার্তা বলবাব অভ্যেস আছে। মানবেন্দ্র কবি। সময় সময় তিনি দেওয়ালকে বলেন, “—মায়াদযাবও একটা ট্রেনিং দবকাব হয়, নইলে ওনলি চাইলডের সেলফ-সেন্টাবড হয়ে যাবাব ভয় থাকে।” মা সেটা শুনেত পান বলে গজগজ কবতে-কবতে হলেও জীবজন্তুর অত্যাচার সযে নেন মেয়েব মুখ চেয়ে।

বনলতা আশৈশব দেখছে তাব বাবা সকলেবই অটোগ্রাফ খাতায় লিখে দেন “—শুনহ মানুষ ভাই, সবাব উপবে মানুষ সত্য, তাহাব উপবে নাই।” অথচ বাড়িতে তিনি দেওয়ালকে প্রায়ই বলেন— “মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার ঢেব ভালো। তাবা ভালোবাসতে জানে।” ফলতঃ, বনলতা ধবে নিয়েছে, বাড়িব বাইবে সবাব উপবে মানুষ সত্য, আব বাড়িব ভেতবে মানুষের চেয়ে জীবজন্তু ঢেব ভালো।

তাই, সে নিজের মাকে সংসাৰে কিছু সাহায্য কবে না বটে কিন্তু কুকুরদের নাওয়ায় খাওয়ায়, বেড়ালদের আঁতুড় তোলে, পাখিদের খাঁচা পবিস্কাব বাখে, ছোলা-কউনদানা, দুধ-মাছ, মাংস-হাড়ি, সবকিছুব যোগাড কবে। ভাইবোন-শূনা বাড়িতে বনলতার সঙ্গী-সাথীব অভাব নেই। তপোবনে শকুন্তলাব মতো, প্রকৃতিব সঙ্গে যোগাযোগ তাবও আছে একটা, এই জীবজন্তুদের মাধ্যমে।

জ্ঞানেন্দ্রের আগে থেকেই কুকুরদের সঙ্গে বনলতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। প্রমাণ একটি মুভী ফিল্ম। একটি বিরাট প্র্যামে ফিলদেওয়া টুপি মাথায় একটি বাচ্চা বসে আছে, বিশাল লোমশ একটি কুকুর চেন দিয়ে প্র্যামেব হাতলে বাঁধা। পীচ বাঁধানো চকচকে বাস্ত্র দিয়ে উর্ধ্বশাসে সেই কুকুর দৌড়ুচ্ছে। অর্থাৎ বনলতাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। টুপিব তলায় বনলতাকে প্রথমে দেখা গেল, ভয়ে সিটিয়ে, পেলায়

এক হাঁ করে, চোখ বুজে (সম্ভবতই পাড়া কাঁপিয়ে) কাঁদছে—পবেব শটেই দেখা যাচ্ছে কোনো অজ্ঞাত কাবণে প্রচণ্ড হাততালি বাজাতে বাজাতে দুলে দুলে ফোকলা মুখে হাসছে নিভীক হাসি। অর্থাৎ ওইটুকু সময়েব মধ্যেই সেই জন্তুব সঙ্গে তাব বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

আবো প্রমাণ, হামাঙডি দিতে শিখেই, বনলতা নাকি খাটের নিচে ঢুকে, সেই বিশাল কুকুর ডিউকের ঘুমন্ত থাবা মুঠোয় তুলে মুখে পুবে দিয়েছিলো। সেই থেকে হামাঙডি দেওয়া বাচ্চা দেখলেই ডিউক প্রাণভয়ে ছুটে পালায়। সেই ছ'মাস বয়সেই বনলতা প্রথম “নিউজ” কবেছিলো, যদিও সে খববেব কাগজে বেবোয়নি।

তাবপব থেকে নানাভাবে নানা জীবজন্তু নিয়ে “নিউজ” কবেছে, কাঠবেডালী, কচ্ছপ, এমনকী চামটিকে পোষা পর্যন্ত বাদ দেয়নি। কাগজে অবশা কোনোটাই বেবোয়নি।

জন্তু এতকু পশুপক্ষী নিয়ে যাব কাববার, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যাব বেডালের লোম কুকুবেব পোকা কাকাত্যাব পালক, কুকুর বেডালবিহীন ন্যাডা সংসাবকে তাব ঘব সংসাব বলে মনেই হয় না। পূবী কি দার্জিলিং তাব কাছে দুদিনেই দুঃসহ হয়ে ওঠে প্রতিপালিতদেব জন্য দৃষ্টিস্ত্রায়। সেই হেন বনলতাকে যখন কলেজেব ম্যাটিনে আইডল ইন্দ্রনীল বিয়েব প্রস্তাব দিল, তখন বনলতা'ব জীবনে একটা প্রবল সমস্যাব উদয় হলো। ইন্দ্রনীল খৈতান বড ব্যবসায়ী'ব আদুবে পুত্রই নয়, পবন্তু বীতিমতো বুদ্ধিমান, সুসংস্কৃত ছেলে। তবে আবাব সমস্যাটা কী? সমস্যা এই যে, বিয়েব প্রস্তাবেব সঙ্গে সে একটা লেজুড এঁটে দিল। একটা শর্ত। জন্তু জানোযাবকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ইন্দ্রনীল যে-সংসাবে থাকবে, সেটা নোযাব আর্ক নয়। সেখানে খেচব-ভুচব-জলচব যাবতীয় জীবজন্তু নিষিদ্ধ। “নো অ্যানিম্যালস, মাই ডিযাব। নো ফিশেস, নো বার্ডস, নো বেপটাইলস। আই ওয়াস্ট এ পিওবলি হিউম্যান বেসিডেস ফব আওয়াবেসেলভস।”

যদিও ইন্দ্রনীলকে স্মামী পাওয়া মানে সবচেয়ে গ্ল্যামাবাস স্মামীটি পাওয়া—নেক্সট ওনলি টু উত্তমকৃমাব—তবুও বনলতা মনস্থি'ব কবতে পাবে না। তিনদিন সময় চেয়ে নেয়। চিন্তা কবতে হবে। সাবাজীবন বলে কথা। কুকুর বেডাল ছাডা কি বাঁচতে পাববে? পিওবলি হিউম্যান বেসিডেস কি সত্যি সত্যিই তেমন সুবিধেব, জানাতে হবে, বনলতা ভাবলো। আগে তাঁদেব মতামতটা নেওয়া যাক।

শর্ত শুনেই কবি মানবেন্দ্র চমকে উঠলেন।

“—এ তো সেই ‘পয়লা বাতমে বিল্লী কাটা’ গল্পেব চেয়েও ভয়ঙ্কব শোনাচ্ছে বে! হ্যাঁগা, শুনেছো? দিনকাল কভো বদলে গেছে? আমবা বিয়েব মন্তব পড়েছি কনেকে বব বলছে, ‘আমাব প্রতি যেমন, আমাব প্রতিপালিত জনেদেব প্রতি, আব আমাব গৃহপালিত পশুদেব প্রতিও ঠিক তেমন সুনজব দিও। সবাইকে নিয়ে এই গৃহেব গৃহলক্ষ্মী হও’—কত চমৎকাব ফিলজফি বল দেখি? আব আজকালকাব



ছেলেদেব সেলফিশ ফিলজফি দেখলে? কেবল আমি আব তুমি। অশ্রিত মানুষ তো দুবেব কথা, এমনকী পশুপক্ষীকেও ভালোবাসতে পাববে না। একলা আমাকে আটেনশান দাও। কী সর্বনেশে কথা?”

“—সর্বনেশে কথা আবার কী?” স্বর্ণলতা আপত্তি কবেন।

“—সে ছেলে হয়তো জীবজন্তু ভালোবাসে না। সবাই কি আব তোমাদেব মতো বিদঘুটে প্রকৃতিব।”

“—ঠিক বলেছ মা,” বনলতা জানায়: “বাপাবটা ঠিক সেলফিশনেস নয় বোধহয়। আসলে ও জন্তুজানোযাবদেব একদম পছন্দ কবে না। চিড়িয়াখানাতে বেড়াতে যেতে চায় না কিছুতেই।”

“—চায় না?” কবি বাবা মাথা নাড়েন “—সেটাও তো ভালোকথা নয় মা? আই স্পট দিস অ্যাজ আ ডেনজাব সিগন্যাল। ইয়ং ক্যাপলদেব পক্ষে জায়গাটা খুবই আইডিয়াল, কলকাতায়া।” বাবাব কথায় লজ্জা পেলেও, বনলতা ইন্দ্রনীলের পক্ষে সাফাই গায়। “—আসলে কি জানো বাবা, ওবা তো জীবজন্তু পোষেনি বাড়িতে কখনো। ও বলে চিড়িয়াখানায় বিক্রী গন্ধ। কুকুবকে ভয় পায়। বেড়ালকে ঘেন্না কবে। অনভোসেব দোষ আব কি?”

কবি মাথা নাড়েন। গঞ্জিব গলায় বলেন—“উ হাঁ। এ তো ব্যাড সাইন মা—জীবজন্তু যাবা ভালোবাসে না, তাবা আসলে মানুষকেও ভালোবাসে না। তাবা হাটলেন। নো। এখানে বিয়ে কবা ঠিক নয়। তাছাড়া ওবকম কনডিশন কবে নেওয়াটা তো আবেই আপত্তিকব। একজনেব শখসাধকে হুমকি...”

“—বাঃ। বেশ কথা তো?” স্বর্ণলতা সুপুঁবি কুচোনো বন্ধ কবে গালে হাত দেন। “—আমাব কথাটা কি ভুলে গেলে? কনডিশন কবে নিইনি বলেই তো আজ আমাব এই হেনস্থা। যা দৃ'চক্ষে দেখতে পাবি না, তাই নিয়েই সংসার। আমি কি জীবনে কখনও কুকুব-বেড়াল ভালোবাসি? তাব মানেই কি আমি হাটলেন? যত হাট সব কি শুধু তোমাব আব তোমাব কুকুবদেব বৃকে? আমাব দয়ামায়া নেই?”

কবি মানবেন্দ্র জিব কেটে গোঁফ দুলিয়ে হাঁ হাঁ কবে ছুটে এলেন—“ছি ছি। সে কি কথা। কে বললে তোমাব দয়ামায়া নেই? দৃ'চক্ষে দেখতে না পাবলেও জীবজন্তুদেব প্রতি তোমাব অসীম সহ্য। নইলে আব আমাব মতন একটা বুনো জন্তুকেও কেউব জীব বলে এতকাল পুষছে?” জিব কেটে ঘোমটা টেনে ছুটে পালানোব স্বভাব স্বর্ণলতাব নয়। তাই তিনি তাব বদলে সুপুঁবি কুচোনোয় চোখ নামালেন— মখে বললেন—“আহা, কথাব ছিবি কি। তাও আবাব বিয়েব যুগিা মেয়েব সামনে।” জিৎ হয়েছে বুঝতে পেবে মানবেন্দ্র গদগদকণ্ঠে বললেন—“সবাই কি আব তোমাব মতো? কুকুববেড়াল না হয় নাই ভালোবাসলে, তবু তাদের কন্নটা তো পোয়াছে? তাছাড়া ফুল তো ভালোবাসে? গান তো ভালোবাসে? তোমাব কথাটা আলাদা স্মরণ।”

স্বর্ণলতার খুব ইন্দ্রনীলকে পছন্দ। অমন সুন্দর জামাই পেলে কে না খুশি হয়? একমাত্র কবিটবিব মতো আকাট বোকালোকরা ছাড়া? তিনি বললেন— “কে তোমাকে বলেছে সে ছেলেও যে আলাদা নয়? জীবজন্তু তো শতকরা নব্বইজনই ভালোবাসে না, আমি মনে কবি ওটা খুবই হেলদি সাইন। তার মানেই এই নয়, যে— সে গানও ভালোবাসে না, ফুলও ভালোবাসে না। জিজ্ঞেস করে দেখেছো মেয়েকে?”

মাযেব কথা শুনেই বনলতার মুখটি লাল হয়ে এল, আব তার বাবাব মুখ ঝলমলিয়ে উঠলো।

—“ঠিক কথা।” তিনি হেঁকে উঠলেন—“হ্যাঁবে, ইন্দ্রনীল কি ফুল ভালোবাসে?”

—“ফুল?” —বনলতা টোক গিলে —“ফুল মানে, এই ধবো গোলাপটোলাপ? নুবজাহানের হাতে যেমন থাকে।” মনে মনে আকুল হয়ে ভাবতে থাকেন কবি, ফুল মানে আব কী কী হতে পারে। তক্ষুনি মনে পড়ে যায়—হস্তেলীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিন্দম...—অথবা পদ্ম-টদ্ম? কিস্তা কুঁদফুলের মালা? এনে দেয় কিছু? ভেবে দ্যাখ তো?”

বনলতা ভাবে—“নাঃ। ওসব দিয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।”

—“হুম। বাগান-টাগান ভালোবাসে?” বনলতা ভ্রু কুঁচকে চিত্ত কবে জবাব দেয় —“একবার হাটিকালচার বাগানে যেতে চেয়েছিলুম, ডালিয়াফুল দেখতে। ইন্দ্র বলেছিল—“আন ইন্টেলিজেন্ট নেচার ডাজ নট ইন্টারেস্ট মি।” শুনে কবি মানবেন্দ্র আবাব চপ কবে গেলেন। প্রস্তুতবৎ। —“হুম।” দু মিনিট নীববতা পালন। ফুল না ভালোবাসাব শাকে।

তারপবেই মন খাপাপটা ঝেড়ে ফেলে হাঁক পাড়েন—“ও, কে। কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। গান। গান গাইতে পারে? তোকে গান গেয়ে শোনায?”

—“গান? কই শুনিনি তো গাইতে। পারে না বোধহয়।”

—“তা বেশ। নিজে গাইতে না পারুক” (মানবেন্দ্রও পাবেন না), “গান শুনতে তো ভালোবাসে? গানের জলসা-টলসায যায? সদাবঙ্গ? ববীন্দ্রসদন? কলামন্দিব? দেখা হয়?”

—“জলসায? নাঃ। দেখা হয়নি তো কখনো। কেবল যাবাব কলেজ থেকে বনাত্রাণের জন্যে চাবিটি শো কবেছিলুম সেবাবে ও গিয়েছিল। ফাংশানের গোডায বনাত্রাণের বিষয়ে যে স্পীচটা ছিল, সেটা ওই দিয়েছিল। কিন্তু গানের সময়ে ছিল না।”

—“ছিল না মানে?”

—“মানে, উঠে চলে গিয়েছিল। ও বাংলা গান সহ্য কবতে পারে না।”

—“আই সী। হুম। যাকগে। দ্য ল্যান্ডযেজ ইজ ইমমোটিবিয়াল, বুঝলি, ইটস

দ্য মিউজিক দ্যাট ম্যাটাবস। বাংলা না হোক, অন্য গান তো ভালোবাসে ? হিন্দি, তামিল, ইংবিজি, উর্দু, ফ্রেঞ্চ ? এনিথিং ?”

তালে তালে মাথা নেড়ে বনলতা বলে— “কি জানি ? জানি না। কে জানে ?”

—“ঘবে গ্রামোফোন নেই ? কিঙ্গা টেপ বেকর্ডাব ? ক্যাসেট ? বেকর্ড শোনে না ?”

—“বেকর্ড বাজাতে তো কই দেখিনি, তবে হ্যাঁ ট্রানজিস্টব রেডিও একটা শোনে দেখেছি। বেডিওটা সবসময়েই খোলা থাকে। তাই তো পুলক ওকে বলে বেডিও-আকটিভ”, বলেই বনলতা হেসে ফেলে।

কবি মানবেন্দ্র হাসেন না। যাবপবনাই সীবিয়াস মুখে চোখ তোলেন —“বুঝলুম। ওতে হবে না। বেকর্ড শোনে না বলছিস ? মোটে অভ্যেসই নেই বেকর্ড কেনাব ? কোনো গানই শোনে না ? হুম ?” ভুকুটিল চোখে দুই ঠোঁট টিপে মোঝাব দিকে তাকিয়ে দু’ আঙুলে টেবিল বাজাতে শুরু করেন তিনি।

অবস্থা সঙ্গীন দেখে স্বর্ণলতা আবার কথা যুগিয়ে দেন।

—“তা গান না হোক, বাজনা ? নিশ্চয়ই বাজনা-টাজনা বাজায় কিছু ? সেতাব-টেতাব ? ছেলেদের ভেতব আজকাল তো খুব চল হয়েছে।”

কবি মানবেন্দ্রব মুখ সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্দীপিত।

—“ঠিক। ঠিক। কোয়াইট কাবেক্ট। ভোক্যাল না হোক, ইনস্ট্রুমেন্টাল ?— সেতাব ? সবোদ ? বাঁশিটাশি ? নো ? ওকে...—পিয়ানো ? ভায়োলিন ? নো ? ওকে...তবলা ? গীটাব ? নো ? ...এমনকী হাবমোনিয়ামও নয় ? যাঃ ববাবা।” ...প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে ছন্দে নঞর্থকভাবে ঘাড় নেড়ে চলেছে বনলতা, আব ক্রমশ কমে আসছে কবি মানবেন্দ্রব কণ্ঠস্রবের তেজ। মৃদু থেকে মৃদুতব হয়ে শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস হয়ে মিলিয়ে গেল তাঁব স্বব। তাবপব বললেন —“তাহলে বাদ দিয়ে দে। সবকিছুতেই ফেল।”

“কিন্তু কবিতা ?” পানের খিলি মুডতে মুডতে শেষ বক্ষাব চেপ্টা করেন স্বর্ণলতা।

—“অনেকেই তো মিউজিকের চেয়ে পোয়েট্রি বেশি পছন্দ কবে। তুমিই তো বলেছ। কবিতাব আবেদন বেশি ইন্টালেক্চুয়াল ? ইন্দ্র তো অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, হয়তো সে গানের বদলে কবিতাই বেশি পছন্দ কবে।”

—“বাইট।” নবোদ্যমে লাফিয়ে ওঠেন কবি মানবেন্দ্র।

—“মিউজিক বেশি ইন্ডিয়গাহ্য ব্যাপাব, কবিতাই বেশি সেবেরাল। হ্যাবে খুকী, ইন্দ্র কী তোকে কবিতা পড়ে শোনায় ?”

—“পড়ে শোনায়নি, তবে কবিতাব বইটাই উপহাব দিয়েছে জন্মদিনে।”

—“বাস বাস বাস। তাহলেই হলো। ভালোবেসে কবিতাব বই দিয়েছে যখন সেই যথেষ্ট। তাব মানেই সে নিজেও ভালোবেসে কবিতা পড়ে।”

—“পড়ে কি ?” বনলতা একটা খাপছাড়া প্রশ্ন বাখে। “আমি ঠিক জানি না, বাবা। কখনো তো দেখিনি পড়তে।”

“—না পড়লে আব কবিতাব বই দিল কি করে তোকে? কী যে বলিস তুই।”

“—দিয়েছে তো আমি চেয়েছি বলে। জিজ্ঞেস কবেছিল তো জন্মদিনে কী চাই? তখন আমি বললুম—”

“—কবিতাব বই চাই। এই কথা বললে?”

“—ঠিক তাই।”

“—গুড গ্রেসাস। আজকালকাব ছেলেবা সাবগ্রাইজও দেয় না? বলে কয়ে উপহাস? তা কী কী বই দিয়েছে? অন্তত দেখা যাক তাব চয়েসটা কেমন।”

“—চয়েস তো আমাবই। কী কী বই চাই, লিস্ট কবে দিতে বলেছিল তো।”

“—বাঃ। চমৎকাব। সেটুকুও নিজে খাটবে না। নাঃ, চলবে না। নট ওয়ান পজিটিভ পয়েন্ট সো ফাব। স্নন, তোমাব এ-জামাই আব হলো না। আশা ছাডো। সুপাত্র নয় মোটেই। কুকুব ভালোবাসে না, গোলাপ ফুল ভালোবাসে না, বডে গোলাম ভালোবাসে না, ববীন্দ্রনাথ ভালোবাসে না—সে আবাব একটা পাত্র নাকি?”

অপবাজেয় স্বর্ণলতা নির্বিকাব গলায় বলেন: “—তা না বাসুক, তোমাব মেয়েকে তো ভালোবাসে? আমাব কাছে সেইটেই যথেষ্ট।”

“—দুব দুব। একটা বাজে লোকেব ভালোবাসা দিয়ে কী হবে? খুকী—” মানবেন্দ্র বায় দেন, “—আই সাজেস্ট ইউ বিজেস্ট হিম।”

বনলতা কিন্তু চলে যায় না। বসেই থাকে। বসে বসে মাথা নিচু কবে আঁচলেব কোণটা আঙুলে জডাতে থাকে। কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য নিঃশব্দে নিবীক্ষণ কবেন কবি মানবেন্দ্র। তাবপবে বলেন—

“—বাপেব তো ব্যবসা আছে বুঝলুম। ছেলে নিজে কিছু কবে?”

“—বিলিতি তেল কোম্পানিতে চাকবি কবছে।”

“—যেমন স্রভাব তেমনি কর্ম। খুব অযলি ক্যাবেস্টাব। তৈলান্ত চবিত্র বলে মনে হয়।”

“—মোটেই না।” ফোঁস কবে ওঠে বনলতা—

“খুব স্ট্রুট ফরোয়ার্ড। ওনলেই তো আমাকে কিবকম বলেছে। ‘হয় কুকুব বেডাল, নয় ইন্দনীল’— ওটা বুঝি তৈলান্ত ক্যাবেস্টাবেব লক্ষণ হলো?”

“—তা অবিশিা ঠিক কথা।” কবি মানবেন্দ্র মাথা নেড়ে সঁকাব কবে নেন মেয়েব জিং। ফেব কিছুক্ষণ মেয়েব মুখেব দিকে চেয়ে থকেন। কী যেন ভাবেন। ...তাবপব বলেন:

“—হাঁবে খুকী, তুইও কি ছেলেটাকে ভালোবাসিস?”

আঙুলে আঁচলেব কোণ জডাতে জডাতে বনলতা ঘটৎ কবে ঘাড কাৎ কবে দেয়। কান দুটি বেগুনী।

“—বাসিস তো?”

“—হঁ।”

“—হঁ?”

গাঁক গাঁক কবে হেঁকে ওঠেন কবি মানবেন্দ্র, “হঁ?—তবে আবার এত কথা কিসেব জনো? এসব কনসিডারেশন তো ভ্যালিড ফর অ্যাবেঞ্জড ম্যাবেজেন ওনলি। এটা তো দেখা যাচ্ছে লাভ ম্যাবেজের কেস। লাভ ইজ ব্লাইনড। চোখে গান্ধাবী মতো সাতপুরু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়া। লাভ থাকলে অগ্নিকুণ্ডই অমৃতকুণ্ড হয়ে যাবে। আর না থাকলে, পুড়ে মববে। এই তো সহজ হিসেব। লাগিয়ে দে প্যাণ্ডেল।”

“—কিন্তু বাবা...”

“—কিন্তু কিসেব? এখনো ভালোবাসা ইজ আনসার্টেন?”

“—তা নয়, বলছিলুম, জীবজন্তু ছাড়া কি সত্যি সত্যি আমি বাচতে পাববো বাবা? যে-বাড়িতে চিনিয়া মনিয়া কিচিব মিচিব কবছে না, কাকাতৃয়া ময়না বোল পডছে না, বেডালছানাৰা পায়ে পায়ে ঘুবঘুব কবছে না, বাড়ি ঢোকবামাত্র কোনো কুকুব এসে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি ওয়েলকাম কবছে না, সেইবকম বাড়িতে কি থাকা যায়?”

“—যায বে যায।” কবি মানবেন্দ্র গোঁফে মোচড় দিয়ে হাসলেন। “—খুব যায। চিবকাল কি আমাব বাড়িতেই এত জীবজন্তু ছিল? দেখবি, ঠিক মনিয়াপাখিব মতোই কৃজন গুঞ্জন কববে, নাইবা হলো মনিয়া, ময়নাৰ মতোই বুলি পডবে, যদিও ময়না নয়, পায়ে পায়েও দিবি ঘুবঘুব কববে, নাই বা হলো বেডালছানা, আর ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি ওয়েলকাম? সেও হবে। ও কম্মোটি কুকুববা ছাড়া আর কেউ কি কবতে পাবে না নাকি? তোব মাকে জিজ্ঞেস কবে দাখ ঠিক বলেছি কিনা?”

“—কি, হচ্ছে কী।” ধমকে ওঠেন স্বর্ণলতা আডাল থেকে—“মেয়েব সঙ্গে বাপেব কথাবার্তাব বকম-সকম কি ওই? লোকে গুনলে বলবে কী? ছি, ছি, ছি।”

“বাঃ। ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে না? দেখবি খুকী—কিছুবই অভাব হবে না, পাখিকে পাখি, বেডালছানাকে বেডালছানা, কুকুবকে কুকুব অল-ইন-ওয়ান। স্পষ্ট দেখতে পাবি, দিবি চেন বগলসে বাঁধা আছে, খাঁচাব ভেতবে ভবা আছে—দাঁডেব ওপবে বসে আছে—যখন যেমনটি মানায়—একই অঙ্গে এত কপ নয়নে না ধবে...এই দেখচিস তো আমাকে—”

“—মবে যাই। থামো তো দেখি?” কৌটোভবা পানটি এগিয়ে দিতে দিতে এক ধমক লাগান স্বর্ণলতা। সে-ধমকে মানবেন্দ্রব মিচকে হাসি মোছে না, কিন্তু বনলতা দৌড়ে পালায়।

আষাঢ় মাস পড়তেই কবি মানবেন্দ্র বাউতে সানাই বেজে উঠলো।  
নতুন পুষি এসে গেছে বনলতাব।

## চাঁদগড়ার কারিগর

“কলকাতায় ? তা খুব বেশিদিন না। এই মাস পাঁচ ছয় হবে। বাপ বে বাপ, কলকাতায় এসে যেন বেঁচেছি। আব কিছুদিন দিল্লিতে থাকতে হলে আমি যেতাম পাগল হয়ে আব জনাথান বোধহয় মবেই যেত—”, একটি তসবেব পাঞ্জাবী পবা নাদুশনুদুশ সাহেবেব কনুই থেকে ঝুলতে ঝুলতেই গৃহকর্তা দত্তমশাইয়েব দেশলাই থেকে সার্কাসেব কায়দায় ঠোঁটের সিগারেটটা ধবিযে নেয় মেয়েটি। তাবই ফাঁকে বসে ঝর্ণাব মতো আলাপ। উন্নত পেটটি সগৌববে আসন্ন শুভদিনেব ঘোষণা কবছে।

—“আজ চাণক্যপুৰী কাল জোডবাগ পবঙ মহাবানীবাগ—ওফ, পাটি যেন বন্যা ডেকে যাচ্ছে বহুব-ভোব। অথচ পবিতাপেব বিষয় এই যে সর্বত্র একই মুখ একই আলোচনা. আব মুখ তো নয় মুখোশ, আলোচনা মানে পবচর্চা, একটা প্লাস্টিকেব পৃথিবী।” ধোঁয়া ছেড়ে মেয়েটা বলে—“আমি ইবিনা ওয়েন। কল মি বিনা। ফ্রম কেবালা, অ্যানড ওয়াশিংটন। অ্যানড যু ?” এবাব দত্তমশাই পবিচয় কবিযে দেন—

—“স্যাব—দিস ইজ নবনীতা, আ বেঙ্গলী পোয়েটা।”

—“নব-নী-তা ? জানো তো. সাউথে নবনীতম মানে কী ? ফ্রেশ ক্রীম। কবিত্বেব সঙ্গে বেশ মেলে—”, বলেই হাসতে থাকে ইবিনা। কথায় কথায় হাসি ওব।

—“নর্থেও নবীনতম মানে ফ্রেশ ক্রীম। তবে আমাব সঙ্গে মেলে না। আমাব নাম ব্রাউন ব্রেড কিংবা ওয়াইলড বাইস হলে বেঁটাব হতো।” খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ইবিনা। “এই তো, এই তো কবিব মতন কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। শুনলে জনাথানেব খুব ভালো লাগবে। জনাথান ?” —নাদুশনুদুশ সাহেবটি তখন নিজেব হাত ছাডিয়ে নিয়ে পানীয়েব টেবিলেব দিকে চলে গেছে। আমি কথা ঘোবাতে বলি—“পাটিব নামে আমাবও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ঠিকই বলেছো, একই অবাস্তব মুখেব মিছিল, একই অবাস্তব হাসি. অবাস্তব বাক্য. তুচ্ছতা, ক্লাস্তি, বিষাদ. কলকাতাও তাইই ইবিনা।”

—“না না না, কলকাতা মোটেই তা নয়, আমায় জনাথান বলেছে। কলকাতা অন্য ব্যাপাব। ইট ইজ আ লিভিং সিটি। এখানকাব পাটিতে কত ধবনেব মানুষ মীট কবছি আমবা, লেখক, নাট্যকাব, শিল্পী, অভিনেতা, শিক্ষাবিদ—এই আজকেব

পাটিতেই দ্যাখো না, কত লেখক, গাইয়ে, অধ্যাপক। দিল্লির ডিপ্লোম্যাটিক পাটিগুলো সব অন্যাকম, একমাত্রিক। ঠিক ওয়াশিংটনের মতো। নেহাৎ দেহাতী মেয়ে বলে প্রথম প্রথম আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। মনে হলো এই তো স্বর্গ, এত হালকা জীবন, বং বস রূপ গন্ধ—কতবকম সাজপোশাক—ভালো ভালো মদ—ভালো ভালো খাবার—নেশাব মতো ফুরফুরে কথাবার্তা—দিব্য চলছিল—হঠাৎ একদিন ক্লান্তি এল। সীসেব মতো ভারী হয়ে উঠল, দুর্বহ হয়ে উঠল এই অর্থহীন পাটি জীবন। ভাগ্যিস ঠিক তখনই জনাথান কলকাতায় বদলিটার ব্যবস্থা কবে নিল।” বলেই একগাল যুইফুলের মতো হাসি হেসে দিল মেয়েটা। ঘন নীল কর্ভুরেব প্যান্টের ওপরে ম্যাচ কবা লঙ্কী কুর্তা, সব চুল টেনেটুনে পিছনে উঁচু কবে ঘোড়ার ল্যাজ-স্টাইলে বাঁধা। দীর্ঘ, কক্ষ, ঘন কালো চুল। বিশাল খোঁপা হতো, বাঁধলে। যেমন চুল তেমনি চেহারা। স্নান্ধবতী একটা চকচকে বাদামী ঘোড়ার মতোই জোয়ান তবতেজী কালো শরীর; বড় বড় চঞ্চল চোখদুটি কৌতুকে ঝকঝক কবছে, বেশ একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব আছে মুখময়। খুব ছটফটে আব তেমনি মিশুক—এমন একটা মায়া আছে ওব মধ্যে, যে সাবাক্ষণ চোখ টেনে বাখে এত লোকেব মধ্যেও। তসবেব পাঞ্জাবী গায়ে নাদশনুদুশ সাহেবকে ওব পাশে বড্ডই শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে। দু’হাতে ভবা গেলাশ হাতে ফিবে আসছেন ভদ্রলোক—“আনড হিযাব কামস মিস্টার জনাথান ওয়েন—গ্যেস হ?”

—“হাব হাইনেসেব চিব বিশ্বস্ত ভূতা, আবাব কে?” হঠাৎ কোমব থেকে নিচু হয়ে বাও কবে নাটকীয়ভাবে একটি গেলাশ ইবিনাব দিকে বাড়িয়ে দেন ভদ্রলোক, তাবপব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক গাল হাসেন। হাসবামাত্র তাব সাবা মুখে ঝলমল কবে ওঠে উষ্ণতা—আর আমার বৃকের মধ্যে আবেকবাব খুশির ঘণ্টা পড়ে—এই তো, আবেকটা আমাদের নিজেব লোক।—ইবিনা আমাকে দেখিয়ে বলে:

—“মীট নবনীতা, আ বেঙ্গলী পোয়েট।”

—“আ পোয়েট? উ-হ...” সাহেবেব চোখমুখে যে স্বর্গীয় আহ্লাদেব উদ্ভাস ফুটলো তা যদি কৃত্রিম না হয় তবে নিশ্চয় যথেষ্ট গর্ব হওয়াব কথা আমাব।

—“আ পোয়েট।” সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। “হাউ মার্ভেলাস। দিস ইজ হোয়াই আই লাভ ক্যালকাটা। উই নেভাব মোট আ পোয়েট ইন ডেললী। ডিড উই, ডার্লিং?” ডার্লিংয়েব বদলে আমিই উত্তর দিয়ে ফেলি।

—“সে কি কথা। দিল্লি তো কবিতে ভর্তি। হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, ইন্দো-আংলিয়ান, বাংলা, ইউ নেম ইট আনড ডেহলী হাজ ইট।”

—“হতে পাবে, বাট দে হিড দেমসেলভস ফ্রম মি। অথচ কলকাতায় এসে অলবেডি কতজন সাহিত্যিককে মীট কবেছি। ডেফিনিটলি ক্যালকাটা ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি অলটুগেদাব—ইট হাজ মোব মীনিং ফব আস—তাই না বিনা?”

—“আমি তো ঠিক তাই বলছিলুম নবনীতাকে।”

—“একটুকুজি মি লেডিজ, তোমাদের সঙ্গে আমি গল্প কবতে চাই, কিন্তু ঘবেব মধ্যে সতাইই আর থাকতে পাবছি না আমি, দম আটকে আসছে সিগারেটের ধোঁয়ায় —একটু বাবান্দায় চল না, সবাই মিলে ফ্রেশ এয়াবে বসি?”

—আমাবও মাথাটা ধবে যাচ্ছে গবমে,—“চল, বাইবেই যাহ ইবিনা—” বাইবে এসে আমবা একটা গোল টেবিলের ধাবে বসি। “ঠাণ্ডা বাত বয়ে যাচ্ছে এখানে।” ছাইদানটা টেনে নিয়ে ইবিনা বলে—

—“কলকাতায় এসে জনাথান হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আমাব অবশ্য প্রথমটা একটু নোংরা ময়লা ভাঙাচোবা এবকম লাগছিল—কিন্তু এখন বুঝে গেছি কলকাতা ওকে কী দিয়ে কেন এমন কবে মাতিয়ে বেখেছে। ইটস দ্য পিপল।”

—“শুধু তাই নয়—আবো আছে বিনা। ইট হ্যাজ ক্যাবেকটাৰ। এত কবে বিনাকে বলি, চল, বিনা লেটস গো ফর আ ওয়াক ইন দিস ম্যাজিক সিটি—তা যাবে না। কিছুতেই গাড়ি ছাড়া এক পা নড়বে না।”

—“তো কী কবব? জীবনে গাড়ি চড়িনি তো আগে? এখন শোফাব ড্রিভন সি, সি. লেখা গাড়িতে বসে মেমসাহেব হয়ে দিবা ঘবে বেড়াই—এ সুখ ছেড়ে কোন দুঃখে গোবব, ডিজেলের কাদা, ফলের খোসা, আব ইউবিনের পুকুবেব মধ্যে পা দিয়ে হাঁটতে যাব বল? উনি হাঁটাব জন্যে পাগলা। ড্রাইভাবেব সঙ্গে তো ওঁব ঝগড়াই হয়ে গেল এই নিয়ে।”

—“ড্রাইভাবেবই দোষটা ছিল—”

—“মোটাই না। সে তাব ডিউটি কববে না?”—

—“ব্যাপাবটা কী?”

—“কিছুই না।” জনাথান উত্তর দেয়— “আমি হেঁটে অফিসে যাব, ড্রাইভাব কিছুতেই আলাউ কববে না। আমি তাব বস, না সে আমাব বস? কে কাব কথা শুনবে? ছোকরা প্রবল গোঁয়াব—”

“আব তুমি বৃষ্টি গোঁয়াব নও? শোনো নবনীতা, অফিস শুক ন’টায়। কাছেই আমাদেব কোয়ার্টাৰ। দ’মিনিটের পথ, হাঁটলে সাত-আট মিনিট, ড্রাইভাব ন’টা বাজতে পাঁচে আসত। উনি হেঁটে যাবেন বলে ন’টা বাজতে দশে বেকতে লাগলেন যাতে ড্রাইভাব পৌছাবাব আগেই পালাতে পাবেন।”

—“ড্রাইভাবও তেমনি। সে পৌনে ন’টায় এসে ঠিক আমাকে ধবল। আমি আব কী কবি? অগত্যা ন’টা বাজতে কুড়িতে বেকলুম। ড্রাইভাব তখন সাড়ে আটটায় এসে হাজিৰ।”

—“ড্রাইভাব সাড়ে আটটায় আসতে লাগল, উনি তার পবদিন সোয়া আটটায় বেকলেন। পবদিন ড্রাইভাব আটটায় এল এবং ভয়ানক ঝগড়াও কবল। সে অনেকদূবে থাকে, আব্দুল না কোথায় যেন। সেখান থেকে তিন মাইল হেঁটে তাকে ট্রেন ধরতে হয়। শীতকালে অত ভোবে আসতে তাব খুব কষ্ট। কিন্তু যেহেতু সাহেবকে অফিসে



নিষে যাওয়াই তাব কাজ, সেটাব জন্যে সে মাইনে পাচ্ছে, সেটা না কবলেও তো তাব মন ওঠে না।” —আমি তো শুনে অবাক।

—“শুধু পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটা নিষেই এত কাণ্ড ? দিলেই তো হয় হাঁটতে। গাড়ি কবে অন্যত্র যাতায়াত কববেন, যখন দূৰপাল্লায় কাজ থাকবে।”

—“তাও যে যাবে না। সেন্ট্রাল অফিস ব্রাঞ্চ অফিস, সর্বত্রই হেঁটে হেঁটে যাবে, বোদ নেই জল নেই। আর বলবে, ‘পায়ে হেঁটে না বেড়ালে একটা জায়গাব সঙ্গে চেনাশুনোই হয় না’।” —আমিও ইবিনাকে বললুম—

—“তুমি বাগ কবলে কি হবে,—উচিত কথাই তো বলেছেন জনাথান। হাঁটাব মতো কিছ্ নেই। হশ কবে গাড়ি কবে উড়ে বেবিযে চলে গেলে, আসল শহবেব সবই তো থেকে যাবে অধবা।” এবাব জনাথান নিজের পক্ষ সমর্থন কবতে এগোয়—

—“আমাব সতি্য বড্ড ভালো লাগে এই কলকাতাব পথঘাট দিয়ে ঘূবে ঘূবে বেড়াতে। কত আশ্চর্য সব গলিঘুজি, কত আশ্চর্য সব বিশাল পুরোনো বাড়ি—কত যে অভাবনীয়া সব গন্ধ—”

—“সি. এম. ডি. এ-ব এবং মোটো বেলের অত্যাচাবে চতুর্দিকে তো গর্ত —হাঁটেন কী কবে?”

—“সাবধানে হাঁটতে হবে বইকি। একটা দাকুণ সম্মোহিনী মায়া আছে এই শহবেব। আমি তো হেঁটে যাই একটা বিচিত্র মিশ্র সৃগন্ধেব মিছিলেব মধা দিয়ে। আমি খুব ফবচুনেট যে কলকাতা দেখলাম।”

—“জনাথান বলে,” ইবিনা যোগ দেয়—“পাশ্চাত্তা সভাতাব বাইবে একটা বর্ণহীন অ্যান্টিসেপটিক কেমিক্যাল গন্ধ আছে, কেমন একটা ধাতব সাদ লেগে আছে ওখানকাব বাতাসে। আব কলকাতা ? এখানে এখনও আছে প্রকৃতিব গন্ধ, বেঁচে থাকার গন্ধ, জ্যান্ত জীবন্ত সব গন্ধ—কখনো গবমাগবম পকৌড়া ভাজাব গন্ধ নাকে আসবে, কিস্মা জিলিপি বসে ফেলছে কোনো দোকানে—জিবে জল আসবেই—”

—“কোথাও বা পাকা আনাবস কাটা হচ্ছে, ফলেব সৃগন্ধে বাতাস ম-ম, কোথাও বা একটা আমেব কি পেয়াবাব ঝুড়ি নামাচ্ছে, আঃ কী সুবুড়ী—কখনও কাকব বান্নাঘবেব পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাসাবন্ধে একঝলক অজানা কোনো ভাবতীয়া বান্নাব তেল বা ঝাল-মশলাব গন্ধ ঢুকে যায়—জিবে জল এসে যায় আমাব।” জনাথান বলে,—“তোমাব মনে হয় না, নবনীতা ? গন্ধেব যেন উৎসব।”

—“শুধু কি খাদ্য ? কখনো বা ফলেব দোকান পাব হচ্ছে, তাজা টাটকা ফলেব তীব্র সৌবভে গলি ভরা, কখনো হয়তো বইপাড়া দিয়ে যাচ্ছে, টাটকা আঠাব গন্ধ, নতুন বইয়েব গন্ধ, তাজা কাগজেব গন্ধ—কখনো কাপডেব পাডায়, কাপডেব গাঁঠবি নামাচ্ছে, ওঃ, নতুন কাপডেব গন্ধ—ওঃ, ইনফ্রেডিবল সিটি। কেউ তাব জানলা দবজায় খসখস টাঙিয়ে, তাতে জলছড়া দিচ্ছে, তাব সুবাস, কখনো কোনো মন্দিব পাব হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ নাকে আসবে ধূপধূনোব মিষ্টি পবিত্র গন্ধ, চন্দন সুরভি

—শঙ্খশটার শব্দ—শব্দই বা কত ধরনের—উঃ। বাতে একবকম, দিনে একবকম, ট্রামেব একবকম, বাসের একবকম, বিকশার একবকম,”—এবার হাসতে হাসতে ইরিনা যোগ কবতে থাকে।

—“ট্রাক লবীর এক বকম, প্রাইভেট গাড়িব এক বকম, ট্যাক্সিব আবেক বকম”—

জনাথান আবাব খেই ধরে নেয়, “এবই মধ্যে কোকিল কুহ কুহ করছে, গরু মহিষ হান্সা হান্সা করছে, কুকুরেব ভৌ ভৌ, বেডালেব ম্যাও, কাকেব কা-কা, চড়াইপাখির কিচির-মিচিব”, ইরিনাও ছাড়বার পাত্রী নয়—

—“কলতলায় মানুষ ঝগড়া করছে, এ-বাড়িতে হোলনাইট বাচ্চা কাঁদছে, ও-বাড়িতে হোল-ডে গিন্নি চ্যাচাচ্ছে”—জনাথানও ছাড়ে না—

—“ওখানে ক্লাসিকাল গানে গলা সাধতে বসেছে কেউ, এখানে ইংবিজি গান বাজিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে ফেবিওয়াল—মোটামাট ভীষণভাবে বাঁচা হচ্ছে চাবিদিকে—ফিবিওয়ালাদের ফিরি কবার জিনিসই বা কতবকমেব ? কত বিচিত্র ? কী ভালো লাগে আমাব।”

—“হ্যাঁ, শুধুই তাই ? আব ভিকিবিব বৈচিত্র্য ভালো লাগে না ? ভিকিবিদেব হাঁকডাক ? গানবাজনা ? আব বহস্যময় শব্দ ? পথে কলাব খোসা ? গোবব ? আর খুতু ? বস্ত্রিবে ছেলেদের প্রাতঃকৃত্য ? আর ঢাকনি-খোলা ম্যানহোলেব সারপ্রাইজ ? সাফ না করা রাশিকৃত জঞ্জালের স্থূপ ? তাব সুগন্ধ ?—”

—“সেও আছে, সেও আছে, সেও তো থাকবেই। খেয়াল কবে হাঁটতে হবে, আর ইয়ুল এনড আপ ইন ট্রাবল, নইলে অন্যগুলো চোখে পড়বে কেন— আফটাব অল কতদূর যে গবীব এই দেশটা। ভাবতে গেলে মাথাই খারাপ হয়ে যায়।—আবার এখানেই ধনীর ঐশ্বর্য প্রদর্শনের সীমা নেই। এত কটিব আব হৃদয়ের অভাবও চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কী নিষ্ঠুর আডম্বর !”

—“ভূমি কি কবিতা লেখো, জনাথান ?”

—“কবিতা ? নাঃ, আমি কিছুই লিখি না। বিনাও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল আমাকে—কাঠমাণ্ডুতে। আশ্চর্য, তোমবা ভাবতীয় মেয়েরা। কবিতা না লিখলে কি সেনসিটিভ হওয়া যায় না ?”

—“তা না, সেনসিটিভ হলে অনেকসময় কবিতা না লিখে পারা যায় না এইটুকু আব কি। কাঠমাণ্ডুতে এই প্রশ্নই কবেছিল বিনা ? কেন, হঠাৎ কাঠমাণ্ডুতে কেন ? এত জায়গা থাকতে ? কী কবিতুটা কবেছিলে সেখানে ?”

—“কাঠমাণ্ডুই তো আসল জায়গা। ইট ইজ হোয়ার ইট অল হ্যাপেনড।” উজ্জ্বল রহস্যময় চোখে ইরিনার দিকে তাকায জনাথান। সেই দৃষ্টিপাতে একটু যেন বিচলিতই হয় ইরিনা—বাস্তব হয়ে বলে—

—“এই বেঃ, সর্বনাশ করেছে। জনাথান তার প্রিয় বিষয়টি এনে ফেলেছে। আব রক্ষা নেই। এখন শোনো বসে কাঠমাণ্ডুতে কী হয়েছিল।”

—“কেন ? কী হয়েছিল সেখানে ? আমি তো শুনতেই চাই। যদি না তোমাদের কোনো প্রাইভেট ব্যাপার হয়।”

—“খুবই প্রাইভেট ব্যাপার। অত্যন্ত প্রাইভেট। কিন্তু জনাথান খুব ভালোবাসে এটা সবাইকে বলে দিতে।”

—“একা আমাবই ফেভারিট টপিক বুঝি ? তোমাব নয় ? বেশ। তবে থাক। আমি বলব না।” জনাথানের গলা ভাবী হয়ে বুজে আসে। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—“বলি ব্যাপারটা কী ? আমি তো শুনতেই চাইছি—গেই বলুক না কেন ? যদি অতিবিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করা হয়ে না যায়,—তবে, বলেই ফ্যালো”, — “বলই না—” হাসতে হাসতে ইবিনা বলে স্বামীকে। “বলে ফেল”, কিন্তু জনাথান থেমেই থাকে।

—“গল্পটা কী— কী হয়েছিল কাঠমাড়তে ?” আমি অধীর হয়ে পড়ছি।

—“না, থাক। বলব না। বিনা হাসছে।”

স্পষ্টই অভিমান ফুটে ওঠে জনাথানের চোখেমুখে অথচ ইংবিজিতে নাকি অভিমানের প্রতিশব্দ নেই। কেন নেই ?

মানভঞ্জনরও প্রতিশব্দ নেই। তাই হয় তো ইবিনাব মানভঞ্জনর প্রণালীটা বেশ ওবিজিনাল মনে হলো: “না বললে তো বয়েই গেল। বেশ, আমিই বলে দিচ্ছি। হলো তো ? দুটো গল্প কিন্তু এক নয়। আমাব গল্পটা আব জনাথানের গল্পটা একদম আলাদা, কেবল শেষটুকুতে মিল আছে। দুটো দুবকমেব গল্প।”

—ব্যাগ খুলে লম্বা বিলিতি সিগারেট আব লাইটাব বেব কবে ইবিনা আমাকে অফাব কবে। —“খাবে না ? কেন ? গুড গার্ল বুঝি ? আমি বাপু খাব। আগে ছিলাম দিশি মেম, খেতাম শস্তা সিগারেট। এখন হয়েছি আসলি মেম, খাই দামী সিগারেট।”

—“কিন্তু দুটোই ইকোয়ালি ইনজুবিয়াস টু ইওব হেলথ বিনা, বিশেষত এখন।” জনাথান মিনতিব সুবে বলে। জনাথান ধূমপান কবে না।

—“কম-কম কবেই খাচ্ছি বাপু, তবে একদম বন্ধ কবতে বোলো না।” স্বামীকে উলটে মিনতি জানিয়ে ইবিনা আমাকে বলে—“এই বিলিতি সিগারেটের ব্যাপারটা যে কী মোহময়, তা জনাথানকে বোঝানো যাবে না। চিবকাল মিশনবীদের ঘবে মানুষ হয় নান, নয়ত নার্স, নয়ত প্রাইমাবি স্কুল টিচাব হব—চিবদিন খেটে খাব। নিম্নমধ্যবিত্তই থেকে যাব, নেহাৎ হরস্কোপেব জোব না থাকলে স্বামী-সংসারও হবাব ফথা নয়—সেই আমি কিনা বিদেশী ডিপ্লোম্যাট স্বামী যোগাড কবে হববখত বিলিতি সিগারেট খাচ্ছি ! এ সৌভাগ্যের কাহিনী যে সিনডাবেলাব গল্পকেও হাব মানায়, সেটা ওকে কে বোঝাবে ?”

—“আই ডোন্ট এগ্রি।” জনাথান বলে— “তুমি কেন সিনডাবেলা হবে ? আমি কি প্রিন্স ? বাবা ছিলেন সেন্ট লুইস শহরের কসাই— মা দক্ষিণেব চীনবাদাম খেতের চাষীর মেয়ে—নেহাৎ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলুম তাই আমাবও আজ এইখানে আসা—”

—“জনাথানের গল্পটা একদম আলাদা, নবনীতা। তুমি আমারটাই শোন তাহলে।” গেলাশে চুমুক দিয়ে ইরিনা বলে—“নার্স ছিলুম, কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে, আর জনাথান ওখানেই কাজ করছিল একটা সমাজসেবী সংস্থায়।—প্রায়ই দুঃস্থ রুগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসত, সেই সূত্রেই চেনাশুনো। কী জনাথান? বাকীটা তুমি বলবে?”—

জনাথান চশমার ফাঁক দিয়ে দুটু চোখে তাকিয়ে হাসে।—“নো ডার্লিং। ক্যারি অন। আমারটা বড় বেশি রোমাণ্টিক। তোমারটাই ভালো। ওতে আমাকে বেশ ভিলেনের মতো দেখায়। আমি বরং ততক্ষণে খালি গেলাশগুলো আর একবার ভরে আনি গে’। কে কী খাচ্ছিলে?”— গেলাশ কুড়িয়ে নিয়ে জনাথান চলে যায়। ইরিনা সেদিকে তাকিয়ে বলে—

—“এখন তো পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। কিন্তু জনাথান সাহেব তখন একেবারেই পাগলা ছিল। কে ভেবেছিল ও হবে ডিপ্লোম্যাট?”

—“পাগলা মানে?”

—“মানে? এই ধর...আচ্ছা দাঁড়াও, উদাহরণ দিচ্ছি কয়েকটা—কত আর বলব? পাগলামির তো গোনাগুণতি নেই। এই আমাদের কোর্টশিপটাই ধর না।” সিগারেটের ছাই ঝেড়ে গলাটিও ঝেড়ে নিয়ে গুছিয়ে বসে ইরিনা।

—“প্রথমে একদিন নেমস্কন করল, চায়ে। আমি তো আহ্লাদে ডগমগ! হায় হায়—এত ভাগ্যও আমার হয়েছে? শাদা চামড়ার সাহেব আমাকে ডেট করতে চেয়েছে? আমার বেস্ট ড্রেসটা পরে নিলুম (যেটার দাম ছিল তিরিশ টাকা)। যথাসাধ্য সেজেগুজে তো বেরুলুম। বুক ধুকপুক করছে। না জানি কোন ফার্স্ট ক্লাস রেস্টুরায়, কোন ফাইভস্টার হোটেলে চা খাওয়াবে? নাকি নিজের আক্তানাতেই নিয়ে যাবে? প্রথম শক, বাইরে বেবিষে দেখি, গাড়িটাড়ি নেই। কাঠমাণ্ডুতে তুমি গেছ তো? যাওনি? তাহলে বলে বাখি শোনো—কাঠমাণ্ডুর পথঘাট কেবল বিদেশী গাড়িতে-গাড়িতে ছাওয়া। হিপিদের পর্যন্ত প্রায়ই বাসের মতন একরকমের গাড়ি থাকে—আর ভদ্র সাহেবমেম কেউই নেই, যার গাড়ি নেই। বেরিয়েই জনাথান হাঁটতে শুরু করলে। পথে কত বিকশা, কত ট্যাকসি দেখা গেল, ভ্রক্ষেপও করলে না। হাঁটছি তো হাঁটছিই, অবিশ্যি জনাথান নানারকম গল্প করছিল—শুনতে শুনতে হাঁটার কষ্টটা গায়ে লাগছিল না। ঘণ্টাখানেক জোর কদমে চড়াই উৎরাই ভাঙবার পরে—আমরা একটা গলিতে এলাম। না, বানীপোখাবি, কি মহারাজগঞ্জ নয়, বা—দববার স্কোয়ারও নয়—একদম বাজে পাড়া ফ্রীক স্ট্রীটের গা থেকে বেরুনো গরীব সরুমতন গলি। সেখানে একটা ক্ষুদ্রে বিস্ত্রী ঝোপড়িতে শতচ্ছিন্ন চটের পর্দা তুলে তো তিনি ঢুকে পড়লেন। আমাকেও সময়ে ঢোকালেন। ভেতরে কিছু বেশি আর টুল পাতা। মহা সমাদরে সেইখানে বসালেন। অন্ধকূপ মতন ঘরের বাতাসে মাছি ভনভন করছে, টেবিল তো মাছিতে থিকথিক, কালো। আমার গা ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো। কান্না পেতে

লাগলো। এত মাছি আমি কোথাও দেখিনি, কাঠমাণ্ডতেও নয়, কেবালাতেও না। আমি কেবল দু'হাত নেড়ে মাছিই তাড়াতে থাকলুম—কথাবার্তা কখন যেন বন্ধ হয়ে গেল। সমানে মুখের সামনে হাত নাড়ছি। নইলে চোখের পাতা পর্যন্ত খুলে রাখা কঠিন। হঠাৎ শুনি গদগদ গলায় সাহেব বলছে—“তুমি বুঝি নাচ জানো? কী সুন্দর তোমার হাত নাড়ার ভঙ্গি। কী এলিগ্যান্ট, কী এক্সপ্রেসিভ। জাস্ট লাইক দ্য ভারতনাট্যম মুদ্রা-জ। কমিউনিকেশন বাই জেস্চাবস্।” আমি শুনে চটেমটে বললুম—“তোমার মুণ্ড, বুদ্ধ সাহেব। এ হচ্ছে সাবহিউম্যান মুদ্রা, কেননা জেস্চাবেব দ্বারা আপাতত আমি শুধু কমিউনিকেট করতে চাইছি মাছীদের সঙ্গেই—এবং সে কর্মেও খুব একটা সাফল্য লাভ হচ্ছে না!” তখন এই বোকা বলে কি জানো?

—“ওঃ! আব ইউ বাই এনি চান্স আনকমফর্টেবল হিয়ার?” এও আবাব বলতে হবে? ওই ঝোপড়ির মধ্যে কমফর্টের যা সব বন্দোবস্ত তাতে মাছিরা আর জনাথান ছাড়া আর কারকেই কমফর্টেবল হবার উপায় নেই। হায় রে পাগল! কী আর বলব! সায়েব তখন নিজেই বলল—“হ্যাঁ, মাছিটা অবশ্য এখানে একটু বেশিই, কেন যে এরা ফ্লীট স্প্রে করে না, জানি না। স্প্রেটা আমি এর পরের দিন নিয়ে আসব সঙ্গে। কী কবি বেলো? কাঠমাণ্ডব বেস্ট আলুর চাট যে এবাই বানায়। আমি সব দোকানে ঘুরে ঘুরে তুলনামূলক বিচার করে দেখেছি। তোমাকে নিয়ে বেরিয়েছি যখন, আই শুড অফাব ইউ ওনলি দ্য ভেরি বেস্ট! এবা কী একসেলেন্ট টী বানায়, এখুনি দেখবে।” তা, অবশ্য কথাগুলো সত্যিই। দাকণ আলুর চাট আব চা দিল ওবা, আব টুলগুলো রাস্তায় বেব কবে নিয়ে আমরা রাস্তাতেই বসে বসে খেলুম, মাছির উপদ্রব সেখানে কম ছিল। বাইরে এসেই জনাথান বলল—“তুমি কি গাঁজাব গন্ধ সহ্য করতে পারো? তাহলে অবশ্য ভেতরের ঘরটায় গিয়ে বসতে পারি। সেখানে মাছির উপদ্রব নেই, কিন্তু কিছু হিপি আছে।” —আমি তো সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধির ঠেলায় হাঁ। তখন হাসপাতাল কোয়ার্টার্সে ফেববার জন্যে প্রাণ অস্থির হয়েছি। ফেববার সময়ে আমি বললাম, “আমাকে আব পৌছে দিতে হবে না—আমি একটা রিকশা ধরে চলে যাচ্ছি।” খুব রাগ হচ্ছে তখন। এতদিনে যদি বা একটা গোবা সায়েব জুটলো, যে নাকি হিপি নয়, সে কিনা হাড়কিস্টে? ইবিনাব সামনে ভর্তি গেলাশটি এগিয়ে দেন এবার হাড়কিস্টে সাহেব, গোলগাল মুখে গদগদ হাস। আমার সামনে আমাব গেলাশটিও বাখেন।

—“তারপর?” বলে, আয়েশ কবে নিজেবাটি নিয়ে স্ত্রীর উন্টোদিকেব চেয়ারে বসেন।

—“তারপর বামেলা বাখালো এক রবিবারে। যেদিন আমাকে প্রথমবার ডিনারে নেমস্তন্ন করলো। আমি স্পষ্টই জিজ্ঞেস কবলাম—ঝোপড়িতে নয় তো? হিপি পাড়ায় নয় তো? মাছি থাকবে না তো?” ও তো হেসেই উড়িয়ে দিল আমাব ভয় ডব—“আরে না না এবার একেবাবে অন্য পাড়ায় নিয়ে যাব।” বেশ। আবাব সেই

তিরিশ টাকার ড্রেসটি পরে, চুলটুল শ্যাম্পু করে, নাইলন স্টকিংস আর নতুন স্টিলেটো হীলসের জুতোজোড়া পায় দিয়ে যথাসাধ্য ফিটফাট মেমবিবিটি সেজে তো বেরলুম। গায়ে ভূর ভূর করছে বস্মতে তৈরি ইভনিং ইন প্যারিস। সে সেন্ট এখন আব পাওয়া যায় না। আবাব হাঁটা। হাঁটছি তো হাঁটছি। ভুল করেছি স্টিলেটো হীলস পরে। ও জিনিস পায় দিয়ে পাহাড়ী পথে হাঁটার যে কী কষ্ট, আর কী ডেঞ্জারাস, সে না-হাঁটলে টের পাবে না। হাঁটতে হাঁটতে সাহেব বলল—“আজ তোমাকে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেবো।” এবাবে গিয়ে পৌঁছলুম এক মধ্যবিত্ত নেপালী রেসিডেনশিয়াল পাড়ায়। এক বিরাট বাড়ির ভাঙামতন দবজায় কড়া নাড়তেই নেপালী কভাগিনি এসে খুবই আদর কবে ঘরে নিয়ে গেল আমাদের। গল্পগাছা কবে ছাং-টাং খাইয়ে শেষ পর্যন্ত মহা যত্নে মাটিতে বসিয়েই পেতলের থালায় ভাত ডাল আর আলুর সজ্জী খেতে দিলে। ওঃ, আমার কী মন খারাপ। আমবা একে কেবালাব লোক, তাও ক্রিস্টান, ওসব নিরিমিষা আহাবেব ধাব ধারি না। মাছ মাংস ছাড়া মুখে ভাত ওঠে না। কিন্তু সাহেব কী খুশি, কী পবিত্রপ্তি কবে খেতে লাগলো, যেন অমৃত! এ কী কিস্টে রে বাবা, বন্ধুব ঘাড়ে ডিনারেব খবচটা সেবে নিলে? খেতে খেতে সাহেব বললে—

—“জানো ইরিনা, আমবা কাব বাড়িতে খেতে বসেছি? ইনি একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত নেপালী সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পবিবাব, বংশানুক্রমে এঁরাই রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক—ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপালী ভাষা ও সাহিত্য পড়ান—কত বড় মানুষেব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিলুম দ্যাখো। খুব ভালো সারপ্রাইজ নয়?” “হ্যাঁ, আমি তখন খুবই সারপ্রাইজড হছি, ঠিকই, কিন্তু তাই দিয়ে ঠেলে তো ভাত নামানো যাচ্ছে না? এমন সময়ে সাহিত্যিকের মিষ্টি গিনি জিজ্ঞেস কবল, ‘তুমি কি ডিম খাও?’ আমি তো তক্ষুণি ঘাড নেড়ে দিয়েছি—‘হ্যাঁ!’ অবিলম্বে অন্তত চারটে ডিম দিয়ে ভাজা বিশাল অমলেট এসে গেল, খাওয়াটিও দাকণ জমে গেল। তাবপবে অনেকক্ষণ কড়া তামাক আর নেপালী মদ খেতে খেতে দিব্যি আড্ডা। লেখক লোকটি সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং। এতদিন নেপালে কাজ কবছি অথচ কোনো নেপালী গৃহস্থ পবিবাবে নেমস্তন্ন খাইনি, পাগলা সাহেবেব কল্যাণে সেটা হয়ে গেল।”

—“ইনি তো হাফ সন্ন্যাসিনী ছিলেন, হয় তো ফুল সন্ন্যাসিনীই হয়ে যেতেন আমি যদি না সময়মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতাম। এই একটা ব্যাপাবে যীশুখৃষ্টকে হাবিয়ে দিয়েছি বাপু। আরেকটু হলেই আমার বউ যীশুর বউ হয়ে যাচ্ছিল আর কি।”

—বলেই কালো বউকে জাপটে ধরে সশব্দে তার গালে একটি শাদা চুমু খায় সায়েব।

—“যাও। কী হচ্ছে?” ধমকে ওঠে কালো বউ—“এটা কি ওয়াশিংটন?”

—“ওয়াশিংটন বৃষ্টি চুমু খাবার দেশ? চল তবে আমরা ওয়াশিংটনে ফিরে

যাই।”

—“বড় পাগলামি কবছো সত্যি। ভালোই হতো যীশুব বউ হলে। সেইজন্যেই তো প্রস্তুত হচ্ছিলুম বাল্যকাল থেকে। মিশনাবীদের খেয়েপবে মানুষ হলে লোকে মিশনাবীই হয় প্রধানত।”

—“খুব ঠকান ঠকিয়েছি তাহলে তোমাব মিশনাবীদের কি বল ? কিন্তু চটেছে বলে তো মনে হলো না কেউ ? দিব্যি আশীর্বাদ কবল সব ?”

—“চটেবে কেন ? যেভাবে বিয়ে হলো, সে তো কল্পনাব অতীত। সবাই কত খুশি হয়েছে আমাব এই সৌভাগ্যে।”

—“সৌভাগ্য বলে মানছো তাহলে ?”

—“নিশ্চয়ই। একশোবাব। হাজাববাব। মহা সৌভাগ্য।”

—“বিয়েটা কোথায় হলো ? কাঠমাণ্ডুতেই ?”

—“বল, বিনা, বল নবনীতাকে, কীভাবে বিয়েটা কবলুম ? সে দাক্ষণ ব্যাপাব। জমজমাট কাণ্ড !”

—“দুব”, ইবিনা তাব স্বামীব উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলে—“সে খুব লম্বা গল্প। কোর্টশিপেব গল্পটা তো শুনতে পাচ্ছ, কম কী একসাইটিং। বিয়ে তো আবো ভয়ংকব। তবে মিশনাবীবা তো মনে কবেছিল আমি হয়তো চিবকুমাবীই থাকব, তাই বিয়ে হচ্ছে বলে সবাই আহ্বাদে আটখানা। নইলে গল্প এমন কিছুই না।”

—“তাব চেয়ে ববং জনাথান আমাকে কীভাবে প্রপোজ কবল, সেই গল্পটা বলি, শোনো। স্বভাবে এই মানুষটি এতই অধীর যে কোর্টশিপেব মোটে সময়ই দিল না। প্রথমদিনে চা, দ্বিতীয়দিনে ডালভাত, তৃতীয়দিনেই প্রপোজাল। আগে কিছুদিন বেশ যে ঘোবাঘুবি হবে, মন জানাজানি হবে, বোমাষ্টিক আলোছাবাব খেলা চলবে —তা নয়। গোড়াতেই বিয়েব কথা পেড়ে বসল।”

—“তাহলে ? নো বোমাস আট অল ? হায হায”—

—“না না। রোমাস টোমাস হলো সবই, তবে আঙুলে এইটে ওঠাব পবে।” একটি গর্বিত অনামিকা তুলে দেখায় ইবিনা। তাতে একটি সিংগল কমলহীবে ঝকঝক কবছে, তাব পাশেই মোটাসোটা বেড দেওয়া ওয়েডিং ব্যান্ড। দুটি দান্তিক অলংকার ঐ সতেজ বাদামী আঙুলে বড় সুন্দব মানিয়েছে। এতক্ষণে খেয়াল কবি ইবিনাব কানেও দুটি বড়-সড় হীরে ঝকমক কবছে। আমাব নজব লক্ষ্য কবে, নিজেব দুই কানে দুহাত ছুঁইয়ে ইবিনা হাসে—

—“ওয়েডিং প্রেজেন্টস। ফ্রম দি ব্রাইডগ্রুম অফকোর্স.—হ এলস ?”

—“বাঃ। খুব সুন্দব, সত্যি। আচ্ছা, কী কবে তোমাব কাছে প্রপোজ কবল জনাথান ?” —সিগারেটে টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো ইবিনা—“সেইটেই তো বলছি। পবেব সপ্তাহে বলল— সেবাবে লোকেব বাড়িতে নেমন্ত্রণে তোমাব মন

ভরেনি। চল এবারে অন্নপূর্ণা হোটেলো।” এক-হুগা পরে ডিনার-ডাঙ্গের নেমস্তন্ন রইল। অন্নপূর্ণাই সবচেয়ে বড় ফাইভস্টার হোটেল ওখানে। শুনেই তো আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লুম। তাহলে ঐ তিরিশ টাকার জামাতে আর চলবে না। এবারে তো একটা ইভনিং গাউন চাই। আপনিই ইবিনার পরনের কর্তৃত্বের প্যাটের দিকে নজর পড়েছিল। এটাও তো একটা ডিনার পার্টি, বড়-ঘরে নাচও চলছে। একটু আগেই তো নিজের স্বামীর সঙ্গে একরাউণ্ড নেচে নিল ইরিনা, সবরকম লৌকিকতার নিয়ম ভেঙে। যে-যার আপন আপন স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে নর্তন-কুন্দন করবে—বিলিতি সামাজিক নৃত্যের এটা নিশ্চয়ই মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার দৃষ্টি নজর করেই ভাবনাটা পড়ে ফেললে ইরিনা— “এখন আমরা কত লিবারেটেড—এখনকার কথা ছেড়ে দাও, এমনি ট্রাউজার্সে ওপর তসরের পাঞ্জাবী ঝুলিয়ে তখন ডিপ্লোম্যাটিক কাজের কথা ভাবা যেত?” —স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে ইরিনা বলে—“সেদিন বীতিমতো ডিনার জ্যাকেট পরে হাজির হয়েছিলেন এই ভদ্রলোক—গলায় বো-টাই বেঁধে। দেখাছিল অবশ্যই খুবই সুন্দর। আমিও ইতিমধ্যে একটি আর্ট সিল্কের ইভনিং গাউন করিয়ে নিয়েছি, সেই কপোলী স্টিলেটো হীলের জুতোর সঙ্গে যাবে, এমন একটা ম্যাটিং শালও কিনে ফেলেছি, আর ভাবছি কি নিদারুণ সেকসি দেখাচ্ছে আমাকে, কি অপরূপ রূপবতী! অর্ধ-শিশি ইভনিং ইন প্যারিস টেলেছি গায়ে, আর মুখে অনেক কিউটিক্যুরা পাউডার। ইস্টেলের অন্য নার্সরা সবাই বলল দারুণ দেখাচ্ছে। সবাই তো মহা একসাইটেড—হোটেল অন্নপূর্ণায় বেড়াতে যাবার সাধ্য কারুবই নেই—কিন্তু সাধ প্রত্যেকেরই আছে।”

—“আবার হেঁটে তো?”

—“না না, এবারে হেঁটে নয়। এবারে রিকশাও নয়—ট্যাকসি। পোশাকের গুণে। ঐ-সব ধরাচুড়ো পরে না যায় বাস্তব দিয়ে হাঁটা, না যায় রিকশাগাড়িতে চড়া। অবশ্য ফ্রীক স্ট্রীট হলে আমার পোশাকটা তবু চলে যেত, হিপিরা তো হামেশাই দিনদুপুরে নাইট গাউন পরেই ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু ওর ডি. জে. টা যেত না। ও জিনিস কোনো ফর্মাল ডাইনিং হলের বাইবে কোথাও মানায় না যে।

অন্নপূর্ণায় ঢুকে তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্নলোক—কোথাও দেখিনি এমন পালিশ করা মোম-চকচকে মেঝে, অথবা এতখানি কাপেট ঢাকা ফ্লোর এরিয়াও। এতগুলো সাহেব-মেম, আসলী মেম, আসলী সাহেব—জনাথানের মতো, আমার মতো নয়—তাদের পরনে সেসব বিলিতি কাটের পোশাক পরিচ্ছদই আলাদা, তাদের হাঁটাচলাই আলাদা, প্রতিটি পদক্ষেপে গরম-গরম কনফিডেন্স ফুটে বেরুচ্ছে—তাদের চুলের কায়দা কত, তাদের প্রতিটি নড়াচড়া, সিগারেট-ধরা, কি গেলাশ-ধরা, হাসি, কথা, কত কালচারড, কত মার্জিত—কত ফ্যাশনেবল। যেন অন্য জগৎ, অন্য পৃথিবী। যেন একগাছা ফরাশী ছাঁটেব পুডল আর পেডিগ্রিওলা অ্যালসেশিয়ানের মধ্যে একটি মাংগ্রেল নেড়ির মতো করুণভাবে শোভা পাচ্ছি আমি। আমার সস্তা কাপড়ের সস্তা



হাঁটের উৎকট জামায় আমার সস্ত্র সেক্টের উগ্র গন্ধ, আমার অমার্জিত ভাবভঙ্গি, অনভিজাত হাঁটা-চলা—সব যেন দশগুণ বেড়ে উঠে আমাকেই দংশন কবতে লাগলো। আমি ঠিক যেন সংযের মতো। এতো সেলফ কনশাস জীবনে ফীল করিনি কখনও। ভাবলুম,—একটু ড্রিংক কবলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাবপর বেশ কয়েক-পাত্র বিলিতি শেরি খেয়েও কিছুতেই রিল্যাক্স করতে পারছি না দেখে ভাবলুম—একটু নাচতে শুরু কবলেই ঠিক হয়ে যাবে। তাবপর বেশ কয়েক রাউণ্ড নেচেও কিছুই ঠিক হলো না। ক্রমশই মুষড়ে পড়তে লাগলুম। আমাব কান্না পেতে লাগলো। ডান্স-হল যেন জেলখানার মতন পিষে ফেলছে, পালাবার জন্যে প্রাণ আইচাই—”

—“এ কিন্তু তোমাব বড় অনায্য কথা বাপু”, আমি মন্তব্য না করেই পারি না এবার—“ধাবায় নিয়ে গেলেও দোষ, মাছি ভন-ভন,—বন্ধুর গেরস্তবাড়িতে নিয়ে গেলেও, দোষ, ডাল-ভাত চচ্চডি, আবার ফাইভস্টার হোটেলে নিয়ে গেলেও দোষ? বড় বেশি বড়মানুষী? —তাহলে ও তোমাকে নিয়ে যাবোটা কোথায়?” একগাল হেসে হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দেয় ইরিনা—

—“সেটাই তো বলছি, জনাথান আমাকে নিয়ে কোথায় গেল।” মোটা ঘোড়াব ল্যাজের গুচ্ছটা বৃকেব ওপব ফেলে নাড়াচাড়া কবতে থাকে ইরিনা—চুলটা যেন আঁচলের মতো দেখাচ্ছে—ইরিনাব কি একটু একটু লজ্জা করছে এবাব?

—“নাচছি বটে, কিন্তু মুখটা নিশ্চয় শুকিয়ে গিয়েছিল, আমার। কেননা নাচের মধ্যেই ফিসফিস কবে জনাথান হঠাৎ বললো, চল, গিয়ে বাইরের খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়াই। এই এখন যেমন, সেই আব কি? আমি তো বাঁচলুম। তক্ষুনি বাজি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। মাথাব ওপব আকাশ, বাইবোটা খুব শান্ত, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, নাচঘবের বাজনাব শব্দ এখানে মৃদু। সুদূব; আলোরও জোর নেই, যে-জন্যে আকাশের চাঁদটা দেখতে কোনোই বাধা হচ্ছে না। জনাথান বললো—“দ্যাখো চাঁদটা আজ কী আশ্চর্য—”

“সতিই চাঁদটা তখন খুব অদ্ভুত দেখতে ছিল। কীবকম অসমান গডনেব, এবড়ো-খেবড়ো, আঁকাবাঁকা। চারদিকে উড়ন্ত ধোঁয়ার মতো কালো মেঘেব হিজিবিজি—আর তাব ফাঁকে একফালি অপষ্ট চাঁদ। তাব রংও কীবকম ভূতুড়ে। গা ছমছম-করা সিঁদূবে-লাল টাইপেব। —ভোঁতা ছুবিতে কেটে দেখা পাকা কুমড়োর ফালিব মতো দেখাচ্ছে। চাঁদটা দেখিয়ে ও বললো—‘দেখেছো কী সুন্দর একটা অর্ধসমাপ্ত চাঁদ? মনে হচ্ছে না কি, যে এখনও সৃষ্টির সবকিছু গড়ন-পেটনের কাজকর্ম ফুবোয়নি? সৃষ্টিকর্তা একটু বিড়ি খেতে উঠে গেছেন?’”

“শুনে গায়ে কাঁটা দিল আমার। সৃষ্টির প্রথম দিনগুলোব কথা তো এমনি করে ভাবিনি কখনও?”

এবার জনাথান বললো—“দূব এমন অসামান্য একটা আধ-গড়া চাঁদ দেখে

ফেলবার পবে, সৃষ্টিকর্তার খাস স্টুডিও থেকে কি আব ঐ বন্ধঘবের আর্টিফিশিয়াল বিন্‌চাকে ফেরা যায়? তুমি কি ব্যাংকোয়েটের খানা খেতে না পেলো খুব দুঃখ পাবে? এবং এবপরে ক্যাবারেঁন্যুটি না দেখলে তোমাব কি জীবন বার্থ হয়ে যাবে?”

—আমি বললুম—“না না, মোটেই না।”

—“তবে চলো, আমবা বেবিযে পড়ি”—ও বললো, “ওই দ্যাখো কী অদ্ভুত ঘনসমুদ্রেব মতো গভীর কালো আকাশ, তাবা নেই—কেমন শাদা-কালো দু’বকমেব মেঘ উড়ুকু মাছের মতো উড়ে যাচ্ছে—আব চাঁদটা—একটা ভাঙাচোবা দ্বীপেব চব যেন সদ্য জেগে উঠছে—চলো ইবিনা চলো, নাগবকোট চলে যাই, কাল ভোবে দু’জনে একসঙ্গে সূর্যোদয় দেখে, তাবপব ফিবে এসে ঘুমোব। যাবে?” —জনাথান আমাব হাতদুটো চেপে ধবেছে। আমি তো অবাক। এত সুন্দব সুন্দব কথা আমি জীবনে কখনো কাকব মুখে শুনিনি, সামান্য নার্স বলে কথা। সাহিত্য-টাহিত্যও পড়িনি তেমন কিছুই, মিলস অ্যাণ্ড বুন-এর বোমাস ছাড়া—আমাব জীবনটাই যে জলজ্যাস্ত মিলস অ্যাণ্ড বুন হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত? আমি বলতে লাগলুম—“বাইবে বাত্রিবাস? ও-বাবা সে পাববো না। হস্টেলের সুপারের থেকে পারমিশন নিয়ে আসা হয়নি—মিশনারী হাসপাতাল বলে কথা।” তখন জনাথান বললো “বেশ, নাগবকোট না হয় আবেকদিন হবে, চল আমবা বাগমতী নদীব ধাবে যাই।”

হঠাৎ জনাথান এবাব আপনমনেই যেন কথা শুরু করল—“পিছনে পড়ে বইল ব্যাস্কোয়েট, তাব চর্বচোষ্য লেহা পেয় নিয়ে, পড়ে বইল নাচঘর আব তাব উদ্দাম বাজনা, দামী পারফিউমের গন্ধ মাখানো ছবি-ছবি সব মেযেবা, আমবা বেবিযে এসে হাঁটতে লাগলুম। হোটেল অন্তর্পূর্ণার দ্বারপালের অবাক চাউনি আমাদেব গায়েই লাগলো না—ইভনিং গাউনেব আব ডিনার জ্যাকেটের সং-সাজা অবস্থাতেই আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহব পেবিযে পাহাড়-নদী-জঙ্গলেব কাছে পৌছে গেলাম। খুব ডেলিকেট একটা নির্জনতা ছিল সেখানটাতে। যেন অল্প জোরে শব্দ হলেই খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে ঐসব ছায়া-ছায়া গাছপালা, বাঙা-ভাঙা চাঁদ, মেঘ-ওড়া কালো আকাশ:—দুবে পশুপত্তিনাথেব মন্দিবের চুড়োটা। বাগমতীব কুলকুল আর ঝোপেব পতঙ্গদেব বিনবিন শব্দে কিম-ধরানো একটা অলৌকিক পরিবেশ—মৃদু জ্যোৎস্না এখানে ওখানে মাটিতে আলো-ছায়ার জাল বিছিয়ে ওঁৎ পেতে চূপচাপ পড়ে আছে, ডালপালার ফাঁক দিয়ে এসে,—ঠিক যেন নিষাদের ফাঁদ। বাগমতীব তীরে নেমে একটা মস্ত বড় পাথবে বসলুম আমবা।”

—“ঐবকম জায়গায় সবচেযে বেখাপ্লা ছিল আমাদের পোশাক,—কিন্তু সেসব কথা তখন মনেই ছিল না আমাদের,” —আবার ইবিনা খেই তুলে নেয়—“আমার সত্যি সত্যিই মনে ইচ্ছিল বুঝি সৃষ্টির প্রথম সপ্তাহ এখানে সমাপ্ত হয়নি।—”

জনাথান আমাকে বলল—“দ্যাখো তো ইবিনা, চাঁদটা এবারে অনেকটা যেন

মোলাযেম হয়ে এসেছে না ? অতটা তো এবড়ো-খেবড়ো দেখাচ্ছে না আর ! কাবিগর ফিবে এসে উকো দিয়ে খানিক ঘষাঘষি করেছেন মনে হয়।” ভালো কবে চেয়ে দেখলুম সত্যি চাঁদটাও অত বাগী লালচে বংও নেই, উডো-মেঘ কিছু সবে গিয়ে, ধাবের খোঁচা খোঁচা ভাবটাও খানিকটা মিলিয়ে গেছে—এখন অনেকটা ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে। কয়েকটা তাবাও উকি দিচ্ছে। আবাব আমাব হাত ধরে জনাথান বলল— “বুঝতেই পাবছ, সৃষ্টিকর্তাব সব কাজকর্ম এখনও শেষ হয়নি। সেই কাবণেই এখানে আসা, —খুব জরুরি একটি কর্তব্য বাকী বয়ে গেছে তাঁব—কই, এবাব আমাব দিকে একটু তাকাও দেখি, বলছি জরুরি কথা আছে। ওই বিস্ত্রী হোট্টেলে এই জরুরি কথাটা মোটেই বলা যেত না। —শোনো এবাব মন দিয়ে—আমাকে বিয়ে কববে তুমি, ইবিনা ?” ইবিনা থামলো। জনাথানের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাইল। জনাথানের মুখে মৃদু হাসি, পেটফুলো বৌকে আধখানা জড়িয়ে ধরে তাব মাথায নিজের মাথাটি ঠেকালো আদব কবে। তাবপব যে-যাব গেলাশে ঠোট ঠেকিয়ে দীর্ঘ চুমুক লাগালো। স্মৃতির সন্মানে ?

—“আব পবের কথাটা ? তাবপবের কথাটা বুঝি বলবে না ?” —জনাথান বলল। দেখি চশমাব ফাঁকে সেইবকম মিটিব মিটিব হাসছে।

—“তুমি না বললে এ অংশটা তবে আমিই বলে দিই ? ঐবকম একটা ডেলিকেট স্তব্ধতা, একটা ডেলিকেট আলো-আধাব। ঐ ঝিম-ধবানো একঘেয়ে মৃদু কুলকুল ঝিনঝিন শব্দলহরী, প্রকৃতিতে একটা ঘোর ধবিয়ে দিয়েছে, গাছে নদীতে পাথবে মানুষে মিশে মিশে যাচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে বনের মধ্যে একটা বাতপাখি খুব জেবে ডেকে উঠল। কী তালকাটা, বেসুবো কর্কশ সেই চিৎকাব, ঠিক বাচ্চাব কানাব মতো শোনালো—আব এই সাহসিকা ঘাবড়ে গিয়ে ওবে বাপরে বলে সবলে জাপটে ধবলো সামনে যে লোকটা ছিল তাকেই। অর্থাৎ এই শর্মােকেই। আব আমি তো বাবা চালু ছেলে, অমন স্বর্ণসুযোগ ছাড়তে হয় ? দিলাম সুন্দব কবে একটা বিউটিফুল চুমু—”

—“আমাব জীবনের সর্বপ্রথম চুম্বন।”

ইবিনা বলল এবং তাবপবেই বিপিট কোয়েশ্চেন—“কী আমাকে বিয়ে কববে তো ?” আমি ঘাড় নাডলুম, “হ্যাঁ। এই বাগমতী সাক্ষী, এই চাঁদ সাক্ষী, হ্যাঁ। কবব, করব।”

শুনে জনাথান বলল—“বাঃ, গ্র্যাণ্ড, ঐ যে দ্যাখো, যা বলেছিলুম, চাঁদ-গড়া এবাব পূবোপূবি শেষ।” “তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো ? কুমডোব ফালি কোথায় ? এ যে টুসটুসে মধু ঝবানো পাকা খবমুজা ? বৈদ্যুতিক যন্ত্রে স্লাইস কবা ইমপোর্টেড হানিডিউ মেলন ?”

—“তারপব ?”

—“তাবও পব চাই তোমার ? তারপব একটু অন্যবকম লিভিং ইন সিন ফর

টু ইয়ার্স—আমাকে তো ফিরে যেতে হলো দু'মাস পরেই। ওই অ্যাসাইনমেন্টে বিদেশে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বছর দুই আমাদের ঘোরতর প্রেম হলো—রীতিমতো প্রিম্যারিটাল লাভ—কল ইট সিন অর কল ইট রোম্যান্স—অ্যাজ ইউ প্লীজ—”

—“কিন্তু আসল কথাটাই তো বলছ না। ‘সিন বাই করেসপনডেন্স’ হচ্ছিল আমাদের। কেননা ‘লিভিং টুগেদার’টা অন্য লোকেরা তো বুঝতে পারছিল না? দৃশ্যত একজন ফিবে গেছে ওয়াশিংটনে, আরেকজন পড়ে আছে কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে। অথচ বাই করেসপনডেন্স দারুণ রকম প্রিম্যারিটাল লাভ চলছে—”

তিনজনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলুম এবারে—

—“তারপর?”

—“তারপর দু'বছর বাদে একদম কোড ডিপ্লোম্যাটিক আঁটা এক দীর্ঘ শাদা বিদেশী গাড়ি এসে হাসপাতালের গাড়িবারান্দাটা জুড়ে দাঁড়ালো। বাস, মাননীয় রাজপুত্র এসে আমাদের তাঁর ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে হাওয়া।”

—“সোজা দিল্লি হয়ে ওয়াশিংটন।” জনাথান মুখ গোমড়া করে বলে—“সে তো না হয় হলো, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমাব এত কষ্টে ফাঁদ পেতে ভারতীয় কনে ধবা, সেই গুড়েই তো বালি? ডাউরির আশায় যাও-বা ধবলুম শিকারটা—তা পাই-পয়সাও পণ জুটল না। কেন? আমার কি বরপণেব যোগ্যতা নেই? একটা মার্বল প্যালেস, গোটা দুই গ্রাম, এটুকুও কি আমি পেতে পারতাম না? অস্বস্ত একটা বাইসিক্ল আর একটা ট্রানজিস্টার? আমার ড্রাইভার তো এগুলো ছাড়া আরো পেয়েছে। সোনার আংটি, হাতঘড়ি, ইভন শুজ, অ্যাণ্ড বেডিং!”—

—“সে তো আমার চেয়ে উঁচু জাতের গো? বর্ণহিন্দু তো সে? আমি তো নেটিব খ্রীস্টান। হীনস্য হীন, দীনস্য দীন,—ভারতবর্ষে আমার কোনোই জাতপাত নেই। ভয়ানক গরীব আমরা। আমাকে মানুষ করবার মতোও সামর্থ্য ছিল না আমার বিধবা মায়ের।

—তাই না মিশনারীদের হাতে সমর্পণ কবেছিলেন? তুমিও যেন বোকার মতো সিলেকশন করেছ? ঠকবেই তো। তো, চল না, আমরা মায়ের কাছে গ্রামে যাই? সম্পত্তি বলতে মায়ের আছে তো শুধু তিনটে মাদী শ্যোর, একটা ছাগল। একটা মোরগ, গোটা কয়েক মুরগী, আর তাদের পাহারাদাব একটা কুকুর। যদি চাও মার কাছ থেকে ডজনখানেক শ্যোরছানা আর গোটা কয়েক মুরগী পণ নিয়ে নিতে পারো এক্ষুনি—”

ঠিক এমন সময়ে রাস্তায় ভঁপ্পর ভঁপ্পর ভোঁ...করে তাশাপাটির ব্যান্ড বেজে উঠলো—“জিসকি বিবি মোটি—”

—সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ, কান খাড়া। মুহূর্তের মধ্যে টেবিল ঠেলে সরিয়ে জনাথান উঠে পড়ে রেলিঙের ধারে ছুটলো। ঝুঁকে দাঁড়িয়েই মুখ ঘুরিয়ে বৌকে ডাকল—“এস, এস, রিনা, শিগগির দেখে যাও, কী সুন্দর!”

—“দেখলে তো ? কেমন পাগল ? দ্যাখো একবার—”, বলে ইরিনা ঘাড় নেড়ে চোখের ইঙ্গিতে স্বামীকে ছেলেমানুষী দেখিয়ে দিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। হাসতে হাসতে উঠেও পড়ে, এগিয়ে গিয়ে স্বামীর কোলটি ঘেঁষে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে পেছু পেছু যাই আমিও। একটু দ্ববন্ধ রেখে দাঁড়াই বেলিঙে ভব দিয়ে।

মস্ত শোভাযাত্রা যাচ্ছে। প্রথমেই লাল জরিদার ঝলমলে পোশাক পবা ব্যান্ড পাটি। রোগাবিবি-মোটাবিবির গান বাজাচ্ছে সদর্পে। তাবপর বিপুল আলোকমালাব জ্যামিতিক সব ত্রিকোণ ঘাড়ে করে দলে দলে গরীব লোক হেঁটে যাচ্ছে, তাব পেছনে একদঙ্গল দিব্যালঙ্কারভূষিতা, মালাচন্দনচর্চিতা, রংচঙে হিজড়ে যাচ্ছে নাচের নামে শ্রীহীন অঙ্গভঙ্গি কবতে কবতে, তাদের পিছনে কিছু গম্ভীর পুরুষ, আর হাসিখুশি নারীরা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে—মধ্যে ঘোড়ায় চেপে সূটপবিহিত বব, ববের মুখখানি দেখা যায় না, ফুলের ঝালরে ঢাকা, তার পিছনে আরো কিছু লোকজন, আরো আলোর মালা, সবশেষে জনশূন্য ফাঁকা মোটরগাড়ির সাবি।

—“বাঃ !” —শুনতে পেলুম জনাথান বলছে: —“ওয়েডিং ? শুধু তো ডাউরি নয় ? এটাও তো তবে ফসকে গেছে ? এই ঘোড়ায় চড়া, এই ফুল, এই আলো, গান-বাজনা, নাচটাচ ?”

—“বললুম তো, ভুল হবে বিয়ে কবেছ যে ? ধবতে একটি মারবাড়ী বউ, পেতে এইরকম দারুণ অভ্যর্থনা—”

—“যাক গে, আমাদের বিয়ের সিলভার জুবিলিতে, বুঝলে বিনা, আমরা ঠিক এইরকম উৎসবের ব্যবস্থা করবো—”

—“ততদিনে নাতি হয়ে যাবে যে ?”

—“নাতিসমেতই ঘোড়ায় চড়ে তোমার কাছে আসবো—ডোন্ট ইউ ওয়াবি ডার্লিং ! চাঁদ কি একবারই গড়েন ঈশ্বর ? সাবাজীবন ঐ একটাই পবিত্রম কবে যাচ্ছেন দৈনন্দিন। রোজ ভাঙছেন, বোজ গড়ছেন— চাঁদ-গডাব কাজটা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি তাঁব—”

আমি সবে এলুম রেলিং থেকে।

## ক্ষণপ্রভা

“তিনশো ইউনিট—বাস। এক পা বেশি এগিয়েছো কি আর দেখতে হবে না। এক মাস অন্ধকার। পেনালটি। বুঝলে গিম্মি ? তিনশো ইউনিটের বেশি হলেই কেটে দেবে লাইন।” বিনোদবাবু কাগজখানা গিম্মির নাকের উগায় নাড়তে নাড়তে বললেন। মালতী

মন দিয়ে কুটনো কুটেই থাকেন।

—“শুনচো ? ফ্যান ঘূবিযে কুটনো কোটা চলবে না।” বিনোদ সুইচ অফ করে দিলেন।

—“যত অসম্ভব কথা।” অবশেষে মালতীই জবাব এলো। “তিনশো মানে ? পাগল নাকি ? বৈঠকখানায় তিনটেতেই তো তিনশো। তাবপব তোমার ঘরে ষাট, খোকাব ঘবে ষাট, খাবার ঘরে ষাট। এতেই তো হচ্ছে তিন ছয় আঠাবো, মানে একশো আশি,—আব তিন শোয়, চাব শো আশি এখানেই হয়ে গেল। তাবপব বান্না ঘবে চল্লিশ আব দুটো বাথরুমে চল্লিশ চল্লিশ আশি—একশো কুড়ি, ছ’শো,—সিঁড়িতে টিউববাতি, খুকুর ঘরে টিউববাতি, ঠাকুবঘবে টিউববাতি—কে জানে বাবা কত, ছাদে পচিশ, গেটে, বাবান্দাদুটোয়, লোকজনদের ঘবে, ওদের বাথরুমে, পিছনের সিঁড়িতে, ল্যানডিঙে, দূবদূব—উম্মাদ-পাগল হয়ে গেছে নাকি ইলেকট্রিক কোম্পানি ? তাব ওপব ফ্যান, ফ্রিজ, গীজাব, রেডিও, টিভি, ইস্তিবি, আভেন—এসবেও তো খবচা আছে ? মাত্র তিনশো—হাজার দেডেক তো লাগবেই, কি ‘দু’ হাজার—”

—“আঃ হাঃ—মুখুয়ি কোবো না তো গিন্নি ? ইউনিট মানে ওয়াট নয়। তুমি দিচ্ছ ওয়াটেব হিসেব, ওবা ধবছে ইউনিটেব। দুটো আলাদা। এই দ্যাখো—দিবি হিসেব লিখে দিয়েছে পবিস্কাব বাংলাকাগজে—একটি এসি পাখা, দিনে বাবোঘণ্টা, সাডে একুশ ইউনিট, একটি ডিসি পাখা সাতাশ, ভাগ্যিস আমাদের ডিসি নেই—একটা চল্লিশ ওয়াটেব আলো, —ঐ তোমাব ঠাকুবঘবে, খুকুব ঘরেব সাধের টিউববাতি আব ল্যানডিঙেব বাতিগুলো সমস্তই চল্লিশ—ছয় ইউনিট কবে প্রত্যেকটা—”

—“মাত্র চল্লিশ ? অথচ অত আলো হয় ? তবে আমাদের ঘবে ষাট পাওয়ারেব আলো কেন ? সব বদলে দাও, সবই টিউববাতি করে দাও না।”—“চুপ কবো। তা হয় না। একটা টিউবের, আব একটা বালবেব দামটার তফাৎ ভেবে দেখো। আজকাল দুটোব লাইফ প্রায় একই হয়েছ—”

—“ডিসি পাখা সাতাশ বললে ? তাব মানে ভবানীপুবেব পাখায়—”

—“বেশি খবচ। হ্যাঁ। এবপব বাপেব বাড়ি গেলে, যতই গরম হোক, দয়া কবে যেন ফ্যানটি চালিও না। একটা মাঝারি ১৬৫ লিটার ফ্রিজ দিনে চোদ্দ ঘণ্টা চললে পঞ্চাশ পয়েন্ট চাব ইউনিট, একটা বেডিও—ঐ যে—” বিনোদ পুত্রব ঘবেব দিকে আঙুল দেখাল, ইংরিজি সুব ভেসে আসছে—“দিনে ৪ ঘণ্টা চললে মাসে পাঁচ ইউনিট। আব চব্বিশ ঘণ্টা চললে তাব ছ’গুন—পাঁচ ছয় তিরিশ—”

—“এক ইউনিটও নয়। থোকা তো ব্যাটারিতে চালায়। ওতে ইউনিট ওঠে না। তোমাব ধেড়ে বেডিওতেই উঠবে ববং।”

আলু ছাড়াতে ছাড়াতে মালতী নিশ্চিত। ছেলেব রেডিও মনের সাথে গাইছে। ধেড়ে রেডিও এবাব খবব পডবে।

—“আব খুকুব ঘরে যেটা চলে ? সেটাও কি ব্যাটারি ?”

—“সেটা তো টেপ বেকর্ডার। ছোট্ট। ওতে আব কত উঠবে? তোমাব বেডিওব চেয়ে কম নিশ্চয়।”

—“ওটাও যদি ব্যাটাবিতে চালান যায়, তবে তাতেই যেন চালায়। খুকুকে বলে দেবে, ইলেকট্রিকে ওসব লাকশাবি এখন চলবে না। ব্যাশনিং মানেই অস্টিয়াবিটি প্রোগ্রাম—”

—“একটু গান বাজনা শুনবে. তাতেও বাগডা দিচ্ছ তুমি? এমনিতে তো বাড়ি থেকে বেবোয়ই না—যা কুঁড়ে মেয়ে। অন্যোবা কত সিনেমা থিয়েটারে যায়—”

—“ছেলেমেয়েব হয়ে ওকালতি কত্তে কত্তেই তো বড়ো হয়ে গেলে গিল্লি। ভুবনব মাসিব অবস্থা হবে তোমাব। সৎকাহিনী পড়েও তোমাব শিক্ষা হয় না?”

—“না। হয় না। যত পাগলের কাণ্ড।”

টুপ কবে নাক বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম বঁটিব ওপব পড়লো। মালতী দেখলেন। বঁটি আঁচলে মুছলেন। ওপব দিকে চাইলেন। “লোডশেডিং?” ফ্রিজের দিকে চাইলেন। না তো? দিবা চলছে। “তবে? পাখা বন্ধ কেন?”

তাঁব স্বব কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রান্ত শোনালো। বিনোদ সান্ত্বনা দেন।

—“পাখাটা আমিই বন্ধ কবেছি। এই সকাল সাতটায় পাখাব দবকাব নেই। একটু সেলফ কন্ট্রোল দবকাব। খোকা খুকুব ঘবেব পাখাদুটো খুলে নিতে হবে। এখনকার মতন।”

—“তাবপব? তাবা শোবে কোথায়? বাম, পাখাটা চালিয়ে দে তো। তাব বাবু খুব ঘামছেন।”

—“শোবে? যেখানে শোয় সেইখানেই। বাম, পাখা চালাতে হবে না।”

—“বিনা পাখাতে ওবা ঘুমবে কী কবে? ঘুম হবে?”

—“আমাদেব কালীঘাটেব বাড়িতে পাখা কবে এল, মনে আছে? গিল্লি? তাব আগে ঘুমুতুম না আমবা?”

—“সে আলাদা কথা। ওদেব তো অভ্যেস অন্যবকম হয়েছো।”

—“কিছুই আলাদা নয়। লোডশেডিং হয় বাত দুটো পর্যন্ত। তোমাব ছেলেমেয়ে কি তখন জেগে থাকে?”

—“সেও আলাদা ব্যাপাব। একেবাবে পাখা খুলে নিলে ওবা পড়াশুনো কববে কী কবে? শবীব টিকবে কেন?”

—“শবীবেব নাম মহাশয়। যা সওয়াবে তাই সয়। বেশ, পড়াশুনোব সময়ে না হয় আলোপাখা খুলবে—একটা ঘবেই বসুক তবে দু’জনে। বাম, পাখাটা বন্ধ কর। বাবণ কবলুম, তবু খুললি?”

—“থাক না একটু। বড় গরম যে এখানটাতে।” দবদব ঘামতে ঘামতে মালতী বললেন।

—“উহঁ। ওনলি টু ফ্যানস অ্যাট ওয়াস।” তাবপব স্ত্রীব ঘর্মাক্ত চেহাবা একনজব

দেখে বিনোদ রায় বদল করলেন। “বেশ, তাহলে যা, দাদাবাবুর ঘরের পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।” রাম নাচতে নাচতে চলে গেল। পরমুহুর্তেই খোকার হংকার শোনা যায়। “এখনি তো ঘর ঝাঁট পড়ল একবার—আবার পাখা বন্ধ কেন?”

—“বাবুর হুকুম।” রাম খুবই খুশি।

—“যত বাজে কথা। দে খুলে শিগগিরি। ইয়ার্কি হচ্ছে?”

“আমি জানিনি—বাবুর হুকুম”—বাম মুচকি হাসে—

“বাবা, তুমি নাকি আমার ঘরের পাখা বন্ধ করে দিতে বলেছ রামকে?” দৌড়ে এ-ঘবে এসে অবিস্বাসী চোখে প্রশ্ন করে খোকা।

—“হ্যাঁ। ইউ আর অলরেডি ইউজিং দ্য রেডিও।”

—“তার সঙ্গে পাখাব কী?” খোকাকে রীতিমতো বিভ্রান্ত দেখায়।

—“ওয়ান ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাট আ টাইম। আজকের কাগজ পড়েছো?”

—“এখনও দেখিনি। কেন, কী হয়েছে?”

—“বিদ্যুৎ এখন থেকে ব্যাশনড।”

—“কিন্তু খোকার রেডিওটা তো ব্যাটারিতে চলে। বললুম না একখুনি? ওটা তো বিলেই উঠছে না। কিছু যদি মনে থাকে তোমার।”

—“তা বটে। নেভারদিলেস। সাবধানে থাকাই ভালো। প্রথমে ওয়ার্নিং। তার পরে একসপ্তাহে নো ইলেকট্রিসিটি। তার পনের বার এক মাস। এবং সঙ্গে সঙ্গে জরিমানাও। তাই প্র্যাকটিস কবা ভালো।”

—“এমনি করে করবে ফ্যান অফ করে দিয়ে?”

—“খোকা, ইউ আর ওলড ইনফ টু আনডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। আমি রিটার্ড। বাম্বায়ের, সিঁড়িতে, আচ্ছা সিঁড়িও না হয় কাট করে দিচ্ছি—তোমার মার ঘবে, বসবার ঘরে লোকজন এলে অন্ততপক্ষে একটা—এসব আলো তো জ্বলবেই? তোমাদের দু'ঘরে দুটো কবে আলো জ্বলে, দুটো পাখা চলে। ওটা একটা-একটা কবে দাও। তুমি আব বোন একসঙ্গে পড়বে। আমি বাড়িতে না থাকলে, তোমার মাকেও ওঘরেই চালান করে দেবো, তাঁব সেলাই বোনা, পাঁজিটাজি, ম্যাগাজিনট্যাগাজিন সবসুদ্ধ। ব্যাস। আরো কমে গেল। অ্যানাদাব ফ্যান লেস।”

—“এই খেয়েছে। একা বামে রক্ষা নেই সূত্রীব দোসর? ঘবভর্তি লোকজন একে খুকু, প্লাস মা? পড়াব তাহলে দফা গয়া। কিন্তু রেস্টিকশন কি এতই বেশি, বাবা? কটা পাখা, কটা আলো অ্যালাউড?”

—“শুধু তো আলোপাখা নয়? ফ্রিজ আছে। ইন্ড্রি আছে। আভেন আছে, গীজার আছে, হীটার, মিক্সার, পার্কেলেটাব, তোমাদের স্টিরিও, রেডিও, কী নেই? ইন্ড্রি, গীজার, হীটার মিক্সাব, আভেন, স্টিরিওব প্লাগগুলো হাজার বারোশোর কম নয়, প্রত্যেকটাই ষাট ইউনিট।”



—“কিন্তু ফ্রিজটা তো লাগবেই। ফিফটি পয়েন্ট ফোর ইউনিট, দিনে চোদ্দ ঘণ্টা চললেই।” এবার মালতী কথা কন:

—“কেন? ওটাও খুলে দাও না। আগে তো আমাদের ফ্রিজ ছিল না! থোকা জন্মানোর বছবেই কেনা হলো। পাখা খুলে নেবার চেয়ে ফ্রিজটা খুলে রাখাই ভালো। নিশ্চয় ঢের বেশি বিদ্যুৎ খায়। অতবড় যন্ত্র। ওটা দরকাব নেই।”

—“তা খায়। কিন্তু খুলে রাখলেই ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া গরমে দুধ, মাছ, মাংস সব পচে যাবে। বোজ বোজ আমাকে বাজারেও যেতে হবে। অনেক বকম অসুবিধে।”

—“তাই বলো? বোজ বোজ বাজারে যেতে ইচ্ছে নেই। এবারে বলো আসল কথাটা? বাড়িতে থাকলেই ঘন্টায় ঘন্টায় ঠাণ্ডা জল চাই কাব? এতবড় গেলাস ভর্তি করে? ফ্রিজ ছাড়া চলবে না কাব?”

—“নাঃ, ফ্রিজটা চালুই রাখতে হবে। আর পাম্প। ওটাও বন্ধ করা যাবে না। তিনতলা বাড়ি। আব সব বন্ধ বুঝলে?”

—“কেন যাবে না, ভারী দিয়ে জল তোলাও। ওতে লাইন কেটে দেবার ভয় থাকবে না, খবচা যতই হোক না।”

মালতীর মুখ সিরিয়াস।

—“আর ভাড়ার জলের কী হবে?” বিনোদবাবু সত্যি চিন্তিত।

—“ভারীকে দিয়ে জল দেওয়াও ওদেরও।”

—“কন্ট্রাক্টে তো সেটা নেই। ওদের জন্যে পাম্পটা চালাতেই হবে। ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট করা চলবে না তো? বিদ্যুৎ থাকলে, পাম্প চালাতেই হবে।”

বাত্রে খেয়ে বাবা-মার ঘবে আলোপাখা জ্বলে চাবজনে বসেছে। বিনোদেব হাতে খাতা।

—“শোনো, কেবল কুটিনটা পালটে ফেললেই সব সিম্পল হয়ে যাবে। ভোব চাবটেয় আলো হয়ে যায়। ৪টেয় বেশ ঠাণ্ডাও থাকে। তখন উঠে যে যাব ঘবে গিয়ে পড়তে বসবে। ৮টা ব মধ্যে পড়া তৈরি হয়ে যাবে। আলোও চাই না, পাখাও চাই না। তাবপর যদি পাখাব প্রয়োজন হয়, পাখা খুলে দু'জনে একসঙ্গে খাবাব টেবিলে গিয়ে বসবে। তোমাদের মাও ৪টেব সময়ে উঠে পূজা কবে নিয়ে কুটনো কুটে দেবেন। আমিও সেখানে বসেই চা খাব। কাগজটাগজ পড়ব। অল আনডাব ওয়ান ফ্যান। তোমবা বেবিয় গেলে আমবা কভাগিনি একটা ফ্যানের নিচেই থাকব, দালানেই হোক, বা ঘবেই। রাত্তিরে আজ আব হয়ে উঠলো না। কালকে থেকেই নতুন ব্যবস্থা। মেঝেয় ঢালা বিছানা হবে—তোমবা দু'ভাইবোন এই ঘবেই শোবে—”

—“মেঝেয়? এই তো ব্রঙ্কাইটিস থেকে উঠলো থোকা—”

—“বেশ তোমার থোকা-খুকু খাটে শোবে, আমি আর তুমি মেঝেতে। বেশ পুরু বিছানা পেতে—”

—“বাবা মেঝেয়?” খোকা হেসে উঠলো— “শুনে আব তুমি উঠতে পারবে? হাঁটু ভাঁজ হবে?”

—“খুব উঠতে পাববো। হাঁটু ব বাবা ভাঁজ হবে। দেখবি। ঘবটা বড আছে, দেয়ার শুডন্ট বি এনি হেলথ প্রবলেম—ছ’টা ভেটিলেটার আছে, চাবটে জানলা—আগে তো চারজনে একখানা বড খাটেই শুতুম যখন তোমরা ছোট ছোট। এই উইকেই দুটো সোফা কাম বেড কিনে ওই ধেড়ে সোফাটাকে বিপ্লেস কববো, যাতে বাত্রে কাউকে মেঝেয় না শুতে হয়—”

—“কিন্তু বাবা?”

—“বলো।” বিনোদ খুব গম্ভীর।

—“অন্যদের বাড়িতে তো আলো জ্বলছে। আমার বন্ধুদের বাড়িতে তো এবকম ব্ল্যাকআউট করেনি কেউ? দাদা বলছিল তিনটে ইউনিটে নাকি সব নবমাল কাজ চলেই যাবার কথা—এক এয়াবকণ্ডিশনাব, কি লিফট—এসব থাকলে অন্য কথা। এতটা অস্টিয়াবিটিব নাকি এখনও দবকাব নেই?”

—“তোমাব দাদা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পডতে পাবে, কিন্তু এখনও এ-বাড়িব মালিক হচ্ছি আমি। এখনও ফুল বেসপনসিবিলিটি এই বৃদ্ধেব। আমি যেটা ভালো বুঝেছি, কবছি। ডু নট ইন্টারফিয়াব।”

—“কিন্তু আমার যে আর তিন সপ্তাহও নেই বাবা? সামনেই পাট ওয়ান।”

—“তাতে কী হয়েছে?”

—“এই সময়ে পড়াব জায়গা, পড়াব অভ্যাস—সবকিছু ডিস্টার্ব কবলে অসুবিধে হবে না? বেজাল্ট গুবলেট হয়ে যাবে।”

—“তোমাব দাদাবও সেমেস্টাব টেস্ট এসে গেছে। কই, সে তো কিছু বলছে না।”

—“দাদা কী বলবে? দাদা তো হস্টেলে চলে যাচ্ছে—বন্ধুদের কাছে থেকে পডবে এই কদিন। এখানে তুমি বলেছ আমি ওব ঘবে পডবো, তাই।”

—“খুকু ভয়ংকর ডিস্টার্ব করে। আমি পড়ি বাত জেগে, ও পড়ে ভাবে উঠে। সাবাবাত পড়েটড়ে আমি যেই একটু শোবো, ও তখন উঠে পডতে বসবে। কেমন কবে আমার একসঙ্গে পডবো? তাছাড়া ও চালায় বাংলা গান, আমি ইংবিজি।”

—“বাস, তাহলে তো চুকেই গেল ল্যাঠা। খোকা শুচ্ছে না। এখন তোমার আব অসুবিধে কী, খুকু? স্টাডি অ্যাজ ইউজুয়াল। নিজেব ঘবেই পডবে। নো ডিস্টার্বেন্স। বাত্রে কেবল এখানে এসে শোবে। অল সেটলড।”

—“এখানে আমার ঘুম হবে না, বাবা।”

—“কেন? হোয়াটস বং উইথ দিস কম?”

—“তোমরা নীল আলো জ্বেলে রাখো সারাবাত।”

—“এখন থেকে আব জ্বলবে না। নো বেডল্যাম্প।”

—“ও বাবা”, মালতী চৈচিয়ে ওঠেন, “ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘবে আমি ঘুমুতে পাববো না। তুমি বাস্তবে তিনবার উঠবে, আমিও উঠি, টর্চ-ফর্চ খুঁজে পাই না। ঘবে একটুখানি আলো না এলে আমার ঘুমই হবে না।”

—“নাইটল্যাম্পে জিবো পাওয়াবেব বালব থাকে বাবা, ওতে কোনো খবচ বাড়বে না।” খোকা মধ্যস্থতা করতে গিয়ে ধমক খায়—

—“কিন্তু ওটা জ্বললে, তোমাব বোন অন্যঘবে শোবে, একটা আস্ত পাখা তাতে ঘুববে—সেটা তো জিবো পাওয়ার নয়। আশি ওয়াট। আটঘণ্টা। হিসেব করো।”

—“দুটো পাখা চললে এমন কিছু ক্ষতি হবে কি? বাবা?”

—“হবে।”

—“খোকা তাহলে হস্টেলেই চলে যাক? এই তোমাব মত? ঠিক পবীক্ষাব মুখে মুখে? নিজের বাপমা বেঁচে থাকতে?”

—“আহা, হস্টেলেই পড়াশুনাটা বেশি ভালো হয়, আর ওদের ওখানে লোডশেডিংও নেই, পাওয়ার ব্যাশনিংও নেই। বন্ধুদের সঙ্গে পাবে তো যাক না থেকে ক’টা দিন, পবীক্ষা পর্যন্ত। ক্ষতি কি? নাথিং নিউ। নাথিং স্পেশাল।”

—“তুমি তাহলে ছেলেটাকে তাড়ালেই বাড়ি থেকে? নেহাৎ মেয়েটা মেয়ে বলেই তাই পারছে না। পানলে ও-ও চলে যেত।”

—“বেশ। তাহলে অলটাবনেটিভ অ্যাবেঞ্জমেন্ট হোক। তোমাব ছেলে ঘবেই থাকুক। মেয়েও তাব ঘবে থাক। নো বেসট্রিকশানস। গিনি তুমিই ববং খুব ঘবে গিয়ে শুয়ো। আমি খোকাব ঘবে। টু ফ্যানস—লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টস। ও. কে.?”

—“আমাব ঘবে? বাবা শোবেন? কি সর্বনাশ।” খোকাব মুখ দেখে খুব খিলখিল করে হেসে ওঠে। মালতী মুখে পানের ওপব আঁচল চাপা দেন। বাবা ঘবে থাকলে বেশ হবে। খোকাব সিগারেট খাওয়াটি এবাব খতম।

—“কেন? তোমাদের বাবা কি কিং-কিং? এতে সর্বনাশের কী আছে?”

—“না না, সেজন্যে নয়। বলছি, আমি তো বাত জেগে পড়বো, তুমি তাব মধ্যে ঘুমুবে কেমন করে, বাবা? বড় আলোটা জ্বলবে তো।”

—“বাজনাও বাজবে নাকি? হোলনাইট গান বাজাতে বাজাতে পড়া তৈরি হবে? ডিস্কো মিউজিক?” খোকা চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে—

—“বাজনা না হয় বাজাবো না। কিন্তু আলো? নীল আলোতে তো পড়তে পাববো না।”

—“বেশ বেশ। আমরা কভাগিনি এঘবেই যেমন ওই শোবো। ফ্যান না চালিয়েই শোবো। আমাদের ফ্যান ছাড়া শোবাব অভ্যাস আছে।”

—“ও বাবা। ও’ অভ্যাস অনেকদিন আব নেই গো—পাখা ছাড়া আমি শুতে পাববো না, বাপু! জানোই তো আমার কী সাংঘাতিক গরম বাতক।”

—“বেশ। তুমি খুব ঘবে শুয়ো। আমি এখানে একা একাই—”

—“গবমে পচবো।” এই তো? তাবপর প্রেশার হাই হয়ে যাবে, ওষুধ আনো, ডাক্তার আনো, পথিা বদলাও—উদ্বেগের চূড়ান্ত করো। ওসব হবে না বাপু, ঘুমের সময়ে পাখাটি চাই। প্রত্যেকের।”

—“ঐ নীল বাতিটাকে নিয়েই যা মুশকিল। মা, আমাকে সেই এয়ার ইনডিয়াব দেওয়া কালো কাপড়ের চশমাটা দিও—দাদা দাদাব ঘবেই থাক—আমি ববং কাপড়ের চশমাটা চোখে বেঁধে তোমাদের ঘবে এসে শোবো।”

—“তাব কী দবকাব? একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে, তাতে জিরো পাওয়াব বাল লাগিয়ে নিলেই, নো প্রবলেম—”

—“কী ব্যাশন হলো জানি না বাপু, তোমাদের বাবা তো তুমুল কাণ্ড শুরু করে দিলেন। অন্য বাড়িতে কাকপক্ষী টেব পেল না। আব এ-বাড়িতে? কুরুক্ষেত্রব বেধে গেল—”

—“সোফা কেনো, ল্যাম্প কেনো—”

—“বাম! অ বাম! রাম?”

—“কি হলো? পিসিমা এয়েছেন?”

—কী কবিচিস বে হতভাগা? পড়ে মবব যে বে? জ্বাল, শিগগিবি আলোটা জ্বাল—”

—“বাতি নি। আমার হাত ধরেন—”

—“লোডশেডিং তো নয়? বেলটা তো দিক্খি বাজলো।”

—“বাতি নি। ইলিকটরি বাসুন। বাবা সব বাতি খুলে দেছেন।”

—“সিঁড়ির বাতিও খুলে দিয়েছে কি রে ব্যাটা। মানুষ উঠবে কী কবে ঘুটঘুটে অন্ধকাবে? চারতলা অন্ধ নিঝুমপুরী তৈবি করিচিস যে রে—এটা কি গোরস্তান?”

—“আমি জানিনি.—বাবু বাবু খুলে নেছেন।”

—“কখনো খুলে নেযনি সিঁড়ির আলোটা। বিন। বিন।”

—“বাস। এই তো এইসো গেচেন উপ্রো।”

—“কী কাণ্ড? দালানেব আলোটাও জ্বালাসনি কেউ? সাতটা বেজে গেল।”

—“বাবু মানা।”

—“মালতী? বৌ। অ বৌ। কোতা গেলি? এসব বাম কী বলচে?”

—“কে? দিদি? আসুন দিদি আসুন। আব বলবেন না। আপনার ভাই আমাকে জ্বালিয়ে খেলেন। ভাগ্যিস আপনি এলেন, দিদি। গীজাব বন্ধ, ইঁটার বন্ধ, স্টোভে চা হচ্ছে, আভেনে বাগা বন্ধ, গ্রামোফোন শোনা বন্ধ, খুকু হেয়াবড্রায়াব বন্ধ, ভিজে চলে কলেজ যাচ্ছে—ইনভার্টার বন্ধ, লোডশেডিংয়ে প্রেশাব বেডে মাথার যন্ত্রনায় মবে যাচ্ছি আমি—”

—“এসব কী বলচিস রে বৌ? সত্যি?”

—“ঠিক বলচি দিদি। সব সত্যি।”

—“বিনুটা চিবকালই একটু ছিটগ্রস্ত, কিন্তু এখন যে বন্ধ উদ্ভাদ হয়ে গেছে বে?”

—“না না, দিদি বিটাযার্ড মানুষ তো? একটু ভাবতে তো হবেই ওঁকে. মেয়ের বিয়ে বাকি. ছেলের এডুকেশন বাকি—”

—“বিয়ে তোমার ছেলেমেয়ে দু’জনেবই এখনও বাকি, এডুকেশনও ছেলেমেয়ে, উভয়েবই বাকি। ‘মেয়েব বিয়ে’ ‘ছেলের এডুকেশন’ এবকম বলতে নেই বৌ। শুনলেও গা জ্বলে যায়। ওসব আমাদের মা ঠাকুমাৰা বলতেন। বাম? পাখাটা খুলে দে। দুটো আলোই জ্বলে দে। সিঁড়িতে আর দালানে। বাপ বে। এই কি আমার বাপের বাড়ি? এ যে অন্ধকূপ। বিনু কৈ?”

—“একটু বেবিযেছেন। বসুন. দিদি। একটু জল এনে দিই।”

—“কোথায় গেছে বিনু?”

—“সেই সন্নকট বিষয়ে কথাবার্তা কইতে। দেখতে আসবে বলছিল. তাব দিনক্ষণ—”

—“এ সেই আমেরিকা থেকে একমাসের জন্যে যে ছেলে আসচে বিয়ে কবতে? ফটো দেখে তো পছন্দ কবেছিল, তাই না?”

—“হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সন্নকটাই—”

—“তা আগেই মেয়ে দেখাবাব কী আছে? ছেলে আসুক. আমবা ছেলেকে দেখি? তবে তো?”

—“ছেলের তো শুনছি আজকালের মধ্যেই এসে পড়াব কথা। একসঙ্গেই ছেলে-দেখা, মেয়ে-দেখা হবে এ-বাড়িতে।”

—“তা ভালো। বাম। সিঁড়িতে আলোটা জ্বলেচিস তো? তোব বাবু বাড়ি এসে হুঁমডি খেয়ে পড়ে না যায়। বিনু যা উটমুখে ছেলে।”

—“বিনু।”

—“কি?”

—“আলোটা জ্বলে দে।”

—“আলো? এই দিনের বেলাতে?”

—“দিনের বেলা হলেই বা। যা বাদলা কবেছে. অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তুই কাগজটা পড়চিস কী কবে? আমার তো বইটাব সব অক্ষব ঝাপসা—শত চেষ্টাতেও আমি যে বইটা পড়তে পাবছি না?”

—“আব একটু চেষ্টা কবতে হবে। ‘যে জন দিবসে মনের হবষে জ্বালায় মোমের বাতি, আশু গৃহে তাব জ্বলবে না আব নিশীথে’—”

—“তোমার গৃহে তো এমনিতেই বাতিবে আলো জ্বলে না। ঘোব অন্ধকার। ঐ সিঁড়িতে আমি কালকে পড়ে মবেই যেতুম আব একটু হলে। বাম ভাগিাস হাতটা

ধরলে। সিঁড়ির আলোটি অতি অবিশ্যি কবে জ্বলে বাখবে বোজ সন্ধে থেকে। তোমাব নিজেব বয়েসও কিছু কমের দিকে যাচ্ছে না, বিনু। একবার হাড়গোড় ভাঙলে—”

—“সেটা না হয় করা যাবে। তা বলে এখন, ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় আলো জ্বলে—”

—“এই রইল তোর বই। এবাব কি ফ্যানটাও অফ কবে দিবি?”

—“দিলে মন্দ হয় না। যা বাদলা বাতাস আসছে। ঠাণ্ডাও লেগে যেতে পারে তোমার।”

—“তুই কি বাড়িসুদ্ধ সব্বাইকে পাগলা করে দিবি বিনু? ছেলেটা বোর্ডিঙে চলে গেল, মেয়েটা সন্ধে পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে—বোঁটার গবমে সাবাদিন প্রেশাব চড়ে মাথা ধরে আছে—বাড়িতে লোকজন এলে তাদের ঘোব অন্ধকূপ সিঁড়ি দিয়ে হুমডি খেতে খেতে উঠতে হয়, এ জনো কেউ তো তোকে আদর্শ নাগবিক বলবে না, বিনু, লোকে যে তোকে হাড়কেপ্পন বলবে বে? মেয়েব বিয়ে দিবি কী কবে?”

—“উপায় নেই দিদি। তিনশো ইউনিট—”

—“খুব উপায় আছে। শোন ইস্তিবিটা কি বন্ধ কবলেই নয়? গাঁজাব, হীটাব ওভেন না হয় বেশি খবচাব ব্যাপার—প্লাগগুলো খোলাই বইল। কিন্তু ইস্তিবির প্লাগটা লাগিয়ে দিলে হতো না?”

—“কেন? অসুবিধেটা কী হচ্ছে? ধোপাকে দিয়ে সব ইস্তিরি কবিযে আনছে তো বাঙিল বাঙিল।

—“ইস্তিবি ধোপা সময় মতন ফেবৎ দেয় না। এই তো আজ মেয়েটা লাইব্রেরিতে গেল গবমেব মধ্যে সিলকেব কাপড পবে—। অথচ ইস্তিরিতেই তৌদেব দৈনিক বেবিযে যাচ্ছে পাঁচ সাত টাকা—ঐ সিলকের শাড়িটা যখন আবার ইস্তিবি কবে তুলে বাখবে, তখন একটাকা লাগবে।”

—“সে কি গো? দৈনিক পাঁচ-সাত টাকা ইস্তিবিতে?”

—“হ্যাঁ। নইলে কী বলছি? বামই বোধহয় সমস্ত কবে দিত? তাই টেব পেতে না কতটা পয়সা বাঁচছে প্রত্যেকদিন।”

—“ছেলেমেয়েগুলোকেও দেখেছি বটে ঘষাঘষ ইস্তিবি ঘষছে কলেজে বেরুনোব আগে—”

—“তবে? মালতীব সে ট্রেনিংও তো নষ্ট হচ্ছে। নিজেব কাজ নিজে না কবিযে বাবুয়ানিব অভ্যেস কবাচ্ছ ছেলেমেয়েকে।”

—“ঠিক আছে ঠিক আছে। ইস্তিবির প্লাগটা দেব’খন লাগিয়ে।”

—“আব সিঁড়িব আলো কটা।”

—“আব সিঁড়িব আলোটাও। একটা। তিনটে নয় কিন্তু।

—“বেশ বাবা তাই সই। মেয়ে দেখানোব তারিখ কবে ঠিক হলো?”

—“বোবাব সকালে। আলো জ্বালবাব ঝামেলা নেই। বেশ প্রাকৃতিক আলোতেই দেখে যাবে।”

—“তবু ভালো যে হটপাট করে পাখাগুলো সব খুলে ফেলতে পারিসনি প্লাগ আব বালবেব মতন।”

—“আরে ? বা, বা, পেতলপালিশ সব শেষ ? ফুলদানিটা ঘষে ঘষে সোনাব মতন কবে ফেলেছিস যে বে ? নাঃ, বাম আমাদেব কাজেব ছেলো।”

—“তা বলে ওতে বজনীগন্ধা বাখলে চলবে না, শ্রাদ্ধবাডি শ্রাদ্ধবাডি মনে হবে—অত বজনীগন্ধা আনিযেছ কেন ? গোলাপ ফুল ছিল না ? গ্লাডিয়োলি—”

—“তোবও যেমন কথা, খোকা। শ্রাদ্ধবাডি মনে হবে কেন ? বজনীগন্ধা নামটাতে কি শ্রাদ্ধ গন্ধ, না ফুলশয্যোর বজনীব গন্ধ, শুনি ? বজনী—গন্ধা—”

—“ফেব ছেলেপুলেব সঙ্গে ঠাট্টা দিদি ? নাঃ, আপনাকে নিয়ে আব পাবা যায় না। যেমন ভাই, তেমনি বোন। দেখুন তো একটু পুড়িংটাব কী অবস্থা ? একটুখানি বাকি ছিল। ওটা বেব কবে, মুরগীটা আবাব ঢোকাবো আভেনে। আপনাব ভাই বাড়িতে পা দেবাব আগেই সব সেবে ফেলতে হবে তো।

—“ছেলেপুলে আবাব কী ? প্রাপ্তে তু ষোডশবর্ষে, জানিস না ? অ খোকা, বাথরুমে গীজাবেব প্লাগটা লাগিয়ে দিইচিস তো বে ? বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে যেন হট-কোল্ড দু'বকমেবই জল বেরুচ্ছে দেখতে পায।”

—“এই গবমে হটওয়াটাব দিয়ে কী হবে পিসিমণি—”

—“হটওয়াটাব দিয়ে ওদের কিছুই হবে না, শুধু তোমাব বোনটি যে কতদূব আবামে আয়েশে অভ্যস্ত সেটাই স্চক্ষে দেখে যাবে তাবা। বিলেতে থাকে বলে পাতবটি যেন মনে কবে না সে একটা কেউকেটা হয়েচে। এখানে, মেয়েব বুডো বাপেব ঘবেও সববকমেব বিলিতি আবাম-আয়েশেব বন্দাবন্তই মজুত বয়েছে। এইটে তাদেব দেখা দবকাব। ওই গাঁকগাঁক গ্রামোফোনটাব প্লাগটা এঁটেচিস ? যাতে এ-ঘরে ও-ঘবে একসঙ্গে গান বাজে ?”

—“সিবিওর অ্যামপ্লিফায়াবটা ? হ্যাঁ, পিসিমণি।”

—“দে না একটা ভালো গান লাগিয়ে দে না। তাদেব হিন্দিমিন্দি নয়, একটা ভালো অতুলপ্রসাদ কি ববীন্দ্রনাথ। শাওন গগনে ঘোব ঘনঘটা।”

—“কিংবা, বঁধু নিদ নাহি আঁখিপাতে ?”

—“আঁা ? পিসিব সঙ্গে এয়ারকি ? বলি সব কটা বাল্ল লাগিয়ে দিইচিস তো ? আকাশে যা ঘনঘটা কবে মেঘ ছেয়ে এসেচে, সকাল বেলা হলে কি হবে দালান, সিঁড়ি, সব তো অন্ধকার। এ-ঘবেও সব কটা আলো জ্বলে দিতে হবে। নইলে মেয়ে দেখায় বিঘ্ন ঘটবে।”

—“কেন ? আলো দিয়ে কী হবে ? বেশ তো বোমাষ্টিক ‘বরিশণ মুখরিত’ অ্যাটমসফিযাব। আঃ। দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে তো বাল্লাঘব থেকে ? মা, মুরগীটা বেশী করে কবছো তো ? ওদেব যেন সবটা খাইয়ে দিও না আবাব। খুক্। খুক্, তোব পুডিং এক্কেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। অমন চেহারা যাব, তাব সোযাদ কেমন হবে

বোঝাই যাচ্ছে। গেল। ঐ পুড়িং দেখলেই কিন্তু সঙ্গ কঁচে গেল—”

—“চুপ কব দিকিনি? যত অকথা কুকথা। দিদি, এদিকে দেখুন তো একটু, পাত্রেব ঠাকুমা আসছেন। তাঁর নিরামিষ জলখাবাবটা—”

—“যাচ্ছি, যাচ্ছি, থোকা—হরমোনিয়াম, তবলা, তানপুরো সব আগে থেকে বের করে ঝেড়েপুঁছে রাখো। তখন যেন টানা-হেঁচড়া করতে যেও না। পাত্রেব শুনিচি ভালো গান গায়। পাত্রেবের গান শুনে চাইব কিন্তু আমবা। ভুললে চলবে না, আমরাও তো ছেলে দেখছি এইসঙ্গেই।—খুকুব সাজ তো দেখি আব শেষই হচ্ছে না মা? কী মাখাচ্ছে এত?”

—“এই হলো বলে। না না না, আজকাল ওসব বেশি কিছু মাখায় না। চোখ আঁকে, ভুরু তোলে, চুল বেঁধে দেয়, ঠোঁটেও আঁকে দেয় দেখেছি তুলি দিয়ে—তা খুকুকে তো ওব কাকী সাজাচ্ছে—অত কিছুই কবছে না।”

—“দবকাবও নেই। মেয়ে আমাদের কপসী।”

—“মা, কফিটা একদম টাটকা গ্রাইণ্ড কবে ফেলেছি, দাকুণ সুগন্ধ বেরিয়েছে। এবারে পার্কোলেটারে জলটল ভরে বেডি করে রাখছি, তুমি শুধু খেতে দেবার আগে সুইচ অন কবে দেবে। বুঝেছ?”

—“তুই নিজেই ওটুকু কবিস বাবা, আমাকে পাঁচদিক দেখতে হচ্ছে।”

—“ও. কে, ও. কে—কফিব ইনচার্জ আমিই বইলুম—”

—“এই যে আসুন, মুকুয্যামশাই, এদিকে—এই হচ্ছে আমাব গবীবখানা—কই গো কোথায় সব? ওবে অ থোকা। অ রাম। দিদি! খুকু। মালতী। এই যে এবা সবাই এসে গেছেন, পাত্রেবপক্ষের পাঁচজন। তোমরা বেডি তো? একি? এতগুলো আলো! কে জ্বালালে? ল্যানডিঙেব এই আলোগুলোতে বাজ লাগালে কে? বাম। থোকা। আই ওয়ান্ট টু নো হু হ্যাজ ডান ইউ?”

—“আসুন মাসিমা আসুন, নমস্কাব, নমস্কাব, আমি হলুম বিনোদেব দিদি, এই যে আপনাবা এদিকে আসুন। এই হচ্ছে আমাব ভাজ, মালতী, মেয়েব মা। এ আমাদের থোকা, মেয়েব দাদা। ভালো নাম বাপ্পাদিত্য, ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ারিং পড়ছে—বসুন মুকুয্যামশাই, এই যে মাসিমা এইটেতে বসলে আপনাব হয়তো সুবিধে হবে। আব তুমিই বঝি অভিজিৎ? বাঃ, সোনার চাঁদ ছেলে। এটি বঝি তোমাব বন্ধু? নাঃ কী বাবা? অমল? বাঃ বেশ, বেশ, আপনিই নিশ্চয় অভিজিৎবেব মামাবাবু? আপনাদের আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো? গা বিষ্টি শুরু হয়েচে।”

—“অ্যাবে, এঘবে একসঙ্গে তিনখানা আলো? হানড্রেড ওয়াট স্ট্র। সিঁড়িময় আলো। দালানে আলো। কে, কে জ্বালালে দিনের বেলায় এত আলো—কতবার বলিচি, ‘যে জন দিবসে মনেব হবষে?’ ওফ—সুইচ দেম অফ। সুইচ দেম অফ ইন্ডিয়ায়টলি।” লাফিয়ে উঠে বিনোদবাবু একসঙ্গে বৈঠকখানার তিনটে আলোই



নিবিষে দেন। ঘবে গভীর অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাইবে ঘোব ঘনঘটা। পাত্রপক্ষ গহন আঁধারে নিমজ্জিত। সেই আঁধাব, সেই মেঘ গুরু গুরু বৃষ্টির ঝঙ্কার ভেদ কবে বিনোদবাবুব কণ্ঠস্বর শোনা যায়—“এইভাবে চললে পাওয়ার ব্যাশনিং ইজ বাউনড টু ফল থ্রু। সবকাব কখনই পেবে উঠবে না, ইনডিভিজুয়াল যদি তাব দায়িত্ব পালন না করে টুওয়ার্ডস দি সোসাইটি—”

—“বেশ বাবা— ঘাট হয়েছে, অনায্য হয়েছে। সিঁড়ির আলো সব নিবিষে দিয়েছে। এবাব এঁদেব দিকেও একটু মন দাও। অতিথিব প্রতিও তো তোমাব কিছু দায়িত্ব আছে, না নেই? মেয়ে দেখাবে বলে ডেকে এনেচো, তাবপবে ঘব অন্ধকার কবে নুকোচুবি খেললে এঁবা তো মনে কববেন, যে তোমাব মেয়ে খুঁতো। আলোগুলো জ্বলে দে, বামা।” বাম আলো জ্বলে না। থোকা এসে আলো জ্বলে দেয়।

—“এবাব ববং কফিটা আনক। অ খুকুমা খুকুমা, কফিটা নিয়ে এসো তো মামণি। খুকুই কিন্তু আপনাদের পাত্রী। আমরা অত মধুমতী মধুমতী বলতে পারি না।”

কাকিমা পর্দা তুলে ধবলেন। কফির ট্রে হাতে ছিপছিপে, মিষ্টি খুকু সলজ্জ মুখে সতর্ক পায়ে প্রবেশ কবলো। সত্যি, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে সবুজ শাড়িতে। ট্রেতে ধূমায়িত পার্কেলেটাব, আব কফিসেট সাজানো। পিছন পিছন কাকিমা এলেন। নিঃশব্দে গোর্গে কাঁপাতে কাঁপাতে শিকারী বেডালের মতন বিনোদবাবু কী যেন শূঁকছেন বাতাসে। হঠাৎ ফেটে পড়লেন।

—“তাই বলি, কিসেব গন্ধ? ফ্রেশ গ্রাউন্ড কফির মতন মনে হচ্ছে? অথচ আমি তো প্লাগ খুলে দিইচি। এখন দেখচি পার্কেলেটাবও চালু কবা আছে। কে? প্লাগগুলো লাগালে কে? লাগালে প্লাগ? গ্রাইণ্ডারব? পার্কেলেটারব? দেবেই। এবারে কানেকশন কেটে দেবেই। কেউ কখনো পাববে না। জ্যোতি বোসও নয়।”

—“আঃ বিনু, ওসব কথা আজকে থাক না, দেখচো বাড়িতে কাজ—...”

—“থাক না? কেন থাকবে? তোমরা সবাই ক্যালাস— শেষটাতে মববে তো এই বিনোদ চক্কোভাই—”

—“বিনু, একটা দিনেব মামলা, প্লাগ না হয় তুমি আবার খুলে দিও—”

—“মামলা একদিন দুদিনেব নয় দিদি, এটা একটা মেন্টাল আটিচ্যুডেব প্রশ্ন। কি বলেন মুকুয়োমশাই, তাই নযকি? এ ল্যাক অফ সিভিক বেসপনসিবিলিটি। নাগরিক দায়িত্বজ্ঞানের অভাব। ছেলেপুলেবা কী শিক্ষা পাবে এসব দেখলে?”

কাকিমা কফি ঢেলে দেবেন কিনা বুঝতে পাবছেন না। টেবিলে পার্কেলেটাব বসে আছে। কাপ সব শূন্য। এই সময়ে মালতী ঘবে এলেন। আবো ট্রে নিয়ে পিছন পিছন বাম। তাতে মূবগীর কাবাব বোস্ট, প্যাটিস, পুডিং, নানাবকম ভালোভালো জিনিস। মালতীর হাতে আলাদা একটি ট্রেতে নিবিমিশ্র জলখাবাব। এবং একটি কেক।

সুগন্ধে ঘর ভরে উঠলো। টেবিলে সব নামিয়ে একে একে প্লেটে সাজাতে লাগলেন মালতী। পাত্রপক্ষেব চোখেমুখে অপার মুগ্ধতা স্পষ্ট। সেটা পাত্রী দেখে, না খাবার-দাবার দেখে, বোঝা শক্ত। পাত্রপক্ষ মুখে অবশ্য বলছেন,— “কী কাণ্ড কী কাণ্ড, এতসব করবাব কী দরকার ছিল? ছি ছি ছি।...”

—“এই যে মাসিমা, এই কেকটা খুকু তৈরি করেছে। একেবাবে নিরিমিষি, এতে ডিম নেই!” ঠাকুমাকে কেক কেটে দিতে দিতে মালতী বলেন। ঠাকুমাও একগাল হেসে—“বা, বা। ডিম ছাড়া কেক? মেয়ে নিজে করেছে? চমৎকাব। কিন্তু মা, আমি তো অবেলায় কিছুই খাইনে। আমার ডিশখানা ববং তুলে নিয়ে যাও।” বলে প্লেট ঠেলে দেন। মালতী যাবপবনাই বিমর্ষ।

—“একটু কফি?”

—“বরং একটু নেবুর জল কবে দাও মা. ঘবে নেবু আছে তো? কফিটিফি আমি খাইনে।”

—“হ্যাঁ হ্যাঁ—” কাকিমা তক্ষুনি বালাঘরে ছোটেন। মালতী প্লেটে খাবাব তুলে দিচ্ছেন, খুকু প্লেটগুলি হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে, পিসিমা যত্নআত্তি করছেন। বিনোদবাব অবশেষে পাত্রের পিতা এবং মাতুলের প্রতি কিক্ষিৎ মনোযোগ দিতে আবস্ত কবেছেন। পাত্র আর তার বন্ধু লজ্জায় খুকুব সঙ্গে কথা না বলে খোকাকে তাব পডাস্তনো নিয়ে প্রশ্ন করছে। খুকু পাত্রের বাবা, আর মামার হাতে প্লেট তুলে দিল। বিনোদবাব বিদ্যুৎ রাশনিং, লোডশেডিং ও ইলেকট্রিসিটি বিল নিয়ে আলোচনা কবতে কবতে হঠাৎ কপোর রেকাবিতে খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন—

—“রূপোর ডিশগুলো এখনো ঘরে? কবে বলিচি ব্যাংকেব ভন্টে বেখে এসো গে? চাও কী তোমবা? ডাকাতেব হাতে জবাই হতে চাও? যাকে তাকে এত কপোব বাসন দেখিয়ে বেডানোব কী হয়েছে। দিনকাল কী পডেচে জানো না?”

—“ব্যাঙ্কেই তো থাকে বারোমাস। আজকে বাড়িতে একটা বিশেষ কাজ, উৎসবের দিনেও ব্যাভার কববে না? তাহলে শখ কবে গড়িয়েচিস কেন?”

দিদির বকুনিতে মুহূর্তমাত্র দমে গেলেও বিনোদ আবাব চাঙ্গা হয়ে উঠলেন প্লেটে রাখা বস্ত্রগুলি দেখে।

—“ও কী ও? পু-ডিং? মুরগীর কাবাররোস্ট মনে হচ্ছে? প্যাটিস? কে...ক? মানে, আভেন? আভেনও চালু করেছে? হয়ে গেল। হু-য়ে-গে-ল। এখানেই হয়তো একশো ঘাশি ইউনিট—গ্রাইন্ডাব, পার্কোলেটার, আভেন! কেন, উনুন কি ছিল না? গ্যাস? কেরোসিন? রোজরোজ তো তার সাপ্লায়ের জন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিচ্চো, আর বাড়িতে কাজকন্মের বেলা আভেন?”

—“আর বিলু—”

—“নো। দিদি, তুমি প্রশ্নই দিও না। কেন মুরগীর দোপেঁয়াজা, লুচি কি করা যেত না? “প্যাটিস না করে চপ? পুডিঙের বদলে হালুয়া, চমচম, পানতুয়া, লবঙ্গলতিকা, —কত কী তো হয় বিজয়ার সময়—সেসব করতে পারতে না?”

বলতে বলতে নিজেবই কী যেন সন্দেহ হয় বিনোদবাবু—গলার সুব পালটে যায়—“অঃ, বুঝিচি, খুকিকে বুঝি এসব শেখানো হয়নি? সে ওই কুকিং ক্লাসে গিয়ে যত বিলিতি ছাইভস্ম বান্না শিখেছে? এইসব আজবাজে যত খাবার, যাব জন্যে আভেন নইলে চলবে না?” বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বিনোদবাবু এক হ্যাঁচকাটানে পাত্রের বাবাব হাত থেকে বেকাবিটা টেনে নিয়ে মালতীর চোখের সামনে আন্দোলিত কবতে থাকেন। এই টানাহ্যাঁচডায় প্যাটিস কাপেটে পড়ে যায়। খোকা বাগ চাপতে ঘব ছেড়ে বেবিযে গেছে। খুকু কান্না চাপতে বিপন্ন, বিষন্ন, ভীত-ভীতু চোখে চেয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। কচি মুখখানি এই বিপর্যয়ে আরো মিষ্টি দেখাচ্ছে। পাত্র আডচোখে কেবলই দেখে নিচ্ছে। মাথা নিচু করে বসে আছেন মালতী। আব ধবা পড়া চোরের মতো ভাবাচাক্য পাত্রপক্ষ নিষিদ্ধ রেকাবি হাতে ধবে, তাতে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রস্তুত। যেন স্টাচু খেলা। খাবার স্পর্শ কবতে সাহস পাননি কেউই। পাত্রের বন্ধু হাসি চাপতে রুমাল বেব কবেছে। পিসিমা এবার ধমকে উঠলেন:

“কী, হচ্ছে কি বিনু? তুই কি কাউকে খেতে দিবিনি আজকে? ছোটবউ, কফিটা ঢাল দিকি। কেউই তোমাকে সৎ নাগরিক বলবে না। বিনু, বলবে ক্ষাপা পাগল। মালতী, যা, ওঁদের একটু খাবারে হাত লাগাতে বল? আজকে বান্না তো যা হবার তা হয়েই গেছে, বিনু যা যা বললে সেসব খেতে আরেকদিন আসতে হবে কিন্তু আপনাদের মুক্যোমশাই। খুকু আমাদের দিশি রান্নাও সবই জানে, জানবে না কেন? ছেলে বিলেতে থাকে বলে বলেছিলুম বিলিতি খাবার কবতে।”

নতুন এক প্লেট খাদ্য পাত্রের বাবার সামনে হাতে তুলে দিতে দিতে মালতী চাপা গলায় বলেন—

“একটু মুখে দিন দয়া করে, ওঁর কাণ্ডকারখানাতে কিছু মনে করবেন না, বড্ড সরল মানুষ, মনে-মুখে এক—”

পাত্রের বাবা বুদ্ধিমান লোক। ঝাঁকরা আশুতোষী গোফের তলায় হাসছেন বলে সন্দেহ হয়। প্লেট টেনে নিয়ে বললেন—

—“না না, মনে করব কেন, উনি তো সব ঠিক কথাই বলছেন।” তারপরে ঘরের কোণে রাখা তবলা, হারমোনিয়াম, তানপুরাব দিকে তাকিয়ে বলেন—“খাওয়াটা আগে চুকিয়ে নিই, তাবপব ববং একটু গানবাজনা হবে. কি বলেন চকোত্তিমশায়? অভিজিৎ বেশ ভালো গজল গাইতে পারে।”

খাওয়াদাওয়া শুরু হতেই বিনোদবাবু অন্য মানুষ।

—“কৈ গো। আমার প্লেটটা কৈ? মালতী, মুক্যোমশায়ের জন্যে আরেকটু

কাবাবরোস্ট, অ মামাবাবু, মানে বাঁড়ুয়োমশাই আপনার জন্যে দুটো প্যাটিস দিক ? পুডিং কই, পুডিং ? বাবা অভিজিৎ, আব অভিজিতের বন্ধু, কী যেন নাম তোমার, লজ্জা কবে খেও না যেন, তাহলে নিজেবাই ঠকবে—মাসিমা যে শববৎ চাইলেন শববৎ কই, শববৎ ? রাম ?”

হাঁকডাকেব চোটে রাম এক-ট্রে জলেব গেলাশ নিয়ে ঢুকে পড়ে। পিসিমা বলেন—“শববৎ খাওয়া হয়ে গেছে। তোমাব কি সেসব দিকে নজব ছিল ?” প্রস্তুবমূর্তি ভেঙে এবাব খুকু জলেব গেলাশ হাতে হাতে এগিয়ে দেয়া শুরু কবে। জলপানেব ঘট্টা দেখে বোঝা গেল অতিথিরা কতদূর তৃষগর্ত ছিলেন, মক্ভুমির যাত্রীদের মতো জল খেতে লাগলেন সবাই। পাত্র বৃষ্টি এতক্ষণে খুকুকে একটা কিছু বললেন। খুকু মদ হেসে জবাব দিচ্ছে। বিনোদবাবু হঠাৎ তেড়ে উঠলেন,

—“বাম ! বাম !” তাঁব প্লেট শূন্য। হাত ধোয়া সাবা। একটু ঢেকুব তুলে বললেন—“মইটা কোথায় ? মইটা দেখি।” —অবাক মালতী বলেন:

—“মই ? এখন মই দিয়ে কী হবে ?”

—“মইটা তো পাশেব বাড়িতে চেয়ে নিয়ে গেছে।”

—“তাহলে এই টুলেই চলবে। খুব শক্ত আছে।” মালতীব প্রশ্নেব উত্তর না দিয়ে বিনোদবাবু বলে চল্লেনঃ —“কে এখানে সবচেয়ে লম্বা ? বামবাটা তো আমাব চেয়েও বেঁটে। খোকা ? মুকুয়োমশাই, আপনাব হাইট কত ? খোকাব চেয়ে লম্বা কি ? এইতো অভিজিৎ-এব দিবি টলফিগার আছে, সিন্ধুফুটাব বোধহয়, না ?” বলতে বলতে খপাৎ কবে একটা শ্রীতিপূর্ণ থাবা বসালেন পাত্রেব কাঁধে। সদ্য কফিব কাপটি মুখে তুলছিল সে।

—“কফি শেষ তো ? বেশ বেশ। এবাব চলো তো বাবা আমাব সঙ্গে একটু, দালানের ওই বালবগুলো খুলে দেবে, আব সিঁড়িতে একখানা বাদ দিয়ে বাকি দুটো। বৃঝলে না বাবা, এটা পয়সাকড়িব ব্যাপাব নয়, পাওয়ার সেভিং-এব প্রশ্ন—”

বলতে বলতে বিনোদবাবু গিয়ে পটাপট কবে বৈঠকখানাব আলো তিনটে নিবিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন—“এই তো, দিবি দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে না কি ? ক্রিয়ার ভিশন। আমি তো মুকুয়োমশাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।” তাবপর ঘেবর আবেক কোণে ছুটে গিয়ে ভারি পেতলেব ফুলসুন্ধু ফুলদানিটা নামিয়ে বেখে বোমান পিলারেব আকৃতিব মোটা মেহগনিব উঁচু টলটা নডাতে চেঁটা কবে ব্যর্থ হয়ে পার্শ্ববর্তী যুবক-দুটিব দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ কবলেন। হাঁ হাঁ করে খোকা ছুটে আসবার আগেই পাত্র এবং পাত্রেব বন্ধু টলটি টেনে হিচড়ে সবাত্তে শুরু কবে দিয়েছে—খোকা এসে হাত লাগায়। —“এই দালানে নিয়ে চলো—”, আর্মি কমাণ্ডাবেব মতো গাঞ্জিয়ারেব সঙ্গে বিনোদবাবু নির্দেশ দেন— “দালানেবটা আগে। বৃঝলে বাবাবা, যে দেশের মানুষদেব নাগরিক দায়িত্ববোধ নেই, সেই দেশেব ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকাব...”

## প্রেমচাঁদিনী

হ্যাঁ, হতো যদি ববীন্দ্র-নজরুল-শরৎচন্দ্র, বহুবাব-য়ে-সময়েব-যেটা, বন্ধা একটা না একটা ঠিকই যোগাড় হয়ে যেত। আমাদের যাব যেরকম সোর্স, সে যাকে ধবতে পারি, ধবে আনি। সে এরিয়া যাই হোক, ফুটবল, ক্রিকেট, গল্প-কবিতা, যাত্রা-সিনেমা, পলিটিক্স-প্রফেসারি—এভরিথিং ইনক্লুডেড। বিখ্যাত হলেই হলো। আমাদের পাঠাগার-পাঠচক্রের বয়েস উনত্রিশ, কোনো দলাদলি নেই। একবছর নববর্ষ উৎসবে মোহনবাগানেব প্লেয়াব আনলাম প্রধান অতিথি, পবের বছর বসন্ত উৎসবে ইন্সটিটিউটের প্লেয়াব। (অবশ্য সেই একই লোক, ধ্যাবেনদাব শালা)। এই তো গত বছবেই স্রাধীনতা উৎসবে সভাপতি এলেন সি পি এম. প্রধান অতিথি এলেন কংগ্রেস-ই; কৈ কোনোই অপ্রিয় ঘটনা তো ঘটেনি? দিব্যি একসঙ্গে এলেন, একসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন, একসঙ্গে চা-সিঙাড়া খেয়ে এক গাড়িতে বাড়ি গেলেন।

গোলমালটা বেধেছে এবাবেই। কেননা বাজোবিয়াজী, যাকে আমবা পাঠাগারের নতুন সভাপতি নির্বাচন কবছি (ঐ উঁচু একতলাসমান পাঁচিলঘেবা সাততলা সবুজ বাড়িটা ওঁদেবই) তিনি আমাদের মোটা চাঁদা দিয়ে বলেছেন মুনশি প্রেমচাঁদ নামক হিন্দুস্থানী বাইটাবেব শতবর্ষ উদযাপন উৎসব কবতে হবে। সেই উপলক্ষ্যে অনেকগুলি হিন্দি বইও দিয়েছেন পাঠাগারকে। উৎসবেব প্রোগ্রামও তৈরী। বাজোবিয়াজীই প্রিন্সাইড কববেন। তবে প্রেসিডেনশিয়াল স্পীচের বদলে তিনি একটি স্ববচিত কবিতা পডবেন, প্রেমচাঁদেব ওপরে। এছাড়া একটি প্রধান অতিথিও চাই মূল বন্ধা হিসেবে, ডক্টরেটেব প্রতি বোঁক। বাকীটা আমাদের ওপরে। খাওয়াব মেনুটাও ভালো হয়েছে এবাব। কিন্তু প্রেমচাঁদেব ওপর ভালো বলতে পাবে এমন পণ্ডিত লোক পাই কোথায়? আমাদের দাসনগর কলোনীর লোকেদেব সোর্স খুব বেশি নয়। মেসোমশাই সেক্রেটারী। আমাদের অবস্থা কাহিল, প্রধান অতিথি পাওয়া যাচ্ছে না। দিকে দিকে খোঁজ খোঁজ বব পড়ে গেছে।

এমন সময়ে সৌম্যই মুখবক্ষা কবলো। ওদেব অফিসেব সেমিনাবে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। ডক্টর কঙ্কড, কথায় কথায় প্রেমচাঁদ বিষয়েও আলোচনা কবছিলেন—দাকণ কালচাবড লোক। জানেন না হেন বিষয় নেই। দিল্লিতে প্রেমচাঁদ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনাবে কোন কোন দেশবিদেশেব লোকেবা এসেছিলেন, সেকথা উনি গল্প কবছিলেন। মার্কিন দেশে উনি কিছুদিন ভাবতীয় সাহিত্য পড়িয়েছেন—আপাতত বিবট এক কোম্পানীব পি-আব-ও। সংস্কৃত সাহিত্যেব পি-এইচ-ডি। বাজোরিয়াজীব সাধ মিটবে। অতিকষ্টে তাঁকে বাজী করিয়েছে সৌম্য। ভদ্রলোক এত বাস্তব সেদিনও আবেকটা মিটিং আছে, তবু কষ্ট করে আসবেন বলেছেন। সৌম্য বলল ট্রাব্রেকের সময়ে আলোচনা হচ্ছিল, উনি বললেন সত্যজিৎ বায়ের সবগুলো

হিন্দি ছবির মধ্যে প্রেমচাঁদের গল্পটাই শ্রেষ্ঠ। আরো বলেছেন নাগিস কেমন করে ভুলে গেলেন যে শতবঞ্জ কে খিলাড়ীতে রাজৈশ্বর্য দেখানো হয়েছে, ভূতের রাজা আর শুণ্ডির বাজাব গল্পেও রাজারাজডাব কাণ্ড, এমনকী সত্যজিতের রিসেন্ট ভেনচাবেও যত হিবে, তত রাজা। বললেই হলো কেবল পড়াটি দেখায়?

উনি বাংলাতেই বলতে রাজী হয়েছেন, চমৎকার বাংলা বলেন। কথায় কথায় বিবেকানন্দ, শ্রীঅবিন্দ, ববীন্দ্রনাথ কোট কবেন। দাকুণ লোক। বহুকাল আমেরিকায় ছিলেন কিনা?

একত্রিশে জুলাই। পাঠচক্রের উত্তেজনা টঙে। ফরাসটারাস বিছানো হয়েছে, বজনীগন্ধাব মালা, ফুলের তোড়া, ধূপ, হাবমেনিয়াম, সমস্ত বেড়ি। এমন কি প্রেমচাঁদের একটি বাঁধানো ছবি পর্যন্ত (বাজেবিয়াজীর কল্যাণে প্রাপ্ত) প্রস্তুত। উদ্বোধন সঙ্গীত থেকেই এবারের বৈশিষ্ট্যটা ফুটে উঠেছে। এ তো নেতাজী-নজরুল নয়। কি অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তও নয়, প্রেমচাঁদ বলে কথা। তিনি নাকি কেবল উর্দু আর হিন্দিতে লিখতেন। তাই উদ্বোধন সঙ্গীত হচ্ছে উর্দুতে। আমরা চেয়েছিলুম—“চৌধুরীকা চাঁদ হো” গাওয়া হোক। প্রেমচাঁদের সঙ্গে বেশ লাগসই হতো; “যো-ভি-হো-তুম খুদাকে কসম লা-জওয়াব হো”টাও একদম মানানসই হতো। তবুও সে-গান ক্যানসেল করে দিয়ে একটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক গান—“সাবে জাহাঁসে আছা হিন্দুস্তাঁ হমারা হায়” গাওয়া হচ্ছে। অকেশানের সঙ্গে যার কোনোই রেলভঙ্গ নেই। প্রোগ্রাম ছোটো। প্রথমেই ওয়েলকাম, এবং প্রেমচাঁদ-প্রশস্তি কবিতা পাঠ করবেন বাজেরিয়াজী। তারপর ডক্টর কক্কডের স্পীচ। শেষে মেসোমশাইয়ের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। অবশ্য এখানেই শেষ নয়। এটা প্রথম অংশের সমাপ্তি। তারপর আছে “ওকাউরি কথা।” আব মাঝখানে আছে বিশ্রাম। অর্থাৎ চা, সিঙাড়া, রসগোল্লা, ডালমুট; ভেজিটেবল চপ। একমাত্র ক্রটি, ফিল্মটা তেলুগু বলে সবার মন খারাপ। হিন্দি হলেই বেস্ট হতো।

ঠিক পাঁচটায় বাজেরিয়াজীর গাড়ি থেকে ডক্টর কক্কড নামলেন। দাকুণ স্মার্ট লোক, সতি। অত মোটা, অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটেন, বাঘের মতো পা ফেলেন। ভুঁড়ি তেমন কিছু বেশিও নয়। পরনে আকাশ-নীলরঙের কড়কড়ে সাফারি-সুট। চোখে লোডশেডিং নীল চশমা। হাতে পাইপ। খুব ফর্সা রং, টাকের রংটা আরো ফর্সা, কেননা কালো চুলের বর্ডার ঘেরা। সকলকে নড করতে করতে ঢুকলেন। সায়েবের মতো হাঁবডাব।

বাজেবিয়াজী তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, সভার উদ্দেশ্য নিবেদন করে, প্রেমচাঁদের গলায় মালা পরিয়ে সভা শুরু করলেন। তারপর নিজের প্রশস্তিপদ্যটি পাঁচালীপড়ার মতো শুরু করে পাঠ করলেন। প্রথম স্ট্যানজটা এইরকম—

“—মুনশি প্রেমচন্দ যুগ যুগ জীও।

ভারতকে নাম উর্চু রাখিও।

হাওয়ামে আওয়াজ উঠত হায 'প্রেমচন্দ'।।

সাবে জগদ্ব চলত হায আনন্দ।।

জুরমানা গোদান জিসনে কিয়া।

ও হী হমাবা প্যাব লে লিয়া।।

মুনশি প্রেমচন্দ জগকা প্রিয়।

দুনিয়াকে দিলদাব, যুগ যুগ জিও।।”

ইত্যাদি। বেশ লম্বা, কিন্তু ভাবি সুন্দর কবিতা। বাংলা কবিতাব চেয়েও বোঝা সহজ। খুব হাততালি পড়ল। তাবপব উঠলেন মূল বক্তা। হাতেব পাইপ টেবিলে বেখে। দু'টি হাতে টেবিলে ভব দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। —“নমস্তে। ফ্রেণ্ডস, ক্যালকটানস এ্যাণ্ড কান্ট্রিমেন, লেনড মি ইওব ইয়ার্স—” বলে একটু থামলেন, একটু হাসলেন, তাবপব সুব বদলে, নেতাজীব স্টাইলে বললেন— “এ্যাণ্ড আই শ্যাল গিভ ইউ মুনশি প্রেমচন্দ।” অডিয়েন্স মন্ত্রমুগ্ধ। নিবাতনিম্বম্প বাজোবিয়াজী। সত্যিই, শিক্ষিত লোক আব কাকে বলে! স্টেজে মেসোমশায়েব দিকে তাকিয়ে দেখি তিনিই শুধু কেমন-কেমন একটা চোখে চাইছেন। একটু যেন বিরত, একটু কনফিউজড। কেন? ওহো, তাইতো, বক্তৃতা তো দেবার কথা ছিল বাংলায়। শুরু হয়েছে ইংবিজিতে। তাই নিশ্চয় সেক্রেটারি বিচলিত। কিন্তু যাক, ত্রিশ সেকেন্ডেব বিবতির পরেই ঝাড়া বাংলায় বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল। সবাই নিশ্চিত।

—“আপনাদেব পাঠাগাব আজ মুনশি প্রেমচন্দেব জন্মশতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবে যে আমাকে আমন্ত্রণ কবেছেন, এজন্য আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। তিনি কেবল হিন্দি লেখকই ছিলেন না, তিনি সাবা বিশ্বেব। যেমন শেক্সপীয়ব, যেমন টলস্টয়, যেমন শবৎবাবু, যেমন ববিবাবু, যেমন ওমব থৈয়াম, যেমন কনফুশিয়াস। তেমনই প্রেমচন্দ ছিলেন সত্যেব পূজারী। গবীবেব দোস্ত। ববিবাবু মতেই প্রেমচন্দও তাঁব সব লেখায় বলে গিয়েছেন—‘সোবাব উপ্রে মানুস সতিয তাহাব উপ্রে নাই।’ শেক্সপীয়াবেব মতন প্রেমচন্দও বলেছেন—‘ম্যান ইজ বর্ণ ফ্রী বাট ইন চেনস এন্ড্রিহোয়াব’, বলেছেন, ‘দিস ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজ।’” উনি নিশ্বাস ফেলতে থামলেন, আমবা চুপ। ঝড়েব বেগে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন উক্টেব কক্কড। আমবা কি পাবতুম হিন্দিতে এমন বলতে?

—“আপনাদেব কাছে প্রেমচন্দেব কথা আব কীইবা বলবো, আপনাবা তো শবৎবাবুকেই জানেন। শবৎবাবুকে জানলেই প্রেমচন্দ আব প্রেমচন্দকে জানলেই শবৎবাবুকে চেনা যায়। একই জিনিসেব এপিঠ আব ওপিঠ। দুজনেবই জীবনেব motto ছিল ‘গবীবা হঠাও’। আপনাবা তো জানেনই যে শবৎবাবু ভাগলপুরওয়াল। হিন্দুস্তানী তাঁর ভালোই জানা ছিল। ঐসময়টায় প্রেমচন্দেব সঙ্গেও তাঁব গভীব দোস্তি হয়েছিল। শবৎচন্দেব অনেকগুলি গল্পই যে প্রেমচন্দেব লেখা, তা কি আপনাবা জানেন? তেমনি প্রেমচন্দেব দু'একটি গল্প আসলে শবৎবাবুব। ওঁরা দুজনে প্রথম

জীবনে একই লিটল ম্যাগাজিনে বিনা নামে গল্প লিখতেন। তাব কতগুলো পরে শবৎবাবুর নামে চলে গেছে, কতগুলো প্রেমচাঁদের নামে থেকে গেছে। কখনো কখনো ওঁবা আবার নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত কবে নিতেন কে কোনটা লিখবেন। ধব্বন, সেই যে পিতাপুত্রের আলুপোড়া খাবার কাহিনী, পাশে ঘরে ‘বহু’ মরছে। আরো দু’জন লোক উপস্থিত ছিলেন সেই বোঁপড়িতে। আলুপোড়া খাওয়ার সময়ে দাক্ষণ গাঁজাও টেনেছিল বাপ-বেটাতে। আব ওদের গাঁজাব সাথী ছিলেন এঁবা দুই বন্ধু, প্রেমচন্দ ও শরৎচন্দ্র। সেদিন প্রেমচন্দ বললেন এ-গল্পটা বরং আমিই লিখে ফেলি, শবৎ? তুমি এটা আমায় ছেড়ে দাও। শবৎবাবু বললেন—বহুং আচ্ছা। কিন্তু তাহলে সেই যে তোমাদের ভ্রমিদাবের পুকুরের বড় মাছ দুটোব গল্পটা তুমি বলেছিল, সেটা তবে আমি লিখি? প্রেমচাঁদ বললেন—বহুং আচ্ছা।” দু’জনেই ঠিক করেছিলেন বিধবা মেয়ে বিয়ে কববেন। প্রেমচাঁদ বিধবা শিববানী দেবীকে বিয়ে কবেছিলেন। শবৎচন্দ্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবেননি। তাই তিনি ব্রহ্মদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে দু’জনের পথ দু’দিকে ভাগ হয়ে গেল।” ডক্টর কক্কড় একটু হেসে বললেন—‘আপনাবা ভাবছেন এসব খবর আমি কী কবে পেলাম? শিববানীই আমাব জ্যোতিমা। তাব প্রথম বিবাহ হয়েছিল আমাব স্বর্গত জ্যাঠাব সঙ্গে।” ডক্টর কক্কড় বিশ্রাম নিতে থামলেন। আমবা মুগ্ধ। স্তব্ধ। এতগুলো নতুন কথা একসঙ্গে শুনতে পাবো কে ভেবেছিল। কিছুই তো জানি না। আমবা দাসকলোনি ববিন্দ্রপাঠাগাবের সদস্যরা এমনিতেই বিশেষ বাইবের জিনিস পড়িনি। প্রেমচাঁদ বিষয়ে দূরের কথা, শরৎচন্দ্র বিষয়েও তো দেখছি অর্ধেক খবর রাখতুম না। কোনো শরৎ-বিশারদ-শবৎ-বিশেষজ্ঞ-শবৎ-বৈবাহিক এসব খবর দেননি।

“সাহিত্যের মূল কথা কী?” ডক্টর কক্কড়ের গূঢ় প্রশ্নে অডিয়েন্স চুপ। —“সাহিত্যের মূল কথাটা কী?” গর্জন কবে উঠলেন এবাবে ডক্টর কক্কড়। অডিয়েন্স নির্বাক। ধীরেসুস্থে এবাব নিজেই নিজেব প্রশ্নের উত্তর দেবেন বক্তা। তাই হলো। স্রব নবম কবে বক্তা বলেন— “সাহিত্যের মূলকথা হচ্ছে সাফবিং।” সুব পালটে আবাব বলেন— “সাফফাববিং...। লিটারেচারের এই সাবটল ডেফিনিশন আছে অ্যাবিস্টটলের পোয়েটিক্সে। এ সম্পর্কে একটা গ্রীক কিংবদন্তী মনে পড়ছে। একদিন এক তরুণ ফিলসফাব, ডেসকাবটিস তাব নাম, চৌবাস্ত্রর মোড়ে দাঁড়িয়ে হাপুস নযনে কাঁদছিলেন। যে যাচ্ছে, সেই জিজ্ঞেস কবছে : কাঁদছো কেন, কী হলো তোমাব, ডেসকাবটিস? ডেসকাবটিস উত্তর দেন না। শুধু কাঁদেন। শেষে প্লেটো চেপে ধবতে, বললেন— “আই ডু নট নো হোয়েদাব আই একজিস্ট অব নট। ডু আই একজিস্ট? অব ডোন্ট আই? টু বি, অব নট টু বি...” তখন প্লেটো বললেন— ‘হোয়াই, শিওবলি ইউ ডু একজিস্ট। বাট অ্যাজ আ রিফ্লেকশন অফ আ রিফ্লেকশন অফ দ্যা...’, ডেসকাবটিস আবাব হাহাকাব কবে কেঁদে উঠলেন। তখন এলেন অন্যান্য গ্রীক মহাপুরুষেবা। সবাই তাঁকে সাত্বনা দিতে লাগলেন। ডেসকাবটিসেব সেই এক কথা।



—‘বাট হোয়ার ইজ দ্য প্রুফ? তাব প্রমাণ কই? আমাব যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ পাব কি করে?’

আর্কিমিডিস বললেন— “একটব জলে নেমে পড়ে দ্যাখো কতটা জন উপচে পড়ে, সেইটে হলো তোমাব ওজন। সেইটেই তোমাব প্রমাণ যে তুমি আছে।”

ডেসকারটিস বললেন— “এহ বাহ্য!” আলেকজান্দার তাঁব পায়ে এক বামচিমটি কেটে বললেন— “এই যে তোমাকে চিমটি কাটছি, তোমাব লাগছে তো? এই তোমাব অস্তিত্বের প্রমাণ।” ডেসকারটিস বললেন— “এহ বাহ্য।”

ইউক্লিড ঘস ঘস কবে কয়েকটা লাইন কেটে, সঙ্গে সঙ্গে একটা থিওরেম লিখে দিয়ে বললেন— “এই দ্যাখো তোমাব অস্তিত্বের প্রমাণ— কিউ, ই ডি” ডেসকারটিস বললেন— “আউট-অব-ডেট। দূব এসব কোনো প্রমাণই নয়। আমি আরো গুট প্রমাণ চাই।” এমন সময়ে ডেসকারটিসের ছেলে (পরে সে স্কেবারটিস নামে প্রসিদ্ধ হয়) এসে বললে— “বাবা, তুমি এত ভাবো কেন বল তো? আব তো কেউ এত ভাবে না?” তখনই বেকল ডেসকারটিসের সেই প্রখ্যাত দার্শনিক উক্তি— “আই থিংক দেয়াবফোব আই একজিস্ট—” “কোগনিটো আবগস সাম” —“দি প্রুফ অফ হিউমান একজিস্টেন্স।” দম নিতে থামলেন উক্তব ককড।

অডিয়েন্স বজ্রহত। তাহলে ভেতরের গল্পটা এই? আমবা তবে ‘কোজিটো এবগো সুম’টা ভুল জেনে এসেছি—অপভ্রংশ ভাষায়? ভাগ্যিস—উক্তব ককড না বলে দিলে কোনোদিনই ঠিকটা জানা হতো না?

—“ডেসকারটিস তো আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছেন। এমন সময়ে পথে দেখা সোফিয়ার্কিসের সঙ্গে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ট্রাজিডিয়ান সোফিয়ার্কিস বললেন— “ডেসকারটিস, আমি তোমাব সঙ্গে একমত নই। ইউ মে একজিস্ট বিকজ ইউ থিংক—বাট আই একজিস্ট ফব এ ডিফাবেন্ট বীজন। তুমি চিন্তা কব, —এটাই তোমাব অস্তিত্বের প্রমাণ বলে মনে কবছ, কিন্তু আমি তো চিন্তাই কবি না, তা বলে কি আমি একজিস্ট কবি না? আই ডু নট থিংক, আই সাফাব। আই সাফাব, দেয়াবফোব আই একজিস্ট।”

ফিসফিস কবে সৌম্যকে বলতে গেলুম— “এটা বুমি সোফিয়ার্কিসের কথা? আমি তো জানি...” —“চূপ কব”, এক ধমকে সৌম্য আমায় চূপ কবিয়ে দেয়। “কানৈব কাছে ব্যাজব ব্যাজব কবিস না, ভালো কবে শুনতে দে।”

উক্তব ককড বললেন— “জগতের সকল মানুষের হয়ে শেষ কথা বলে গেছেন সোফিয়ার্কিস। আই সাফাব দেয়াবফোব আই একজিস্ট।” প্রেমচন্দ্রেরও মূলকথা তাই। সাফাবিং এবং একজিস্টেন্স ইন্টার ডিপেনডেন্ট। পবম্পব নির্ভব। —“সুফবিসাস আবগস সাম।” এফেক্টের জন্য থামলেন। —“এটা আবাব কি? কখনো শুনিনি তো?” ফিসফিস করতেই সৌম্য আমায় বকল— “গ্রীক। চূপ কববি, স্টপিড?” উক্তব ককড আবাব শুরু করেন :

“প্রেমচন্দ্র স্পোক ইন আ লো ভয়েস, তিনি মানুষের কানের মধ্যে কথা বলতেন না, বলতেন মন বুকের মধ্যে। চোঁচিয়ে পাড়া মাং করলেই হৃদয়ে পৌঁছনো যায় না। এ বিষয়ে এমার্সনের গল্পটা সবচেয়ে ভালো। ব্যালফ ওয়ালডো এমার্সন একবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা শুনে গেছেন। এমার্সন আর থোবো তো বনেজঙ্গলে কুটির বেঁধে ট্রান্সেনডেন্টাল মেডিটেশন চর্চা করবেন (ঐজন্য ওঁদের ট্রান্সেনডেন্টাল ফিলসফার বলা হয়) ধ্যান-ধাবণা জপতপে দিন কাটে, তাঁরা কখনো এত লোকজন দেখেননি। প্রেসিডেন্টের স্পীচ, চতুর্দিকে বড বড মাইক্রোফোন, বিরাট বিরাট স্পটলাইট, টিভি ক্যামেরাজ ক্লিকিং আওয়ে, জার্নালিস্টদের দৌড়োদৌড়ি, এমার্সন তো কাণ্ড দেখে খুব ঘাবড়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট যখন ডায়াস থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন— ‘মিস্টার এমার্সন, আমাব বক্তৃতা কেমন লাগল?’ তখন সদা সত্যবাদী ঋষি এমার্সন বললেন— ‘মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যাব, ইওর স্পীচ থানডাবড সো লাইডলি, আই কুড হিয়াব নাথিং’, রুজভেল্ট তো শুনে একদম স্পীচলেস। দার্শনিকের যোগ্য উত্তরই বটে।” —করুড একটু থেমে, বলতে লাগলেন — “আজকের সমাজ সচেতন লেখকদের বেলায় আমিও তাই বলি, দে থানডাব সো লাইডলি, রীডার্স হিয়াব নাথিং। কিন্তু মুনশি প্রেমচাঁদ তার ব্যতিক্রম ছিলেন। হি স্পোক নট উইথ এ ব্যাঙ বাট উইথ এ হুইস্পার। ঠিক ইলিয়টের মতন। আর তেমনই ছিলেন শবৎচন্দ্র। তাঁরা কি মার্কসিস্ট? হ্যাঁ এবং না। কেননা তাঁরা তার চেয়েও বড। তাঁরা হিউম্যানিস্ট। তাঁরা কি ন্যাশনালিস্ট? হ্যাঁ এবং না। যেহেতু তাঁরা সত্য অর্থে তাব চেয়েও বড। তাঁরা যে ইন্টারন্যাশনালিস্ট। তাঁদের কি বলব রিয়্যালিস্ট? হ্যাঁ এবং না। কেননা তাঁরা তো ন্যাচারালিস্টও বটেন। মুনশি প্রেমচাঁদ তবে কী? কিভাবে তাঁকে ডিফাইন করবো? তিনি আসলে একটি বিব্যাট প্যারাদক্স। এ গ্রেট ইনিগমা। ঠিক শবৎচন্দ্র যেমন, জগতের সব মহৎ শিল্পীই তাই। প্যারাদক্স। ইনিগমা। ববীন্দ্রনাথও তাই টলস্টয়ও তাই। ইনিগমা।

“গালিব বলেছেন— ‘সাঁজ তো হাজিব হ্যায় মগব আওয়াজ কহাঁ গঙ্গি? জস-বাত তো হাজিব হ্যায় মগব আলফৎ কাহাঁ গঙ্গি?’ আমিও বলি বাজনা তো আছে, সব কই? কথা না হয় বইল, কিন্তু বর্ণমালা কই? প্রেমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ তো এল, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি, আমাদের এমন ভাষা কই? তাই একটা ছোটোখাটো নিজের লেখা সবল কবিতা দিয়েই বক্তৃতা শেষ করছি :

—মুনশি, যব জগমে আয়ে

জগহসে তুম বোয়ে।

এইসা করকে চলি হো মুনশি

তুম হসে জগ বোয়ে।।—

থ্যাংকিউ। দ্যাটস অল। নমস্তু।”

ঘব ফেটে পড়লো। তালি থামতে চায় না। অসাধারণ। উত্তমকুমারের শোকে

আমবা এমনিতেই বড় মনমবা ছিলাম, কিন্তু ডক্টর কক্কড আমাদের সম্মোহিত করে অবতড় শোকও ভুলিয়ে দিয়েছেন। পকেট থেকে গোলাপী কম্বল বেব করে ঘাড় গলা টাক কপাল মুছলেন। সৌম্য তাতাতাডি জলেব গেলাস এগিয়ে দিল! মদু হেসে জলপান কবলেন। তাবপব পাইপটি ধবানোয় মন দিলেন। আমবা ধন্য। কৃতার্থ। সৌম্য গর্বিত চোখে অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে চেষ্টা কবছে। (ভাবখানা : এ আব এমন কি। এমন কতজনকে আনতে পাবি আবও)। ধন্যবাদ দিতে উঠলেন মেসোমশাই। সৌম্যব বাবা। (তাবই কন্যাদায়েব গল্পটা আপনাবা অন্যত্র আগে শুনেছেন)।

মেসোমশাই উঠে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খব গন্তীর ভাবে চূপ করে বইলেন। উনি ওঁব জগখিচুডি বাঙালভাষাব জন্য একটু সঙ্কোচ বোধ কবছেন বলে মনে হলো।

তাবপব গলা থাকাবি দিয়ে বক্তব্য শুরু কবলেন। —“মাননীয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, এবং সমবেত বক্তৃগণ, আইজ আমাগো বড়ই আনন্দের দিন। প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী লেখক প্রেমচন্দ্রব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় আমাগো মেলা পয়সা দিসেন। এবং এই লেইগ্যাই এই সভা ডাকা সম্ভব হইছে। তেনাবে অনেক ধইন্যবাদ। এই উপলক্ষে সিনেমা এবং যে জলখাবাবেব বন্দোবস্তও সম্ভব হইসে, হেইজন্যও সভাপতি মহাশয়ে ধইন্যবাদ দিতাসি। আইজ মাননীয় প্রধান অতিথি মহাশয় আমাদিগে বাশি বাশি নূতনকথা শুনাইসেন। ক্যাবল প্রেমচন্দ্রই না, শবৎচন্দ্রব সম্পর্কেও আমাগো জ্ঞান অত্যন্ত স্লগ্নই ছিল, বুঝা গেসে। প্রেমচন্দ্রব লগে যে শবৎচন্দ্রব ফ্রেইগুশিপ ছিল, তাগো জয়েন্ট গল্পগুজব থিক্যাই যে শবৎচন্দ্র গল্পগুলি পাইসেন, তেনাব কিছু গল্প যে হিন্দিব থিক্যা অনুবাদ, এইয়াও আমাগো জানা ছিল না। মাননীয় প্রধান অতিথি সাহিত্যেব ডক্টর, তদুপবি প্রেমচন্দ্রব দ্বিতীয় স্ত্রীব প্রথম স্ত্রী তেনাব সাইফাৎ জ্যাঠা হইতেন, কাজে কাজেই ওনাব কথা বিশ্বাস না কবানোব কিসুই নাই। নিচ্চয় সম্যকজ্ঞান আবং প্রমাণপত্র, হক্কলই তেনাব নিকট মজুত আছে। আমাব এই বিষয়ে কোনোই বেসিক নলেজ নাই, হাতেও কোনো প্রুফ নাই। তাই ওনাব কথাব উপব মন্তব্য কবা আমাব সাজে না। হেইয়া যাই কউক গা, গল্প সে না গল্পই। গল্পেব মতো কইবা লাইটলি নিলেই হইল।

তা প্রধান অতিথির লেইগ্যা আমিও একখান স্পেশাল গল্প বলি, শোনে। তুলসীদাস গল্পাতিবে বইস্যা বামাযণ বচনা কবতাসিলেন, হেনকালে কক্কড সাহেব আইস্যা কইলেন : ‘পণ্ডিতজী, আমি প্রেমচন্দ্রবে নিয়া এক পইদা বানাইসি, শোনবেন?’ তুলসীদাস কইলেন—‘কও, গুনি। কী লেখসো?’ কক্কড শোনাইলেন —‘মুনশি যব জগমে আইযো’ প্রভৃতি। শুইন্যা তুলসীদাসেব এমুনই লোভ ধইব্যা গেল যে, ‘মুনশি’ব জাগাতে ‘তুলসী’ বসাইয়া নিজেব নামেই এটা পইদা বানাইয়া ফালাইলেন তিনি। হেইডা আমাগো অফিসেব দাবোযানেব মুখে প্রায়ই শুনা যায়। ভদ্রতায় মানুষে টেকি পজ্জস্ত গেলে, আব তুলসীদাসেব এইটুক উইকনেস তো হালকা বেপাব। হেইডা ভদ্রতা কইব্যা খুবই গেলা যায়। সিম্পল টাস্ক।

কিন্তু স্লাইট কনফিউশন বাধে ডেইট লইয়া। পোলাপানগো হিষ্ট্ৰি লেসন গুলেট হইয়া যায় পাছে, তাই এটু ক্লিয়ার কইব্যা লই বরং। কী কন? প্রধান শিক্ষক. প্রধান অতিথি. প্রধানমন্ত্রী এনাৰা সব মুখ ফুটাইয়া যাই ক'ন, বাসসা-কাসসা-গুলান হেইডাবেই শাস্ত্রবাইকা বইল্যা ধইব্যা লয়। তাই কইতাসি, কি থিওডব, 'কি ফ্রাঙ্কলিন যেই বজ্জভেণ্টই হউক, দুইজনাব একজনাও মনীষী এমার্সনকে দ্যাংহে নাই। এমার্সন তো নাইণ্টিনথ সেনচুৰিৰ, এনাৰা হইলেন টুয়েণ্টিথেথ। তিনজনাই অবশ্যি মাৰ্কিন দ্যাশেৰ, তিনজনাই মহাপুৰুষ, তিনজনাই স্বৰ্গত। কিন্তু মৰ্ত্যে অস্তত এমার্সন-বজ্জভেণ্ট সাক্ষাৎকাব হয় নাই। আৰ টিভি ক্যামেৰা, কি বজ্জভেণ্ট, কি এমার্সন, কাবও ভাইগেই টিভি-দৰ্শন ছিল না। এমার্সনেৰ বনজঙ্গলে তো বিজলীবাতিই জোটে নাই। তবে এইয়া ঠিকই যে এমার্সন যদি আইজ এই সভায় বইয়া এই বক্তৃতা শোনতেন তাইলে ওই কমেণ্টই কবতেন। তাইতে কাবো সংশয় নাই। তা যাক, গল্প তো গল্পই।

প্রধান অতিথি মশয়বে বহু ধইন্যবাদ, নানা গল্পে গল্পে সময়টা চমৎকাব কাইট্যা গেলে। প্রাচীন গ্ৰীক ফিলসফাৰ স্ক্ৰাটিসেৰ বাবা ডেসক্ৰাটিসেৰ গল্পডা শুইন্যা আমাব একজনা ফবাসী দাৰ্শনিকেব কথা স্মৰণে আইয়া গেল। হেইডা অবশ্যি বেশি প্রাচীন কালৰ কথা না। তিনশত বৎসৰ পূৰ্বে ফবাসী দ্যাশে বেনে ডেকাৰ্ট কইব্যা এক গণিতবিদ আছিল। হেইয়াও কইসিল— 'আই থিংক দেয়াবফব আই একজিস্ট।' হিব্ৰতে না জাপানীতে: লাতিনে না ফবাসীতে কোন ভাষায় যে কথাডা কইসিল, অতশত আমাব জানা নাই, তবে এক্সপ্ৰেশনডা হইল গিয়া এই—'কোজিটো এবগো সুম', আমি চিন্তা কৰি অতএব আমাব অস্তিত্ব আছে। বেনে ডেকাৰ্ট যে দাৰ্শনিক ডেসক্ৰাটিসেৰ কথাই ব্যাবাক ইকো কবসে, এ প্রসঙ্গ আমাব সইতাই সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত ছিল। আমবা জানি কথাটা বৃথি অবিজিনালি ওনাৰই কপিৰাইট। আমেবিকাৰ কথা জানি না, আমাগো ইনডিযাতে হেইডাই অহন কমন নলেজ। যাই হউক, আইজ আমবা সইতাই বিপুল জ্ঞান লাভ কবসি। ডক্টৰ কৰুডবে আন্তৰিক ধইন্যবাদ, বেশ আমোদ-প্ৰমোদেৰ মাধ্যমে জ্ঞান বিতৰণ কবসেন বইল্যা। অহন বিবতি। চা-জলখাওগাবেব পৰ মৃণালবাবুৰ ফিল্ম—'ওকাউৰি কথা'। শুইন্যা আসছি হেইডা নাকি প্ৰেমচাদেবই কাহিনী থিকা নইসেন। কিন্তু কি জানি আইজ তো দেহি হক্কলই নূতন, হক্কলই কিঞ্চিৎ প্যাৰাডক্সিকাল। আইজ যা শোনলাম, স্টেবিডা হইতেও পাবে প্ৰেমচাদ, কিন্তু শবৎবাবুও হওয়া কিসুই বিচিত্র না। যেমুন 'পথেব দাবী'। হইতে পাবে শবৎচন্দ্র, প্ৰেমচাদ হইলেও আশ্চৰ্যেব কিছু নাই। হক্কলই ইনিগমা। স্চক্ষে দেইখা লইয়া তবেই আমাগো সদস্যবৃন্দ ডিসাইড কববেন শবৎ, না প্ৰেম, হেইয়া কোন চাঁদিনী। (বোঝলে হয় অবশ্যি, ছবি তো আবাব জানি তেলুগু না তামিল।) আইছা, পুনৰ্বাৰ ধইন্যবাদ। নমস্কাৰ।"

ডক্টর ককড আর চা-খেতে থাকতে পাবলেন না, তাঁর অন্যত্র জরুরি মিটিং ছিল। মেসোমশাই একসঙ্গে দুটি বসগোল্লা মুখে পূবে হেসে হেসে—অতি-গম্ভীর-মূর্তি বাজোরিয়াজীকে বললেন— “আপনের প্রশস্তিটা চমৎকার হইসে। কিন্তু প্রধান অতিথি যেইভাবে বিগিন কবসিল না, আমি তহনই ওয়াবিড হইয়া পডসি। ‘ফ্রেইণ্ডস ক্যালকটানস এণ্ড কানট্রিমেন ক’ওনেব সাথে সাথেই যে ‘আই কাম টু বেবি প্রেমচাঁদ, নট টু প্রেইজ হিম’ অংশডাও ফলো কবে কি না? একজন দেশববেইণ্য জিনিয়াস মহাত্মাব লেইগ্যা আইজ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব, আইজ এটুক হ্যাপি বিগিনিং হইলে তবেই সে না ফিনিশিংডা ঠিক হইত?”

## আবার এসেছে আষাঢ়

“একি কাণ্ড! এ যে একেবাবে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং কম বানিয়ে ফেলেছিস অমন দাক্ষণ বৈঠকখানাটাকে?”— ঘবে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি থমকে দাঁড়ান। এই দৃষ্টিটাকেই ববীন্দ্রনাথ বোধহয় বলেছেন ‘নিমেষহত’। নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুলাতে থাকেন ঘবময়। দৃষ্টিটা যেন পুলিশ সার্জেন্টের হাতের টর্চলাইটের মতো থেমে প্রত্যেকটা জিনিস চেঁচেপুছে স্পর্শ কবে যায়—আর লজ্জায় আমাব মাথা থেকে পা পর্যন্ত (সংস্কৃতে বলে পা থেকে মাথা) ভাবি হয়ে উঠতে থাকে। দাদামণিব নজর ফলো কবে আমিও ঘবটা নতুন চোখে দেখছি। ঝকঝকে ইতালীয় মার্বেল পাথরের মেঝে, কালো মার্বেল আব মাদার অব পার্ল বসিয়ে বর্ডার দেওয়া।—সেই মেঝের ওপরে থাকার কথা সোফা-কৌচ-কার্পেটের—সাধাবগত এ-ঘবে তাবাই থাকে— কিন্তু এখন আছে? (১) একগাদা লেপ তোশক, বেডকভাবে পুঁটলি বাঁধা—পুঁটলির ফাঁক দিয়ে ময়লা মশাবি উপছে পড়ছে বাইবে। (২) তিনটি বিশাল পুঁটলিতে বহু বাতিল হওয়া জামাকাপড—মাদার টেবিজা, বামকৃষ্ণ মিশন ও ভাবত সেবাশ্রমের জন্য বাখা। (৩) সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা খুলে ফেলে তাব ন্যাডা ড্রাবগুলো পাশাপাশি দাঁড় কবানো। তাব ওপরে কিছু তাকিয়া, কুশন, আব ছ’সাতটা বক্সফাইল। টেবিলের মাথাটা বইয়ের তাকেব গায়ে হেলান দেওয়া। তাব ওপরে একটা শাট ঝুলছে। শাটের ওপরে বেডালটা ঘুমোচ্ছে। আবামে। (৪) মেঝের একটা বিবট বাবকোশের ওপরে কয়েকটা তেলবঙের টিন, টার্পিন তেলে ভেজানো বুরুশ, বোতল, শিবিষ কাগজ, পুটিং-এব তাল। (৫) চতুর্দিকে সাতআটটা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে ভরা দবকাবী কাগজপত্র, খেলনাপাতি, চিঠিপত্র, ফটো। (৬) একধামা

শিশিবোতল (খালি)। (৭) একধামা সাদা গম। (৮) একটা বিশ লিটারেব বৈয়ামে কেরোসিন। (৯) ঘবেব মাঝখানে একখানা গদি—তাতে খাতা, বই, কলম, চাবি, চশমা। (১০) যে খাটের গদি, সেই খাটটির কাঠের অংশগুলি খুলে উল্টোদিকের দেয়ালে হেলানো। তা থেকে ভিজ়ে তোয়ালে ঝুলছে। (১১) মেঝেব ওপরে হার্মোনিয়ামেব বাক্স। তার ওপরে টিভি। তাব ওপরে একটি কাচের বাটির মধ্যে দুটো তাজা বেলফুলেব গোড়ে মালা সুবডি ছড়াছে। (১২) একটি কার্পেটের ওপরে বানীর মতো সগৌববে অচল টেলিফোন এবং তাব পদতলে, মোসাহেবেব মতো, ভুটানী সাবমেয়ী কুতুল বসে আছে। কার্পেটটা আবাব উলটো পাতা। (১৩) বইয়েব তাক কিছু খালি করা হয়েছে—মেঝেয় বইয়ের স্থপ—তাবই ওপরে ইতস্ততঃ যামিনী বায়, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব সেন, দেবীপ্রসাদেবা শুয়ে আছেন, অজস্র বেকর্ড দ্বাবা পবিবৃত হয়ে। (১৪) দুটি বিরাট স্টিবিও স্পীকাব মেঝেব ওপরে পাশাপাশি বাখা। তাব ওপরে কিছু শূন্য চায়েব কাপ ও জলেব বোতল। একপাশে অয়ত্রে পড়ে আছে তার বেকর্ড চেঞ্জাবটা—তাব ওপরে দুটি আম। এক প্লোট কুবিভাজা।

—“ছি। ছি। ছি।”—দাদামণিব ক্ষোভে দৃংখে বাকবোধ হয়ে যায়। “কবেছিস কি। এ যে বন্যার্তদেব শিবিব।” হাতেব ছাতাটা দিয়ে মেঝেব কোণটা দেখালেন, যেমন ডেমনস্ট্রেটববা দেখায় ছডি দিয়ে— “এসব কী? ঘরদোব ঝাঁটপাট দেওয়ার পাট কি তুলে দিযেছিস?”

ঘবভর্তি কুতুলেব লোমেব সাদা সাদা বল উডছে। যত্রতত্র চুনবালি। দেওয়াল ও ছাদ থেকে খসে-পড়া। ঝুলেব টুকবো ইতিউতি উড়ে বেড়াছে প্রজাপতিব মতো, পাখাব বাতাসে ডানা মেলে।

—“ঈসস—চোখে না দেখলে, বিশ্বাস হতো না যে এ ঘবটার এই মূর্তি কবা যায়। কবা সম্ভব!”

—লজ্জায় মাথা ঝুলিয়ে বসে আছি।

—“নাঃ, তুই আব ভদ্রলোক হলি না, খুকু। সংসারী জীব আর হলি না। দেখেছিলি, খবরেব কাগজে বেগম অব আউশের ছবি? কেমন গুছিয়ে বানীব মতোই সংসার করছেন নিউ দিল্লিব প্ল্যাটফর্মে? বেয়ারা, বাবুর্চি, ছেলে-মেয়ে, ডটা শিকারী কুকুর, ফুলেব টব, পার্সিয়ান কার্পেট, চাইনিজ ভাস, সব সমেত। যে বানী হয় সে প্ল্যাটফবমকেও প্রাসাদতুল্য কবে নিতে জানে। আর যে স্বভাব-ভিকিরি সে প্রাসাদকেও প্ল্যাটফবম বানিয়ে ফালে। ছোঃ।”

প্রথমে দাদামণিব লেকচাবটি হজম কবি। তাবপর ঝাঁজিয়ে উঠি।

—“দেখতে পাচ্ছে না? বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে? ঘরে সোফা কৌচ নেই, শোবার ঘর, ভাঁডাব ঘর, স্টাডি, সব ঘরের জিনিস এই ঘরে জড়ো কবা? সব-কিছু মেঝেতে নামানো? খাট টেবিল সবই খোলা? সবকিছু পুটলি বাঁধা? এমনিভাবে বৃষ্টি আমি থাকি? এই একটি ঘরই নেয়নি—বাকি সবগুলো ঘবই যে মিস্ত্রিরা নিয়ে

নিষেছে। ওছিয়ে রাখবই বা কী কবে, রেখেই বা কী হবে? আবার তে' তুলতে হবে যথাস্থানে? এটা তো টেমপোবারি—”

—“নিষে নিষেচে? নেবে কেন? কেন নেবে? তুমি দেবে তবে তো নেবে? তুমি দিলে কেন?”

—“ওবা সব ঘবে কাজ শুরু কবে দিলে একসঙ্গে।”

—“বলি, একসঙ্গে সব ঘরে মিস্ত্রী লাগানোব কথা কে কবে শুনেছে? তুই দিয়েছিস কেন ঢুকিয়ে? একখানা ঘব কববে, সব শেষ কবে সাজিয়ে দেবে, তাবপব আবেকখানা ঘব। এ আবার কেমন ধাবা কাজেব ছিবি?”

—“আমি কী কবব? বহমানকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। সে যেমনভাবে কববে তেমনভাবে হচ্ছে তো। সে একসঙ্গে দু-তিনটে ঘব কবছে। আমরা আব সাজিয়ে তুলতে সময় পাচ্ছি না। একে একে সবাই এই বড় ঘবে এসে জমছে। ভাঁড়াব ঘব, শোবাব ঘবগুলো, স্টাডি, সবই বেএল্লাব হয়ে আছে যো।”

—“শোবাব ঘব সব ক’টায় কাজ হচ্ছে?”

—“কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সব আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো। ও ঘবগুলোতে শোয়া যাচ্ছে না। এ-ঘবে আলো পাখা ঠিক আছে।”

—“আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো? কেন গেল?”

—“বলতে পাবি না। হয়েছে এটুকু জানি। বহমান বলছে ব্রাশেব টানে অমন হয়েই থাকে?”

—“মোটাই হয়েই থাকে না। তোমাকেও পেয়েছে গাধা। তোদেব ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নেই?”

—“এনেছিলাম। সে বলল ঘডাঞ্চি ছাড়া পাখা সাববে না। ঘডাঞ্চি ওব কাছে নেই—অন্যত্র কাজ হচ্ছে। সেখানে আছে।”

—“ঘডাঞ্চিওয়ালা আব কোনো মিস্ত্রী নেই পাডায়?”

—“নাঃ, আব অন্যবা সব মইওলা পাটি। মইতে হবে না।”

—“তা শুচ্চিস কোথায়? এ ঘবেই? খাট তো খোলা। এই মেঝেব গদিতে তো একজন মাত্র—বড়জোব দু’জন—”

—“ঐ ফোলডিং খাটে আবেকজন। আব মাদুবেব ওপর ডানলোগিলো পেতে আবেকজন, ঐ কর্নাবে। ভার্গাস ঘরটা বড় ছিল।”

—“এই ঝুলকালি-চুনবালিব মধ্যে মাটিতে গুস কী কবে? ঝাঁটপাট বন্ধ কেন? ঝ্যাটা নেই তোদেব?”

—“ঝ্যাটা থাকবে না কেন? ঝি নেই। কাজ ছেড়ে দিয়েছে।”

—“দেবে না? ঘবদোবেব যা ছিবি? থাক? ও তো পাগল হয়ে যাবে।”

—“সে বলেছে মিস্ত্রিবি না বেকলে সে আর ঢুকবে না। তাই নিয়মিত সাফাই হচ্ছে না। ওই মজুবদেবই দুটো কবে টাকা দিয়ে ঘবটর মুছিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু রোজা

কবছে বলে সব দিন ওরা বেশি খাটতে চায় না। কাল মোছেনি। কাল আগে আগে চলে গেছে। আজকে ঈদ কিনা। আজ ওবা ছুটি করেছে।”

—“আজ ঈদ, প্লাস বথ! কোথাও না কোথাও কেলেকবি হবেই মনে হচ্ছে। দু’চারটে ভালোবকম হাল্কাব স্টোবি আজ না হলেই নয়।” ঘবেব সুদূব কোণে একমাত্র চেযাবটি দখল করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দীপু এতক্ষণে পবিতৃপ্ত সুবে কথটা বলল, পায়ের কাছে মেঝেভর্তি সিগারেটের ছাই, দেশলাইকাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো, শূন্য প্যাকেট। হাত-খানেক দুবেই শূন্য অ্যাশট্রে-টি ঝকঝকে হাসছে। দাদামণি দেখলেন। এবং হুঙ্কার ছাড়লেন।

—“ওঠ বাটা হিপি। তোল সিগারেটের টুকরো। কেন, ঐ অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে পারো না? পাশেই বয়েচে?”

জগতে সবই নশ্ব, ছাইই বা কী, ছাইদানিই বা কী—এমনি একখানা মুখেব ভাব কবে দীপু পা দিয়ে টুকরোগুলো একত্র কবতে থাক। দেখে দাদামণি খুশি হন। তাবপবেই ভুরু কঁচকে যায়। কান খাড়া কবে গুনতে থাকেন। কোথায় একটা ঘস ঘস ঘস ঘস শব্দ হচ্ছে। অনন্ত।

—“ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকটাও তো মন্দ দিসনি? ও কিসেব শব্দ?”

—“পালিশ মিস্ত্রী। বাথকমেব পাথব পালিশ কবছে।”

—“পা-লিশ?” দাদামণি হেসে ফেলল। “বাড়িব তো এই অবস্থা, এব মধ্যে পালিশ?”

—“না না, বাথকম বিপেযাবিং পের্টিং কমপ্লিট। পালিশ হলেই এব ঘব শেষ। পঞ্চ এসেছে, ওব তো ঈদ নেই।”

এমনি সময়ে, ঠিক মাথাব ওপরে অকস্মাৎ ঠঠাং ঠঠাং কবে একটা বিকট শব্দ গুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দ। বাড়ি কাঁপে।

—“ও বাবা।” দাদামণিও দৃশাত কেঁপে ওঠেন। “ওটা আবাব কীবে? কী পেটাচ্ছে ওটা? লোহাব কিছু?”

—“ও কিছু না। ট্যাংকটা ভাঙছে বোধহয়।”

—“ও কিছু না? ট্যাংকটা ভাঙছে বোধহয়? কিসেব ট্যাংক? কে ভাঙছে? কাব হুকমে ভাঙছে?” দাদামণি ক্ষিপ্তপ্রায়।

—“মানে ঐ জলেব বড ট্যাংকটা খুব পুরনো হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল তো? ওটা বদল কবেছি। এক পুরনো লোহাওলা সেটা কিনেছে। সে-ই এসেছে ট্যাংকটা কেটে টুকরো কবে নিয়ে যাবে বলে।”

—“ওহ। তাই বল। যাই বলিস খুকু বাড়িটাকে সত্যি সত্যি ইন্সিশানে পবিগত কবেছিস। ভদ্রবলোকে থাকতে পাবে এতবকম শব্দের মধ্যে? কাকিমাকে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছিস ভেবে দেখেছিস? ভাগ্যিস আব নিচে নামতে পারেন না—এ ঘরটা দেখলেই সিওব হার্টফেল, কিংবা সেরিব্রাল! ওই বীভৎস আওয়াজেও আয়ুক্ষয় হচ্ছেই



—সডিও পলিউশান একেই বলে—”, বলতে বলতেই চোখ পড়ল ঘবেব আবেক কোণে—“আঁ? যামিনী বায়, সুনীলমাধব—সব মাটিতে ফেলে রেখেছিস? তোল তোল, তুলে বাখ—কাকাবাবু যত্নেব এসব জিনিস তুই ধবংস না কবেই ছাড়বি না দেখছি—”. বলতে বলতে নিজেই তুলতে শুরু করেন ছবিগুলো। “জানিস, আমেরিকায় এ ছবিব এখন কত দাম?” তাব পাশেই একটা তেতলা বথ—কাগজের শেকলের মালায় অর্ধসজ্জিত। বাকী শেকল, কাঁচি, আঠা, বহুদিন কাগজ সমেত ভুলুটিত। কাবিগবগণ বোধহয় অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি টানে নিষ্কান্ত হয়েছেন আপাতত। মোমবাতি, কাসব প্রস্তুত।—“ওঃ, আজ বথ। বিষ্টি হবেই। আকাশও সেজে আসছে। আমি ঘবেই আছি। বিষ্টি নেমে গেলে মুশকিল হবে। নে, ঘবদোর ওছিয়ে বাখ—আমি চাবটে পাঁচটা নাগাদ ফিরে যেন সব টিপটপ দেখি। ভালো কবে চা খাওয়াবি তখন—” যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন দাদামণি। আজকাল দুর্গাপূবে বদলি হয়েছেন—এবাব বেশ মাস তিনেক বাদে এলেন।

দাদামণি বেকতেই ঝাটা ঝাডন নিয়ে লেগে পড়ি চুনবালি কুকুবেব লোম সাফাইয়ে। গোপাল ঘোষ, যামিনী বায়দেব তুলে বাখি স্টিবিও স্পীকারদুটোব মাথায়। কাপড়িশ বোতল-টোতল ট্রেতে কবে সবিয়ে ফেলি। টুকবোটা কবাঙলো যথাসাধ্য তুলে ট্রে ভবে ভবে ওছিয়ে বাখি। জুতোটুতো সবিয়ে দিই। গমের ঝুড়ি আব কেবোসিনেব টিন বাগাঘবেই পাঠাতে হবে—তাব আগে জানলাগুলো বন্ধ কবি। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। দাদামণি না ভিজ়ে যান। বাচ্চাবা বথই বা টানবে কেমন কবে? আমাব পক্ষ অবিশিা ভালোই হলো বৃষ্টিটা হয়ে—জলছাদটা এত খরচ কবে যে ফেব পেটানো হলো—পড়াব ঘবে জল পড়া বন্ধ হলো কিনা সেটাব একটা পবীক্ষা হয়ে যাবে। পড়াব ঘবটা বৃষ্টিব জলেব চোটে অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল। বহুমান বলেছে তিবিশ বছবেব মধ্যে আব জল পড়াবে না, পড়াব ঘব এমনই বিপেয়াব কবেছ।

জানালা-টানাল্য বন্ধ কবে ফেব নজব কবে দেখলম এত ঝাটপাট দিয়ে ঝেড়েঝেড়ে ওছিয়েও ঘবটাকে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুম থেকে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমও উন্নীত কবা যায়নি। অতগুলো ধাবড়া বড বেডকভাব জড়ানো পুঁটলি, মেঝেভর্তি বই, খোলা খাট, খোলা টেবিল, খোলা স্টিবিও সিস্টেম, দু'খানা ধামা, এসব যাবে কোথায়? হাবমোনিয়ামেব ওপব টিভি সেট? তাব ওপাবে গোড়ে মানা? যাকগে যাক। আব পারি না।

পুজোব লেখা সব বাকি। আজ মিস্ত্রী নেই—এই ফাকে কাগজ কলম নিয়ে মেঝেব গদিতে উপুড় হই। একটা বড গল্প আধখানা লেখা হয়ে পড়ে আছে। বাইবে রুমরুমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কডকডাং বাজ পড়লো কোথায়। সীজনব প্রথম বড বৃষ্টি। শব্দটা খুব ভালো লাগছে। ট্যাংক কাটা বন্ধ বেখে মিস্ত্রী নেমে গেছে নিচে। পঞ্চ অবিশিা গম্ভে যাচ্ছে—তাব শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃষ্টিব রুমরুম। এই সময়ে এককাপ চা হলে হতো।

—“ঝর্ণা? এককাপ চা হবে নাকি? ঝর্ণা?”

এই বাক্যেব সোনার কাঠিতে হেটমুণ্ড দীপু প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেই চৈচাতে শুরু কবে—“ঝর্ণা। ঝর্ণা। চা। চা।”, সিঁড়িতে ঝর্ণাব মাথা দেখা যায়। একগাল হেসে বলে—

—“চা হবে নে—আনাঘবে তুলকেলাম?” সদাহাস্যময়ী ঝর্ণা বুড়ো আঙুল দেখায়।

—“মানে? বান্নাঘবে তুলকেলাম। কেন?”

—“জল পড়তেচে, গো জল। আনাঘব জলে থৈথৈ কভেচে—চাল আটা তেল চিনি সোব ঘেঁটেঘেঁটে একাক্কাব”—দুই হাত নেড়ে শূন্যে গ্লোবাকৃতি কবে ঝর্ণা।

—“সেকি? কী কবে হলো?”

—“কে জানে, কী কবে হলো। আমবা তো জিনিস সবাইই টাইম পাচ্চিনি—এই বাটি বসাই তো ঐথেনে জল পড়ে—ওথেনে থালা পাতি তো সেইথেনে ঝঝঝঝ কবে জল—আমরা খালি ছুটোছুটি কবে থালাবাসন পাততিচি আব ঘব পুচতিচি—একেবাবে বোকা বাইনে দেচে। এাকোন চা-টা হবে নে, আগে এটু সামাল দিয়ে নি।”

—“তা সামাল আব দিচ্ছো কোথায়? দিচ্ছো তো লেকচাব”—দীপু বলে।

—“মা তো বলেচে, আজ বিষ্টিতে খিজ্জি আন্না হবে? তাই ভগমানই আনাঘবে আবনা, আবনি খিজ্জি এঁধে একেচেন—দ্যাকো গে যাও।”—

দীপু এবাব বলে, “বাজে বোকা না—বান্নাঘবে আবার জল পড়বে কী কবে? জল তো পড়ে পড়াব ঘরো।”

—“সে ঘব তো শুকনো খটখট কভেচে—এ লোতন ফুটো গো—আগে ছেলনি।”

—“জল পড়ছে তো চা কবতে কী হয়েছে? আশ্চর্য।” দীপু আব একটা যুক্তি খাড়া কবতে চেষ্টা কবে ঝর্ণাব কাছে বকুনি খায়।

—“উদিকে নংকাকাণ্ড হচ্ছে—বলে কিনা, কী হয়েছে। তুমি নিজেই চা কবে দ্যাকো না?”

—“যা না দীপু, দাখনা একবাব ব্যাপাবটা কী?”

—“যাচ্ছি, যাচ্ছি। বাক্বা। এককাপ চাও চাইবাব উপায় নেই। অমনি সংসাবেব একটা কাজ ধবিযে দেবো।” বলে দীপু টিভিব ওপব পা তুলে দিয়ে—জানলা দিয়ে বাইবে তাকিয়ে বলে—“ইস দিদি—বাইবেটা কী সুন্দব হয়েছে—”, এবং উদাস গলায় গান ধবে—“মেঘছায়ে সজলবায়ে—” ওপবে যাবার লক্ষণ দেখায় না।

সত্যিই বাইবেটা ভাবি মোহময় হয়েছে তো? সামনেব কদম গাছটাতে বৃষ্টি যেন গণিগণিকোর মতো ঝঝঝঝ কবছে—মেঘমেদুব আবছ। ঝাপসা আলোব মধ্যেও কী উজ্জ্বল ওব সবুজ বংটা—কে বলে আমাদের আদরের কলকাতা মুমূর্ষু?

—“মা! মাগো! কী মজা। কী মজা। দেখবে এসো দিম্মাব বাবান্দায় নদী হয়েচে—”, নাচতে নাচতে টুস্পা এল। হাতে স্প্যানেল মলাটে বানানো নৌকো।

—“নদীতে কত জল—ankledeep-এব চেয়েও বেশি, আমার প্রায় Kneedeep জল—দিদি নৌকো ভাসাচ্ছে। এটা নিয়ে সাতটা হবে—দিগ্গা বলেছেন সপ্তডিক্কা।”

—“ওগুলো সব গিয়ে নালীর মুখ বৃজিয়ে দেবে—এত বৃষ্টি মধ্যে নৌকো তো ভাসবে না, বৃষ্টি থামলে।”

—এত বৃষ্টি কোঁথায? কঁমে গেছে তো? ভাসছে তো?—বলতে বলতে টুমপা নৌকা সমেত পালায় তেতলায়। পবনমূর্ত্তেই তাব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা যায়—

—“মা! মা! দেখবে এসো—কী মজা! দিগ্গা ঘবেব মধ্যেও কি সুন্দব জল ঢুকছে—flood-এব মতন—”

তাব পবেই মায়েব সেবিকা পুতুলেব আঁতনাদ।

—“ও দিদি! ও কানাই! কী হবে? ঘবে যে জল ঢুকছে! বাঁটা? ঝাঁটা কোঁথায?”

—“সমস্তই তোমাদেব নৌকো ভাসানোব প্রতিফল।”

মূর্ত্তিমত্তী অবসিকা হয়ে ব্যাঘ্রগর্জনে এবং ব্যাঘ্রাশ্রপনে তেতলায় ধাবিত হই। এবং ঝাঁটা হস্তে জলভরা বারান্দায় ঝাপিয়ে পড়ি। কানাইই বা অমন কাব্যিক বাক্যবন্ধকে বাস্তবায়িত কবাব সুযোগ ছাড়বে কেন? ‘ঝাড়ুহাতে এল কানাই’—সেও হাঁটু অবধি লুঙ্গি উঠিয়ে ঝাড়ু নিয়ে নেমে পড়ে টুমপাব নদীতে। দুজনে মিলে বৃজে যাওয়া নর্দমাব ঝাঁজরিকে আক্রমণ কবি। এই মিস্ত্রী খেটেছে তো? চুনবালি সব ঢুকেছে বোধহয়—একগাদা ভিজে কাগজের নৌকোব শব তোলা হয়—স্নানমুখে পিকো-টুমপা ঘবেব মধ্যে দণ্ডায়মান—তাদেব দিগ্গা সাত্ত্বনা দিচ্ছেন—“সপ্তডিক্কা মাধুকরী ডুবেই থাকে দিদি—কিন্তু আবাব ঠিক ভেসে উঠবে দেখো।” কিন্তু ওবা কিছুই শুনছে না। নর্দমার খনিগর্ভ থেকে কানাই একে একে শগেব নুডো, দেশলাই-কাঠি, ইঁটেব কুচি, শুকনো ফুলেব মালা—এই জাতীয় প্রচুর বত্তুবাজি উদ্ধাব কবছে। আস্তে আস্তে জলটা দিবা নামতে শুরু কবলো। আশিও ঝাঁটা ফেলে, নিশ্চিত্ত হয়ে বান্নাঘবেব ‘তুলকালাম’ পবিদর্শনে গাই।

ছাদেব মাঝখান দিয়ে জল পডছে। মেঝেয় আমার একটা ধোয়া শাড়ি ব্লাটিং পেপারেব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চাবিদিকে থবে থরে থালাবাটি কাপড়িশ বিছানো। তাব মধ্যে বৃষ্টিব জল ধবা হচ্ছে। আমার সাধেব জাপানি ছাতাটি কাযদা কবে মিটসেফের সঙ্গে আটকে, তাব নিচে বসে একা একাই বেধডক বাগাবাগি কবে মিস্ত্রীদেব চতুর্দশপুরুষ উদ্ধাব কবতে করতে বাটনা বাটছে ঝর্ণা। বান্না কববাব টেবিলেব তলায় গ্যাসরিংটি নাগিয়ে তাব নিচে সঙ্গেপানে বান্না চড়ানো হয়েছে। ভয়ে চায়েব প্রসঙ্গ উত্থাপন না কবে, নিঃশব্দে কেটে পড়াই মন্তল মনে কবে পা টিপে টিপে সবে আসি—পবিস্থিতি আয়ত্ত্বাধীন। নিচে গিয়ে লেখাটা ধবতে হবে।

নিচে এসে ঘবে ঢুকতে গিয়ে পায়ে যেন জলেব মতেই কী ঠেকলো। আবে। এঘরে আবাব জল আসবে কী করে। বোতল ভাঙলো নাকি? নজব করে দেখি

বড় খাটের পালিশ করা খোলা অংশগুলি ভিজিয়ে দাপটে জলশ্রোত আসছে। কোথা থেকে আসছে? দুটো জানলাই তো বন্ধ? জানলাব ওপব বইগুলো তো শুকনো? তবে তো জানলা দিয়ে নয়! ভাঙা কাচ-টাচ দিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না—তবে সদ্য কাচ সবই সাবানো হয়েছে—তবে? ঐ তো জলটা ধেয়ে আসছে বইয়ের ব্যাকের তলা দিয়ে কুলকুলিয়ে। কাপড়ের পুটলিও গা বেয়ে। কাপেট ভিজিয়ে—কুতল উঠে গদিতে চড়ে বসেছে—টেলিফোন উঠে সবে যেতে পাবেনি, তাই ভিজে যাচ্ছে। সর্বনাশ। এত জল কোথেকে আসছে?

কুতলটাও আশ্চর্য। সত্যি। উঠে গেছে, অথচ একটুও ঘেউ ঘেউ করেনি। কবরেই বা কেন? জল তো চোব নয় ডাকাতও নয়, যে ঘবে ঢুকলে কুকুবকে চৌচিয়ে তাব জানান দিতে হবে? জল তো আউট অব সিলেবাস। কিন্তু একটু আগেও তো জলটল ছিল না? এই তো ওপবে গেছি বাবান্দা সাফ করতে—এব মধোই এত জল এল কী করে। বৃষ্টি তো কমেই গেছে! দীপুটাই বা কেমন? চপচাপ এব মধো বসে আছে? দেখছে না?

—“দীপু!” হাঁকটি ছাড়ি। প্রায় কাপালিকদেব মতো। কিন্তু কোথায় দীপু? চেয়াব খালি। বাড়িতে চায়েব সুবিধে হবে না বুঝে তিনি নির্ধাৎ পাড়াব দোকানে গেছেন। আশ্চর্য ছেলে। সংসাবসুদ্ধ চুলোয় যাক, তাব দৃষ্টিপাত নেই। চা-সিগারেট হলেই হলো।

—“পিকোলো! টুমপা। কানাই। ঝর্ণা। পুতুল। শিগগিরি নেমে আয়। শিগগিরি। নিচেব বৈঠকখানা ভেসে গেল জলে—”, আমি আমাব সংসাবেব টোটাল ম্যান পাওয়াব ব্যবহাব করতে চেষ্টা কবি—প্রত্যেকটি মানুষকে মোবিলাইজ না কবলে ও সংকটেব মোচন অসাধা।

—“জল? বৈঠকখানায়? ও—ম্মা। কী মজা!”

—“কই? কই? কই? সত্যি বলছ তো?”

মহোল্লাসে কলরোল করতে করতে দম্ব বিকশিত কবে দুই কন্যা লাফাতে লাফাতে এসে পড়ে। ঠাস ঠাস করে দুই থাণ্ড কষাতে ইচ্ছে কবল আমাব। এটা যে সমুহ বিপদ, ওবা তা বুঝতে পাবে না? মজা পাচ্ছে? মোক্‌ভর্তি আমাদেব যাবতীয় ভূসম্পত্তি—বই, বেকর্ড, এবং অন্যান্য সবই যে মুহূর্তেব মধো জলমগ্ন ও বিনষ্ট হবে, এই ঘবে যে বান ডেকেছে—ওবা কিছুই টেব পাচ্ছে না—নির্বোধ শিশু কাঁধাকা। জলেব উৎস সন্ধানে তার গতিপথ অনুসরণ কবে পাশেব ঘবে উপস্থিত হই—কাপড ঢাকা খাট। কাপড ঢাকা গডবেজ আলমাবিব মাঝখানে দিয়ে বাঁশেব ভাবাব তলা দিয়ে বিপুল ক্রমবর্ধমান জলবাশি খবরেব কাগজ ঢাকা দেওয়া ট্রাংক স্যুটকেস ড্রেসিং টেবিলেব তলা ভিজিয়ে ছুটে এসে আমাব পদসেবা কবে, সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। উৎস, নর্দমা। কোণেব নর্দমাটি দিয়ে বাইবের বেনওয়াটার পাইপেব প্রবল জলকল্লোল অনায়াসে দোতলাব শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করছে। মাথাব

ওপর তিনতলাব বাবান্দায় কানাই তখনও সিংহবিজ্রমে ঝাঁটা নিয়ে জলযুদ্ধ চালাচ্ছে, তাব সম্মার্জনী-ঝংকাব শুনতে পাচ্ছি।

মুহূর্তেই ঘটনাটি পৰিষ্কাব হয়ে যায়। যত জল আমবা ওপব থেকে ঠেলে দিচ্ছি, সব জল বেগে পালিয়ে এসে আমাবই শোবাব ঘবে শেলটাব নিচ্ছে। কোনো বিশেষ কাবণে জল একতলায় নামতে পাবছে না। কি সৰ্বনাশ। প্রথমে ওপব থেকে জল নামা কথতে হবে।

—“কানাই। ও কানাই। ঝাঁটা বন্ধ কব, ঝাঁটা বন্ধ কব”— বলতেই কানাইগব আবো জেদ চেপে গেল। সে তো নিচেব সমস্যা জানে না? আমি যত চেঁচাই —“ঝাড়ু থামা”—ও তত বলে—“আমাব কোনো কষ্ট হচ্ছে না দিদি, এই তো আর একটুখানি—জল সব সাবাড।” তাব বোখ চেপেছে, বাবান্দা সে নিৰ্জলা কববেই।

—“অ পুতুল। অ ঝর্ণা। প্লিজ কানাইকে থামাও। বাবান্দাব জল বাবান্দাতেই থাকা ভালো, ও জল নাবিয়ে কাজ নেই—জলটা থাকুক, জলটা থাকুক, নৰ্দমা বৃজিয়ে দাও—ববং নৰ্দমাব মুখে নাতা গুঁজে দাও—”, শুনে কানাই ভাবলে দিদিব মাথা খাবাপ হয়েছে, সে আবো জোবে ঝাঁটা চালায়। নিজেব কানকে অবিশ্বাস কবে পুতুল ও ঝর্ণা নিচে আসে এবং ব্যাপাব দেখেই বান্নাঘবে দৌড়োয়—নাঃ, এ নাতা-বালতিব কেস নয়—এ কেলোব কীর্তি,—ওয়াব ফুটিংয়ে এব মোকাবিলা কবতে হবে—যে যা পাবে, থালা বাসন নিয়ে, বালতি ডেকটি নিয়ে হাজিৰ। টমপা পিকো সমেত কাঁসি নিয়ে কড়া নিয়ে মেঝেব জল ছেঁচে বালতি ডেকটিতে তোলা হতে লাগলো—কুতুল হঠাৎ জেগে উঠে ঘবে এত লোক এত হেঁচ দেখে, বেধডক চেঁচাতে শুরু কবলে —হট্টগোল শুনে পালিশ মিস্ত্রী পঞ্চ ছুটে এল, এবং অবস্থা দেখে বললে জালিটা ভেঙে না ফেললে জল বেব কবা যাবে না। বলেই কোথা থেকে একটা লোহাব বড এনে ঝাজবিটা ভাঙতে শুরু কবে দিলে। আমি চেষ্টা কবছি একবাব গদিটা টেনে সবাবাব—বেকৰ্ডগুলো ভাগিাস জলেব যাত্রাপথে নেই—ঘবেব অন্যপাশে আছে —একবাব লেপ তোশকেব পুটলিটা নডাতে চেষ্টা কবছি—কবতে কিছুই পাবছি না —পুতুল দুই হাতে ঝাঁটাটা ক্রিকেট ব্যাটেব মতো বাগিয়ে ধবেছে—দু’হাতে জল পেটাচ্ছে, তাব চেষ্টা জলটাকে বই আব গদিব দিক থেকে সবিয়ে দরজাব দিকে পাঠাবাব—যে যাব পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ঝর্ণা দবজাব কাছে, দীপুব একটি জীনস জিভছোলাব মতো কবে দু’টো পা দু’হাতে ধবে ছেঁচে ছেঁচে ঘবেব সব জল নিয়ে সিঁড়িতে ফেলছে।

এতক্ষণে কানাইও নিচে এসেছে। এসেই আধোভিজে লেপ তোশকেব গন্ধমাদনটা ও-ঘবেব খাটে তুলেছে। স্টিবিও স্পীকাবদুটো গদিব ওপব তুলেছে। ও-ঘবে খাটেব নিচে থেকে সাটকেসগুলো বেব করে শুকনো জায়গায় বাখছে—আব বলছে—“যাতো ঢাকন সবই উপ্রে আব যাতো জল সবই নিচে—এাব বেলাইতি ছুটকেশ সব ভিজো গেল গাঃ।”

হঠাৎ জল ছেঁটা ফেলে টুমপা কেঁদে উঠলো—“আমাব রথ! আমার রথ একদম ভিজ়ে গেল—ওমা! আমাব বথ!” আর পিকো চেঁচাচ্ছে—“মা! মা! স্টিবিও! স্টিবিও!”

স্টিবিওর মা কী কববে? অতবড় জিনিসটাকে কানাই দুই হাতে তুলে, হঠাৎ লক্ষ্মণের ফলধরা অবস্থায় পড়ল—সেটাকে নামানোব জায়গা নেই—বিক্ষাপর্বতের মতো কুঁজো হয়ে অনন্ত অপেক্ষায় বয়ে যায় কানাই। প্রত্যেকেই আমবা চেঁচাচ্ছি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে নির্দেশ এবং উপদেশ দিচ্ছি একই সঙ্গে, এবং মা ওপব থেকে অনববত তাঁব ঘণ্টিটা এক নাগাড়ে বাজিয়েই চলেছেন পাগলা ঘণ্টাব মতো। আব বলছেন—“ওবে—তোরা সবাই কোথায় গেলি? ওপবে কেউ নেই কেন? বাবান্দায় যে এখনো অনেক জল বয়ে গেল।”

এদিকে দোতলায় তো প্রত্যেকের কাঁসাঝিঁকাব অবস্থা। কাঁকবই স্টেশন ছেড়ে নডবাব উপায় নেই—মা বেচাবী কিছুই টেব পাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একতলায় তিনটে অধৈর্য ডোরবেল বাজলো। কেউই সাড়া দিতে পাবছে না। ওদিকে পঞ্চ ঝাঁজরি ভেঙে ফেলে সর্বনাশ কববেছে। “ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে বিপুল বোম্বে”। বিনা বাধায় দ্বিগুণ বেগে ঘবে জলপ্রবেশ ঘটছে। আবাব বেল! আবাব! আবাব! এবার ঝাঁটা হাতে পুতুল ও সানকি হাতে পিকোলো উঁকি দিল। নিচে ধোপদূরন্ত দু’জন অধীব, অভিযোগনিবত ভদ্রলোক। আমাদেরই নিচেব তলাব বাসিন্দাব।

—“আমাদের ঘরে আপনাদের জল ঢুকছে। একটু যদি জলটা না সামলান, তবে—”

—“স্বচক্ষে দেখে যান জল সামলানো হচ্ছে কি হচ্ছে না—”, ওপব থেকে উত্তব যায়।

তাঁবা স্বচক্ষে দেখতেই আসছিলেন, কিন্তু অভ্যৎসাহী ঝর্ণা অতো না বুঝে আবেক ক্ষেপ জল ঝাড়ে—এবং নাযাগাব মতো জলপ্রপাত হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে নেমে তাঁদের হাঁট অবধি সিল্ক কবে দেয়। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে জল নেমে একতলাব দবজাব তলা দিয়ে ওঁদের ঘবে ঢুকছে। চৌকাঠ না থাকাব কুফল।

—“দবজাব নিচে দুটো বস্তা লাগিয়ে নিন!” এবাবে আমিই চেঁচাই—“সিঁড়িব নিচে আছে।”

নিচেব ভদ্রলোকবা যথার্থই ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান। মুহূর্তেই বুঝে নেন, এটা সংকটজনক মুহূর্ত—এবং সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ পাটিতে যোগ দেন। অর্থাৎ দৌড়ে নিচে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বেবিযে রেনওয়াটার পাইপটি পবিদর্শনে লেগে যান। উপড় হয়ে চিৎ হয়ে উঠোনে শুয়ে নানাভাবে নল খোঁচাখুঁচি করে তাঁদের ডায়াগানোসিস হলো—“নল তো জ্যাম। একেবাবে অনেকদূর পর্যন্ত। একেবারে কংক্রিট হয়ে গেছ—মিস্ত্রীবা ভেতবে সিমেন্ট ফেলেছে নিশ্চয়ই—অতএব পাইপ ভর্তি হয়ে গিয়ে জলটা দোতলায় ঢুকছে।” এবার শুক করলেন নলটি ভেঙে ফেলার ব্যর্থ

প্রচেষ্টা। তাই দেখে আমার মনে পড়ে গেল—আবে। লোহাওয়ালা কোথায় গেল? সেই যে ট্যাংক ভাঙছিল? তাব তো যন্ত্র আছে।

লোহাওয়ালা বকে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বেবীর সঙ্গে মাথা না হোক, মাথাব সঙ্গে বেবী—ট্যাংকের সঙ্গে বেনওয়াটার পাইপও পাবে শুনে মহা উৎসাহে সে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে লেগে পডল, ঠাঠাং, ঠাঠাং, ঠাঠাং...কিন্তু তাব আগেই—যুবক পঞ্চব বডেব অবিরাম ধাক্কাব কাছে পঞ্চাশ বছরের পূর্বনো বেনডটি আত্মসমর্পণ কবল। আব কত সহিবে? পঞ্চ সমানেই খুঁচিয়ে যাচ্ছে—তাব দৃঢ় ধাবণা এখানেই কিছু জমে আছে—তাব খোঁচানোব চোটে মর্চে ধবা লোহাব নলটি গর্ত হয়ে গেল, এবং দোতলাব ওপব থেকে দুটো নল দিয়ে নোংবা জল কিছু ইট-পাটকেল-শনের নুড়োসমেত প্রবল ধাবায় নিচে কর্মবিত্ত পবোপকাবী ভদ্রলোক এবং লোহাওয়ালাব মাথায় ঝাঁপিয়ে পডল। আমি ভয়ে কাঁটা। ছি ছিঃ—কী কাণ্ডটাই হয়ে গেল। কিন্তু মানুষেব মন ভাবি আশ্চর্য বস্তু—ভিজে যাওয়া মানুষগুলিব কণ্ঠ দিয়ে যে উল্লাসধ্বনি নির্গত হলো—সেটা ববি শাস্ত্রীব ছক্কা মাঝাব সময়েই মানায়। পঞ্চকে দেখাচ্ছিলও ববি শাস্ত্রীব মতো।

জল ঢোকা বন্ধ। এবাবে বিল্যাক্ষ কবে আমবা অর্থাৎ দোতলাব জলকর্মীবন্দ ঘবেব জল, বাবান্দাব জল, সিঁড়িব জল, যাবতীয় জল সাফ-সুতবো কবতে থাকি। আমাব হাঁটুব কাছে কাপড় তোলা। হাতে নাবকোল ঝাঁটা। একমনে ঘবেব জল ঝাঁট দিচ্ছি। ওয়ারফুটিং থেকে এবাবে গার্মস্থ পর্যায়ে নেমে এসেছে কর্মেব জাতীয় চবিত্র। এবাব শুনতে পাই পাগলা ঘণ্টিব সঙ্গে সঙ্গে শয্যাবন্দী মা চোঁচাচ্ছেন—“ওবে। ভাত পোড়া গন্ধ বেকছে যে?—ওপবে কি কেউ নেই?”

ঝর্ণা জিভ কেটে ছুটলো ওপবে। হঠাৎ আমাব কানেব কাছে—

—“দিদি!”

—“কে বেঃ—”। চমকে উঠি। দুটি ছেলে।

—“আমবা এসেছিলাম মধুকৈটভ থেকে—এবাবে আমাদের পূজো সংখ্যাটা—”

—“আজ থাক, বুঝলেন? এখন খুব ব্যস্ত—”

—“যদি একটা প্রেমেব কবিতা—এটা শুধুই প্রেমেব কবিতাব সংকলন—”

—“আজ থাক ভাই, আবেক দিন, কেমন? এখন ভাবতে পারছি না—দেখতেই তো পাচ্ছেন—”

—“ও-ঘবে জল ঢুকে গেছে বুঝি? কী কবে ঢুকল?”

—“আবেক দিন সব বলব—বোবাব সকালে আসবেন—”

আপনমনে ঝাঁট দিতে থাকি। ছেলেদুটি চলে যায়। প্রেমের কবিতাই বটে।

—“দিদি!”

—“আবা-ব?”

—“আমি শওকৎ। ঈদ মুবাবক।”

—“ওঃ”—

শওকতের পবনে ধবধবে নতুন পোশাক—হাতে একটা কাগজের বাক্স। খাবাদাবাব আছে বলে মনে হয়। মিষ্টি? কাবাব? যাই থাকুক—এই কি তার সুযোগ্য সময়?

—“ঈদ মুবাবক শওকৎ। স্যরি, আমি আচ্ছ একটু—”

—“এটা ধরুন দিদি—পিকো-টুমপাব জন্য একটু পেস্তা।”

—“কেমন কবে ধববো? হাতে তো ঝাঁটা। দেখছো না বাড়ির কী অবস্থা?”

দেখবে না কেন? কিন্তু শওকৎ বড় ভদ্র ছেলে। খানদানী পবিবাব তাদেব। সে এসব কেলেঙ্কারি মুহূর্তগুলি দেখেও দেখে না। যেন এটাই আমার স্নাত্তিক জীবনযাত্রা—এই সিঁড়িতে জলপ্রপাত, এই হাতে ঝাড় নিয়ে, হাঁটু বেব করে অতিথি আপ্যায়ণ। যেন কিছুই হয়নি। সবই যথায়থ আছে। ইংবেজী এবং লখনউয়ী ভদ্রতায় এখানে একটা মিল আছে।

হঠাৎ যেন বাতাসে গন্ধ পেয়ে দুই মেয়ে হঠাৎ উদয় হয়। হাঁটু অবধি গোটানো ভিজ়ে জীনসে একজন, আব যত্রতত্র ভিজ়ে ন্যাকডাব মতো ফ্রকে আবেকজন। দু’জনেবই হাতে পুষ্পপাত্রের মতো ধবা দুটি সানকি। তাতে নোংরা জল। শওকতের হাতে বাক্স দেখেই লোভী টুমপা চকচকে চোখে প্রশ্ন কবে, “কী গো? শওকৎ-মামা? বাক্সে কী আছে?”

শওকৎ যেন বেঁচে যায়। বাক্স বাড়িয়ে ধবে সে বলে—“কিছু না, সামান্য পেস্তা। নে, তোবা খেয়ে ফ্যাল—”

অমনি ঘাড় কাৎ কবে কৌকড়াচুলভবা মাথাটা এগিয়ে আকাশ-পাতালব্যাপী একটি হাঁ কবে টুমপা। “দাও।”

তাব মুখে ফেলে দিতে হবে; এটা সম্ভব নয়। পিকো ভদ্রভাবে বলে—“ওই টেবিলে বাখো। ওটা শুকনো জায়গা। আমরা পবে নিচ্ছি। তুমি ওই চেয়ারটাতে বসতে পারো। ওটা বোধহয় শুকনো চেয়ার। আজ বাড়িতে যা কাণ্ড। বাপবে—”

—“হামতুম...এক কামবেমে বন্ধ হো”—নিচে উচ্চঃস্ববে গান গাইতে গাইতে চা-প্রীত চিত্তে দীপুব প্রবেশ। অবং আর্তনাদ। —“একী। সিঁড়িতে এত জল কেন? কানাই। কানাই। ন্যাতা আব বালতি নিয়ে আয়। এত জল এলই বা কোথেকে—” বলতে বলতে ওপবে এসে দীপুব চক্ষুস্থির।

“সর্বনাশ। বই? বেকর্ড? সব ভিজ়ে গেল নাকি? স্টিবিওটা? টিভি? সব তুলে বেখেছো তো?”

—“গেছে। সব গেছে। তুই যা ফুটপাথের দোকানে গিয়ে চা খা ততক্ষণ। ঘবে যে জল ঢুকছে, খববটাও তো দিবি? ছিল তো এই ঘরেই।”

—“জা-জানলে তো দেব? আগে তো ঢুকছিল না। ঢুকল কখন? ইস। হেভি কেলো কবে বেখেছো দেখছি?”



—“আমি ? আমি কেলো কবেছি ?”

—“না, না, মানে কেলো হয়ে বয়েছে।”

—“কেলোব তুই আব দেখলি কী ?”

এখন ঝর্ণা, পুতুল ঘর মুছছে, কানাই সিঁড়ি মুছছে, ঐ জলেই ফিনাইল গুলে নেওয়া হয়েছে, সবাই হাসি হাসি মুখে—তত বেশি ক্ষতি হয়নি যতটা হতে পারতো। এটাই যদি বাত্রে হতো ? যখন সবাই ঘুমিয়ে ? পর্দা, তোয়ালে, ফ্রক, ইজের যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেছে সবই তখন ব্যবহার করা হয়েছে ঘরের জল শুষে নেওয়াব মহৎ উদ্দেশ্যে। একমনে কানাই সিঁড়ি মুছছে যেটা দিয়ে, সেটা দীপুব পাজামা। দীপু দেখেও চিনতে পারলো না।

—“ওকি। ওকি। সর্বনাশ কবেছে—”, বলে সে লাফিয়ে পড়ে তুলে গিলে ভিজ়ে চুপচপে একটা চার্মসেব প্যাকেট। “ঝশশশ।” —বাসা থেকে খসে পড়া মৃত পক্ষিগণের মতো ব্যর্থ প্যাকেটটিকে আদব করে আবার ফেলে দেয়।

বৃষ্টি ধবে গেছে। লাজুক লাজুক একটু হলুদ বোদও উঠেছে। পুতুল বসে গেল ভিজ়ে পুটলিগুলো নিয়ে। ঘবে ঘবে সর্বত্র মেলে দেওয়া হতে লাগলো ছেঁড়া, ভিজ়ে, বাতিল কাপড়-চোপড়ের বাশি। মা চোঁচাচ্ছেন, “ওকি বে খাটের বাজুতে ভিজ়ে কাপড় দিল কে ? তুলে নে। তুলে নে। পালিশের আসবাবে জল ঠেকাতে নেই—” মা যদি জানতেন নিচের খাটটা কেমনভাবে জলসিক্ত হয়েছে আজ। —মেঝেয় বিছিয়ে দেওয়া হলো ভিজ়ে বইয়ের বাশি। “পাখা খুলে দে।” পাখা ঘুরলো না। লোডশেডিং। ঈদ প্লাস বখ। তবুও লোডশেডিং ? ওঃহো। নিচে তো শওকৎ বসে আছে।

—“শওকৎকে চা মিষ্টি দে তো, পিকো।”

—“শওকৎমামাকে চা মিষ্টি দাও তো, ঝর্ণাদি।”

অবগ্যদেবের ঢাকবাদকদের মতো নির্দেশটি বিলে হয়ে গেল। কিন্তু আমিও অবগ্যদেব নই, ঝর্ণাও নয় অবগ্যেব অধিবাসী। সে সাফ সাফ বলে দেয়—

“আমি কাউকে চা মিষ্টি দিতে পারবুনি বাপু। অগ্রে আমাকে কাপড় ছাড়তে হবেনি ? সর্বো অঙ্গ নাতাজোবডা ? ভিজ়ে ঢোল ? চা দাও বসেই হলো ?”

—“থাক থাক দিদি। আমার আজ চা খেতে ইচ্ছে নেই—আমি ববং যাই—পবে একদিন আসবো—” শওকৎ উঠে দাঁড়ায়। এই বাড়িতে এই মুহুর্তে সভ্যভবা শওকৎ বড় বেশি বেমানান।

—ঐতক্ষণে মনের মতো ভূমিকা পেয়ে দীপু এগিয়ে আসে। “চলো, চলো, শওকৎ, আমার ববং ধীরেধীরে দোকানে গিয়ে ঈদ স্পেশাল চা খেয়ে আসি—এ বাড়ি থেকে এখন কাটিয়া পড়াই মঙ্গল—গুড লাক দিদি। ঈদ মূবাবক।”

শওকৎও ভদ্রতা ভুলে হেসে ফেলে, পা বাড়ায়।

বারান্দায় ভিজ়ে কাপেট ঝুলছে। চতুর্দিকে ভিজ়ে কাপড়। ঘববাড়ি ঝকঝক

তকতক কবছে। চুনবালি ঝুলকালি সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার। আমবা সবাই পরিষ্কার শুকনো কাপড় পবে চুলটুল বেঁধে আদা-চা খেতে খেতে গল্প কবছি। বিদ্যুৎ এসে গেছে। পাখা ঘবছে। বই শুকোচ্ছে। তবু বৃকের সেই ধডফডনিটা কমছে না কিছুতেই। এখনো বৃকের মধ্যে হাতুড়ি, এমার্জেন্সি-কালোচিত উদ্বেগ। কিছুক্ষণ আগেব ঘবেব মধ্যে উচ্ছ্বসিত জলবাশিটার দৃশ্য ভুলতে পাবছি না।

নিচে বেল বাজলো। পাটভাঙা পাঞ্জামায়, ফর্সা গেঞ্জিতে, টেবি-কেটে চুল আঁচড়ে, শ্রীমান কানাই দবজা খুলে দিল। গুন গুন গুন গাইতে গাইতে।

—“উফ কি বৃষ্টি। কি বিষ্টি। কাজকর্ম আজ কিছু হলো না।” বলতে বলতে ওপবে এসে পড়লেন দাদামণি। বৈঠকখানা ঘবে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি বললেন—“কি বে? বথ সাজানো কমপ্লিট?”

শুকনো মোঝে খবড়ে বসে টিমপা তখন বথেব গা থেকে ভিজে কাগজ খুলছে। আব নতুন কাগজ কাঁচি আঠা নিয়ে পিকো বসে গেছে নতুন মালা-শেকল তৈরি কবতে।

চাবিদিকে তাকিয়ে দাদামণি উচ্ছ্বসিত—

—“বাঃ। এ যে ম্যাজিক রে! এই দেখে গেলুম ঝুলকালি চুনকালি, আর এর মধ্যেই যে দিবা ফেসলিফটিং হয়ে গেছে। পবিস্কার বাকবকে মেঝে—সিঁড়ি থেকে ঘব পর্যন্ত যেন ধুয়ে মুছে বেখেছিস। এই তো চাই। কে বলে খুকু সংসারী হয়নি?” বলতে বলতে দাদামণি চেগাবে মেলো বাখা দুটো ভিজে বাতিল ব্লাউজের ওপবে বসে পড়লেন।

## নাট্যারম্ভ

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

“মা, এই যে. পুপসিকে দেখতে চেয়েছিলে? পুপসি, এই যে, আমাব মা।”

একহাতে কালো হেলমেট, অন্য হাতে ডেনিম জ্যাকেট, কাঁধে ভারী ক্যামেবার ব্যাগ—সব সামলে পুপসি নিচু হয় ববিব মাকে প্রণাম কবতে। বন্দনা দু’পা পিছিয়ে যায়। “থাক থাক। হয়েছে।” পিছোবাব ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এটা তো ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। বন্দনা নিকপায়। কোনোটাই স্বেচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। এই যে পুপসিকে দেখতে চাওয়া সেটাই কি আব স্বেচ্ছাকৃত? নেহাৎ না দেখলেই আর চলছিল না, তাই চাওয়া। বিশ্বসৃদ্ধ প্রত্যেকে দেখেছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, ববিব

অফিসের কোসীগবা, কেউ বাকী নেই। পথেঘাটে, বেস্বাঁয়, নন্দনে, আকাডেমিতে, মিটিঙে মিছিলে সর্বত্র দু'জনে জোড় বেঁধে পবিত্রশ্যামান। হবি তো হ, সমস্ত বন্দনাদেবই চেনা লোকেদের সামনে। একমাত্র বন্দনাই দেখেনি। রবিও না। তাই আজ নেমস্তল্ল কবেছে। ববি বন্দনাকে জানিয়েছে এই মেয়েকেই সে জীবনসঙ্গিনী কবতে চায়। আব তো না দেখে উপায় নেই। তাই ডাকা।

পুপসি নামটাও যেমন বিতিকিচ্ছিব, অনেকটা পেপসি কোলাব মতন, ওব ভাবভঙ্গিও ঠিক তেমনি। ছোট কবে ছাঁটা প্রায় ছেলেদের মতন চুল, কালো টা শাট আব ব্লু জীন্স পবনে, পায়ে সূতী মোজাব সঙ্গে কাদাটে ময়লামতন গোন্ধা একজোড়া বিশ্রী ন্যাকডাব জুতো। ববিরও আছে ঠিক ঐ জিনিস। দাম নাকি চাবশো-পাচশো টাকা—কী যে দবকাব অমন যাচ্ছেতাই চেহারা বস্ত্র অত দামে কেনবাব তা বন্দনা বোঝে না। ঐ দামে চমৎকাব চামডাব জুতো হয়ে যায়। দু'খানা মোটববাইকে চড়ে 'ভটভট' শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে ববি আব পুপসি প্রেম কবে বেড়াচ্ছে। বন্দনা আব ববিরও তো বাপু প্রেম কবেই বিয়ে? কই এমন হতচ্ছাড়া বেহাগাপনা তো ছিল না? চুপিচুপি, কেউ যাতে না দেখতে পায়, কাকপক্ষীতে না টেবটি পায়, এমনভাবে লুকিয়ে চুবিয়ে দেখা কবতো। তবেই না প্রেমের মজা? আব এরা? এদের প্রেমের দাপটে দেশসুদ্ধ লোক অস্থির। কেবল ববি কেন জানি না পুপসিকে এই তিন বছরে একবারও বাড়িতে আনেনি। এবাব ডেকে পাঠিয়েছেন বন্দনা।

বন্দনা পিছিয়ে গেল, পুপসিও আব তেড়ে এল না, প্রণামের ভঙ্গি কবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একগাল হাসল, যেন কী অপকপ কীর্তিটাই না কবেছে সে বন্দনাব ছেলেটিকে হাত কবে।

—“হয়েছে, হয়েছে। বোসো।” বলে বন্দনা সোফা দেখায়। ইতিমধ্যেই পুপসি ব্যাগ বেখে বন্দনাদের পেটমোটো মিনিবেডালটাকে কোলে তুলে নিয়েছে এবং অদ্ভুত সব ভাষাতে তার সঙ্গে বাকালাপ শুরু কবেছে। মিনিও নেহাৎ বিশ্বাসঘাতিনী বমতো, আবামে গুবগুব শব্দ কবেছে।

—“কি বে? বোস। মা বসতে বলছে না?” আবেকবাব ধাক্কা লাগে বন্দনাব। ববি পুপসিকে ‘তুই’ বলল। তাদের সময়ে ‘তুই’ বলা মানেই ‘বন্ধু’ ছিল আব ‘ভাম’ মানেই ‘সংশয়জনক’ অবস্থা। তবে হ্যাঁ, পাডাব দাদাবা অনেক সময়ে তুই-তোকাবি কবলেও প্রণয়দৃষ্টিতে তাকাতো বটে। কিন্তু ববি তো দাদা নয়, সমবয়সী। এবং কদিনের ছোটই হবে। পুপসি ধপ কবে বসে পডল। সুন্দর কাচের টেবিলে নেসের শোভাটা না দেখেই তার ওপরে ধ্যাবডাবড হেলমেটা চাপিয়ে দিল। তাবপব পাশের আসনটা খাবড়ে ববিকে বলল, “তুইও বোস?” বন্দনাব আব অবাক হবাব কিছু নেই। খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলে অবিশ্য মেয়েটাকে খুব একটা খারাপ দেখতে নয়। একটা আলগা চটক আছে। বয়েসের একটা লাবণ্য তো থাকবেই। মোটা চশমার আড়ালে হলেও, চোখদুটি বেশ। ঝকঝকে, হাসিভরা। না, হাসিটা সত্যিই মিষ্টি। দাঁতও

কেন্দ্র সাজানো। রংটা যদিও চাপার দিকেই বলতে হবে (বন্দনা টকটকে ফরসা), নাকও খুব একটা টিকোলো নয়, তবে হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা আছে, নোখগুলো পরিষ্কার করে কাটা, রং মাখানো নয়। চশমার ওপব কোঁকড়াচুল ঝামবে পড়ছে, জ্যাকোং যাতটুকুনি চুল আছে। ছেলেদেব মতো কবে ছাঁটা চুল বন্দনা দু'চক্ষে দেখতে পারবে না। এইই ছিল তাদেব কপালে? এই নাকি মুখজ্যোবংশেব বড় বড়? পরনে কালো শ্বেজি, আর রং-ওঠা ব্লু জীনসেব পেটুলুন? অন্তত আজ একটা শাড়ি পবতে পারতো না? হাত শূন্য। কানে ফুটো নেই। মুখে বংটং নেই। ঠিক ববিও যেমন, এই মোবোও তেমন। ঘেমো, ক্লাস্ত চেহাৰা। সারাদিন আপিস কবে এসেছে। বাত নাজিৰ সময়ে। রবি স্নান করে ঘবে এল।

—“বাবা, পুপসি।” পুপসি আবাব প্রণাম কবতে উঠে দাঁডায়। নীচু হয়। রবি সবে যাঁরা না। মাথায হাত দেয। “থাক থাক” বলে মুখে। রবির ঠোটে পাইপ, পরনে পাজামার ওপব কমল মিত্র টাইপেব ড্রেসিং গাউন। পুপসি স্পষ্ট চোখে চেয়ে দ্যাখে। লাস্সা, সুপুরুষ পুষ্টি একজোডাগোঁফ। এই ববির বাবা? ববি তো বোগা, বাতাসে ফিৰ্ফিৰ কৰছে। একমুখ দাড়িগোঁফ চুলটুল মিলিয়ে একশা। বড় বড় চোখ দু'খানাই শুধু দেখা যায়। রবি একটা সোফায় বসে পড়ে বলে, “বোসো। সো? হ্যাঁ ডিষ্ট ইণ্ডর ভে গো?” বলেই খুদে কীসব যন্তরপাতি বেব কবে পাইপটা খোঁচাখুঁচি তরু কবে রবি। ওটা ওর খুব সুবিধে। বন্দনা কী কববে? একটা বোনোও নেই ছাই হাতে, যা গরম। “আমি যাই বরং তোমাদেব খাবাব গরম করি, রাত হয়ে গেছে ফিৰ্ফিৰে দেরি হয়ে যাবে তোমাব—” বলে বন্দনা উঠে পড়ে।

—“এখুনি খাওয়া কী? এই তো এলাম?” চটপট বন্দনাব ছেলেব প্রেমিকাব উত্তর।

—“কোয়ান্ট বাইট! এখুনি খাওয়া কী? তোমাব ভালো নাম কী পুপসি?” রবি বলে।

—“কাকুবাকী। কাকুবাকী দাশগুপ্ত।”

—“বাবা। বা। বা। হুম।” আব কথা নেই। ঘব শুক। পাখা ঘুবছে। আপনমনে নুয়ে পড়ে কোলেব মিনির সঙ্গে বাক্যলাপ চালিশে যায় কাকুবাকী দাশগুপ্ত। অবশেষে ববি বলে:

—“তোমাব বাবা—”

“কেল টেলিফোনে। নু জার্সিতে। আমাব মা এখানে। পড়ান।”

—“কেন। বেশ। বাঃ। তোমাব কত ভাইবোন?”

—“আমি একা।”

—“একা? ওনলি চাইলড? আই সী।” রবিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিস্তিত দেখায়। পাইপটা মুখে ভজতে চেষ্টা কবে সে।

—“ববির চেয়ে বেশি স্পয়েল্ট নই।” ঘবে অ্যাটম বোমা ফেলার মতো বলে দেয় পুপসি, এক মনে বেডাল আদব কবতে কবতে। “গ্রাই যে, পুসিমিনি,

তুই অবশ্য সবচেয়ে বেশি স্পয়েন্ট।” এবাব বন্দনা এগোয়। “তা বটে। ববি খুব অলস।”

—“তোমরা তো পাম এভিনিউতে থাকো?”

বাজে প্রশ্ন। পুপসি উত্তর দেওয়ার দবকাব মনে কবে না।

—“রাত বাড়ছে, ওকে তো একা একা ফিবতে হবে অতটা বাস্তব? আমি খাবাব দিয়ে দিচ্ছি। এ্যাতো দেবি কবে এলি।” সঙ্গে সঙ্গে ববির চটপট উত্তর এল—

—“আগে এলেই বা কী হতো? বাবা তো এই এলেন।”

—“তুমি বান্নাবান্না জানো পুপসি?” টেবিল সাজাতে সাজাতে বন্দনা জিজ্ঞেস কবে।

—“ঐ একটু আধটু—কাজ চালানোব মতো। আমি হেলপ কববো?” তিডিং কবে উঠে পড়ে পুপসি। “আমি টেবিলটা সেট কবে দিচ্ছি। তুমি খাবাবটা গবম কবো। ববি, এদিকে আয় তো?” তুমি! এই তো প্রথম দেখা। এখন তুমি? কী গায়ে পড়া মেয়ে বে বাবা, ভাগ্যিস তিন বছর ধরে এ-বাড়িতে তেড়ে আসিনি।

টেবিল বেশ পাকা হাতেই সাজিয়ে ফেলল। দিব্যি গল্প কবে আড্ডা মেবে হাসি ঠাট্টা কবে খেল, যেন কত জন্মেব চেনা। এসব মেয়েবা আশ্চর্য বেহায়া। জানে তো “এবাই আমার শশুব শশুডী হবে?” একটা লজ্জা সংকোচ ভয় নেই।

খাওয়াটা খুবই কম। ঐ আচাবটাই যা চেয়ে নিয়ে খেল, আব আলুভাজাটা। মাছটা খেয়ে জিজ্ঞেস কবলো— “মাছটা বুঝি সর্ষে, নাবকোলেব দুধ দিয়ে করেছে?”

ববির সঙ্গে খুব জমে গেছে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা। ববির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে গলে গেছে। অথচ প্যান্ট পরা, গেঞ্জী গায়ে, হেলমেট হাতে, নোংরা ন্যাকডাব জুতো পায়ে, ছেলেদেব মতো মুড়িয়ে চুলকাটা মেয়েকে মুখ্যজ্যোবাডিব বড় বউ কবতে ববিবই ঘোব অমত ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। কি জানি, এই ব্যবহাবটা ও মন থেকে কবছে, না ভদ্রতা কবছে। বন্দনা অতশত বোঝে না। কোম্পানিব অফিসাবদের নানাবকম কৃত্রিম ভব্যতাব অভ্যেস থাকে। বন্দনাব ওসব ধাতে নেই। ওব মন যা চায় না ও তা কিছুতেই কবতে পাবে না। হঠাৎ খাবাব টেবিলে যেন যুদ্ধ বেধে গেল। প্রচণ্ড তর্ক লেগে গেছে বৃশ আব সাদ্দামকে নিয়ে। ববি একদিকে। পুপসি আবেক দিকে। ববি বাবার মুখের ওপব কথা বলে না। ববি চূপ। পুপসি মুখে মুখে তর্ক কবছে—ববি একদম তর্ক সহ্য কবতে পাবে না। বন্দনা থামাতে চেষ্টা কববে কি? বন্দনাব ভয় কবছে। ফেব হঠাৎই তর্কটা শেষ হয়ে গেল। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল। আবার হাসিঠাট্টা। গল্প। যাক। বাঁচা গেছে। এখন মেয়েটা বাড়ি গেলেই তো হয়। বাত এগাবোটা বাজে। ববি নিশ্চয়ই বলবে—“পৌছে দিয়ে আসি।” অর্থাৎ ফিবতে সেই বাত বাবোটা। কিন্তু না, মেয়েটা

বাজী হলো না বরিকে সঙ্গে নিতে। বলল, —“কিস্যু ভাবনা করিস না। হুশ কবে চলে যাবো। পৌছে ফোন কবে দেবো।” তা, হুশ কবেই গেছেন তিনি। পনেরো মিনিট যেতে না যেতে ফোন এসে গেল। রাত্রে শুয়ে ববি বলল, “না, মেয়েটা বেশ ব্রাইট আছে।” বন্দনা বলল “একটু-আধটু বান্নাও জানে, মাছটা খেয়ে বলতে পাবলে, কী মশলায় বাঁধা।”

### প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা বেল বাজালো। বন্দনা খুলল।

—“নমস্কাব। আমি কাকবাকী'ব মা—শমিতা দাশগুপ্ত।”

—“আমি বন্দনা মুখার্জী। আসুন, ভিতরে আসুন।” আঙুলে গাড়ির চাবি, চটি ঘষতে ঘষতে শমিতা ঢুকল। বন্দনা নিজেব বাড়িতে ওব চেয়ে ঢেব বেশি পবিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে একটা সিল্কেব শাড়ি পরে আছে। শমিতাব পবনে একটা চটকানো ডুরে শাড়ি। খোঁপাটা একপাশে খানিকটা খুলে ঝুলছে। চোখে চশমা। ঘেমোকপালে একটা বড় কুমকুমের টিপ। গয়নাগাঁটির বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, হাতে কানে গলায় যেখানে যা থাকাব। কাঁধে দুটো প্রকাণ্ড থলি। একটা বোধহয় এককালে বেশ দামী ভ্যানিটি ব্যাগই ছিল, এখন চামড়াব বস্ত্রাব মতন দেখাচ্ছে। অন্যটা বস্ত্রাই। চটেব ঝোলাভর্তি কাগজপত্র। ঢুকেই একগাল হাসল শমিতা। মেয়েব মতো, মায়েবও দেখি বেশ বিনা কারণে হাসাব অভ্যেস। রবিকে ডাকে বন্দনা। পাঞ্জাবি পাজামা পবা, ভদ্র, স্নান-কবা ববি বেবিয়ে আসে। “নমস্কাব, নমস্কার। বসুন ?” বোঝা গেল, মাকে দেখে ববিও আশস্ত। তবু ভালো। মেয়েব মতন চুলছাটা প্যান্টপবা নয়। বলা যায় না। ডিভোর্সিব বউ বলে কথা। অনেককাল নাকি বিলেতে ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাস্টারি কবে, আবার কবিতা লেখে। প্রেমে পডবি তো পড ববি এমনই মেয়েকে পাকডালো, যাব সববকমেব ‘দোষ’ আছে। একে তো অসবর্ণ বিয়ে, বদিব সঙ্গে বিয়ে এ-বংশে আগে হয়নি। মেয়েব ইঞ্জিনিয়ার বাপেব আবার দুটো বিয়ে। ছাত্রাবস্থায় প্রথম বউ নাকি জার্মান মেয়ে ছিল। ডিভোর্সেব পব এই বিয়ে। মেয়েব দিদিমাবও নাকি দুটো বিয়ে। তারা আবার ব্রাহ্ম। বালবিধবাব বউয়েব শশুবই নাকি বিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয়বাব। সে বালবিধবাই হোক, আব যাই হোক, বিয়েটা তো হয়েছে দু'বাবই। আত্মীয়স্বজন তো ছেঁড়ে কথা কইবে না। মেগেব মা কেমন হবে, মনে মনে বেশ উদ্বেগই ছিল। তা, ভয়েব কিছু আছে বলে দেখে তো মনে হচ্ছে না। দেখতে শুনতে স্নাতবিকই, কেবল একটু খাপাটে আছে বোধহয়। জীবনে প্রথমবাব আলাপ কবতে আসছে হবু বেয়াইবাড়িতে। কবি বলেই কি এমন আলুথালু হয়ে আসতে হয়। বেয়াইবাড়িতে একটু পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে তো ?

—“এই নিন। মাছের কচুবি। আপনাবা মাছের কচুবি খান তো ?” বস্ত্র থেকে

একটা টিফিন বাক্স বেব করল শমিতা। বন্দনাকে দিল। ববি বলল, “হইস্কি, বাম, কিছু চলবে? বায়াব?”

—“নাঃ। ওসব ভালো লাগে না। থ্যাংক ইউ। শববৎ হবে এক গেলাস? বাপ বেঃ যা গবম।” —“নিশ্চয়ই!” বন্দনা উঠে গেল শববৎ কবতে।

—“তা, বলুন এবাবে—আপনারা কিছু ভাবলেন?” শমিতাব সোজাসৃজি প্রশ্নেব উত্তরে ববি ভুরু কঁচকোলো।

—“আমবা? আমবা আবার ভাববো কী? আপনিই তো মেয়েব মা। আমবা তো আশা কবছিলুম আপনিই যোগাযোগ কববেন। তাই তো কবাব কথা।”

—“কথা আবার কী?” শমিতা চোখ পাকায। —“এটা কি সম্ভব কবে বিয়ে হচ্ছে, যে ‘ছেলেব-বাডি—মেয়েব-বাডি’ এসব থাকবে? দেখুন ভাই, সম্ভব কবলে আমি কিন্তু কখনোই আপনার ছেলেব সঙ্গে সম্ভব কবতুম না। অতটুকুনি ছেলে। যতই সে ব্রিলিয়ান্ট হোক, সবেমাত্র কাঁচা চাকবিতে ঢুকেছে। শবীবস্বাস্থ্য তো তালপাতাব সেপাই—মেয়েব চেয়ে পুরো সতেরো দিনেব ছোটো। সম্ভব কবে এমন কচি পাত্র কেউ যোগাড় কবে? আবেকটু বয়স্ক, আবেকটু পাকা চাকবিতে এস্টাব্লিশড পাত্র খোঁজে লোকে। শল্পেপাল্ল, পবিণত তাই না? যদিও ববি ছেলোটাকে আমবা ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি, ওব গুণেব শেষ নেই, তবু ওকে ঠিক ‘পাত্র’ ‘পাত্র’ মনে হয় না। আব সম্ভব কবলে আপনিও নিশ্চয় ঘটক লাগিয়ে আমাব মেয়েটিকে খুঁজে বেব কবতেন না ঘবের বউ করবার জন্যে? একে তো আপনার ছেলের সমানবগিনী, তায ছেলেদেব মতন ভাবভাব। চুলছাঁটা, প্যান্ট পবা, দিন নেই বাত নেই মোটব সাইকেলে গাঁক গাঁক কবে শহর চষে ফেলছে। চাকবিটাও এমনই, যে বিপোটিং কবতে আজ এখানে কাল ওখানে যততর ছুটতে হয়। তায আমবা বদ্যি, আপনারা ব্রাহ্মণ। আমাব মায়েব আবার বিধবা-বিয়ে হয়েছিল। ওব বাবাবও একটা ডিভোর্স হয়েছিল—বাঙালীসমাজে এমনটি তো খুব লোভনীয় সম্ভব নয়? বলুন? সম্ভব কবলে আপনিও আমাব মেয়েব সঙ্গে বিয়ে দিতেন না, আমিও আপনার ছেলেব সঙ্গে বিয়ে দিতুম না। এতে সন্দেহ নেই। তবে সম্ভবতা তো পাত্রপাত্রীই কবেছে। সো লেট আস মেক দ্য বেস্ট অফ আ ব্যান্ড সিচুয়েশন—কী বলো ভাই বন্দনা? তুমিই বলছি, আমি বয়েসে বড়ই হবো।” বন্দনা আবার বলবে কী? দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে ববির সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে ফেলেছে সেও।

—“আবসলিউটলি।” ববি বলে হাসতে হাসতে, “উই হ্যাভ নো চয়েস। আফটার অল, উই আর ইন দ্য সেম বোট, সিসটাব। আমাদের ছেলেমেয়েব ভবিষ্যৎ যখন এক, আমাদের স্বার্থও তখন অভিন্ন।”

—“আসুন, তবে দিনটা ঠিক করে ফেলি। কবে, কোথায়, কীভাবে আশীর্বাদ হবে। আশীর্বাদ-কাম-এনগেজমেন্ট। ওদের প্লাস আমাদের বাগদান।”

ববির মুখ গভীর হয়। সে ধীরে ধীরে বলে:

—“দেখুন, আমি কিন্তু আমার ঠাকুবদাকে ডাকতে চাই। সোজা কথা।”

—“তা ডাকুন না। ডাকবেন বইকি? এ আর”—

—“ঠাকুরদাকে?” শমিতাকে থামিয়ে দেয় বন্দনা। “তোমার ঠাকুবদাকে? ববিব আশীর্বাদ? তিনি তো কবেই—ববিব জন্মের আগেই”—কথা শেষ না কবে রবির দিকে হাঁ কবে চেয়ে থাকে বন্দনা। শমিতা হঠাৎ হেসে ওঠে।

—“ওহো. বুঝেছি বুঝেছি, নান্দীমুখ, বুদ্ধি, এইসব বিচুয়ালসেব কথা বলছেন তো? পূর্বপুরুষদের আত্মান, হেন তেন? দূব! ওসব আবার আশীর্বাদে কী? ও তো বিয়ের সময়ে হয়। স্বর্গত গুরুজনদের জন্য এখানে কোনো স্লট নেই। ডাকলেও তিনি আসবেন না।”

সামান্য ঘাবড়ালেও ববি মচকায় না।

—“আমাদের কিন্তু হিন্দুবিবাহ চাই। আপনাবা নাকি ব্রাহ্ম?”

—“আমার মা বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন—আমরা ব্রাহ্ম নই। কিন্তু হিন্দু রিলিজিয়াস বিচুয়ালসে বিশ্বাসীও নই। বেজিস্টি বিয়ের পক্ষপাতী আমরা—”

“বেজিস্টি তো করতে হবেই। কিন্তু হিন্দুবিবাহ না হলে বিয়ে হবে না। এই বলে দিলাম।” শমিতা ওতে দমে না।

—“আমাকে বলে কী হবে? আমার তো বিয়ে হচ্ছে না, যাদের বিয়ে, তাদের বলবেন। আপনাব ছেলেকে বলুন, বউকে বলুন। আপনি দয়া করে শুধু অত হিন্দু-হিন্দু কবে চোঁচাবেন না! একুনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকজন চলে আসবে—এখন দিনকাল ভালো নয়—সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়।”

—“তা আশীর্বাদেব দিন ঠিক করার কী হলো?” বন্দনা খেই ধবিয়ে দেয়।

—“দিন ঠিক হয়ে যাবে। আগে নীতিটা ঠিক কবে নিচ্ছি।” ববি উত্তর দেয়।

—“নীতি?” শমিতা হেসে ওঠে ঝরঝরিয়ে।

—“এসব বিষয়ে আমার কোনোই নির্ধারিত নীতি নেই। এসব হচ্ছে ব্যক্তিগত নীতিব ব্যাপার। যাবা বিয়ে কববে তারা বুঝবে। বিয়ে না কবলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।” শমিতা মহানন্দে জানায়। “দিল্লি-বঙ্গোত্তে আজকাল ছেলেমেয়েরা অকছাব বিয়ে না কবে লিভ টুগেদাব কবছে। বিয়ে-থা হয়ত পবে কবে। কলকাতাতে ওসব চলে না অবশ্য, লোকে ছ্যা ছ্যা কববে। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাই না—ইটস দেয়ার লাইক. দে শুড ডিসাইড হাউ টু লিভ ইট।”

বন্দনা শিউরে ওঠে। ও বাবা. মেয়েব কবি মা কী ভীষণ ভীষণ সব কথাবার্তা বলছে। দেখলে মনে হয় নিরীহ। বন্দনাব আর ববিব খুবই আপত্তি আছে এইসব দুর্নীতিতে। লিভ টুগেদাব আবার কী? ছিঃ। যতসব অসভ্যতা। বিলেত থেকে আমদানি কবা বেহায়াপনা। আর শমিতারও বলিহাবি যাই। তুই মা হোস, কোথায় সুবুদ্ধি দিবি. তা না—লজ্জা কবল না এসব কথা বলতে? বন্দনা বিষয়টা পালটাতে তাড়াতাড়ি বলে, “আমরা কি তাহলে নতুন বছরের পাঁজি নিয়ে শনিবাব সন্দেরবেলা আপনাদের



বাড়ি যাবো ? আশীর্বাদেব দিনটা স্থির কবে ফেলতে ? কালই ঠাকুবমশাইকে খবর দিচ্ছি।”

—“ঠাকুবমশাই ? আশীর্বাদেও আবার পুত্র লাগে নাকি ? আমাদের ত্রো লাগেনি ? শুধু গুরুজনেবা ছিলেন।”

—“আমাদের লেগেছিল। তাছাড়া কাদের বাড়িতে আগে হবে ? ছেলের না মেয়েবা ?”

—“দু’ বাড়িতে দু’বাৰ কবে কী হবে ? একসঙ্গে সেবে দিলেই হয় ॥ ছেলোমেয়েবা দু’বাড়ি থেকে একই লোকেরা তো আশীর্বাদ কববেন পাত্রপাত্রীকে ; দু’বাৰ ধবে নোমস্কল খাইয়ে কী হবে ? দু’বাৰ ঝামেলা। দু’বাৰ ধবে সময় নষ্ট।”

—“বাঃ ! এটা দাকণ সাজেস্ট কবেছেন তো মিসেস দাশগুপ্ত ? বেশ একটা নিউট্রাল জায়গা ঠিক করে ফেলা যাক—কতো তো বিয়েবাড়ি ভাড়া দেয়—”

—“ঠিক আছে, সেটা আমি ব্যবস্থা কববো” শমিতা বলে— “লোক তো কম কবেও শ’ দেডেক হবেই, দু’বাড়িবা যখন ?”

—“কেটাবাব আমি পাঠিয়ে দেবো”— হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে ববি বলে ॥ “সেদিন আমার শালাবা বাড়িতে দাকণ বেঁধেছিল—” হঠাৎ উৎসবের হৃদয় আনন্দে ঝলসে ওঠে ঘরের বাতাসে।

—“আশীর্বাদে ছেলে পাজামা পবলে হবে না, ধৃতি পাপ্তাবি পরা চাই ॥ আজকাল দেখছি খুব পাজামাব চল হয়েছে বিয়েবাড়িতে।”

—“পাজামা-পরা বের কবে দেবো না ?” ববি বলে। “বলে দেখুক না ॥ ধৃতি আমি নিজে হাতে পবিয়ে দেবো, বেণ্ট লাগিয়ে দিলেই হবে। হঃ, পাজামা পরবো ॥” বন্দনা শমিতাব দিকে চেয়ে হাসে, ইঙ্গিতে ববিকে দেখিয়ে বলে—

—“বাগী আছে । ছেলে বাবাকে খুব ভয় পায়—যা বলবাব সব আমাকে বলে ॥ আপনাব মেয়েবা কথাও বাবাকে বলেনি, আমাকে।” শমিতা কলকল করে ওঠে ॥

—“আমার মেয়েও বাগী আছে। আমি খুব ভয় পাই। তুমিও কিন্তু সামলে চোলো বাপু । আজকাল তো বউদেরই দিন। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল ॥ শাওড়িকেও ভয় পেয়েছি, আবার বউকেও ভয় পেতে হবে। আমবা মাকেব জেনারেশন তো চেপ্টে গেছি।”

—“ঈদুঈদুকা ।” বন্দনা বলে। “বউকে আমি ভয় পাই নাকি ? দেখবেন ওকে ঠিক বাবণ কবে দেবো, আশীর্বাদেব দিন জীনস পবলে চলবে না। হাঁ, ঐটুকু তো মেয়ে।”

—“ঐটুকু মানে ? ধানী লংকা। আজকালকাব সবগুলো বাচ্চা ধানী লংকা ॥”

—“এরা তো বডো হয়ে গেছে। বাচ্চা নেই, ধানী লংকাও নেই, পাহাড়ী লংকা হয়ে গেছে। সিমলাই মিচ। ঝাল নেই, কেবল গন্ধ আছে।” ববি হা হা হাসে ॥

—“সে হলুম আমবা। ওবা অন্য বস্তু। বন্দনা, ভালো চাপ তো সামলে খেবো ॥

যা বৃদ্ধি, তুমি নেহাৎ ভালোমানুষ।”

—“আশীর্বাদের দিন ওদের কিন্তু অফিস গেলে চলবে না। ছুটি নিতে বলে দিতে হবে।” বন্দনা আবাব বলে। শমিতা মীমাংসা করে দেয়:

—“ববিবাব, গোধূলি লগ্নে আশীর্বাদ করলেই তো হয়। সামনে ইলেকশন। ওদা দু’জনেই খবরের কাগজে কাজ করে, ছুটি কি পাবে? ববিবাব খুব ভালো দিন—শনিবার বিকেল আবে ভালো দিন— আব সমস্ত গোধূলি লগ্নই সুলগ্ন। তখন ঐ কনে-দেখা আলোটা ফটে ওঠে—ঐ সময়টা আশীর্বাদের পক্ষে আইডিয়াল লগ্ন—”

—“না না ওভাবে হয় না। পাঁজি চাই পাঁজি।” ববি শমিতার উচ্ছ্বাসে ছিপি এঁটে দেয়। “শনিবার সন্ধ্যায় আসছি পাঁজি নিয়ে। দু’দিন সব্ব্ব করুন। এভবিথিং উইল বি সেটলড। নতুন বছর তো পড়েনি, পাঁজি কেনা হয়নি এখনও।”

## দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

মেঘের বিয়ে বলে কথা। দুগগা দুগগা বলে শমিতা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিবকে পাঠিয়ে একটা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত হাফ পঞ্জিকাও কিনিয়ে ফেলেছে সাড়ে সাত টাকা দিয়ে। কিন্তু কিনে এনে দেখেছে সেটি বিশুদ্ধ গ্রীক। সিদ্ধান্ত নেবে কী আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝতে পারছে না। সবই সাংকেতিক, ব্রাডশ’ বা প্লেনেব এবিসি গাইডেব মতো। পড়তে জানা চাই। পি এইচ ডি করার সময়ে শমিতাকে পাঁজি পড়তে শেখানো হয়নি। শনিবার সন্ধ্যাবেলায় বন্দনা এসে শমিতাকে তাব টিফিনবাক্স ফেবৎ দিল।

—“এটা ফেলে এসেছিলেন। এতে কিছু প্যাটিস আছে”, গুছিয়ে বসে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, ববি বলল:

—“আ স্মল প্রবলেম। পাঁজিতে দেয়ার্স নো স্পেশাল মেনশন অফ আশীর্বাদ এনিহোয়ায়্যাব। গৃহপ্রবেশ, সীমন্তোন্নয়ন, কুপ্তাণ্ডভক্ষণ, গর্ভাধান, অলাবুভক্ষণ নিষিদ্ধ। সমস্তই ডিটেল আছে। আশীর্বাদ নেই। না থাক, আপনাকে দুটো চয়েস দিতে পাবি — নাট্যাবস্ত ? না বীজবপন ?”

—“মানে ?” দু’হাতে প্যাটিসেব বাক্স, শমিতা বোকার মতো চেয়ে থাকে। -

—“মানে আশীর্বাদই বলুন এনগেজমেন্টই বলুন এটা তো জীবননাটকের শুরু ? এই একেশনের সবচেয়ে কাছাকাছি যায় যেসব একেশন তাব মধ্যে, ‘নাট্যাবস্ত’ একটা আব ‘বীজবপন’ একটা। কোনটা নেবেন ? সিগনিকালি দুটোই চলবে।”

—“বীজবপনটা একটু অর্লি হয়ে যাবে না ?” শমিতা একটু চিন্তা করে বলে। “তাব চেয়ে নাট্যাবস্তই—” বন্দনা গভীরমুখে শুনছে। ববি পাঁজি উলটোচ্ছে। এবাব প্রশ্ন করে:

—“বেশ, নাট্যাবস্ত। নেক্সট, অমৃতযোগ, না সোনায সোহাগা ?”

—“সোনায় সোহাগা আবাব কী ?”

—“ঐ যে ঐবকম শুনতে একটা ডাবলবারেলড শুভযোগ—অমৃতযোগ, আব, আব, আ, এই যে—মণিকাঞ্চন যোগ ? কোনটা চান ? নাকি দুটোই নেবেন ?”

—“দুটো একসঙ্গেও আছে ?” বন্দনা সোৎসাহে প্রশ্ন করে। শমিতাও স্বাদ পেয়ে গেছে মজাটাব।

—“দুটো যদি পাওয়া যায় তো দুটোই থাকুক না ?” লোভী বমতো বলে শমিতা। “ক্ষতি কী ?” দিন স্থির হয়ে গেল। সুন্দর একটি ববিবাব। ‘নাট্যাবলী’ আছে। বিকেলবেলায় ‘অমৃতযোগ’ও আছে, আবাব মণিকাঞ্চনও আছে। শমিতা আব বন্দনা এবাবে নিমন্ত্রণের তালিকা প্রস্তুত করবে। আব কেটাবাবের খাদ্যতালিকা। ববি দেখবে ঘবভাড়া ডেকবেটব আলো ইত্যাদি। খবচ সব আধাআধি। চমৎকার।

পবদিন সকালেই ফোন। ববি। উদ্বিগ্ন।

—“মিসেস দাশগুপ্ত ? স্যবি। হবে না।”

—“হবে না মানে ?”

—“ঐদিন আশীর্বাদ হবে না।”

—“হবে না। কেন হবে না ?”

—“এই ধবন, বন্দনা বলবে ?”

—“শমিতাদি ? ঠাকুবমশাই বললেন ঐদিন আশীর্বাদেব লগ্ন নেই।”

—“তবে যে তোমবা বললে আশীর্বাদেব লগ্ন বলে কিছু হয় না ?”

—“ভুল বলেছি। হয়, অনাভাবে লেখা থাকে। আমবা পড়তে পারিনি। ঠাকুবমশাই চাব-পাঁচটা দিন দিয়েছেন। বেছে নিন।”

—“নাট্যাবলী চলবে না ?”

—“নাঃ।”

—“অমৃতযোগ ? মণিকাঞ্চন যোগ ?”

—“ঐ সমস্ত আছে। আটাশ, উনত্রিশ, দোসবা, পাঁচুই—”

—“ফোনে এসব হয় না। তোমবা কাল চলে এসো।”

—“বেশ। কাল হবে না। ও টাবে যাচ্ছে। পবেব বেস্পতিবাব।”

## দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা এবাব নিউ জার্সিতে ফোন করল। পুপসিব বাবাব মতটাও জানা দবকার। তাঁকে তো আসতে হবে আশীর্বাদ করতে।

পুপসিব বাবা এসব ঠাকুবমশাই-টশাই শুনলে ক্ষেপে ভূত হয়ে যাবেন। হাফ সাহেব মানুষ। বৈজ্ঞানিক। প্রায় চল্লিশ বছর পশ্চিমে আছেন। পুপসিব প্রণয়ীব সঙ্গে তাঁর অবশ্য আলাপ পবিচয় হয়েছে।

শমিতা ব্যাখ্যা কবল যথাসাধ্য বেখেডেকে, কেন আশীর্বাদেব লগ্নটা ঠিক হয়নি। ওইটেই বাকী। ওদিক থেকে পুপসির বাবার গলায় উদ্দীপনা:

—“লগ্ন ? নো প্রবলেম। আমি ঠিক কবে দিচ্ছি।”

—“তুমি ? তুমি লগ্ন ঠিক কববে ? তোমাব কাছে পাঁজি থাকে ? যা তা কথা বোলো না।”

—“আমাব ডায়েবিতে phases of the moon আছে— বুঝলে ? তাতে পূর্ণিমা থাকে— পূর্ণিমা মানেই শুভলগ্ন,” কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তাবপব—সোৎসাহে—“এই তো আটাশে, মঙ্গলবার full moon —এদিনই লাগিয়ে দাও—অবশ্য ওটা ব্লু মুন নয় —বেশ তো বৈশাখী পূর্ণিমা—কী এটা তো বৈশাখ মাসই ? মে মাসে পচিশে বৈশাখ হয় না ?” —শমিতাও নেচে ওঠে

—“বৈশাখী পূর্ণিমা ? গ্রান্ড। তাব মানে ওটা বুদ্ধপূর্ণিমা। ছুটিব দিন। ববিবাবেব মতই হলো। দ্যাখো ওদেব ঠাকুবমশাই মানেন কি না ?”

—“মানবে না মানে ? খুব মানবে ? আমি ফ্লাইট বুক কবছি। ওদেব বলে দাও। আটাশে, আগামী বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমা শুভলগ্নেই আশীর্বাদ। ন অন্যথা।”

বন্দনা শুনে বললে, “আটাশে ? হ্যাঁ, আটাশেও আছে। ঠাকুবমশাইও তো আটাশে বলেছিলেন।” ববি বললে— “ওয়ান্ডাবফুল। লাইফ ইজ সো সিম্পল।”

শমিতা বললে, “দ্যাখো তো বন্দনা, এদিন ‘নাট্যাবস্ত’ আছে কিনা ? ওটা আমাব বড্ড পছন্দ হয়েছিল—” পাঁজিতে দেখা গেল সত্যি সত্যিই সেদিন নাট্যাবস্তও বয়েছে। আব কি ? বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া।

## দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

বুকে বল নিয়ে বন্দনা বলে ফেলল, “পুপসি, তোমাকে কিন্তু কান ফুটো কবতে হবে। আমি তোমাকে যে-সব গয়না দিয়ে আশীর্বাদ কবব, তাতে আমাব শাশুড়িব একটা কুমকো আছে— ফুটো না হলে পববে কী কবে ?” “কেন ?” পুপসি বলল, “ওতে ক্লাসপ এঁটে নেব।” বন্দনা অটল—“সোনাব জিনিস ওভাবে পবা চলবে না। কোথায় টুক কবে খসে পড়ে যাবে। ওটা আমাব শাশুড়িব গয়না। কানে ফুটো কবতে হবে। বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ।”

কানে ফুটো ? যত পৈশাচিক, বর্বব কাণ্ডকাবখানা। গয়না কে পবতে চায় ? না। কববে না পুপসি কানে ফুটো। তাতে আশীর্বাদ না হয়, না হবে।

—“ওমা সে কি ? এত ভয় পেলে হয় ?” শমিতা বলে ফালে। “একটুও লাগবে না, দেখিস। আমাব ছাত্রী অনুবোধাব একটা gun আছে, কানে যন্ত্র দিয়ে ফুটো কবে গয়না সের্টে দেয়, staple কবাব method, কানে লাগেও না, কান পাকেও না। ভয়েব কিছু নেই।”

—“ভয় পাচ্ছি কে বললে? নৈতিকভাবে আপত্তি আছে। বিশ্রী বার্ষিক প্রাকটিস।”

—“নীতিটা বড়বড় ব্যাপাবেব জন্য তুলে বাথ ববং। কানের ফুটো নিয়ে নীতিব লড়াই কবতে হবে না। স্বস্তববাড়ি বলে কথা। ছোট ছোট ব্যাপাবগুলো মেনে নিতে হয়। বড় ব্যাপাবে নীতিব প্রশ্ন উঠলে, তখন আপত্তি কোব। এটা অতি তুচ্ছ ব্যাপাব। এটা মেনে নাও।”

—“তাবপব, কানে পাচড়া হবে। দগদগে ঘা হয়ে বস গডাবে, আশীর্বাদেব দিনে নকল টেপা-দলও পবতে পাববে না, তখন বুাবে মজা।” মেয়ে বলে।

—“সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ঘা হবে না। হলেও সাবিয়ে দেব। চল, এক্ষুনি চল। ছ’ হণ্ডা লাগে কান সাবতে। টায়টোয় ছ’ হণ্ডা পেয়ে যাবে। শ্লীজ এটা নিয়ে ঝামেলা কোব না।” কানের কানপাশা stapled হয়ে গেল মুহূর্তেই। আশীর্বাদেব জন্য প্রথম প্রস্তুতি। বন্দনাকে ফোনে জানাল শমিতা। “হয়েছে। কানে ফুটো।”

—“বাঃ। তবে কেন বলছিলে মেয়ে বাণী? ভয় পেতে হবে? মেয়ে তো লক্ষ্মী।”

—“হ্যাঁ, লক্ষ্মী বটে। বেকবে, গুণপনা সবই বেকবে। লোক ভালোই, কিন্তু লক্ষ্মী নয়।”

বন্দনা এসে পড়ল, মেয়ে নিয়ে শাড়ি কিনতে যাবে। দিবা লক্ষ্মী মেয়েব মতোই একবেলা একটু তাড়াতাড়ি ফিবল পুপসি। শমিতা অবাক।

—“বাঃ। শাশুড়িব জনো তো দিবা তাড়াতাড়ি ফেবা হয়। মা বললে বাত বাবোটার আগে ছুটি মেলে না। পুজোব কাপড জীবনে কিনতে যাও না।”

—“কী? হিংসে হচ্ছে? ছি মা। হিংসে কবে না। তুমিই তো বললে এসব তুচ্ছ ব্যাপাবে নীতিব লড়াই কবতে হয় না। শাড়ি কেনা অতি তুচ্ছ ব্যাপাব।”

বেশ গোটাকতক শাড়ি কিনল বন্দনা। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজপিসও আছে, জামা কবতে দেওয়া হল। পুপসিও দিবা বিনাবাক্যব্যয়ে নিজেব দর্জিকে গিয়ে হাতাওয়ালা ব্লাউজেব মাপ দিয়ে এল। এবাব জুতো। জমকালো একখানা বেনাবসী শাড়ি হয়েছে। তাব জনো জবিব চটি চাই। ম্যাচিং হতে হবে তো? কিন্তু মেয়ে যাবেই বাটাতে। নর্থস্টার কিনবে। যা কাজে লাগবে, তাই কেনা ওব মত।

—“না। আমি কিছুতেই তোমাকে ওই বিশ্রী নোংবা ন্যাকডাব নর্থস্টার কিনতে দেবো না।” বন্দনা অনড। “চটিই কিনতে হবে। লাল, জবিব চটি। তত্ত্বে সাজানো হবে।”

বাটার দোকান থেকে শেষ পর্যন্ত কেনা হলো কী? লিপস্টিক, পাউডাব, কাজল, ব্লাশাব, ক্রীম, শ্যাম্পু দোকানে এসমস্তই আছে। কিন্তু জবিব চটি নেই। সেটার জন্য ফুটপাতে কিনতে যেতে চাইছিল পুপসি। বন্দনা শুনল না, “অন্য দোকানে চলো।”

“শুধু শুধুই কিনছ। ও আমি জীবনে পরব না। জবি-ফরি।”

“পরতে তো বলিনি? তত্ত্বে সাজিয়ে দিতে হবে তো?” বন্দনারও সাফ জবাব।  
“লোকে দেখলে বলবে কী?”

“ওই বেনাবসী শাড়িটা যে তুমি কিনলে, ওটা আশীর্বাদে পরবো না?”

“ওমা সেকি? ওটা পববে কেন? ওটা তো তত্ত্বে সাজিয়ে দেবো? আশীর্বাদের দিন তোমাদের বাড়ির শাড়ি পবতে হয়।”

—“অঃ। বাড়ির শাড়ি? তাব মানে মার শাড়ি।”

—“মার শাড়ি কেন পববে? মাকে বলবে, তোমাকে নতুন শাড়ি কিনে দেবেন।”

—“তাব মানে আবেকদিন তাডাতাড়ি বাড়ি ফেবা? ইমপসিবল। আজকেই দু’জনের একসঙ্গে বেকনো উচিত ছিল। দোকানে তো কত শাড়ি ছিল। আবেকখানা নিয়ে নিলেই লাঠা চুকে যেত। কিন্তু শাড়ি কি না পবলেই নয়?”

—“মানে? প্যান্ট নয়, বেশ গর্জাস একটা সালওয়াব কুর্তা পবলে হয় না? মুভমেন্ট অনেক ইজি”—

—“মুভমেন্টের দবকাবটা কী? চুপটি কবে আসনে বসে থাকবে। নড়বে না। সালওয়াব পবে বিয়ে হয়েছ কখনও বাঙালী মেয়েব? বেনাবসী চাই।”

—“বিয়ে তো হচ্ছে না? হচ্ছে এনগেজমেন্ট।”

—“সে যাই হোক। সামাজিক অনুষ্ঠানে ওসব কুর্তাকুর্তা চলবে না। শাড়ি পবতে হবে। বেশ জমকালো শাড়ি।”

পুপসি শেষ চেষ্টা কবে।

“শাড়ি খুলে গেলে জানি না কিন্তু।”

—“খুলবে না। মাকে বলবো, পিন কবে দেবো।”

“পিন কবলে ছিড়ে যাবে।”

—“গেলে যাবে। আবার হবে।” বন্দনাও মবিয়া। যতই জেদী বউ হোক, সে ছাড়বে না। ভয় পাবে? ঈশ। সে না শাশুড়ি?

### তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

—“মাটিতে শুয়ে পড়। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। হাতটা গালিয়ে দে। যাদুব যায়—” বডমাসি ইস্ট্রাকশন দিচ্ছেন ভুলুগিত শমিতাকে। ভুড়ির জন্যে নিজে যেহেতু পাবছেন না। শমিতা হাত গলিয়ে গলিয়ে নানাবকম বাস্তব বের করছে। মাঝ গমন। ঠাকুমার গমন। নিজের বিয়েব গমন। বাবাব ঘড়ি-আংটি, কর্তাব ঘড়ি-আংটি-বোতাম। “ঐ তো, ঐ তো, তোর কর্তাব বোতাম। ঈশ, পালিশ কবার আব টাইম নেই। দেখি, যদি একটা চটকা লাগিয়ে দিতে পারি।” গর্তটা থেকে বাস্তব পর বাস্তব

বেকছে। বাস্তব পব বাস্তব খোলা হচ্ছে। কনেকে কী পরিয়ে সাজানো হবে স্থিৎ হচ্ছে। শমিতা নিজের গয়নাও যদি কিছু না পবে, ভালো দেখাবে কেন? বডমাসি সব বেছে-টেছে ঠিকঠাক কবে দেবেন। শমিতাব কাজ শুধু মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে টেনে টেনে বাস্তব বেব করা।

—“অত্যন্ত বিব্রী এই ভোল্টটা নিয়েছিস।”

—“সেবাব ওখানে জল ঢুকে যাবাব পবে এইখানে সব সবিয়ে নিতে হলো।” এই সময় ঐ ঘরে আবেকজন উটকো লোকেব আবির্ভাব হলো। লোকটা ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো শমিতাদেব। ওখানেই ওব ভোল্টটা। শমিতা শুয়ে শুয়েই মুখটা তুলে টেবিয়ে টেবিয়ে দেখতে চেষ্টা কবলো। খুবই অস্বস্তিকব শাবীবিক পজিশন এটা। মন্দিবে মানায়। কিন্তু এটা ব্যাংক।

ঐ লোকটার অবস্থাও বিপবীত বকমে সঙ্গীন। খুব একটা লম্বা লোক নয়। তাব ভোল্টবাস্তবটা আবাব অনেকটা উঁচুতে। ডিঙি মেবে মেবে অতিকষ্টে বাস্তব কবছে। পাশেই একটা টুলি টেবিলে বাখছে। আবার ডিঙি মেবে উঁকি মেবে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আবেকটা বাস্তব। “ইচ্ছে কবলেই বডদি ওই টেবিল থেকে লোকটার অন্য বাস্তবটা নিয়ে নিতে পাবে”—শমিতা ভাবল।

—“কোনো প্রিভেসি নেই। কোনো সিকিওরিটিও নেই। যাচ্ছেতাই।” হঠাৎ বলেও ফেলল কথাটা সে বেশ জোবেই।

—“যা বলেছিস শমি”—বডমাসি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকান। যেন ওবই দোষ। ও কেন ঢুকেছে। শমিতা বোঝে ভদ্রলোকেব দোষ নেই। তাবও তো কাজেই ঢোকা। তবু বাগ হয়। লোকটা দেখতে বেশ ভদ্র, নিবীহ, সভ্যভব্য। ভয়েব কিছু নিশ্চয়ই নেই। তবু, যদি দুটু লোক হয়? এই মাটিব নিচের ঘরে—নিড়তে শমিতাদেব খুন কবে বেখে গেলে? অতগুলো গয়নাব বাস্তব। লোকটাব সামনেই খোলা ছাড়া উপায়ও নেই। তিনটেব সময় বন্ধ হয়ে যাবে। ভেতবে কেন যে পুলিশ থাকে না? যাক। লোকটাব কাজ শেষ হয়ে যায় বেশ তাড়াতাড়িই। সে বাস্তব বন্ধ কবে হঠাৎ একগাল হাসে। তাবপব হাত জোড় কবে বলে—“আপনিই তো শমিতা দাশগুপ্ত? আমি হচ্ছি ববিব ছোটমামা। বন্দনাব ছোড়দা। এখানে আপনি যে-উদ্দেশ্যে, আমিও সেই উদ্দেশ্যে।” হাসিমুখে নমস্কাব কবেন ভদ্রলোক।

—“ববিব ছোটমামা!” (ছি ছি, কী ভাবল।)

—“নমস্কাব। নমস্কাব। আব ইনি পুপসিব বডমাসি।” আমাব বডদি। শমিতা শয়ান অবস্থাতেই সাধ্যমতো ভদ্রতা কবাব চেষ্টা করে। কিন্তু বডমাসি স্মাট লোক।

—“কিছু মনে কববেন না ভাই। আপনাকে তো চিনি না? তাই ভেবেছিলাম কে না কে। বাইবেব লোকেব সামনে এতগুলো গয়না—”

—“তা তো বটেই, তা তো বটেই”—

—“তাহলে, মঙ্গলবাব সন্কেবেলা দেখা হবে?” বলে বডমাসি একটা ফাইনাল

হাসি হেসে দেন। শমিতা তো সেই মুহূর্তে এমনিতেই “মাটিতে মিশিয়ে” শুয়ে আছে—লজ্জায় লোকেব যা কবতে চাইবার কথা। নতুন করে করার কিছু ছিল না।

বাড়ি ফেবাব পথে শেষ পর্যন্ত—

—“বডদি ? অত ভারী ঝাডলঠন ঝুমকো তো নিচ্ছিস, কিন্তু পুপসিব কানে তো রস গড়াচ্ছে। এখনও নিমকাঠি। কান তো সাবেনি।” শমিতা বলেই ফ্যালো।

—“চমৎকাব। কানে নিমকাঠি পরে মেয়ে সেজেগুজে আসনে বসবে ?”

—“ধরো দু’খানা বেশ কচিকচি নিমপাতাসুদ্ধ কাঠি, বেশ আটস্টিক কবে যদি লাগানো যায় ?”

—“কনে পাতাসুদ্ধ নিমের ডাল পববে কানে ?”

—“আহা, শান্তিনিকেতনে যেমন ফুলের গয়না পবতেন না সুধীরাদি ? তেমন কিছু যদি, নিমপাতা দিয়ে—”

—“সোনা। সোনা পবাতে হবে। সোনা। ওসব ডালপালা চলবে না। এফুনি গিয়েই একটা মাকড়ি পরিযে দিচ্ছি। মাবকিউবোক্রোম লাগিয়েছিস ? যন্তো পাগলের কাণ্ড।”

### তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

—“ওরে ব্লাউজগুলো আনিযেছিস ? ওদেব বাড়িতে পাঠাতে হবে।” শমিতাব হঠাৎ মনে পড়েছে।

—“কিসেব ব্লাউজ ?”

—“ঐ পুপসিব শশুববাডি থেকে যে শাড়িগুলো দিচ্ছে তাব সঙ্গেব ব্লাউজপিসগুলো সব দিয়ে গেছে, জামা কবিয়ে দিতে।”

—“অনেকগুলো শাড়িও দিচ্ছে নাকি ? এই যে শুনলাম জডোযাব সেট দিচ্ছে—”

—“সেও দিচ্ছে। তাব ওপব দেখলুম তো বেশ কযেকটা ব্লাউজ কবাতে দিলে—”

—“বেশ কযেকটা ব্লাউজ ? ওবা তবে তত্ব কবছে ? বেশ কযেকটা ব্লাউজ মানেই বেশ কযেকটা ট্রে।”

—“তা হবে।” শমিতাব নিশ্চিত উত্তবে বডমাসিব গা জ্বলে যায়। গলায় উদ্বিগ্ন নিয়ে বডমাসি বলেন:

—“আব আমবা ?”

—“আমবা মানে ?”

—“বাঃ। ওবা তত্ব কববে, আমাদের তত্ব ?”



—“আশীর্বাদে আবার তত্ত্ব কী ? আমাদের ওসব তত্ত্বফত্ত্ব নেই। আমরা বিঘেতে তত্ত্ব কববো।”

“বা, বা। দু’পক্ষের লোকজন আসবে, একসঙ্গে দু’পক্ষের আশীর্বাদ হবে, ববপক্ষ থেকে থালা থালা তত্ত্ব আসবে, আব কনোপক্ষ ভোঁ ভোঁ ? তাই কখনও হয় ? খুব খাবাপ দেখাবে।” শমিতার বড়দি মুখঝামটা দেন। শমিতা তাতে ঘাবড়ানোব পাত্রী নয়।

—“দেখাদেখিব কী আছে ? ওদের ইচ্ছে ইয়েছে ওবা দিচ্ছে।”

—“তোমাব ইচ্ছে হয়নি, তুমি দিচ্ছে না। এই তো ? সেইটাই বলছি। অন্যলোকেও ঠিক তাই বলবে।”

—“ইচ্ছে হবে না কেন ? এই তো এই টাইটা বেব কবেছিলুম দোব বলে। বোতামের সঙ্গে, আব ঘড়িব সঙ্গে। তা মোয়েই দিতে দিচ্ছে না। দ্যাখো কী সুন্দব টাই ?”

—“টাই ? ইঠাৎ টাই কেন ?”

—“খাস বেনাবস থেকে আনা। বেনাবসী সিল্ক ব্রোকেডের টাই। পুপসিব বাবাকে আমাদের বিয়েব সময়ে আমাব বেনাবসেব সেই ব্যাচেলব জ্যাঠাশুণ্ডব দিয়েছিলেন দু’খানা। তাবই একখানা তুলে রেখেছিলাম। চমৎকাব দেখতে। এযাবলুম বলে কথা।”

—“পাঁচিশ বছর তুলে বেখেছিলি ?”

—“সাতাশ। একদম নতুন আছে। চকচকে।”

—“টাই দিলে সঙ্গে সুটও দিতে হয়। বুঝেছ ?”

—“তা কেন ? এই যে বোতাম দিচ্ছি, কৈ ধুতিপাঞ্জাবি তো দিচ্ছি না ?”

—“কিসের জন্যে দিচ্ছ না ? দেওয়াই তো উচিত।”

—“জীবনেও ধুতি পববে না ও-ছেলে, দিয়ে নষ্ট কবে কী লাভ ? ধুতি এখন শাড়িব চেয়ে দামী।”

—“তবে বোতাম দিচ্ছিস কেন ? বোতাম কিসে পববে ?”

—“ছেলের বাবা তো বাবগই কবেছিলেন। বলেছিলেন ছেলেকে একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিতে। জার্নালিস্ট মানুষ। কাজে লাগবে। ঘড়ি ওব আছে। বোতাম পরে না।”

—“সে তো বেশ ভালো হতো। বেশ নতুন জিনিস। যেটা কাজে লাগবে।”

—“ধুৎ। দু’হাতে কবে ধানদুবোব সঙ্গে ছেলের মাথায় টাইপরাইটার তুলে দেবো নাকি ? আশীর্বাদী ? তাই কখনও হয় ? তাছাড়া পুপু বেঁকে বসলো।”

—“বেঁকে বসলো ?”

—“বললো, তাহলে ওকেও ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিয়েই আশীর্বাদ কবতে হবে। ও-ও পেশাদার জার্নালিস্ট। ওও তো শাড়ি গয়না পবে না। ওবও ওইটেই

বেশি কাজে লাগবে। দু'জনে একই চাকরি কবে, ছেলের বেলায় একরকম, মেয়ের বেলায় অন্যরকম চলবে না।”

—“ভাবপর?”

—“তখন ওঁরা বললেন, ‘আপনার যা খুশি তাই দিয়ে আশীর্বাদ করুন, আমরা তা বলে টাইপরাইটার দিয়ে বউকে আশীর্বাদ করতে পাববো না।’ তাই পুপু বাবা বিলেত থেকে জামাঘের ঘড়িটা আনবেন। আর বোতামটা—পুপু বলেছে, পুপুই কুর্তায় পাববো।”

—“শমি, হোঁচর শব্দবাবুডিতে তত্ত্ব থাক না থাক আমাদের তত্ত্ব সাজাতেই হবে। নইলে বড্ড খাবাপ দেখাবে বো।”

—“আজ বাদে কাল কাজ। এখন তত্ত্বের ব্যবস্থা করবো কী কবে? দেবোটাই বা কী? ধৃতি পাঞ্জাবি তো জপ্তালা।”

—“জপ্তালা দিবি কেন? ছেলে যা পাববে তাই দো।”

—“টী শাট আর ব্লু জীনস?”

—“তা কেন? তুমি বাছা স্যুট দাও। ওরা বেনাবসী দিচ্ছে। আমি আজই মাস্টারকে খবর দিচ্ছি, দুদিনে বানিয়ে দেবে। তুমি শুধু ছেলেকে ধরো মাপের জন্যে। আর স্যুট-লেংথটা কিনে আনো। যাও, ফোন করো, ছেলেকে পাকড়াও। এক্ষুনি!” বডুমাসিব ছাড়ান নেই। শমিতা ছুটল ফোন করতে। তক্ষুনি। সন্কে ৮টা সময় মাস্টারকে এনে ফেলবে বডদি।

—“হ্যালো। মিস্টার মুখার্জি? আজ সন্কে আটটায় ববিকে একবার পাঠিয়ে দেবেন? স্যুটের মাপ দিতে হবে।” ওপারে যেন বিজলীৰ শব্দ লাগে। রবি শিউবে উঠেছে, বোঝা গেল।

—“স্যুট? ববিকে স্যুট দেবেন আপনারা? ক্ষেপেছেন? আমার বিয়েতে তিনখানা স্যুট পেয়েছিলুম। তিবিশ বছর পরে বছর বছর শুধু রোদে দিচ্ছি আর ন্যাপথলিনে জড়িচ্ছি। মাথা খাবাপ? খবদাব না। কোম্পানির কাজেই স্যুট পবতে লাগে না, তো জার্নালিজমো।”

—“তাহলে? কী দেবো আমরা তত্ত্ব?” শমিতা হাহাকাহ করে ওঠে।

—“ও, তত্ত্ব? শাটপ্যান্ট, শাটপ্যান্ট।”

—“শাটপ্যান্ট? বেশ দেখি মাস্টারকে বলে যদি কবে দেয়। শাট কি এত তাড়াতাড়ি—”

—“কবাবেন কেন? পিকার্ডিলি! পিকার্ডিলি। ওখানে সব বেডিমেন্ট পাওয়া যায়, একঘণ্টা সময় দিলেই সব ফিটিং কবিয়ে দেবে। ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস। তালপাতাব সেপাইদেবও ফিট কবিয়ে দেবে।”

—“পিকার্ডিলিটা আবার কোথায়?”

—“চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি—ববি এখনও বাড়িতে আছে, পিকার্ডিলি আধঘণ্টার মধ্যে খুলে যাবে—”

—“ওখানে কি স্পোর্টসজ্যাকেটও”—

—“স-ব। স-ব। কিন্তু অত দেবেন কেন? কিছু দবকাব নেই। ‘তত্ত্ব’ বলে কাতবে উঠলেন, তাই ভাবলুম নিয়ে যাই। অত দেবেন না, অত দেবেন না, ডোন্ট স্পয়েল হিম। এ যে জামাইআদব শুরু কবে দিলেন।”

—“জামাই তো?” শমিতা এবাব হুডমুড়িয়ে হেসে ফ্যালো। “সত্যি মিস্টাব মুখার্জি, আপনি না।—”

### তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

বড়মাসিব বড় আনন্দ! শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, বাঃ। দিবি তত্বেব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—এব সঙ্গে গেম্ভী, ইজিব, জুতো, মোজা, কমাল, বেলট, তোব সেই বেনাবসী টাইটা, তেল, সাবান, শেভিং সেট, ওডিকোলোন, চিকনি বৃকশ—চমৎকাব। বড়মাসিব আনন্দ ধরে না।

—“আয়্যাম সবি টু স্যে দিস, কিন্তু মাগো, তোমাব বেনাবসী টাইটা কিন্তু চলবে না।” দুঃখিত গলায় পুপসি বলে। —“আজকাল সব টাই কেউ পরে না। তাছাড়া বড্ড বকমকে। ব্রোকেড টাই কেউ পরে?”

—“পরে না? বেনাবসী সিল্ক ব্রোকেড?”

—“ববং ওটা বিযেতে দিও। ততদিনে হয়তো ওইটেই ফ্যাশন হয়ে যাবে। কে বলতে পাবে?” পুপসি সাবুনা দেয।

—“এবাব তবে ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলো কিনে ফ্যাল? জুতো, মোজা, কমাল টুমাল পুপসি আব ববি গিয়ে কিনে আনুক ববং—”

—“সেই ভালো”—নাচতে নাচতে পুপসি ববিকে ফোন কবতে থাকে।

—“ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলোও গডিয়াহাট থেকে আজই কিনে নেবো কি?”

—“প্রথমেই শ্যাম্পু চাই। ববির চুলগুলো বাপু বড্ড কাণেব বাসা হয়ে থাকে”—বড়মাসি বলেন, “শিলু লিখে নাও—শ্যাম্পু, ওডিকোলন, ট্যালকম পাউডাব, চিকনি বৃকশ, তেল সাবান, শেভিং সেট, শেভিং ফোম, আফটাব শেভ—”

—“ও কী? ও কী?” পুপু ফোন ধবেই হেসে গডিয়ে পড়ে। “শেভিং সেট দিয়ে কী হবে? আফটাব শেভ? ববির তো একমুখ দাড়িগোঁফ।”

—“তা হোক। দিতে হয়।”

—“মোটাই না। তাব চেযে ববং একটা ডিওডোব্যান্ট দিও। ছেলেকে আশীর্বাদ কবতে এসে লোকে যাতে পালিয়ে না যায়।”

—“বেশ। শিবু, লেখো. ওডেনিল।”

—“ওডেনিল?” শিবু আপত্তি করে।

—“সে কি বড়দি? সে তো বাথরুমের জন্যে। মানুষের জন্যে আলাদা”—

পুপসিব হাসি আব থামে না। “বডমাসি, তোমরা গুটা ছেড়ে দাও দিকি? এবার আমিই বাবাকে ফোন করে দিচ্ছি—বিলেত থেকে টয়লেটেব জিনিস নিয়ে আসবেন —ওখানে অনেক কিছু মেলে—”

শিবতোষ এসে পড়লো আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন। সবাই মিলে বসে গেল তাব বাস্তু ঘাঁটতে। বাঃ। চমৎকাব ঘড়িটা তো? কী অপূর্ব টাইগুলো বাবা? প্রসাধনদ্রব্যও প্রচুর—শমিতাব লিস্টি ধবে কিনেছে শিবতোষ। কিছুই ভোলেনি। শ্যাম্পু, সাবান, ডিওডোব্যান্ট, ওডিকোলোন, ট্যালকম, এমনকী একটা পুরুষমানুষেব পাবফিউম পর্যন্ত এনেছে বুদ্ধি কবে। কই কই দেখি, কী আনলে?” মহা উৎসাহে ছুটে যায় শমিতা।

—“ও মা। এগুলো সব দিশি গো?”

—“দিশি কী? সমস্ত নিউ ইয়র্কে কেনা।” শিবতোষ আশ্চর্য হয়ে যায় শমিতার নিবুদ্ধিতায়।

—“কিন্তু এগুলোই তো দিনরাত গড়িয়াহাটে দেখি। অন্য কোনো বিলিতি কোম্পানি কি ছিল না? এ তো এখানে পাওয়া যায়।” শিবতোষ যাবপবনাই মর্মান্বিত। সে নিজে প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহাব কবতে অভ্যস্ত নয়।

—“ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ওলড স্পাইস খুব নামকরা বিলিতি কোম্পানি, এখন তুমি বলছো দিশি? এগুলো দিশি?”

—“সত্যিই তো খুব নামকরা কোম্পানি, বাবা”—পুপসি ছুটে আসে বাবাকে বক্ষা কবতে।

—“দেশেরগুলো সব নকল। ভেজাল। মা কিছু জানেন না। খালি শিশিতে দিশি জিনিস ভরা। তুমি মার কথা শুনো না তো? খুব ভালো কোম্পানি ওলড স্পাইস।” শিবতোষেব মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিদেশে থাকে বলে কি সে স্বপ্নেব হতে জানে না?

### চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

জাহাজ থেকে এসে পড়েছেন ছেলের কাকা, টবি, নেভাল কম্যাণ্ডে, সময়মতন ছুটিটা জুটে গেছে। ব্যাচেলর মানুষ, দাড়িগোঁপভর্তি মুখ। গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন একধাবে—যখন তব্ধ সাজানোর ফাইনাল লিস্ট হচ্ছে। —“সবই এসে গেছে। এখন বাকী শুধু চিকনী, বুকশ, মোজা, কমাল—”

—“আর একটা দাঁড়ি আঁচড়ানোব চিরুনিও লিখে নি।” ছেলের কাকা বলে ওঠেন।

—“আর একশিশি দাড়িব আতর, একশিশি লাইসিল। ব্যাস, তবেই টয়লেটেব ট্রে পারফেক্ট।”

বডমাসি লিখে নেন—“দাড়িব চিরুনি, দাড়ির আতর, লাইসিল।”

শিবুমামা ব্যাগ নামিয়ে ফ্যানের নিচে মোড়াটা টেনে নেন।

—“এই নাও। চিরুনি, বুরুশ মোজা, কমাল, দাড়ি আঁচড়াবাব চিরুনি কেউ দিতে পাবল না। একটা দাড়িওলা দোকানদার এইটে দিল। একদিকে সৰু, একদিকে চওড়া। বলল এটা দিয়ে দাড়ি, ভুরু, দুটোই আঁচড়ানো যাবে। বড়বাজাব থেকে আতর এনেছি। দাড়িব জন্য আলাদা কোনো ব্রাণ্ড নেই। গোলাপী, জেসমিন, হাজাবটা গন্ধ। মাথা খারাপ হবাব যোগাড়। এইটে এনেছি। কিন্তু সাজিয়ে দেবে কিসে? বিদ্রী দেখতে তো শিশিটা। আব এই নাও লাইসিল।”

শিবুমামাব বক্তৃতা থামতে না থামতে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পুপসি।

—“তোমবা সত্যি সত্যি তত্ত্বে লাইসিল সাজিয়ে দিচ্ছে? তোমাদের কি মাথা খাবাপ? তোমবা জানো না লাইসিল উকুনব ওষুধ? এতে ববিকে অপমান কবা হয়। ওবা তবে তত্ত্বে তোমাদের মেয়েকে দাদের মলম সাজিয়ে দিক? ঠাট্টাও বোঝো না?” শিবুমামা স্তব্ধ। বডমাসিব এতক্ষণে মুখ খোলে।

—“এ আবাব কী ধরনের ঠাট্টা? আমি কী করে বুঝবো—”

“যাগ গে যাক, দেখি আতরটা কেমন? আঃ কী সুন্দব গন্ধ। তত্ত্বে-ফতে দিয়ে কাজ নেই, ও-বাড়িতে চলে যাবে। কবে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই, ততদিনে ওই আতব উবে যাবে! চাকরিবাকরিব ঠিক নেই, তোমরা বিয়ে বিয়ে করে নেচে উঠলে। দেখি, আতবটা আমাকে দাও—”

—“নেচেছি কি সাধে মাগো?” বডমাসিব পষ্ট কথা। “—তোমবা যা নাচানাচি গুরু কবেছিলে তাতে বাপমায়েব আব না নেচে উপায় ছিল না যে?” পুপসি পালিয়ে যায়। “লাইসিলটা বাথরুমে থাক”, বডমাসি বায় দেন। “চিরুনিটা তত্ত্বে যাক।”

### চতুর্থ অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

বডমাসি মেঝেতে বাবু হয়ে বসেছেন। সামনে নানান সাইজের ট্রে। সেলোফেন কাগজ, বস্ত্রিন ফিতে, জরিব টুকবো, পুবোনো বাখী, শোলাব ফুল, নাইলনের ফুল, পাতা, রাংতা, কাঁচি, আঠা, মার্বেল পেপাব, লেসেব টুকবো, ভীষণ ব্যস্ততা ঘবময়—ট্রাউজার্স আব জাকেট ছাড়া সব এসে গেছে। এক ঘণ্টায় ফিটিং হবাব কথা ছিল। কিন্তু ববি কষ্ট কবে তুলতে যেতে পারেনি বলে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

ওই ট্রে দুটো লাস্ট মোমেন্টের জন্যে থাকবে। “লাস্ট মোমেন্ট” ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি এ-বাড়িতে। তত্ত্ব সাজানো চলছে।

একডালা ফল-মেওয়া যাবে—ছোট ছোট বস্তিন চুপড়ি এসেছে। ডালাতে সাজানো হবে সুশ্রী পাঁচবকম ফলের চুপড়ি—আব একথোলা মেওয়া। বাদাম পেস্টা কিসমিস আব সঙ্গে ছেলের (মেয়েবও) প্রিয় খাদ্য, চকোলেট। এটাও বাবা এনেছেন বিলেত থেকে।

হঠাৎ বডমাসি চৈঁচিয়ে ওঠেন, “শমি!—ছ’টা ট্রেব জন্যে বাট কবে ছ’টা কবিতা লিখে দে তো ভাই? ছেলের বাড়ি থেকে যতো যাই সাজাক. কবিতা তো লিখে দিতে পাববে না? আমবা কবিতা সাজিয়ে দেবো তত্ত্বে”—বলতে বলতে হঠাৎ এই আবিষ্কারে বডমাসিব স্ববেই প্রকাণ্ড রকম গৌবব বৃদ্ধি পায়। নাঃ. এখানে ববপক্ষ জিততে পারবে না। যত যাই দিক। তত্ত্বে নানাবকম কাবুকলা হয়। আজকাল তো তত্ত্ব সাজানোব প্রফেশনাল আর্টিস্ট ভাড়া পাওয়া যায়। আগে মা মাসি ঠানদিবা তত্ত্ব সাজাতে এক্সপার্ট ছিলেন। এখন সবই স্পেশালাইজেশনের যুগ। তবে হ্যাঁ বডমাসিকে একজন এক্সপার্টই বলা যায়। লোকে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি তত্ত্ব সাজাতে। কবিতা দিয়ে তত্ত্ব সাজানো কি সোজা মাথায় আসে? সঙ্গে সঙ্গে কাগজকলম নিয়ে ওবই মধ্যে মহোৎসাহে শমিতা বসে যায়। —“কবিতা হবে না, তবে ছ’টা ছড়া হতে পাবে, বড়দি”—“ওই হলো”—বডমাসিব ওতেই কাজ চলে যাবে।

খুশি মনে শমিতা কলম কামড়ায়, বডমাসি কাঁচি চালান। কানাই আবেকবাব চা দিয়ে চলে যায়—

—“দিদি, কেটাবার এসেছে।”

—“ওই তো বললুম—”

—“কোস্ট ড্রিংক কাবা সাপ্লাই দেবে? ওবা না আমবা?”

—“আমবা! আমবা! কল্যাণ চাকবি কবে তো থামস আপেই—অনেক সন্তায় পাচ্ছে সে—”

—“ওকে বলে দে, আমবা! আমবা!” লোক মাবফৎ নিচে প্রতিধ্বনি চলে গেল কেটাবাবের কানে,—“আমবা! আমবা!”

—“দিদি, কেটাবার জিজ্ঞেস কবছে—পানের ব্যবস্থা কবেছেন তো? লিস্টে পান লেখা আছে। কিন্তু সেটা ওবা নাকি সাপ্লাই দেয় না। মিষ্টিও যেমন দেয় না।”

—“দেয় না বৃষ্টি? সবেবানাশ। শিগগিব ছুটে যা. চিন্তামণিব দোকানে বলে আয়।” শমিতা সমাধান দেয়।

“চিন্তামণি পাববে। ওই যে আমার জন্যে যেমন পান করে, মিঠেপাতা, এলাচ, সুপুবি, চমনবাহাব—তাই করুক না? পানে গুচ্ছেব জ্যাম-জেলি দিতে হবে না। তিনশ পান বলে দে। ঠোঙা দেয় যেন। আব কিছু দেবে পানে?”

—“ছানা দিতে পাবে।”

পাত্ৰেব কাকা সেখানেই দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধৰাচ্ছেন।

—“খুব হেলথ ফুড ফ্যাড হয়েছ। আজকাল পানে ছানাটা খুব চলছে দিল্লি বন্ধেতে। পান-পনীৰ।”

—“পান-পনীৰ? সে আৰাব কেমন খেতে?”

—“গ্ৰাণ্ড। হেলথ ফুড স্টোৰে তো পাওয়া যায়। খাননি?”—এৰাব পাত্ৰেব কাকাৰ মুখেব দিকে সন্দিক্ৰ চোখে তাকিয়ে থাকেন বডমাসি। “পান-পনীৰ? না বাবা, সেসব আমবা খাইনি।”

—“সে কি কলকাতায় চলবে? তাব চেয়ে আমাব মনে হয় ওই গিঠে পানই ভালো। পান-পনীৰ থাক।” ছুড়া লিখতে মগ্ন শমিতাব এতক্ষণে টনক নড়ে।

—“পান-পনীৰ? কে? কে বলেছে কথাটা? কাব মগজে জন্মেছে? ওঃ আপনি? তাই বলুন। তত্তে লাইসিল ঢুকিয়েও হয়নি, আপনি এখন পানটা ধবংস কবতে এসেছেন। সত্যি মিস্টাব মুখার্জি, কেন যে আমাব দুবুদ্ধিটা হলো একসঙ্গে উৎসব কবাব? শিবু, তোকেও বলিহাবি—পানে ছানা কেউ দেয়? তুইই বা শুনছিস কেন ওব বাজে কথা—যতো কুবুদ্ধি দুটুবুদ্ধি নষ্টবুদ্ধি।”

ছেলেব কাকা টবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদুমদু হাসে। হাসি দেখেই শমিতা বাণে ফেটে “ও, আপনিই? আপনি এখানে কি কবছেন? এখানে আপনাব কি দবকাব? যান বাড়ি যান। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কবুন।”

—“ঐ যে, কোটাৰাব। তাবপব আসবে ডেকবেটব। ইলেকট্রিকেব লোক। আপনাকেই তো সবাইকে আটেঙ কবতে হবে। তাই এলাম। আপনাকে হেলপ কবছি। দাদা পাঠিয়ে দিলেন।”

—“হেলপ কবছি? এব নাম হেলপ? এক্সুনি শিবু পানে ছানা অর্ডাব দিয়ে দিচ্ছিল। এটা কি ইয়ার্কি মাৰাব সময়? আচ্ছা মানুশ মশাই আপনি।”

—“মেয়েব বিয়েতে অমন একটু আধটু হয়েই থাকে।”

—“বিযেটা কি কেবল আমাব মেয়েব? আঁা?”

—“নো, নো, অফ কোর্স নট। বিযে আপনাব মেয়েব, আব আপনাব জামাইয়েব।”

—“আব আপনাব তবে কে? আপনাদেব কিছু নয়?”

—“নিশ্চয়ই! আমবা তো খেতে আসবো। নইলে খাবেটা কে?”

—“তবে তাই আসবেন। এখন বাড়ি যান দিকিনি? উঃ”—

—“দাদা বলেছেন, যাও, মিসেস দাশগুপ্তকে”—

—“হেলপ কবো। উঃ—যেমন দাদা”—

—“ঐ যে দাদা নিজেই এসে গেছেন।”

—“এই যে। এই যে। মিস্টাব মুখার্জি কী একখানি ভাইকেই পাঠিয়েছেন—”

—“করেছে? করে ফেলেছে? ওয়াওবফুল!”

—“কি করবে? করবেটা কী?”

—“ঐ যে ডেকরেটোরদের সঙ্গে গিয়ে দেখবে কোথায় কী হচ্ছে—ক’টা টেবিল, ক’টা চেয়ার গুনে নেবে—সি ই এস সি’র মিটারটা”—

—“মুণ্ড করবেছন। এখানে বসে বসে সব গোলমাল পাকাচ্ছেন—” ছেলের কাকা মিটিমিটি হাসেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হয় না তাঁকে।

—“কী বে শমি? কদ্দূর এগোলো?”

যাক শমিতার বড় জা তাহলে এসে পড়েছেন। শরীষটা ভালো ছিল না, উনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারবেন কি না বর্ধমান থেকে, তাবই ঠিক ছিল না। শমিতার আনন্দ ধবে না।

—“এসেছো? দিদিভাই? এসো এসো—এই যে এঁবাই হলেন আমাদের নতুন কুটুম—এই যে, ইনি আমার ভাসুর, আব ইনি আমার খুড় ভাসুর”—আহ্লাদে ডগমগ শমিতা উথলে ওঠে। কিন্তু বড় জা স্তম্ভিত হয়ে যান। তাবপব বলেন:

—“কী বললি? তোর—ভাসুর?”

—“স্যবি, শ্বশুর।” শমিতা কি একটু ঘাবড়ে যায়?

—“তোর শ্বশুর? শমি?”

—“না, না, মানে, আমাদের জামায়ের।”

—“তোব জামায়েব শ্বশুর? ওঃ বুঝছি। চল দিকিনি, ওপরে চল। তোব বোধহয় ঘুমটুম হচ্ছে না ঠিকমতন।”

অগত্যা রবিই এগোয়।

—“অদূর ভবিষ্যতে পুপসিব শ্বশুর হবো এমন একটা চান্স আছে। আপনি?”

—“নমস্কাব, বেয়াইমশাই। আমি পুপূর জ্যাঠাইমা। আর আপনি?”

টবি এতক্ষণ চপচাপ লক্ষ্মীছেলের মতো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার কথা বলতে পেয়ে বেঁচে যায়। গভীর মুখে টবি বলল—

—“ঐ যে শুনলেন? খুড়-ভাসুর? আমি হচ্ছি একজন খুড়-ভাসুর।”

—“খুড়-ভাসুর আবাব কী? জন্মে শুনিনি এসব শব্দ।” ছোকবাকে এক ধমক লাগান জ্যাঠাইমা। “কার খুড়-ভাসুর আপনি?”

—“লজিক্যালি ঠিকই আছে। আমি যদি কারুর ভাসুর হই, তবে আমার ছোটভাই খুড় ভাসুর হতেই পাবে। তাই না?”

ববি আন্তরিকভাবেই সাহায্য করার চেষ্টা করে।

—“ওটা খুড়শ্বশুর হব”—সামলে নিয়ে শমিতা এতক্ষণে প্রুফ কারেক্ট কবে দেয়।

—“পুপসিব হবু খুড়শ্বশুর?” বড় জার মাথা ডিটেলে খুবই পরিস্কার।—“তাই বল।”



—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“তা, ওঁদের জলটল কিছু দিয়েছিস? বসুন আপনারা। বৈঠকখানা ঘরে—”

—“না না, ওবাও যে হোস্ট—দিদি, জয়েন্ট সেলিব্রেশন হচ্ছে না? এনগেজমেন্ট-কাম-আশীর্বাদ, দুই পক্ষ একসঙ্গে জয়েন্টলি, মনে নেই?” শমিতা বাগ্গ হয়ে মনে কবিয়ে দেয়। “সব খবচে হাফ আনড হাফ।”

—“খুব মনে আছে। কিন্তু এই বাড়িটা কার? ওঁদের? না তোমার? না হাফ এ্যাণ্ড হাফ? এখন ওঁবা তোমার বাড়িতে এসেছেন। তুমি ওঁদের বসাও। কুটুম বলে কথা! শববৎ টরবৎ দাও। চিবদিনেব পাগলি বয়ে গেলি? মেয়েব বিয়ে দিতে চললি—তবু বুদ্ধিটা পাকল না।”

—“বসাবেন কী। এতক্ষণ ঝগড়া কবছেন”—‘খুড ভাসুর’ কমপ্লেন কবেন চটপট।

—“ঝগড়া কববো না? উনি এক্সুনি ছানা দিয়ে পান সাজাতে অর্ডার দিচ্ছিলেন দিদিভাই—জ্বালিয়ে মা বলেন উনি আমাকে—কেবল খ্যাপাচ্ছে—”

—“ভালই হয়েছে। তোব একটা বেয়াই-কাম-দ্যাওব জুটলো—ওটাব তো অভাব ছিল—”

### চতুর্থ অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

ট্রে সাজানো প্রায় কমপ্লিট। চমৎকাব দেখাচ্ছে। শমিতা নিজেব ছড়া পড়ে নিজেই মোহিত। বডদিব এই আইডিয়াটা দারুণ কিন্তু। এবাব চান কবতে পাঠাতে হবে একজন একজন করে। দুটো বাজে।

—“দিদি, নিচে আপনার কাছে লোক এসেছে”।

—“কিসের লোক?” বলতে বলতে শমিতা নিচে নামতে থাকে। জিজ্ঞেস করাব চেয়ে গিয়ে দেখতে সময় কম লাগে। ঝোলাঝুলি নিয়ে একটা দাড়িওলা ছোকবা। বাঁচা গেল। এসে গেছে।

—“ওঃ, আপনি? আপনি তো ইলেকট্রিশিয়ান। তা, ‘এত দেবি যে? চলুন, চলুন, আরো দুটো ফ্লাডলাইট লাগবে। ওই মড়ার-মতন-দেখানো-শাদা জোবালো আলোগুলো আমার দ’ চক্ষের বিষ। হাজার ওয়াটেব ঐ একটার বদলে ঘবে দুটো পাঁচশোর—”

“আজ্ঞে, আমি ‘নন্দিনী’ পত্রিকা থেকে এসেছিলাম। ঐ যে ইন্টারভিউ নিয়ে গেছে পরশু? আমি ওরই ফোটোগ্রাফার।” শমিতা ঘাবডায় না। সময় বড্ড কম।

—“ওঃ ফটোগ্রাফ? নিন। নিয়ে নিন।”

—“আপনি একটু তৈরি হবেন না?”

—“তৈবি? তৈবির কী আছে? দেখছেন তো আমার মরবার সময় নেই।”

—“আপনার চুলটা—”

—“ওতেই হবে।” (শমিতা কি ফিল্মস্টার?)

—“কাপড়টা একটু গুছিয়ে—”

—“হাফ। হাফ ছবি নিন।” (শমিতা প্রাকটিক্যাল।)

—“আপনার হাতে কি ওটা থাকবে?”

শমিতা এবাব তাকায়। হাতে? ওঃ! তত্ত্বে সাজানোর জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। দু’ পাটি মস্ত মস্ত সোয়েডের বৃটজুতো খুব যত্ন কবে শমিতা দু’হাতে বুকেব কাছে জড়িয়ে ধবে আছে। তাব ভেতবে একটা বাংতাব লাঠিতে একটা মিকিমাউসেব মুণ্ডু আঁকা কাগজেব টুপি। সেই টুপিতে পালকেব মতো একটা ছড়া গোঁজা মিকিমাউসেব গোলগাল কান ফ্যানেব বাতাসে পতপত কবে নডছে। অত্যন্ত কৃত্রিম বিনয়েব মুখ কবে তরুণ ফোটোগ্রাফারটি হাসি চেপে দাঁড়িয়ে ক্যামেবা তাক কবছে।

শমিতা হেসে ফ্যালে। জুতোজোড়া টেবিলে নামিয়ে, দু’হাতে খোঁপাটা ভেঙে আবাব জড়িয়ে নেয। শাড়িটাকে গুছিয়ে ভদ্রভাবে টেনে নেয় গায়ে। “ক্লিক”। “ক্লিক”। “ক্লিক।”—থ্যাংকিউ।—অসময়ে বিবল্ল কবলাম বলে খুবই দুঃখিত।” বলে ছেলোটো ক্যামেবা গুছোতে থাকে।

—“না না তাতে কী”—বলতে বলতে শমিতা দৌড়ে ওপবে উঠে যায়। ট্রেতে জুতোটা নামানো মাত্রই কানাই ডাকতে আসে।

### চতুর্থ অঙ্ক: চতুর্থ দৃশ্য

“দিদি, নিচে আবাব লোক।”

—“আবাব কে এল? এবাব ঠিক ইলেকট্রিকেব”—

—“না, ইলেকট্রিকেব নয়। নাম বলছে না, বলছে চেনালোক নয়। এক মিনিট কথা আছে।”

“উঃ! তাকে বলে দিতে পাবলি না, আজ সময় নেই?” শমিতা ফুঁসতে ফুঁসতে নিচে নামে।

—“শমিতা দেবী আমি আপনার লেখাব”—

—“থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। মাপ কববেন আজকে আমার একেবারে সময় নেই—”

—“আমি আপনাকে গত বারো বছর ধবে”—

—“অনেক ধন্যবাদ। আমার মেয়েব কালকে আশীর্বাদ, বুঝলেন? একদম সময় নেই”—

—“চিঠিপত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমার নাম সুশান্ত বায়।”

শমিতা চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ। অজস্র চিঠি লেখে। কী উপায়ে পালাবে সে? এত, এতবছর বাদে কিনা আজই? হায় বে।

—“দেখুন, আজ আমি বড়ই বিব্রত, বুঝলেন? আপনি আবেকদিন আসুন—আজ আমার একদমই—”

—“সময় নেই? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার একটা ঘড়ির খুব দরকাব। আপনাকে একটা কিছু উপহাব দিতে আমার বড় ইচ্ছে, আপনাকে চিঠিতে তো জানিয়েছি আগেই—এখন মনে হচ্ছে একটা ঘড়ি—”

—“না না, আমার কিছু চাই না। কিছু উপহাব চাই না আমার”—শমিতা অসহায় বোধ কবে। এমন সময়ে ক্রুদ্ধ শিবুমামাব অবির্ভাব।

—“এই যে, এসে গেছেন দেখছি। এখন ক’টা বাজে জানেন?”

—“কথাব দরকার নেই। কাজেব কথা বলুন। আপনি তো ফুলেব লোক? তবে শুনুন ফুল যা বলেছিলাম, তাব চেয়ে মনে হচ্ছে কিছু বেশিই—”

—“আমি যদিও ঠিক ফুলেব লোক নই তবে ফুলেব লোক হতেই পাবি। এখন আমি আপনাদেব ঘড়িব লোক। আচ্ছা আপনাদেব ঘড়ি কত লাগবে?”

শিবুমামাকে বিভ্রান্ত দেখায়।

—“ফুলেব লোক নন? স্যাবি। ভেবি স্যাবি। কিন্তু ঘড়িব লোক মানে কী?”

—“শিবু, শিবু, তুই ওপবে যা ভাই, ঘড়িব ব্যাপাব তুই বুঝবি না।” শমিতা আতর্নাদ করে ওঠে। “একদম সময় নেই।”

—“না বোঝাবার কী আছে?” শিবুমামা বলেন।

—“ঘড়িব সেলসম্যান তো? জামাইয়েব জন্যে আমাদের ঘড়ি কেনা হয়ে গেছে ভাই। থ্যাংকিউ, আব লাগবে না।”

—“নাঃ, আমি তাও নই। বং গেস। টাই আগেন।” সুশান্ত বায়েব চোখ মিটিমিটি হাস্য কবে। কিন্তু শিবুমামাব হাসি পায় না।

—“তবে আপনি কি কবেন? জীবিকা নির্বাহেব জন্য? এখানে ঘড়ি-ঘড়ি কচ্ছেন কেন?”

—“আমি ইঞ্জিনিয়াব। সবকাবি চাকবি কবি। আপনি কী কবেন জীবিকা নির্বাহেব জন্য? ফুলেব লোকেব পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া।” সুশান্তব অমায়িক প্রশ্নে শিবুমামা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

—“দেখুন ভালো চান তো কেটে পড়ুন, দিদিব এখন ঠাট্টা ইয়ার্কিব সময় নেই—”

—“সময় নিয়েই তো কথা হচ্ছিল। ঘড়িব প্রসঙ্গ তাই উঠেছে। কাল আশীর্বাদটা ক’টার সময়?”

—“তাতে আপনার কী মশাই?”

শমিতা তাতাতাড়ি মধ্যস্থতা করে—

—“আশীর্বাদ সন্ধেবেলাতে—কিন্তু এখানে হচ্ছে না”—

—“তবে আমি আজই কোনো সময়ে এসে দিদির ঘড়িটা দিয়ে যাবো—”

—“ঘড়ির কোনো দরকার নেই ভাই”—

—“আপনার সময়ের প্রচণ্ড অভাব, ঘড়ি দরকার”—।

—“ঘড়ি? দিদির ঘড়ির অভাব? ক’টা ঘড়ি চাই? ওঃ ঘড়ি-ঘড়ি করে তখন থেকে...”

—“কে আপনাকে ঘড়ি দিতে বলেছে মশাই?” এমন সময়ে অফিসফেবৎ দীপুমামাব অবির্ভাব। হাতে সিগারেট, ঠোঁটে শিস। কাঁধে ঝোলা। চোখে চশমা।

—“ঘড়ি? কাব ঘড়ি? কে কাকে ঘড়ি দিচ্ছে শিবুদা? আমাব ঘড়িটা যে সেদিন কোথায় হারিয়ে ফেললাম। একটা ঘড়ি আমাব খুব দরকার। ও. এই যে! আপনিই বুঝি ঘড়ি দিচ্ছেন? তা বেশ, দিন দিন, আমাকেই দিন।” হাত বাড়িয়ে দেয় দীপু—সঙ্গে সঙ্গেই সুব করে গান ধবে “ঘড়ি ঘড়ি মেরা দিল ধড় কে, কিঁউ ধড কে, কায ধড়কে”...গানটা শুনে সুশান্তর মুখের চেহারা পালটে যায়। শমিতা ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে। সুশান্ত বলে—“বাঃ, এই তো চাই। সাবাজীবন আমি আপনাকেই খুঁজছি।”

এইবার দীপুর মুখে সন্দেহ জাগে।

—“আমাকে? না মশাই না। ভুল আড্ডেসে এসেছেন। সে নহি নহি। গে নহি নহি।”

—“গে হবাব কী দরকার মশাই? পাগল তো বটেন? পাগলের সঙ্গে পাগলের যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পূর্ণচাঁদের মায়ায়, আর মছার নেশায় সম্ভব”—

—“মছয়া? মছয়া বললেন?” দীপু সচকিত হয়ে বলে।

—“কানাই। ও কানাই, দু’কাপ চা। চলুন মশাই বারান্দায় চলুন। এখানে কথা হবে না।” শিবুমামা গজগজ করতে কবতে নিচে যান—।

—“যত পাগল জুটেছে। বলে—‘ঘড়ি নেবেন, ঘড়ি?’ ওঃ বন্ধে কবো”— অন্য ফুলের লোক ধরতে হবে। শিবুমামা ছোটেন। কাণ্ডকাবখানা যা হচ্ছে. বলাব নয়। তায ছেলের কাকাটি আর এক বিচ্ছু। দিচ্ছিল সব গড়বড করে।

—“এই প্যাকেটটা আবার কী? এটা কাব প্যাকেট?” বড়মাসি চেষ্টাচ্ছেন।

—“ওটা একটা লোক এসে দিয়ে গেল। বলল দিদিকে দিয়ে দিতে।” বিন্দু বলে।

—“কে লোক? কী আছে এতে?”

—“ঘড়ি।” কানাই উত্তব দেয়।

“লোকটা বলে গেছে এতে দুটো ঘড়ি আছে। দুটোই দিদির জন্যে। এক এক সময় এক একটা পববেন। খেয়ালখুশি মতন।”

—“দুটোই পুপসিকে?” বড়মাসি একটু বিভ্রান্ত।

—“না না, দিদিমণিকে।” বিন্দু কাবেষ্ট কবে দেয়—“পুপদিদিব মাকে দিয়েছে।”

—“কিন্তু আশীর্বাদ তো পুপসিব।”

—“আশীর্বাদের সঙ্গে যোগ নেই। লোকটা বলে গেল, দিদি নাকি অনেক তুচ্ছতাক জানেন। ওর অনেক উপকাব করেছেন। তাই। কৃতজ্ঞতা জানাতে।”

—“তুচ্ছতাক জানে? আমাদের শমি? তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে? হায় কপাল! কই, কী ঘড়ি? দেখি?” নির্দয় হাতে বড়মাসি প্যাকেট খুলে ফ্যালেন। দুটিই টাইটান। গ্যাবাটির কাগজপত্রব সমেত। হাজার দেডেক মতো লেগেছে দুটো মিলিয়ে। তিনটি চিঠি আছে ভিতরে। একটা দীপুমামাকে। ঝাড়গ্রামেব কোয়াটােবের ম্যাপ ট্যাপ সমেত নেমজ্ঞ। যে কোন শুক্রপক্ষে। আরেকটা পুপসিকে। আশীর্বাদ। আরেকটা শমিতাকে। তুচ্ছতাকের জন্যে ধন্যবাদ। দুটো ঘড়িই তাব একাব জন্যে। বাজেটে যেহেতু দুটোই কুলোলো, তাই। বড়মাসি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

—“যন্তো উন্মাদ পাগলেব কাণ্ডকাবখানা। এখন শমি এই ঘড়ি নিয়ে কী কববে?”

শমিতা এসে ঘড়ি দেখে প্রায় কেঁদে ফেললে। “ছি ছি! এখন আমি কী যে কবি? এ-পাগলা যে সত্যি সত্যিই ক্ষাপা বড়দি? পরে দীপুর ঐ ম্যাপটা দেখে দেখে ঝাড়গ্রামে গিয়ে ঘড়ি ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। খবর্দাব পুপ, ও-ঘড়িতে তোমবা হাত দেবে না। ওগুলো কিন্তু আমাদের নয়।”

দুটো ঘড়ির একটা ছেলেদেব, একটা মেয়েদেব। শিবুমামা বললেন, “আশীর্বাদে একটা ববিকে, একটা পুপকে দিয়ে দাও, চুকে যাক ল্যাঠা। ওর বোধহয় সেটাই মনেব ইচ্ছে। নইলে দুটো দিল কেন?”

বড়মাসি বললেন, “সেই যদি ইচ্ছে হবে তাহলে সেইটে বললেই পাবতো? শমিকে দিলে কেন?” দীপুমামা এসে ঘড়ি দেখে নির্বাক। তারপব বললে—“একটা তুমি রেখে দাও দিদি। দুটোই ফেবৎ দিও না। দুঃখ পাবেন ভদ্রবলোক।”

—“অন্যটা আমাকে দিয়ে দাও—এই তো বলছি?” বড়মাসি টিপ্পনি কাটেন।

—“নাঃ। তা বলিনি। অন্যটা ওকে ফিবিযেই দিতে হবে। সত্যিকারেব পাগল। হাঁ, কতরকমই মানুষ আছে পৃথিবীতে।” তাবপবেই গেয়ে ওঠে—“হায় দিল—মুশকিল—জীনা য়ঁহা—ওরে কানাই বে, এককাপ চা করবি বাবা?” চাটি ফটফট কবে দীপু রান্নাঘরে চলে যায়, সম্ভবত দেশলাই চুরিব অসৎ উদ্দেশ্যে।

শমিতা যেন একটা ষোরেব মধ্যে আছে। তাবই ভেতর খেয়াল কবে ঘড়িদুটোকে আলমারিতে তুলে রাখে। তারপরেই ছোট্টে—“ওবে? কুলপির জন্যে ববফ আনা

হয়েছে? বাবু? বাবু ফিবেছে মিষ্টি নিয়ে? ও যখন তেওয়ারীতে কুলপি আনতে যাবে, তখনই তোবা কেউ বরফটা আনিয়ে রাখবি।”

### পঞ্চম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

গাড়ি থেকে পুপসি নামলো যখন, চেনা যাচ্ছে না। শাড়িতে গয়নায চন্দনে কুমকোয় কমপ্লিট কনে। না, কোনো দোকানে কনে সাজান্ধে মেয়েকে নিয়ে যায়নি শমিতা। মায়ে-মাসিতে-জৈঠিতে মিলেই যা পেবেছে সাজিয়েছে। দোকানে কনে সাজানো ওব ভালো লাগে না। একবার শমিব এক বন্ধুব ভায়েব বিয়েব দিনে, দল বেঁধে ‘কববী’-তে চুল বাঁধতে গিয়ে ভাবী কনেব সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেও চুল বাঁধতে গেছে। ঝুটি-কবে-চুল-বাঁধা সেই অপ্রস্তুত কনেকে দেখে আবধি শমি ঠিক কবেছিল—নেভাব। —পুপসি নামতেই হলুধবনি, শাঁখ বাজলো। মেয়ে আসতে একটু বিলম্ব হয়েছে। ছেলের বাড়িব পুরুতমশাই ছেলের আশীর্বাদ শুরু কবে দিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। ধৃতিপাজ্জাবিতে শোভিত ববিকে চেনা যায় না। ছেলের বাবা মা কাকা মামা সবাই উপস্থিত। মেয়েব বাবাও অলবেডি প্রেজেন্ট। কিন্তু মেয়ের বাবা রাজি হননি। বাজি হননি কেননা আশীর্বাদে কনেব পিতাব ‘জেশচাব’টাই যে কবা হবে না তাঁব। ঘড়ি বোতাম কিছুই তো ওখানে নেই। সব মেয়ের মাব সঙ্গে আসবে। পুরুত বললেন মস্ত্রের সঙ্গে ধানদুব্বি যথেষ্ট। মেয়ের বাবা বললেন, যেহেতু উনি মস্ত্র পডবেন না, ধানদুব্বো তাই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া মেয়ের মা-ই উপস্থিত নেই। এত খেটেখুটে সব ব্যবস্থা সে কবেছে, সে থাকবে না।?

—“কিন্তু লগ্ন যে পেরিয়ে যাচ্ছে?”

—“ধুবোব লগ্নেব নিকুচি কবেছে—”

উদ্বিগ্ন ছেলের বাবাব কানে কানে মেয়ের বডমামু বলেন—“একটি কথাব দ্বিধা থবোথবো চুড়ে/ ভব কবেছিলো সাতটি অমবাবতী/ একটি নিমেষ দাঁড়ালো অল জুড়ে/ থামিলো কালের চিবচঞ্চল গতি।” এসব লগ্ন কদাচ পার হয়ে যায় না মশাই, ওদের আগে আসতে দিন। একা একা কি এনগেজমেন্ট জমে?”

—“মণিকাক্ষনযোগ পেরিয়ে যাচ্ছে—অমৃতযোগ অবিশ্যি আছে কিছুক্ষণ” —বাস্ত হয়ে পুরুতমশাই জানান।

—“অমৃতই তো আসল মশাই, মৈত্রেয়ীর কথাটা মনে করুন না? মণিতেই বা কী হবে আব কাক্ষনেই বা কী হবে। যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য়াম? মণি, কাক্ষন এসব তো বাহ্য”—ভুল সুধীন্দ্রনাথ থেকে অন্তর্দ্বা উপনিষদে চলে যান বডমামু, আর কজিব ঘড়িব দিকে গোপনে বাস্ত দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে হলুধবনি। শঙ্খধবনি।

ছেলেব বাবা-মা-কাকা-মামাদের আশীর্বাদ প্রথমে হলো।। নির্বিল্লই হলো। কাকা

কোনো গুণগোল কবেনি। কেবল ববি মেয়ের হাতে গয়নাটা পবাতে পাবেনি, বন্দনাব সাহায্য লেগেছে। এবাব মেয়েব বাড়িব পালা। মেয়েব বাবা বললেন মন্ত্ৰ তিনি পডবেন না, তবে বাবা হিসেবে একটা আশীৰ্বাদী জেশচাব কবতে চান ঘডিটা ছেলব হাতে পবিয়ে দিয়ে। শিবতোষ সন্মহে ববিব হাতটি টেনে নিয়ে দেখে, সেখানে আবেকটা ঘডি আছে। ওটা পবে আসাব কথা ছিল না। ভুল করে পবা হয়ে গেছে। তাডাতাডি ঘডিটা খুলে ববি পকেটে ভবে ফ্যালে। ফাঁকা কজ্জিতে কৃতজ্জচিত্তে শিবতোষ ঘডিটা পবিয়ে দেয। ববি প্রণাম কবে। ধানদূৰ্বা দিতে দিতে শিবতোষ খেয়াল কবে ছেলব হাতে water resistant লেবেলটা সের্টে গেছে। সময়মতন ওটা খোলা হয়নি। ওটা ওঠানোব কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সব আলো নিবে গেল। লোডশেডিং। “ভয নেই—জেনাবেটব আছে”—শিবমামাব গলা। “পুপসি, গয়নাব বাক্সগুলো দেখিস”—বডমাসিব গলা।

—“কপোব জিনিসগুলো সামলে”—শমিতাব ভাঙা গলা। হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায় কনে দুই হাত দু’পাশে ছড়িয়ে আপ্রাণ গয়নাব বাক্সগুলো সামলাচ্ছে। বব কপোব দীপদানটা চেপে ধবে আছে। পুরুতমশাই কপোব থালাটা আগলে আছেন। একমুহূর্তে সবাই অট্ট হাসি হেসে ওঠে। দৃশ্য বটে।

এবাব মেয়েব মায়েব পালা। তাঁব কপাল ভালো। Water resistant মার্কামাৰ জামাই ক’জনেব ভাগ্যে জোটে? তিনি বসতেই পুরুতমশাই বললেন, “আপনিও তো মন্ত্ৰ বাদ?” শমিতা বলে—“না। আমি মন্ত্ৰ পডবা।” ঠাকুবমশাই চন্দনে একটা বজনীগন্ধাব বৃত্ত চুবিয়ে ওব হাতে দেন—তিনবাব যে মন্ত্ৰ পডান, তাতে যে আশীৰ্বাদেব কী আছে তা শমিতা বুঝতে পাবে না। “ওঁ সুবাসিত ভব” আবার কেমন ধাবা আশীৰ্বাণী? যাঃ। সেই যে পুপসি বলেছিল তদ্বেব সময়ে ডিওডোব্যান্ট কেনাব কথা, শমিতাব সেইটে মনে পড়ে যায়। শমিতা ধানদূৰ্বা নিয়ে, প্রাণভাবে বাংলায মনে মনে আশীৰ্বাদ কবতে থাকে—“ভালো থেকো বাছাবা, বেঁচে থেকো, শান্তিতে থেকো, আনন্দে থেকো, তোমাদেব এই ভালোবাসা, এই বিশ্বাস, যেন কোনোদিন ফুবোয না।” বলতে বলতে ধানদূৰ্বা বোতামেব বাক্স সবই সে ববিব মাথায় বেখে দেয। পুরুতমশাই বাক্সটা নামিয়ে, খুলে, ছেলব হাতে তুলে দেন।

এবাব মেয়েকে আশীৰ্বাদ। কি জন্মদিনে, কি বিজয়ায, কি পবীক্ষাব সময়, মেয়েই আগে মাকে প্রণাম কবে, তাব উত্তবে মা আশীৰ্বাদ কবেছেন। এবাবেব প্রণালীটা বিপবীত। মেয়ে চপ কবে হাত গুটিয়ে বসে আছে। মাকে আগে আশীৰ্বাদ কবতে হবে। মা পুরুতব দিকে তাকান। মন্ত্ৰেব আশায। মন্ত্ৰ বলে আশীৰ্বাদ কবতে হবে। কিন্তু মন্ত্ৰ? ঠাকুবমশাই চপ কবে আছেন। মেয়েকে আশীৰ্বাদেব কোনো মন্ত্ৰ টন্ত্ৰ বলছেন না। শমিতা হাঁটু গেড়ে বসে। চন্দনেব বাটিতে কড়ে আঙুলটা ডুবোয। মনে মনে ভাবতে থাকে—এবাব কী কবা? আঙুলটা কখন মেয়েব কপালে ঠেকে গেছে। হঠাৎ শোনে মেয়েই মাকে হেলপ কবছে। পুপসি গুনগুনিয়ে মন্ত্ৰ বলে

দিচ্ছে—“মেয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা—” যাবপরনাই কৃতজ্ঞচিত্তে শমিতাও বলতে থাকে: “মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা।” ঠাকুরমশাই হঠাৎ আপত্তি করে ওঠেন—“আরে, আরে ওটা কাঁ বলছেন? ওটা নয়, ওটা নয়, বলুন—”

বাইরে তখন ভরা পূর্ণিমার জোয়ার ডেকেছে। টুনিবান্ডুলো লতায় পাতায় মিষ্টি হাওয়ায় হেলেদুলে বিকিমিকি চোখ টিপে বলছে, “পুসিসোনা ভালো থেকো, ববিবাবু ভালো থেকো”— চবাচরপ্লাবী জ্যোৎস্নায় আল্লাদে ঢলঢল লেকের জলের শামুকগুলো হেসে গলাগলি করে বলছে, “পুপসি, সুখী হও, ববি, সুখী হও”, আর বুদ্ধপূর্ণিমাব পূর্ণিচাঁদ ওদেব ওপবে অজস্র জ্যোছনার ধানদুৰ্বে ছড়াচ্ছে। তার যেটা চিবকালেব ‘জেশচাব’।



বসন্মাস  
ও অন্যান্য গল্প



## স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার

বঙ্গনেব বসনমামাকে দেখেছেন? আমিও দেখিনি। তবে জানি। বঙ্গনকে যে জানে, বঙ্গনেব বসনমামাকেও তাব না জেনে উপায় নেই। বেলগাডিব গার্ড তিনি, ছোট্টো খাট্টো মানুষটি, কালো কোট সাদা পেন্টলুন, বুট-মোজা, নাকের ডগায় নসিয়া আব আগায় নিকেলের চশমা, মাথায় অল্পসল্প চুল, অথবা অল্পসল্প টাক (যে যেদিক থেকে খুশি ভাবতে পাৱেন।) এই বসনমামা বঙ্গনদেব বাড়িতে ভি. এস. পি.; যখনই আসেন, বাড়িটাকে উথাল পাথাল কবে দিয়ে যান। ভি. এস. পি. মানে 'ভেবি স্পেশাল পার্সন'। বঙ্গন অবিশিা নিজেও যদুমদু নয়। সেও একজন ভি. ভি. এস. পি.—কবিতায় সে প্রেমিকাব বর্ণনা লেখে—'টেলিফোনেব মতো কালো'। তাব পায়ে একবাব বোতলফটফটি বোগ হয়েছিল। পায়ে সোডাব বোতল দডি দিয়ে বেঁধে ঘটং ঘটং ঘোৱাতে ঘোৱাতে সে কলেজে এল, মাস্টাবমশাইবা জিজ্ঞেস করতে বলল পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা—বোতলফটফটি অসুখ করেছে। ওটাকে সাবাবাব জনাই 'পায়ে বোতল বেঁধে বেড়াতে হচ্ছে, ও বোগের এটাই একমাত্র টোটকা। সেই শুনে চ্যাটার্জি স্যাব ওকে আবেকটা টোটকা দিয়েছিলেন—সাতদিনেব জন্য লিখিতভাবে সাসপেনড করে। তাতেও এই বোগটা বেশ সাবে দেখা গেল। আব একবাব এদেব বাজপেয়ী স্যারেব ক্লাসে বঙ্গন বাঁ হাত দিয়ে বুক পকেট থেকে ডাল-ভাত বেব কবে গেরাস পাকিয়ে খাচ্ছিল, আব ডান হাতে বিদ্যুৎগতিতে ক্লাস নোট লিখছিল। বাজপেয়ী স্যাব আবে মন দিয়ে ওর ভাত-খাওয়া দেখবেন বলে পুৱো দুমিনিট লেকচার দেওয়া বন্ধ বেখে চুপ করেছিলেন। তখনও অতি-মনোযোগী বঙ্গন বিদ্যুৎবেগে নোট লিখেই গিয়েছিল ডাল-ভাত খেতে খেতে। এই বঙ্গনেব যখন-তখন প্রাণে হঠাৎ ফুটি জাগে। আব জাগলেই সে ঘটং কবে তক্ষুনি বাস্ত্য ঙ্গবাজি খায়। তাব ফলে কোঁকড়া চুলে প্রায় কাগজেব কুচি আমেব খোসা বিডিব টুকরো লেগে গেলেই বঙ্গন তক্ষুনি চটপট উবু হয়ে বসে বাস্ত্য পাৱে হাইড্রান্টেব পবিত্র গঙ্গাজলে 'ওম দেবী সুবেশবী সুবধনী গাঙ্গে' বলে চট করে মাথাটাকে ধুয়ে শুদ্ধ করে ফেলে। পকেটে সিগারেটের পয়সা ফুবিয়ে গেলেই, বঙ্গন জামাটা খুলে উবু হয়ে হেঁটে ফুটপাতের লোকদেব তাড়া কবে ইনিযে বিনিযে ভিক্ষে কবতে থাকে। পনেরো মিনিটেই পয়সাটা উঠে আসে। কেউ কিছু বললে বঙ্গন বলে—

‘নবানাং মাতুলক্রম, জান না ? আমি তো আমার বসনমামাবই নেফিউ।’

যে মাতুলের কল্যাণে বঞ্জনব এহেন গুণপনা, সেই বসনমামা হলেন বঞ্জনব মৃতদাব হাবাণ জ্যাঠাব অতি আদবে ছোটো শালা। বঞ্জনব বাড়িতে তাঁব একটা পার্মানেন্ট ঠাই হয়ে গিয়েছে। কলেজে এসে বঞ্জন যেদিনই বলে ‘আজ বাড়িতে কেলেকাবি কাণ্ড।’ সেদিনই আমবা বুঝে নিই বসনমামা এসেছেন। তাবপব বঞ্জন গল্প শুক করে।

আপনাবা আমাকে দোষ দেবেন না, বসনমামার গল্পগুলো যদি বিশ্বাস না হয়, তো বঞ্জনব দোষ। এসব তো আব আমার গল্প নয়। বঞ্জনব। বসন্তমামা আমাব মামাও নন। বঞ্জনব। তবে ঘটনাগুলো সত্যি এবং সত্য সর্বজনের সম্পত্তি এ অধিকার অবিসংবাদিত। কেবল বসন্তমামা আপনি যেখানেই থাকুন—দয়া কবে এ গল্পটা পড়বেন না। সুখের বিষয়, বঞ্জন এখন কলকাতাতে নেই—ব্যাঙ্গালোবে। নইলে ওকেও বাবণ কবতাম।

একদিন বসন্তমামা এসে বললেন—‘বিবাট এক্সিডেন্ট হইয়া গেল—ট্রেন লইয়া যাইতেছিলাম গোমো। আংগুল কাইটা দুই খান।’ —‘সেকি। সেকি। সেকি।’ বাড়ি শুদ্ধ লোক মুহূর্তে সে ঘবে জড়ো হয়ে গেল—‘দেখি! দেখি!’ বুড়ো আঙুলের গোড়াব কাছটা দেখালেন বসনমামা, হাতের পাতাটি উচিয়ে। সত্যিই স্টিচের দাগ বয়েছে।

‘কী করে হল, কী সর্বনাশ।’

—‘হইল! যেমুন কইব্যা.হয়। জানলাব ধাবে বইয়া আছি, মেইল ট্রেন, কাজ নাই হাতে। চান্দনী বাইত, ফুবফুব কবতাছে বাতাস, চান্দ টান্দ দ্যাখতাছি. কফি-চা খাইতাছি. এটা পোয়েট্রিক্যাল মূড আইয়া গেছে। সাডেনলি আইল ল্যামপোস্ট। মাইবল ধাক্কা! শাটাব পইব্যা গেল হাতেব উপব। বক্ত গঙ্গা বইয়া গেল। দিলাম চেইন টাইন্যা। কিন্তু মেইল ট্রেনেব ড্রাইভাব তো হুডহুডাইয়া গেল চইল্যা সাত মাইল। ড্রাইভাবেব কামবায় সিধা চইল্যা গিয়া কইলাম—স্টপ ইট। থামাও ট্রেন। ব্যাক ইট। কব ব্যাক। খাস আংলো ড্রাইভাব তো, ইংবাজী ছাড়া কিসুই বুঝে না। ওলড ফিংগার লষ্ট। বুড়া আংগুল কাইটা লাইনে পইব্যা গেছে। পিক আপ ফিংগাব। ড্রাইভাব খুব সং লোক—তৎক্ষণাৎ ব্যাক কইবা চইল্যা আসল সাত মাইল. হেই ল্যামপোস্টেব ধাবে। নামলাম লম্ব দিয়া। শালার টর্চে কুলায় না এমুন ঘুরঘুইটা আঁধাব। জ্বলাইলাম লঠন। লাইনেব ধাবে হঠাৎ ড্রাইভাবেই কইল—‘হব বে। হব বে। ফিংগাব ফাউনড। লং লিভ দি ফিংগাব!’ দৌড়াইয়া গিয়া দেখি, বাঃ। লাইনের ধাবে পইব্যা আমার সাধেব বুড়া আংগুল টিক টিক টিক টিক করতাছে। টিক টিক। টিক টিক! য্যান ডাকতেছে। —‘কই আঙ্গুল উঠাও?’

উঠাইলাম আংগুল। লাগাইলাম দৌড়। তিন মাইল দৌড়াইয়া একদম সিধা সদব হসপিটাল। সিঁড়িতে পৌছাইয়াই ‘জয়হিন্দ’ বইল্যা আছড়াইয়া পডলাম ফিট হইয়া। মুঠায় আংগুলডা কিন্তু শব্দ কইরা ধইবাই আছি। এদিকে সিঁড়ি তো বন্ধে ভাইয়া

যায়। য্যান হুদু ফলস। ক্যাবোল হেইডা দেইখ্যাই দুইডা নার্স সেঙ্গলেস হইয়া পডল।

জ্ঞান যখন ফেবল দেখি নার্সবা হক্কেল আমারে ডাকতাছে ‘মিস্টার ফিট’ কইবা। পৈতৃক নামডা তো আব কইতে টাইম পাই নাই। আগেই ফিট হইয়া গেছি।

মবগ্যান সাহেব হইল আমাগো জিলা ডাক্তার। খাস আংলো। দুই টুকবা আংগুল মূহুর্তের মধ্যে জোড়া লাগাইয়া একখান কইর্যা দিল। ওঃ, কী সেই সুই, মেজদি। গুণসূচের লেইগ্যা মোটকা একখান সুই। ফটফট কইবা দিল আংগুল সিলাইয়া। সেই থিক্যা মরগ্যান সাহেব আমারে কী নামে ডাকেন কন তো দেহি? ‘মিস্টার সেপাবেট’। সদব হসপিটালের নার্সবা অহনও আমাবে কয়—‘মিস্টার ফিট’, আব ডাক্তাবে কয়, ‘মিস্টার সেপাবেট’।

এমন সময়ে হাবাণজ্যাটা বললেন, ‘কিন্তু বসন্ত, তোমাব বড়ো আঙুলের পিছনে তো কোন স্টিচের দাগ দেখছি না? পুরোটায তো কই সেলাই পডেনি, পিছন দিকটা তো আন্তুই বয়েছে।’ বসনমামা খুব রাগ-বাগ মুখ কবে বললেন—‘আংগুলটা ছিন্ন হইয়া গ্যালে কি ভাল হইত জামাইবাবু? পুবাটা সিলাইলেই আপনি খুশি হইতেন?’ আংগুলডা আন্তুই আছে দেইখ্যা আপনাব তো গ্লাডই হওয়া উচিত, খুশি হইবেন তা না, উলটাইয়া দোষ ধবতেছেন—‘কই বসন পুবাটা কাইট্যা ফ্যালাও নাই ক্যান?’

মঞ্জুটা বোকা, সবসময়ে গোলমাল কবে। সে বলে ফেলল—‘পুরোটা যদি না কাটলো, তবে ‘মিস্টার সেপাবেট’ নাম দিল কেন তোমাকে সায়েব ডাক্তাব?’ আব সশ্টুটা পাজি। সে বলল—‘তাহলে তুমি সাত মাইল মেলট্রেন ব্যাক কবিযে এনে বেললাইনেব ধাব থেকে কী কুড়িয়েছিলে তখন, বসনমামা? যেটা টিকটিক টিকটিক কবছিল?’ চোখ পাকিয়ে গলায় ভয়াবহ সুব এনে বসনমামা বললেন—‘আবে, য্যায্যা—সশ্টুটার বড্ডই ফুটানি হইছে দেখি? ক্যাবোল বড্ডদেব মুখে মুখে কথা? এক্কাব চটাইয়া বডি-মুণ্ড সেপাবেট কইবা দেমু তোমাব। অকালকুস্মাণ্ড। যাক, মেজদি, শোনেন একটু এইদিকে। বাসায় আমবা কয়জন? আপনি, আমি, সেজদা, জামাইবাবুব কথাডা আলাদা। বঞ্জু, মঞ্জু সশ্টু—মোট ছয়। ছয়জনাব জনো ছয় দ্বিগুণে, বাবো, আব ধবেন জামাইবাবুব জন্য চাব—ষোলোটা। আব সদা-পচা-মেস্ত্রীব জন্যও যদি একটা একটা কইব্যা ধবি—আহা বাতদিন আইস্যা বান্নাধবে বইস্যা থাকে তো—ষোলো প্লাস থ্রী, হইল উল্লিষ্টা। আর ওয়ান ফাউ—বিশ। বাস। না. ষোলো না. মেজদি—বিশ। বিশখান টোটা দ্যান দেহি মেজদি, বিশটা ঘুঘু আইন্যা দিমু। আমাব টিপ তো জানেনই। এক্কেবে সেই বান্নাকীব ব্যাধ—আব বসন্ত এই বটব্যাল। ইণ্ডিয়া নান্নার ফাইভ ছিলাম নাইশ্টিন ফটি সিক্সে। ওয়ালটাব টমসন ছিল ওয়ান, পাতৌদি টু. গোয়ালিয়ব থ্রী, মিস মে ফোব, বসন্ত ফাইভ। দিনকাল গেসে বটে। হঃ। যাক—

টোটা দিবেন বিশটা, ঘুঘু পাইবেন বিশখান। বাস। সিধা হিসাব। অখন থিক্যাই কটি বানাইতে থাকেন। আর গরম মশল্লা আদা পিঁয়াজ পিঁয়িয়া বাইখোন। বিশখান ঘুঘুব গরম মশল্লা। পিঁয়াজ বশুনই প্রায় কিলো দুয়েক লাইগা যাইবো। রঞ্জু-মঞ্জু-

সন্টু। সদা পচা-মেস্তীরে অহনই কিস্যু কইস না। মঞ্জু তুমি মায়েব সাথে লাইগ্যা পড়— মশল্লা পিষিয়া দাও আব আটা মাইখ্যা দাও। সন্টু-রঞ্জু, বড় বড় কয়ডা ব্যাগ ল' দেখি, ব্যাগ লইয়া আমাগো সাথে সাথে আয়। ঘুঘুগুলান ভইব্যা আনবি। মেজদি জামাইবাবুবে ক'ন যাইয়া—বিশখান টোটা, বিশটা ঘুঘু। জামাইবাবু টোটা দিতে এত ভয় কবেন ক্যান কন তো দেখি? এই ঘুঘু মাইরবাব ছরবা দিয়া কি হিউম্যান মাবা যায়? নো, নেভার। স্বয়ং দাবোগা হইয়া গুলিগোলায় এত ভয়ডা কিসেব লেইগ্যা?’

অনেক ঝোলাঝুলিব পবে বঞ্জনের জ্যাঠামশায়েব কাছ থেকে পনেরোটা টোটা পাওয়া গেল। জ্যাঠামশাই বললেন, ‘বিশখানা ঘুঘুব দরকার হবে না। সাতটা পাখি হলেই অনেক হবে। বাকিগুলো থাক একটু।’ বসনমামা কেবল গম্ভীর হয়ে বললেন—‘ও কে।’

‘ফিপটিন টোটাড, ফিপটিন ঘুঘুজ। নো মোব, নো লেস। অ্যাজ ইউ সো, সো ইউ বীপ। আয় চইল্যা বঞ্জু-সন্টু। প্রত্যেকেব দুইটা কইব্যা। জামাইবাবু ইনক্লুডেড। অনলি টু।’ সাড়স্ববে আদা পেঁয়াজ বাটা হতে লাগলো, কটি গড়া হতে লাগলো, বেলাও বাড়তে থাকলো—কটিতে কটিতে বান্নাঘর উপচে পড়লো, ঘুঘু আব আসে না। শেষে দুটো ভাতে-ভাত বেঁধে বেলা তিনটেয় বাড়ির লোকদের খাইয়ে দিলেন মা।

বঞ্জু-সন্টু-বসন্তমামা ফিরলেন, বেলা তখন পড়ে এসেছে। বাড়ির সামনে পাট ক্ষেতেব পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আকাশ লাল। মঞ্জু-বাবা-সদা-মেস্তী-প্রত্যেকেই বাগানে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দাওয়ায় জ্যাঠামশাই, রঞ্জনের মা-বাবা। এমন সময়ে পাটক্ষেতের আলের ওপারে বসন্তমামার শোলাব হাট দেখা গেল।

ক্রমশ পুরো বসন্তমামা, কালো কোট, সাদা পেটলুন, বন্দুকসমেত। ক্লান্ত, গম্ভীর। পিছনে রঞ্জু-সন্টুব হাতে চাবটে পেটফোলা ব্যাগ—ভয়ংকর ফুলে আছে। বাঃ। বাড়িতে ঢুকে বসন্তমামা বিনা বাক্যে সোজা হাত পা ধুতে চলে গেলেন, বন্দুকটা জ্যাঠামশায়েব কোলেব ওপরে আলগোছে নমিয়ে বেখে। মেস্তী-মঞ্জু-সদা-পচা ব্যাগেব ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।—ক'টা? —ক'টা? সাত, দশ? নাকি পনেরোটাই? উত্তবে সন্টু শুধু বলল—মা, খিদে পেয়েছে কিন্ত। খেতে দাও। আব বঞ্জু বলল—উঃ কী কাদা রে বাবা।

দুজনেব পায়েই হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

—এত কাদা কী কবে মাখলি?

—ঝিলেব ধারে ঘবে ঘবে—

—ঝিলেব ধারে ঘুঘু কি রে?

—ঘুঘু না, হাঁস।

—হাঁসও এনেছিস বুঝি? কতগুলো?

—নাঃ। হাঁসগুলো খুব চলাক। ভারি পাজি।

- আব ঘুম ? কটা ঘুম পেলি ?
- ঘুমও নেই। নেই মানে ঘুমই নেই কোথাও।
- চাষীবা বলল এ তল্লাটে ঘুম হয় না।
- ঘুম পাসনি মোটে ?
- ঘুম পাসনি ? সমবেত আৰ্তনাদ হয়।
- কী এনেছিস তাহলে ? তিতিব ? কাদাখোঁচা ?
- পাটপাতা।

পাট-পাতা। পুনৰায় সমবেত আৰ্তনাদ নিৰ্গত হয়।

—ক্যান ? পাইটপাতা শুইন্যা অমন কাতবাইয়া ওঠলা ক্যান ? পাটপাতা কিছু খাবাপ খাবাব ? খাইছস কখনও ? বসন্তমামা হ্যাটকোট খুলে বেখে লুপ্তি পবে এসে বসলেন। শোনে মজদি—এই লইয়া আইলাম পাইটপাতা। চমৎকাৰ কচি কচি টাটকা তাজা পাইটপাতা আনছি, একেবে ‘গাবডেন ফ্রেইশ’ যাবে কয়—এইবাব বাইস্কেন গিয়া—মশল্লা তো সব পেয়াই আছে। এই অকাল কন্নাওঙলাবে একবাব দাখাইয়া দ্যান দেহি পাইটপাতা কী কপ সুখাইদ্য। —আইজকাৰ মেন্ হইল: পাইটপাতাব ঘণ্ট, পাইটপাতাব ডাইল, পাইটশাক ভাজা, পাইটপাতাব ঝোল, পাইটপাতাব ঝাল, পাইটপাতাব ডালনা, পাইটপাতাব বড়া, পাইটপাতাব কালিয়া আব পাইটপাতাব টক —ক্বাস। কমপ্লিট। খাইয়া দাখ ব্যাটাৰা, ফ্ৰেশ ভেজিটেবুলেব স্নাদ কী। ও বস্তু তোৰা তো জন্মেও খাইস নাই। আব মজদিব হাতেব পাইটশাক। আহা স্নৰ্গেব দ্যাবতাৰাও খাইতে নাইয়া আসে।

জ্যাঠামশাই ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন অকস্থলে—তা মজবউমা যতই ভাল বাঁধুন পাঁচবাগ পাটপাতা খেলে কেবল দেবতাবাই স্নৰ্গ থেকে নেমে আসে না —মানুষবাও স্নৰ্গে উঠে যায়। অ্যাজ ইউ সো. সো ইউ বীপ—পনেবোখানা টোটো খসিয়ে তোলা পাটশাক—ও কি হজম কৰা সোজা কথা. মাই ডিয়াব ব্রাদাব-ইন-ল ?

পাটপাতাব ফিষ্ট দেবাব হস্তাখানেকেব মধ্যেই বসন্তমামা হৈ হৈ কবে আবাব এসে পড়লেন। সদব থেকেই প্রবল হাঁক—মেজদি। মেজদা। কই সব ? জামাইবাবু। বঞ্জু-মঞ্জু-সণ্টু। সদা-পচা-মেস্তী। কাৰে আনছি দাখ। মেজদি, দাখেন। কী আনছি আপনেব লেইগ্যা ! হৰিণশিশু। আহা, এতটুকু মা-হাবা শাবক, বনে বনে পথ হাবাইয়া ঘুবতছিল। আমি কইলাম—‘ব, তোবে মায়েব কোলে লইয়া যাই’ ধবেন মেজদি, হৰিণ শাবকেবে কোল দ্যান। মাতৃহীন মৃগশিশু অবোলা প্রাণী। দৃক পাইয়া। সৰ্ববাই ছুটে এসে ঘিবে দাঁড়িয়েছে বসন্তমামাকে।

কই হৰিণশিশু ? কোথায় হৰিণছানা ?

—এই তো।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বসন্তমামা ছোট্ট একটি হৰিণছানা বেব কবেন

—‘জুউলাজিকাল সারভে-ব ফিলডওয়ার্ক পার্টি উডিয়্যার ফরেস্টে যাইয়া বনে বনে হবিণ তাডা কবতছিল। একপাল হরিণকে অন্য বনে তাড়াইয়াই দ্যাখে এই শিশুটা আছে পইব্যা। কী আব কবে? ফালাইয়াও তো যাওন যায় না, আনতছিল সাথে কইবাই। জু-গাবডেনে দিবার লেইগ্যা। আমারই ট্রেইনে! আমি দেইখ্যা কইলাম—আহা মা-হাবা-হবিণশাবক—আমাবে দ্যান, আমাগো মেজদিব প্রাণে বড় দরদ—আর বাসায় বেশ জমিনও আছে। পোলাপানগো খেলাব সাখীও হইবো, শকুন্তলাব মত। লইয়া আসলাম ব্যাগে কইব্যা। সিধা আপনের বাসায়া!’ সবাই অসম্ভব খুশী। হাবাণজ্যাটাও একবাব হাত বলিয়ে গেলেন। মাতৃহীন হবিণশাবককে ভাল না বাসবে এ হেন চামাব কে আছে ভুবনে? কাকীমা বললেন—দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চা, গরুর দুধ খাবে তো? নইলে হবিণের দুধ কোথায়?

—আবে খাইবো খাইবো—ফিডিং বটলে দিবেন, ঈষদুগ্ধ কইর্যা।

—থৈবী বাঘটাও তো খাইত। বাঘে যদি গরুর দুধ খায় হবিণে খাইবো না ক্যান? এই বয়সে বাঘেবও যা, হবিণেবও তাই। দুধেব বেলায়, বোঝলেন মেজদি, বাঘে-হবিণে ফারাক নাই।

—দুধ ছাড়া কিছ—?

—হ’ তাও দিবেন। কচি তুণ, আব পদ্মমধু। কচি কচি তুণ তো বাগিচাতেই পাইবেন, দুর্বা হইলেই ভাল আব পদ্মমধুডা কান্নাবে ভাল হয়। আইছা, আমিই আইন্যা দিমু’খনে। (গ্রামোদ্যোগেও পাওয়া যায় অবইশ্য)। আব যদি পদ্মমধু নাই হয়, তাইলে আসামেব কমলামধুও ভাল। আমাগো নিমেব মধুডাও খাবাপ না। নিম খুব সাস্থকব। মধুডা খাঁটি হইলেই হইল, ক্বাস। কোন ফুলেব মধু হেইডাতে ইনফ্যাক্ট অধিক পাট্রিকুলাব না হইলেও চলে। তবে কচি তুণটা কম্পালসারি। দুধেব সাথে। জন্মদিনে সন্টকে ‘বুক অব অ্যানিম্যালস’ দিযেছেন তার মাসী। তাই সন্ট বলল—এটা কোন জাতেব হরিণ, বসন্তমামা? সন্টুব ইন্টাবেস্টা স্পেশালাইজড।

—ইনডিয়ান স্পটেড ডিযাব। নাম শোনস নাই? চন্দনবিন্দুব মতো ছিট ছিট পিঠ? মাঝিচ যে স্নর্গমৃগ হইছিল না। ছবি দ্যাখছস তো, হেইডা ছিল ইনডিয়ান স্পটেড ডিযাব। এইরাও তাই।

মঞ্জুটা সর্বদা যা করে, তাই কবল—কিন্তু স্পট কই? চন্দনেব ফোঁটাব মতো দেখা যাচ্ছে না তো?

—দ্যাখবা, দ্যাখবা। বড় হইতে দ্যাও? গরু কি শিং লইয়া জন্মায়? পাখি কি পালক লইয়া জন্মায়? তুমি কি ঐ বেণীডা লইয়া জন্মাইছিলি? বড় হইলে হবিণেব স্পট হয়।

বসন্তমামাব ঘঘু না-মাবার লজ্জা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। মাতৃহীন মৃগশিশু নিয়ে মেতে উঠল ছেলেবুড়া সর্ববাই। কচি তুণ, ফিডিং বটলে ঈষদুগ্ধ গরুর দুধ। খাঁটি মধু—সবই যোগাড হয়ে গেল। বাগানে খেলে বেড়ায় ইনডিয়ান স্পটেড ডিয়ার।



আপাতত অবশ্য স্পটলেস। মূক শ্রাণী। দুদিন গেল। সত্ৰ গয়লাব ছেলেটা এসে বলল—এটাকে কবে আনলেন? ‘আঃ আঃ চুক চুক’ বলে হাতের একগোছা খড় এগিয়ে দিল। মঞ্জু ধড়ফড় কবে ছুটে এল—ওকি। ওকি। খড় দিতে নেই, খড় দিতে নেই—

—কেন? দিতে নেই কেন?

—ও তো ইনডিয়ান স্পটেড ডিয়াব, ও কেবল পদ্মামধু দিয়ে কচি তুণ আব কুসুম কুসুম গবম দধ খায়।

—ইনডিয়ান কী হয়?

—স্পটেড ডিয়াব।

—তাব মানে কী?

—তাব মানে হবিণ।

—হ—বি—ণ? — সত্ৰর ছেলে হাঁ হয়ে যায়। তাবপবে বলে—আমি তো ভেবেছি বুঝি—কী আশ্চর্য। হবিণছানাটাকে ঠিক—। আমি তো আগে কখনো হবিণছানা দেখিনি, তাই ভেবেছি বুঝি। এমন সময়ে দেখা গেল মৃগশিশু নিজেই খড়ের আঁটি টেনে নিয়ে খড় খেতে শুরু কবে দিয়েছে। দেখেই মঞ্জু ঝাঁপিয়ে পড়লো তাব ওপবে—

—ছিঃ ছিঃ খায় না। খায় না। অসুখ কববে যে—দাপাদাপিতে হবিণ ছানাব নবম শবীবে বোধ হয় বাখা লেগে গেল। মঞ্জুব তো ওজনটি কম নয়। ছানাটা কঁকিয়ে উঠল—

—বব্যা। —এ্যা। —এ্যা।। আব সত্ৰর ছেলে চেঁচিয়ে উঠল। —হাগলছানা। হাগলছানা। যা ভেবেছি তাই। হবিণ না আবও কিছু।

শুনেই মঞ্জু মর্মবিদাবক এক কান্না জুড়ল—এবং মা-হাবা মৃগশিশু তাকে সাত্বনা দিলো—‘ব্যা-এ্যা-এ্যা,’ ‘ম্যা-আ-অ্যা’—

পবদিন বসন্তমামা এলেন। হাতে মধুব শিশি।

—‘কই, গেলা কই সব? মৃগ শিশুগ্যা কই? মৃগশিশু আইজ আছে কেমন? খাইতাছে কী? এভেবিথিং অলরাইট?’ গোমড়া মূখ বঙ্গন বেবিয়ে এল—তোমাব স্পটলেস স্পটেড ডিয়াবের কথা বলছ? ভালই আছে।

—পদ্মামধু লইয়া আইলাম। খাঁটি কাশ্মীরী মাল। কচি তুণ, ঈষদুষ্য দুগ্ধ—সণ্ট উত্তব দিল—সব, সব খেয়েছে। খড়টডও দিবিা চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে। মধু আব লাগবে না মনে হয়। ইতিমধ্যে মঞ্জু ঝড়ের মতো এসে বলল—

—হবিণছানা, না ছাই। বিচ্ছিরি ব্যা ব্যা করছে—

—কী? কী কইলা? বসন্তমামা মঞ্জুব মতোই মর্মান্ত হন। ধীবে ধীবে হাতের মধুব শিশিটা পকেটে ভবে বাখেন। ওষুধ কিনে ছুটে ছুটে হাসপাতালে এসে বোগীব মৃত্যু সংবাদ পেলে লোককে যেমন দেখায়, তাঁকেও তেমনি দেখাল।

—ব্যা ব্যা করতাকে হবিগশিশু ? মাই গড !! তাবপব মুখে আব বাক্য সবল না তাঁব। নিঃশব্দ কাতব বসন্তমামাকে ঘিরে ক্রমশ রঞ্জু, সস্টু, মঞ্জু, সদা, পচা, মেস্তী, কাকীমা, কাকাবাব, হাবাণ জ্যাঠা—সবাই মিলে মা-হাবা মুগশিশুব এই ব্যাকবণ নিয়ে একসঙ্গে ভযানক বেগে প্রচণ্ড উচ্চ গ্রামের আলোচনা শুরু করে দেন। শুনতে শুনতে, বসন্তমামা হঠাৎ মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিয়ে তাতে জোবে চাঁটি লাগিয়ে ফটাফট টেবিল চাপড়ানোব মত শব্দ করে বললেন—বাস ! বাস ! —ঢাব হইসে। নাউ স্টপ। নো কমপ্লেইনিং। ওকে, হবিগশিশু ভাল না লাগে তো কাইট্যা খাও। ফিনিশড ? মেজদি—আইজ বাতেই বানাইয়া ফ্যালান, শত্রুর শ্যাষ বাখতে নাই। হবিগশিশু হইয়া ব্যা কইবা দিসে। ব্যাটা বেইমান।

## মেহেবুব টেলার্স

(ক্যালকাটা নাইন)

বঞ্জন এসে বলল—‘বাব্বাঃ, যা বিশ্রী কেলেংকারি হতে চলেছিল আজ। উঃ। আবট হলেই থানায় নিয়ে যেত।’

‘কী বে, কী হয়েছে ?’

‘বসনমামাব কাণ্ড। সেই যে গত সপ্তাহে যে কোটের কথা বলেছিলাম না, তাবই জেব মিটল আজ।’

গত সপ্তাহে বঞ্জন বলেছিল বটে একটা কোটের ঘটনা। তাবপব থেকেই খুঁজছিল ক্যালকাটা নাইনটা কোথায়।

‘পেলি না কি ক্যালকাটা নাইন ?’

‘পেলাম না ? ওঃ, সে কী পাওয়া। মেহেবুব টেলার্সও পেয়েছি।’

আমি ববং বঞ্জনেব গল্পটা গোড়া থেকেই বলি। ঠিক ও যেমন কবে বলেছে, তেমনি।

‘বসন্তমামাব গায়ে সেদিন দেখি এক কালো কোট। গার্ডের ইউনিফর্মে রোজ যেমন কোট পবেন প্রায় তেমনিই। কেবল এটার বোতামঘরায়, পকেটে, আব হাতাব মুখে জীবব কাজ কবা। অনেকটা বাজা-বাজডাব মতো, বা ব্যাণ্ডপাটির লোকেদেব মতো। ঢুকেই চোঁচিয়ে উঠলেন।

‘রঞ্জু-মঞ্জু-সস্টু ! কই সব ? দেইখ্যা যা, কো-ট। সদা-পচা-মেস্তী ! আয় এই দিকে, কো-ট !’

সদা-পচার পাশের বাড়ি। ওবা ছিল না, বঞ্জু-মঞ্জু-সস্টু দৌড়ে এলো তিনজনে।  
'কই কোট ? কোট কই ?'

বসনমামা ফ্যাশন মডেলের মত কোমবে দুই হাত বেখে ঘুবে নিলেন গোডালিতে ভর দিয়ে। ঘূর্ণি খামিয়েই ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন কবলেন—

'দ্যাখছস ? দাক্বণ না ? পাক্সা ইংলিশ কোট। গোবা সাহেবের কোট বইল্যা কথা।'

তাৰপৰ কোটেৰ তলাৰ দিকটা দু আঙ্গুলে তুলে বললেন।

—'কাপডখান দ্যাখ একবাব। খাইস বিলাতী টুইড। একেবে ইটাৰ ফিট কবা। কাপনজঙ্ঘাব গায়ে পবাইয়া দিলে কাপনজঙ্ঘা গইল্যা যায়। ছুইয়া দ্যাখ একবাব। হাত লাগাইলেই লগুন বেডাইবাব সুখ হয়।'

আমবা সবাই অমনি একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে একটু কোটটা ছুঁলাম। কম্বলের মতো কুটকুটে। এই নাকি লগুন ?

তাৰপৰ ব্যায়ামবীৰেৰ মতো দুই হাত নিজেৰ দুই কাঁধে বেখে মাসল দেখানোৰ ভঙ্গিতে বললেন।

'পুট দ্যাখ পুট। একেবে পাবফেক্ট।'

ঠিক যেন বলছেন—'দ্যাখ কী বাইসেপস, দ্যাখ কী গুলি দ্যাখ হাতে আমবা।'

'আব সেস্ত ?' বলে ডান হাতটা সামনে দিকে ঘূষি মাঝে ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলেন স্যাং কবে। —'দ্যাখ সেস্ত দ্যাখ।'

আমবা সবাই অমনি একটু পিছিয়ে গেলাম একসঙ্গে। মঞ্জুটা বলে ফেলল —'ওখানে আবাব সেস্ত কোথায় ? সেস্ত তো ঘাড়ে না কাঁধে কোথায় যেন হয়।'

'ওই একই হৈল।' বসনমামা একটু লজ্জা পান বোধ হয়।

'যাঁহা বায়ান্ন তাই হৈল গিয়া তেপান্ন, যাবে কয় হাতা হোই তাবেই কয় সেস্ত। তুই আমাবে টেইলাবিং টার্মস শিখাস ? দুই দিনেৰ বৈবাগী ভাতেবে কয় অন্ন। ওঃ—'

বসনমামা বেগে যাচ্ছেন দেখে মঞ্জু বলে, 'সবি, আব বলব না।'

খুশি হয়ে বসনমামা আবাব শুরু করেন 'কী কইতাসিলাম ? ওঃ হ্যাঁ, সিলাই। সিলাই দ্যাখছস ? সুইসুতাব কামডা কী ফার্স্টক্লাশ ? আব পকেট দ্যাখছস ? পকেট আব বুতামঘব ? একেবে জবিদাব কাশ্মীরী শাল। ফাইন এমব্রয়ডাবি, বোঝলা ? এইয়া সহজ কাম না ! পয়সা লাগে। আব দ্যাখায় কী ? হাইক্লাশ। যান নিজামেব সিপাই।'

কিছুক্ষণ ড্রামাটিক এফেক্টেৰ জন্য চুপ কবে থেকে বসনমামা বলেন—

'এইবাবে ঝুলটা দ্যাখ। পাবফেক্ট ঝুল। জাস্ট আপটু থাই।' হাত দিয়ে টেনে টুনে কোটটা খানিকটা নামান বসনমামা। বলেন—

'ওঃ কী ফিটিং ! যান বাঘের গায়ে বাঘেব চাম। অল পাবফেক্ট।'

আমাদের কিন্তু কেমন কেমন লাগে। মনে হয় একটু ছোটই হয়েছে। হাতদুটোও কেমন খাটো খাটো। খুশিতে ভাসতে ভাসতে বসনমামা কিন্তু এবাব বোতামে চলে যান।

‘বুতাম দ্যাখছস ? বুতাম ? ভাল কইব্যা দেইখ্যা ল’। জার্মানীর বুতাম। চামডাব। হিটলাব যে ইহুদিব চামডা দিয়া বুতাম বানাইত ? সেই স্টাইল। অবশ্যই ইহুদিব চামডাব না। বিক্কাপর্বতের নীল গাইয়েব স্কিন।’

মঞ্জু বলল—‘চামডারই নয় বসনমামা, প্লাস্টিক।’

‘চামডাই না বসনমামা, প্লাস্টিক।’ বসনমামা মঞ্জুকে ভেংচে ওঠেন। ‘তর কানটাও তাইলে প্লাস্টিক ? দেখুম নাকি টাইন্যা ?’

মঞ্জু দুইহাতে কান ঢেকে দূবে পালায়। তৃপ্তি বোধ কবে বসনমামা বলেন—

‘মাইয়াডাব এট্টা ধ্যাও চ্যাও নাই। চামডারে কয় পেলাস্টিক !...’

...এইবার ল্যাপেল দাখ। কতোটা চওড়া। এমন চওড়া ল্যাপেল আইজকাইল কেউ দ্যাখতেই পায়না। হে-ই ফটিথিতে যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ইনডিয়া ভিজিটে আইসিল তখনই ফেশন হইসিল চওড়া ল্যাপেল কোট। অহন এতটা কাপডই বা খরচা কবে কোন শালা ? এই কাটই বা জানে কোন টেইলব ? ... কলাবটা দ্যাখ এইবাব।’

একহাতে কলাবটা উঠু করে ধবে অন্যহাত পকেটে ঢুকিয়ে ঘবের এধার থেকে ওধাৰ স্মার্টলি একবাব মাৰ্চ করে এলেন গুজস্টেপে।

‘রয়্যাল কাট—এই কাটেবে কয় রয়্যাল কাট।’

সন্ট হঠাৎ বলে ফেলল—‘ফটিথিতে প্রিন্স অব ওয়েলস কে ছিল বসনমামা ? ফিফটিথিতে তো দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাণী হলেন ?’ এবং মঞ্জু বলল—‘ফটিথিতে যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ইনডিয়াতে তো কোনো রাজা আসেইনি।’

‘শাটাপ। ফুটানি মাইরলে এক থাবডা দিয়া পিঠ ফাইড়া ফ্যালাইমু। যা বাইবাইয়া যা সব। অপোগণ্ডেব দল। মেজদি ! ক্যাবল আপনেই শোনেন কোটেব কাহিনী।

স্টার্চ-দ্যাওয়া হোয়াইট পেন্টুলুনেব উপব এই কোটখান চড়াইয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া হাতে ফ্ল্যাগটা লইয়া যখন গোমো স্টেশনেব এই মাথা থিক্যা ওই মাথা পর্যন্ত পায়চাবি করুম না মেজদি, পেসেনজাববা কইবো ইওবোপীয়ান গার্ড যাইতাসে বুঝি। সেইসব টাইম তো! অবা দ্যাখেই নাই। অবা আব এই কোটেব মর্ম বুঝবো কী কইব্যা।’

বসনমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিছন ফিবে বসার জন্যে চেযাব টেযাব কিছু খুঁজলেন।

মা বলে ফেললেন—

‘ও বসন্ত, তোমাব কোটেব পিছনে যে ফুটো ?’

‘ওঃ, এটা ? গুলিব ফুটা। গুলিব। এইটা ফ্রিডম ফাইটেব কালেব কোট তো ? ওঃ—মেজদি, কী দিনই গেসে গিয়া। পনপন কইর্যা ছুটতাসি পথে, পিছে পুলিশ লইয়া—শনশন কইর্যা ছুটতাসে গুলিব ঝাঁক—বনবন কইব্যা ঘুইব্যা পড়তাসে মানুষগুলান স্টানস্ট উনডেড হইয়া—আব তাগো বুকের বন্ধে কালা পিচের পথ বাঙ্গা হইয়া যাইতাসে—’

হঠাৎ মঞ্জু বলল ‘লোকেদের পিঠে গুলি লাগলে ‘বুকেব বক্ত’ কেন বলে বসনমামা?’

এই বে। আবার প্রশ্ন! মঞ্জুটাকে বাঁচাতে সন্টু তাদাতাড়ি বলে ওঠে-‘তুই থাম দিকি মঞ্জু। জানিসনা শুনিসনা সবতাতে কথা। আচ্ছা বসনমামা, তোমাব পিঠে যে-গুলিটা লেগেছিল সেইটেব—’

‘আমাব পিঠে গুলি লাগবো ক্যান? ষাইট। গুলি লাগুক গিয়া আমাব শত্রুগো পুটে।’ কিন্তু মঞ্জুকে বক্ষ কববে কোন দাদা। আবার মঞ্জু বলল, ‘কিন্তু তোমাব কোটেব ফুটেটা তো পিঠেব দিকে?’ ওব কথাটায় থাবা মেবে বলে উঠল সন্টু ‘তোমাব কি তবে বুকেই গুলি লেগেছিলো বসনমামা?’

অদমা মঞ্জুকে থামায় কে? মঞ্জু চটপট বলে দেয় উল্টোকথাটা ‘তবে যে তুমি বললে পেছনে পুলিশ নিয়ে তুমি ছুটছিলে? পেছন থেকে বুকে কেমন কবে গুলি লাগবে?’ ভীষণ বেগে গিয়ে বসনমামা জিবে-টাগবায় চুক চুক কবে শব্দ কবে বলে উঠলেন—‘আঃ হা। আমাব বক্ষে গুলি লাগাইয়া তোমাগো কামডা কী শুনি? আমাব দেহে গুলিই বা লাগবো ক্যান? আমি কোথায় কইতাসি চিবস্মবণীয় শহীদ ফ্রীডম ফাইটাবগো কাহিনী, আব তোমাবা কও ক্যাবলই আমাব কথা। আমি কি শহীদ?’

সন্টু চুপ কবে যায়। কিন্তু মঞ্জু চুপ কবে না। ‘কিন্তু কোটেব ওই ফুটেটা’—

‘আঃ। কোটে ফুটা ত’ আমাব কী? তাব কথা আমাবে জিগাও ক্যান? কোটেব ফুটা কোটেব ফুটা।’ বসনমামা বিবক্তমুখে জানলা দিয়ে বাইবে তাকিয়ে থাকেন। এই উত্তবে কাবও মুখে আব কোনো কথা যোগায় না। চমৎকৃত হয়ে চুপ কবে যাই প্রত্যেকে। এমনকি মঞ্জুও। সকলেই মনে মনে একটা যুংসই প্রশ্ন ভাবছি, এই বিচিত্র উত্তবেব মানোটা কী কবে জেনে নেওয়া যায়? এমন সময়ে কখন হাবাণজ্যাঠা ঘবে ঢুকেছেন।

জেঠিমা মাবা গেছেন সেই ক-বে। তাব এই অতিআদবে ছোট ভাইটি জ্যাঠাবও অতি আদবেব! সেই সূত্রেই আমাদেব মামা বসনমামাকে দেখেই খুব খুশি হয়ে হাবাণজ্যাঠা জিগেস কবে বসলেন—‘বাঃ। বেডে জবিদার কোট ত? —কোথায় বানিয়েছ বসন্ত এমন কোটখানা?’

‘এই তো জামাইবাবু ল্যাখাই আছে’—চট কবে হেসে দিয়ে, পিছু ফিবে চেযাববেব মত হয়ে আধো-বসে পড়েন বসনমামা।

কলাবাটা উল্টে ফেলে তলা থেকে একটা লেবেল দেখান। সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ আউডে যান—‘দ্যাখেন, ল্যাবেল দ্যাখেন, মেহবুব টেইলার্স, ক্যালকাটা নাইন।’

‘ক্যালকাটা নাইনটা আবার কোনদিকে?’

‘তা জানে কেডা? আমি তো বেলেব গার্ডমানুষ। আড্ডেস আপনে বরং পোস্ট অফিসের পিওনরে জিগান গিয়া। আমি জানি স্টেশনের খবর। বাস।’

‘সেকি ? তোমার দর্জি, তুমি জাননা কোন পাড়া ?’

‘আমাগো দরজি কেডায় কইল ? আমাগো দরজি তো যতীন বাবু, বাহাব টেইলার্স, ক্যালকাটা টুয়েন্টিনাইন।’

‘তাহলে এই কোট ?’—

অধৈর্য হয়ে বসনমামা বলেন—‘আহাঃ এতো কোট কোট কবেন কান ? কোটের আমি জানি কী ?’

‘—মানে ?’

‘—মানে. কোট কি আমাব ?’

‘—তবে কার কোট ?’

‘—হেইডাই বা আমি জানুম কী কইব্যা ?’ এবাব হাবাণজ্যাঠা স্পষ্টত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।— ‘তাব মানে ?’ মা. সন্টু. মঞ্জু, সঙ্কলে মিলে কোরাসে হাবাণজ্যাঠাব সঙ্গে গলা মেলাই।

‘—তাব মানে ?’

‘—তার মানে ?’

‘—তাব মানে ?’

‘—আঃ হা। আমি তো এইডা আইজই কুড়াইয়া পাইলাম। কে জানি ফেলাইয়া গেছিল। গার্ডেব কামবায়। তা ফটা ফটা পুরানা কোট, ওইয়া আব ফিবাইয়া নিবে কেডা ? তাই ভাবলাম আমিই কোটটা পবি। গরম আছে বেশ। দ্যাখেন, হাত দিয়া দ্যাখেন জামাইবাবু ?’

বলে বসনমামা একটু লাজুক হাসেন।

‘কই মেজদি, চা হইল ?’

এত পর্যন্ত ঘটেছিলো গত সপ্তাহে। বঞ্জন বলল ‘তাবপবে আজকে কি হলো জানো নবনীতাদি ? বললে বিশ্বাস কববে না। এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম আমবা. হঠাৎ চমকে দেখি গলিব মুখে একটা ছোট্ট দোকান তাতে সত্যি সত্যি সাইনবোর্ডে লেখা—‘মেহবুব টেলার্স, ক্যালকাটা নাইন।’ তিনজন দর্জি একটা গ্যাবাজে বসে বসে পা-মেশিনে মশাবি সেলাই কবছে। নীল নীল নাইলন নেটের স্বপ্নেব মতো সব মশাবিতে ঘবেব মেঝে ভর্তি।

আমি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবে ফেলেছি—‘আপনাবা কি কোটও বানান ?’

চিকনেব শাদা টুপি মাথায়, মেহেদী লাগানো দাড়ি নেড়ে বুডো দর্জি গোল গোল বাইফোকাল লেন্সেব নিকেলেব চশমা দিয়ে তাকালেন। তাবপব বললেন— ‘না তো। ক্যানো বলুন দিকি ?’

‘—মানে কোটের গায়ে আপনাদের লেবেল দেখেছি—’

বুডো দর্জি হাফপ্যান্টপবা ন্যাড়া মাথা সদা পৈতে-হওয়া সন্টুকে একবার ভালো কবে দেখে নিলেন। তাবপব ফোকলা মুখে অপূর্ব এক হাসি হেসে বললেন—

‘—কোট তৈরি কবিনা বটে, তবে লেবেল লাগিয়ে দি।’

‘—তাব মানে?’

‘—মানে চোবা বাজাব থেকে কোট নিয়ে এলে, আমবা তাব লেবেলটা পালটে দি আবকি। আগে ছিল একটাকা পাব লেবেল, এখন হয়েছে পাঁচ টাকা।’ তাব পবে বড়ো দর্জি নাকি নতুন দাড়ি গোঁপ ওঠা বজ্ঞনেব আপাদমস্তক লক্ষ্য কবে, ওব হাতে ঝোলানো কলেজের ব্লজার্টাব দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে একটা চোখ টিপে নিচুগলায় বলেছিল—‘কেন খোকা? আছে নাকি কোট? বেশতো, নিয়ে এসো, তিনটাকায় কবে দিচ্ছি। এ লাইনে পেরথম কাজ বনেই মনে হচ্ছে?’

‘—বাপবে বাপ। চোবই ভেবে নিয়েছিল ওবা আমাদের, নবনীতাদি। আবটু হলেই হয়ত পুলিশে ধবত। বসনমামাবও যেমন কাণ্ড। কোথেকে প’বে এসেছেন এক চোবের ফেনে-দেওয়া কোট।’ বজ্ঞন হাঁপাতে থাকে, আমি হাঁ কবে থাকি। ধন্য বসন্তমামা। ধন্য তাব কোট।

## দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ

এবার পূজোব ছুটিতে আমাদের বজ্ঞন অনেকদিন পবে এসেছিল। বেশ গৌফদাড়ি গজিয়েছে দেখলুম। আরো কিছু খবর দিয়ে গেলো বসন্তমামাব। বজ্ঞন বলল:

“সেদিন বিজয়া দশমী।

বসন্তমামা হস্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন, ঢুকেই, এক হাঁক পাডলেন—

“সন্টু-মন্টু-বজ্ঞ। এই বাইখ্যা গ্যালাম মহাশঙ্খ। আমি যাইতাসি স্নানে। হাত দিবা না কেও। এই কইয়া দিলাম। শঙ্খে হাত দিলেই হাত কাইট্যা ফালাইমু। হ। এইয়া যেই-সেই শঙ্খ না। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। ডাইনদিকে পাঁচ বোঝালা? অবডিনাবি শঙ্খ গুলান কেমন হয় খাল আছে? লেফট সাইডেড, স-ব লেফট সাইডেড।”

তাকিয়ে দেখি বসনমামাব হাতে এক বিবাট শঙ্খ। সতিই বেশ অসামান্য অসামান্য দেখতে। হাত উচু কবে গোড়ালি তুলে শাঁখটা বসনমামা যত্ন কবে জানলাব মাথায় কুলুঙ্গীব তাকে উঠিয়ে বাখলেন। তাবপব মাকে ডাকলেন চোঁচামেচি কবে:

—“মেজদি। যত্ন কইয়া তুইল্যা বাখেন, আপনেব লেইগ্যাই আনসি। গেসিলাম গোপালপুর-অন-সী। আঃ সে কী ফাশ ক্লাস সী বিসট। যান সাউথ অফ ফ্রানসে যাইয়া পড়সি পথ ভুইল্যা। সী সাইডে, মানে সমুদ্রের ক্লে ক্লে বজ্ঞন ছাতায় ছাতায় ছত্রাকার। প্লেন থিক্যা দেখায় যান শত শত মন্টি কলব বিনুক পইর্যা

আছে। আব ছাতির নিচে ? ছাতির নিচে নিচে ক্যাবল ম্যাম আর সাহেব। সাহেব আর ম্যাম। মেমগো আবাব লাজলজ্জা নাই—বড়ই বেশরম। সাহেবগুলো তাও মন্দের ভালো। তাই বইল্যা আমিই কি কম ? কী কন মেজদি ? আমিই কি কম যাই ? আমিও বইস্যা পড়লাম ছাতির তলায় গাও এলাইয়া —দিলাম দুই পাও টেবুলে তুইল্যা। আ-হ। নাকের ডগায় সবুজ গগলস ঝুলতাসে, মনে মনে একটা-অস্ট্রেলিয়ান টিউন হামিং কবতাসি—এই টিউনটা সমুদ্রে স্কাইলাব ভাইঙ্গা পডাব সময় দাকগ পপুলার হইসিলগা অস্ট্রেলিয়ান নেভীতে—আব কোলের উপব এট্টা বংচঙ্গা ইংবাজী নবেলের পাতা উন্টাইয়া উন্টাইয়া যাইতাসি, কতকটা আউট অব মাইণ্ড—মানে কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া আব কি—এমন সময়ে আইল এক ষণ্ডাগণ্ডা অস্ট্রেলিয়ান সাহেব। পবনে এইটুকু একখান কালা মতন গেঞ্জীব জাঙ্গিয়া—মোরাবজীব গঙ্গাসাগব স্নানের জাঙ্গিয়াডাব থিক্যাও ছোটই হইব তো বড না—আব এই বড় একখান দেহ—শেত হইব লেইগ্যা শাদা মাংসেব পাহাড—”

এই সময়ে মা বললেন—“স্নানে যাবে না, বসন্ত ?”

বসনমামা বললেন—“এই যাই মেজদি—”

কিন্তু আমবা তখন অদম্য হয়ে উঠেছি।

—“এখন না বসনমামা এখন না, আগে বলে যাও কী হলো—তাবপব সেই সাহেব—?” —বসনমামা এবাব চৌকিতে পা তুলে বসলেন। তাচ্ছিল্যেব ভঙ্গিতে হাতটা উল্টে আব ঠোট বেকিয়ে বললেন—

—“অইব আবাব কী ? কিসুই না। সাহেব আইয়া আমাবে কইল—“গুড মবনিং ছাব।’ আমিও মুখ থিক্যা পাইপটা নামাইয়া নড কইবা সিরিয়াসলি কইলাম—“গুড মবনিং সাব।”—কিন্তু পাও নামাইলাম না। দেইখ্যা সাহেব কইল—“আমি কি বসতে পাবি ? মে আই সিট ডাউন ?”

আমিও কইলাম—“বস না বস, তুমি আমাগো দ্যাশেব অতিথি বইল্যা কথা। সিট ডাউন, সিট ডাউন।” সাহেব তো আমাব ইংলিশ শুইন্যা এককেবে হকচকাইয়া গেসে। কইল “তুমি কী গানটা গাইসিলা ? চিনা চিনা কইবা গুনা যায় ?” আমি মদু হইস্যা কইলাম “সাহেব আপন দ্যাশেব জাতীয় সঙ্গীত চিনো না ? এইটা তোমাগো সমুদ্রে স্কাইল্যাব পতনের সময়কাব গান—” সাহেব তখন এত খুশি, নীল নীল চক্ষু দিয়া নীল নীল পানি গড়াইয়া পড়ে— কয় “বাঃ ঠিক ! এইয়া আমাগো দ্যাশেবই গান বটে ! আমাগো দ্যাশেব ভাটিয়ালী সঙ্গীত !” সাহেব কয়—“আমি তো নাবিক, আমাগো বন্ধে এই গান খেলা কইবা বেডায়। কিন্তু তুমি ইণ্ডিয়ান হইয়া এই গান শিখলা কী কইরা ?” আমি বলি—“সাহেব, আমি নাবিক নই, কিন্তু বাঙ্গালদ্যাশেব পোলা, আমরা হইলাম পানির পোকা— পানির বেপাবে আমাগো লগে তুমি পারবা না—” যেইনা কইসি, সাহেবটা খটাং কইরা বাজী ধইরা বসল—“বেট ? চল, ডুব সাঁতাব দেই, দেখি কে কী তুইল্যা আনতে পাবে সাগরের তল থিক্যা।” আমিই



কি ছাড়ি ? কইলাম— “হোয়াই নট ? ক্যান কাটুম না ডুবসাঁতাব ?” সাহেব কইল — “ও কে পাটনার। কামান, সুইম। সুইম।” আমিও তৎক্ষণাৎ “গড ইজ গুড, জয় মা কালী।” কইয়া পরনেব তৌলিয়াখানই দিলাম ছুইড্যা সমুদ্রেব তবন্ধে, তাবপব — “চল সাহেব, ধবি গিয়া” — বইল্যা ঝাপ দিয়া পডলাম জলে। মাবলাম এক ডুব।

“ও। সে কী গহীন গাঙ। ডুবতাসি, ডুবতাসি, ডুবতাসি—তলকূল আব মিলে না। শ্যাষে একেবে অতলে যাইয়া দেখি, গুচ্ছ গুচ্ছ প্রবাল, আব মাদাব অফ পার্লেব শুক্লিগুলাব লগে খেলা কবতাসে আমাব সাধেব তৌলিয়া। সে কী বিউটি তোমবা বোঝবা না। হেলিয়া দুলিয়া যেন লুকাচুবি খেলতাসে। মস গ্রীণ জলজ উদ্ভিদেব ফাঁকে ফাঁকে উকি মাবতাসে আমাব হলুদ তৌলিয়া। আব তৌলিয়াব লগে খেলা কবে কে ? কেডা খেলে ? কইত্যা পাব ? এই সন্ট, তুই না ব্রাশে ফাশটি বয়, তুইই ক—কেডা খেলে ?”

সন্ট ঘাবড়ে গেল। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাডল। ভয়ে ভয়ে। ছোট হলও মঞ্জুটা চিবকেলে সাহসী। সে বলল— “কে খেলছিল বসনমামা ? মৎস্যকন্যা ?”

— “আবে ধুব। বসনমামা এক হাত নাড়াতেই মঞ্জু খতম। “মৎস্যকইন্যা হইলে কি আব আমাবে দেইখাও ওয়েট কবত ? করত না। নিঘঘাত পলাইত। আবেঃ, মৎস্যকইন্যাবা যে বড লাজুক হয়। বোঝা না ? অগো লাজুক না হইয়াই উপায় নাই।”

এই সময়ে আবার মা ব্যাঙ হয়ে বললেন— “বসন্ত, তুমি স্নান কবতে যাবে না ?” বসনমামা বললেন— “আবেঃ—যাম্ যাম্, স্নানেব ডিসকাশনই তো কবতাসি। অবগাহন স্নান। এইয়া আপনেব কল খুইল্যা টুপুব টাপুব গোছল না। হঁ। তাবপব সমুদ্র তলে যাইয়া দেখি, আমাগো তৌলিয়াব লগে খেলা কবতাসে—এই, এই বিবাট শঙ্খগগ্যা। অঃ হো। সে কী ব্রাইটনেস মেজদি। বাশি বাশি মগি-মুন্ডাব জ্যোতিবে মলিন কইব্যা দিতাসে এইয়াব অমলিন গুভতা। সপ্তসিন্ধুব বড়বাজি যেন শবমে মুখ লুকাইতাসে বালুব শয়াথ। আব জলমধ্যে শতদল পদ্মফুলেব মতো সগৌববে শোভা পাইতাসে—এই শঙ্খ। বাসস। লইয়া আইলাম তীবে। ভুস কইব্যা ভাইসা উইঠ্যাই দেখি সাহেব। লাল নীল ছাতিব নিচে বইস্যা বইস্যা বড বড শ্বাস ছাডতাসে। আমাবে দেইখা কইল— “ওফ ! তুমিই দ্যাখাইলা বটে। বিনা অক্সিজেনে জলেব তলে পাক। বিশ মিনিট ?” আমি কইলাম— “এই দ্যাখো সাহেব—পদ্মাপাবেব প্র্যাকটিস। কই তুমি কী তুইল্যা আনসো দ্যাখাও দেখি ? তৌলিয়া তো ধবতে পাব নাই জানিই।”

সাহেব কয়— “মাই গড ! হোয়াট সী। হোয়াট ওয়েভ !” এই উত্তাল তবন্ধিত বঙ্গোপসমুদ্রে তো উহাবা নামে নাই। ব্যাটাৰ পাঁচ মিনিটেই দম ফিনিস। সমুদ্রবক্ষ থিক্যা কিসুই তুলিতে পারে নাই। আমাব হাতেব শঙ্খ দেইখা তো সাহেবেব চক্ষু স্থিৰ। কয়— “এইয়া আবার কী — হোয়াট ইজ দিস ?” ওইয়াবে বুঝাইবাব লেইগ্যা তো, শঙ্খে লাগাইলাম এক ফুঁ। উ-রি-ব্বাস ! এই যে মেজদি শোনে। এই কইয়া

দিলাম হৈল ফ্যামিলিৱেই জয়েন্ট ওয়ার্নিং দিয়া দিলাম—এই শব্দে ফুঁ দিবেন না। নেভাব। উফফ। শা-বাশ..সে কী ভোঁ। বাপ রে বাপ। সেই থিক্যাই আমি এই ডাইন কানটাতে স্লাইটলি কমতি শোনতাসি। বঞ্জ, মঞ্জ, সন্টু শুইন্যা দ্যাখো, সদা-পচা-মেস্ত্রিবেও কইয়া দিবা—শব্দে কেও য়ান কদাচ ফুঁ দিতে যাইও না। সর্বনাশ হইব। ভেবি ভেবি ডেনজাবাস।

“যাইতাসিল এক মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ দূব দিয়া। পেটিংয়েব লাখান দেখা যায়। যেই না দিসি শব্দে ফুঁ, অমনি গেসে থামিয়া। হ, ঐ যুদ্ধ জাহাজ। গেসে থামিয়া। সে কী বিবাট শব্দ। সমুদ্রেব জলে ব্রেইক টানসে ত ? নিঃশব্দে পিচেব পথেই দোতলা বাস ব্রেইক টাইনলে কত না শব্দ কবে, আব সদা কলকল সমুদ্রে সাত তলা জাহাজ ব্রেইক দিসে—তাঁব যা শব্দ—ওঃ। জাহাজ তো গেল মধ্য সমুদ্রে স্থিব হইয়া। আমাব শঙ্কনিনাদে ভয় পাইয়া। তখন আমাবেই সিচুয়েশন সেইভ কবতে হইল। চিংকাব কইর্যা কইয়া দিলাম—“অল ক্রিয়াব। ভয় নাই। ফ্রেইণ্ডস হিয়াব।” হুডাহুডি কইব্যা পকেট থিক্যা বাইব কইব্যা, দিলাম এই শাদা কমালডা নাইড্যা” বসনমামা পকেট থেকে নসি-ঝাডা ময়লা ব্রাউন কমালটা বেব কবলেন। মঞ্জু বলে উঠল: —“বাবে ? তখন তোমার পকেট কোথায় বসনমামা ? তুমি তো তখন তোয়ালে পবে—”

বসনমামা বেগে গিয়ে বললেন—“মঞ্জুডাব হইসে বডই চিটপিটানি স্বভাব—বডদেব সব কথায় কথা কওন চাইই। তাবে আব কিসসু কমু না। যাঃ। তাব-পর, সাহেব তো আমার শব্দের কপেঙণে এক্কেবে পাগল। ক্যাবলই কয়—

—“ওঃ। গ্র্যাণ্ড। গ্র্যাণ্ড। দি গ্রেইট ইণ্ডিয়ান সী-সাইবেইন। হাউ মাচ ?”

“আমি তো স্টেইট কইয়া দিলাম—দিমু না সাহেব, এইয়া হৈল গিয়া দক্ষিণাবর্ত শঙ্ক, এ আমাগো বড লক্ষ্মীমন্ত দ্রব্য—এ আমি তোমারে বেচুম না।” সাহেব খালি কয়—“প্লীজ হাউ মাচ ? ওয়ান থাউজ্যাণ্ড ? টু থাউজ্যাণ্ড ? ও কে, —থ্রি ?”

.আমাব মুখে একই বাইক্য ! মাথা নাডতাসি আব ওনলি কইতাসি: “নো সাব। নট ফব সেইল। এইয়া আমাগো মেজদিব লেইগ্যা লইয়া যামু—বড পয়মন্ত শঙ্ক—”

একটু থেমে বঙ্গন বলল, “আমাবা তো ততক্ষণে আশ্চর্য হয়ে জানলাব মাথায় কুলুঙ্গিব খোপে সুরক্ষিত নট ফব সেল দক্ষিণাবর্ত শব্দের দিকে মন্ত্রমুগ্ধেব মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, বসনমামাও আমাদেব তাকানোটা তাকিয়ে দেখছেন স্নেহ-মৃদু হয়ে. এমন সময়ে ভীষণ গোলমাল কবতে কবতে একপাল ছেলে ঢুকলো ঘরে।

“জানিস বঙ্গন, কী কাণ্ডই হয়েছে প্যানডেলে ?”

“ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া যাচ্ছে না। পুরুতমশাই বেগে কাঁই—বড়াদেব যাচ্ছেতাই করছেন—”

“বিরাট কেলেকারী—”

“তুলকালাম কাণ্ড । প্রতিমাব অঙ্গহানি হয়েছে।”

“প্রতিমাব হাত থেকে না—”

“কে যেন শাঁখটা—”

“চুবি কবে নিয়েছে—”

“সেটা না পেলে বিসর্জনই আটকে থাকছে—”

মা অবাক হয়ে বললেন, “কিন্তু ও গুলো তো মাটির শাঁখ হয়, ও শাঁখ চুবি কববেই বা কে, আব কেনই বা কববে?”

এমন সময়ে বসনমামাব গলায় যেন ঝড়ঝড়াক্কে কবে বাজ ডাকলো:

—“আঃ —অই তো বইসে। লইয়া যা না তগো ছাদাব মাথা শঙ্খ—” নিতান্ত অশ্রদ্ধাব সঙ্গে মাথাব পিছন দিকে বড়ো আঙুল উঁচিয়ে কুলঙ্গীব দিকে দেখিয়ে দেন বসনমামা। বিবস্ত্র কণ্ঠে বলেন—“সতত সব লেইট লতিফ—আমি মনে কবি বিসর্জনটা হইয়াই গেছে বুঝি। এখন ক্যাবল লবীব অপেক্ষা। পেনডেলে একটি ধনপ্রাণীও নাই? ছিঃ।” তাবপবে মাকে বললেন—“কই মেজদি, গামছাড়া দিয়েন, গানডা সাইব্যা আসি। ওঃ, ভাবি তো একখান মাটির শঙ্খ, হেইয়া না পাইলে নাকি প্রতিমা বিসর্জনই হইতো না। যা-তা একখান ব্লাফ ঝাইডলেই হইল? আমি বুঝি না ওইয়াগো প্যাঁচ?”

আমি বললাম—“বঞ্জন, এটা নিশ্চয় বসনমামাব সতি ঘটনা নয়। এটা তুমি বানিয়েছ। এ কখনো সতি হতে পাবেই না।”

বঞ্জন বলল—“বাঃ? আমি বানাতে পারি বলে বিশ্বাস হয়, আব বসনমামা বুঝি বানাতে পাবেন না?” বলে বঞ্জন গোপেব ফাঁকে মুচকি হাসলো।

## মূলতানী কামধেনু

বঞ্জন একটু পাগল। বঞ্জনেব বসন্তমামা আবো একটু পাগল। হাবাগজ্যাঁচাব অতি আদবেব ছোট শালা তিনি। জ্যাঠাইমা মাবা গেলেও বঞ্জনদেব বাড়িতে তাঁব চিবস্থায়ী প্রবল প্রভাপ। প্রত্যেকবার এলেই একটা হৈ-হট্টগোল পাকিয়ে যান। সেদিন বঞ্জনবা ভাত খেতে বসেছে, বসন্তমামা ঢুকলেন। এক নজব খালাব দিকে তাকিয়েই ঠোঁট বেকিয়ে বললেন, “খায় কী? ভেজিটেবুল? অঃ! এতে কিসু না-ই।”

বঞ্জনের মা বললেন, “থাকবে না কেন? কত ভিটামিন...”

“আরে ধুর। হট্টক গিয়া ভিটামিন। ঐ ভিটামিন তো ঘাসেও প্রচুর। ঘাসই

খাওয়াইয়েন না ক্যান তাইলে পোলাপানগো—গ্রোয়িং চিলড্রেনের লেইগ্যা প্রোটিন চাই, প্রোটিন-ন। আব চাই ক্যালশিয়াম। ক্যালশিয়ামে হাড় শক্ত করব—ব্যালান্সড ডায়েট দ্যান পোলাগো।”

“কেন, মাছও তো খাচ্ছে। মাছমাংসে তো প্রোটিন থাকে শুনি। এই তো কাতলামাছেব মুডো দিয়ে মুডিঘস্ট করেছে।”

“আবে ধুর। কাতল মাছ? কাতল মাছে প্রোটিন? ওই মাছে কিসুই নাই। ঐগুলান কি আব মাছ আছে মেজদি? মাছ অহন ক্যাবোল তিন প্রকারেব—কই, মাগুব, সিংগি। ব্যস।”

“আর কই-কাতলা বুঝি মাছ নয়? ব্যাঙ?”

“শোনেন মেজদি, শোনেন। মাছ বইল্যা যেই বস্তুটা কিইন্যা আনেন, কোলড স্টোবেজেব মাল, হেইডা হইল বিষ। বিষ। পিয়ার পইজন।”

“বিষ মানে?” রঞ্জনেব মাযের একটু ভয়-ভয় গলা।

“বিষ মানে মাবক দুইবা। যা খাইয়া দেহেব একটাও উপকাব নাই, অপকাব আছে হাজারখান। ঐ মাছ খাইয়া মিত্য পজ্জন্ত হইতে পাবে। বিচিত্র কিছুই নাই। হে-ই ফটিগ্রি-তে তৈয়াবি কোলড স্টোবেজ তো? ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের পুবা না মাছও থাকা অসম্ভব না। গোবা সৈনাগো লেইগ্যা বানাইসিল, কিন্তু অবা তো মাছই খাইত না।”

“সে কী ভাই? তিরিশ চল্লিশ বছরের মাছ? সত্যি বলছ?” রঞ্জনেব মাযেব গলায় ভয় আব চাপা থাকে না। বসন্তমামা এবাব তল্লপোশে পা গুটিয়ে গুছিয়ে বসেন। সাত্তনায দক্ষিণ হাতে অভয়মুদ্রা কবে বলেন, “সইত্য না তো কি মিথ্যা কইতাসি? তবে ভয় নাই। ভয় পাইবেন না মেজদি, জগতে হেলথ-ফুড অখনও আছে। দুধ। দুধ খাওয়াইবেন। খাঁটি দুধ নিজেই একটা কমপ্লিট ডায়েট। দুধ খাওয়াইলে পোলাপানগো হেলথ ফনফনাইয়া বাইড্যা যাইব।” বলতে-বলতে ডান হাতটা মিস্টাব ইনডিয়া স্টাইলে ভাঁজ কবেন। কালো কোটেব শ্রিভেব তলায় গুলি ফোলে কিনা দেখা যায় না।

মা বলেন, “কেন, দুধ তো খায়।”

“বতল? বতলেব দুধ তো? সে নামেই দুধ। ইনসাইড স্টোবিডা শোনেন মেজদি। ও দুধ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুধই না, পাউডার, পাউডাব। সয়াবীনেব পাউডাব। হেইয়াও তো ভেজিটেবুলই হইল? লিকুইড ভেজিটেবুল জুস। আমি কইতাসি দুধেব কথা। পিটুলিগোলাব কথা আপনে কইতাসেন। ফলস তৃপ্তি পাইয়া লাভডা কী, কইতে পারেন? সয়াবীনের চচ্চড়ি কইরা খাওয়াইবেন। একই হইব। চাপার পড়ব।”

কাকিমা এই চাপলাকব আবিষ্কাবে এতই অবাক, কিছুই বলতে পাবেন না। অবাক চোখে চেয়ে থাকেন বসন্তমামার দিকে।

বসন্তমামাই আবাব নৈঃশব্দ্য ভাঙেন। “খাঁটি দুধ খাওয়াইয়েন, ব্রেইন খুলব।

আহা খাইতে পায় না, তাই তো এমুন অবস্থা। স্কুলে বৎসব-বৎসব ফেইল করতাসে বসিয়া বসিয়া।”

এবারে মা বিরক্ত হন মৃতা বডজা'র আদুরে ছোটভায়েব ওপবে। “ফেল কববে কেন? বালাই ষাট। বছব-বছব তো ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে ওঠে ওবা।”

“আঃ, ওই হইল আর কি। কিন্তু চাইয়া দ্যাছেন চাহাবাগুলি কেমন? দেইখা দাঁতকপাটি লাইগ্যা যায়। সাব সাব বসাইয়া খুইছেন—যান এনাটমি ক্লাসেব স্কেলিটন।”

এবার মা'র মুখ অসম্ভব ম্লান আর বসনমামাব গলা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যায়। “দিদি, টাইমলি কেযাব না লইলেই কিন্তু সর্বনাশ! দুধ খাওয়াইয়েন, দুধ।”

“বলছি তো, দুধ খাওয়াই নিয়মিত।”

“আহা আমিও কইলাম তো, ঐ দুধ দুধই না, পিয়ব ভেজিটেবুল। গরু কিনবো? সাইক্ষাং ভগবতী। আইজই দেইখা আইলাম গো-হটায। হেই সকল হাচে তো যায়েন না আপনাবা, দ্যাখবেনই বা ক্যামনে? অ-সা-মা-ই-ন্য! আহা, কী কপ। এইয়া উঁচা শরীব—যান মহাদেবেব বৃষ, আব লেজখান কী। যান চমবীগাই—পিঠেব মাছি তাড়াইতাসে, কী গ্রেসফুলি—যান মন্দিবে দেবদাসী চামব ঢুলাইতাসে। আব চক্ষু? কাজলপরা, টানাটানা, উদাস-উদাস, ভাবুক-ভাবুক,... আর শিং দুইখান? এ-ই বড-বড—” দুই হাত ওড়িশি নাচেব মতো মাথাব ওপবে তুলে ভয়ানক এক বেড কবে দেখান বসনমামা, “বাইসনেব শিং দিদি, যেন পেযাবাগাছেব শাখা—মূলতানী গরু তো? কালই পাটনা থিক্যা আইস্যা পৌছাইসে। —ড্যাম চীপ—মাত্র তিনশো ট্যাহা। নিবেন নাকি?”

বিকেলের মধ্যে সববাই বাজি। পবদিন গরু কিনতে যাওয়া হল। সত্যি—দেখবাব মতো গরু। ঠিকই বলেছিলেন বসনমামা। কী স্বাস্থ্য। এ গরু মূলতানেব সুলতানী খানা না খেয়ে হয়নি। এই লম্বা শিং, সত্যিই যেন পেযাবাগাছেব ডাল, কী উঁচু বাপবে বাপ। গলায় লাল ট্যাসলে সোনাব মতো ঘুন্টিব মালা বাঁধা, আহা, কী কপ। ঘাড় ঘোবাচ্ছে, যেন খোদ মহাবানী ভিক্টোবিয়া। আব চোখ? সকলেই মন্ত্রমুগ্ধেব মতো গুটিগুটি গরুব সামনে। বসনমামা হস্তদন্ত হয়ে এসে পড়লেন। “আঃ হাঃ! ও কী কবেন জামাইবাবু? এদিকে কই যাইতাসেন? ওই গরু না, ওই গরু না। ওইটা তো গরুই না মোটে। দ্যাখতাসেন না—বলদ? দ্যাখবেন তো চক্ষু মেইল্যা? জোডাবলদ ঐ দিকে, আব গাইবাহুব এইদিকে। নাউ, চুজ। কোনটা নিবেন? গরু চাই? না বলদ?” বসনমামা নিজেব বসিকতায় নিজেই হেসে কুটিপাটি হয়ে টানতে টানতে যেদিকে নিয়ে গেলেন, প্রথমে সেখানে কোনো গরুই দেখা গেল না। একগাদা মহিষ। তাবপরে লক্ষ কবা গেল একপাশে একটি বেঁটে, বোগা, খয়া-খয়া, লালচে-কালচে, করুণ, হ্যাংলা ও স্রিয়মাণ গরু, যাব প্রত্যেকটা পাঁজবা গোনা যাচ্ছে। হয় তাব শিং ওঠেনি, নয় তাব শিং ভাঙা—অর্থাৎ গরু না বাছুব সেটাও ঠিক বোঝা

যাচ্ছে না। —টেরিয়ে টেবিয়ে এদিকে তাকাচ্ছে বাগী-বাগী গোল-গোল, পাগল-পাগল চোখে, —আব মুখময় নোংরা ফেনা তুলে বিস্ত্রীভাবে জাবব কাটছে। ওটাৰ ধাবে-কাছেই যেতে ইচ্ছে কৰে না। বসনমামা ওখানেই নিয়ে গেলেন সকলকে।

“সাইফাং ভগবতী। কামধেনু মেজদা, কামধেনু! এইযাব গুণেব তুলনা পাইবেন না—কপ দেইখা ভুলব তো ইডিয়টে। বাঁট থিক্যা দুধ অঝোৰ ধাবে ঝাইরা যায়। বাঁটে পিতলেব নিপিল পবাইয়া দিবেন দুধ সামাল দিতে। ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস। বোঝলেন মেজদা? কমপ্লিট ডায়েট!”

বাড়িতে আনা হল গরু। বজ্ঞনেব মা বললেন, “এঃ। এই গরুর কথাই বলেছিলে? তুমি যে বললে এই আ্যাতো উঁচু গরু? মূলতানী না কী যেন—”

“আঃ হা এইটাই তো মূলতানী। মূলতানে কি ক্যাবল উঁচা-উঁচা গরুই হয়? সব দ্যাশেই তো ঢ্যাঙা-খাটো আছে। নাকি? মূলতান থিক্যা আইতাসে তো, ট্রাকে কইবা—ঝাঁকাইতে-ঝাঁকাইতে এইযাব দেহে আব কিসু না-ই। বাস্তাটা তো কম না—এইবাব খাইয়া-দাইয়া ফেব উঁচা হইবো খনে—”

বজ্ঞন বলল, “তুমি যে বললে ইয়া-ইয়া শিং? কই বসনমামা, এব তো শিংই নেই?”

“তোমবা চাওডা কী? কও ত দেহি স্পষ্ট কইরা। শিং ধুইয়া জল খাইতে হয় তো চল, হেই উঁচা বলদটাবেই নিয়ে আসিগা—শিং ধুইয়া জল খাও। আব দুধ খাইতে হয় তো এইটাবে দ্যাখ। নম্র, মধুর স্বভাব, সাইফাং সুরভি, কামধেনু। দুধেব গাঙ্গে দুধ ভাইয়া যায়। যায়েন মেজদি, যায়েন, জলদি সিন্দুবডা লইয়া আইসেন, ভগবতীবে ববণ কইবা গৃহে তুলতে হয়—”

সিঁদুর-কৌটো হাতে গুটিগুটি অগ্রসব হবামাত্রই বিনা শিংয়েব গরু টুঁ মাবতে তেড়ে এল। হুডমুড় কবে পালিয়ে এলেন মা, চোখেমুখে ভীতি। আব কেউই এগোয় না দেখে সিঁদুর-কৌটোটা চেয়ে নিলেন বসনমামাই। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন। হাতে কৌটো। “আবে দ্যান মেজদি, দ্যান—আমাবেই দ্যান। যদিও এসব ববণ-ঠবন কবা আমাদেব ঠিক সাজে না—মাইয়ালোগেবই কাম।” তাবপব বীবদপে গরুর দিকে এগোলেন। “আইসো মা লক্ষ্মী, আমাগো ঘবে আইসো। দ্যাখেন মেজদি। এই লইলাম সিন্দুব। এই লাগাইলাম কপালে।” বলবামাত্র বিজলী-চমকেব মতো কী একটা ঘটে গেল, মুহূর্তেব মধ্যে বসনমামা অদৃশ্য। সেই ‘সোনার কেল্লা’য় কামু মুখাজী যেমন বলেছিলেন—‘ভ্যানিশ’, তেমনি। ব্যাপারটাও প্রায় একই। কামধেনুর বামগুঁতো তাঁকে পেড়ে ফেলেছে উঠোনে। সিঁদুর-কৌটা ছিটকে পড়েছে একদিকে, নিকেলের চশমা আব একদিকে। আর মাঝখানে বসনমামা গড়াচ্ছেন। গরু ওদিকে ঝাঙা উঁচা রহে হামারা স্টাইলে লেজটি তুলে খটাখট খটাখট গ্যালপ করে ধুলো উড়িয়ে সোজা গেটের দিকে ছুটেছে। ভাগিাস দড়িটা লম্বা ছিল, তাই হারানজ্যাঠা ধরে ফেললেন। “সিঁদুর পরানো ব্যাপারটা তাহলে বাদই দিয়ে দিই, কী বলো বসন্ত?” বসনমামার

গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে মা সসঙ্কোচে বললেন। বসনমামা উত্তর দিলেন। “তাই থাকুক মেজদি, ফব দি টাইম বিইং। মা লক্ষ্মীর আমাব দেখি স্বভাবটা একটু লাজুক আছে।”

গরু প্রথমে বাঁধা হল বাড়ির সামনেব আড়িনায়া। দশ মিনিটেব মধ্যেই জেঠিমাৰ নিজেব হাতে পুঁতে যাওয়া সাদা পঞ্চমুখী জবাগাছেব মাথাটা আব বজ্জনেব বাবাব শখেব লতানে আমেব গাছেব ডগাটা মুড়িয়ে খেয়ে ফেললে, তদুপৰি মঞ্জুব দোপাটিগুলোকে নিশ্চিহ্ন কৰে দিলে। পাডুসুদ্ধ সাড়া পড়ে গেল, “কী সৰ্বনেশে গরু বে বাবা। সবাও, সবাও, হাটাও, হাটাও।”

অগত্যা গরু এল পেছনেব উঠোনে। এসেই সে বেদীৰ তুলসীগাছে গিয়ে মুখ দিল। হাঁ হাঁ কৰে উঠে ওকে তৃতীয়বাব সবিয়ে দেওয়া হল কুযোতলাব পাশেব সৰু জমিটুকুতে। ওখানে যাবামাত্র দাখ না দাখ, তাৰে হাবাণজ্যাঠাব গামছা ঞ্কেচ্ছিল, আবাম কৰে খেতে ঞ্ক কৰে দিয়েছে। এ কী হ্যাংলা, ছাগলপানা গরু ? একে কোথায় বেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে ? খব শব্দ খোঁটাতে খব ছোট্ট দড়িতে প্রায় ফাঁসি দেবাব মতো কৰে বেঁধে বাখা হল। বসনমামা দূৰ থেকে তাকিয়ে মুখে বললেন, “ছি। অত কঠোৰ বন্ধন দিতে নাই। গাভী-ভগবতী বইল্যা কথা।” কিন্তু বাঁধন আলগা কৰাবও কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

বিকলে সতু গয়লা এল দুধ দুয়ে দিতে। অমনি বসনমামাব রূপ পালটে গেল। ঠিক যেন আৰ্মি কম্যাণ্ডাৰ। পকেটে হাত ঞ্জে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকাবি দিয়ে হাঁক পাডলেন “বজ্জ-মঞ্জু-সন্টু। পচা-সদা-মেস্ত্রী। আটেইনননশনন। লাইন বাইক্সা খাডাইয়া যাও। কই, মেজদি, প্রত্যেক চাইলডেব হাতে হাতে পোয়া-বাটি দিয়া দান, পোয়া-বাটি, একেক বেলায় পাশসেব কইবা ...কামধেনু বইল্যা কথা।”

পাডাপ্রতিবেশীৰ বাচ্চাবাও সব এসে লাইন দিয়ে দাডাল। যেন পঞ্চাশ সালেব লঙ্গবখানাব দৃশ্য। সেই সঙ্গে কাচ, পেতল, এলুমিনিয়াম, কাঁসা, স্টেনলেসেব প্রদৰ্শনী। সববাব হাতে গ্লাস, কাপ, মগ, বাটি, জামবাটি, কাসি, ডেকচি, সসপ্যান, টিফিনকৌটা। যে যা পেয়েছে এনেছে, কামধেনুৰ দৃষ্টি খাবে। কৌতুহলী বাপ-মায়োবাও এসে আশেপাশে দাঁড়িয়েছেন। বসনমামা একটা বাটি কৰে একপো তেল এনে সতুব হাতে সসন্মানে তুলে দিলেন। গবৰ্ণবেব হাতে যেমন কৰে বন্যাভাণেব ৫০১ টাকা চাদা দেওয়া হয়, অনেকটা সেই স্টাইলে। অত দুধ দুইতে হবে, বেশি বেশি তেল লাগবে না, বাঁট নবম বাখতে ? অধীৰ আগ্রহে সবাই চেয়ে আছে। ঠোট উলটে সতু বলল, “গরুটাৰ দুধ কোথায় ? এ তো মিনিট দুয়েকেই ফুৰিয়ে যাবে।” গেলও তাই। মোট এক গেলাস দুধ হল।

বসনমামা চূপ। পূৰো একমিনিট উঠোন জুড়ে গভীৰ স্তব্ধতা। কাকৰ মুখে শব্দ নেই। সতু গয়লা কটমটিয়ে বসনমামার মুখেব দিকে চেয়ে আছে—আব বসনমামা সতুব দিকে। আব উপস্থিত দৰ্শকবৃন্দ একবাব এব দিকে আব একবাব ওব দিকে।

কাপ-গ্লাস-মগ ধরা হাতগুলো নেমে এসেছে। বাতাস সীসের মতো ভারী। হঠাৎ বসনমামা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, “বুঝছি। বুঝছি। প্রবলেমটা হইল গিয়া কনসেনট্রেশন। মেজদি লইয়া আইসেন কলসী, মিশান জল! এই দুধ, কামধেনুর দুধ। স্কীরের মতো ঘন। কনসেনট্রেটেড মিঙ্ক! ওই সয়াবীন খাওয়া পাকস্থলীতে এমন আনডাইলুটেড কাউজ মিঙ্ক তো ডাইজেস্টই হইব না। কাইলই ভেটারিনারি সার্জেনেরে লইয়া আসুম, গরুরে ইনজেকশন দিয়া যদি দুধডা কিঞ্চিৎ পাতলা কবতে পারে। আইজ ববং এককাপ কইরা জলে এক চামচ কইবা দুধ—এই কনসেনট্রেশন থাকুক।”

তাই খেল বঞ্জু-মঞ্জু-সণ্টু-পচা-সদা-মেস্ত্রী। সঙ্কলে! এককাপ জলে একচামচ কনসেন্ট্রেটেড কাউজ মিঙ্ক। খাবার সময়ে বসনমামা উত্তেজিত হয়ে চোঁচাতে লাগলেন টি. ভির বিজ্ঞাপনের ব্যাকগ্রাউন্ড-ভয়েসের মতো—“পিয়ব প্রোটিন, মেজদি, ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, ফসফাস। কামধেনুর দুধ পিয়র অমৃত—বোঝলেন মেজদি, অমৃত বেশি-বেশি খাইতে নাই। বিন্দুতেই সিদ্ধ পবিমাণ।”

পরদিন রাত না পোহাতে দেখা গেল বঞ্জনদের গেটে একজন লোক সাইকেলে ঘণ্টি মাবছে। সাইকেল থেকে বেশ কয়েকটা বালতি ঝুলছে, তাব গা খালি, হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি। ট্রিং ট্রিং কবে ঘণ্টি মাবে আব “হেইঃ বাবুঃ” বলে হাঁক পাড়ে। রঞ্জন বেকল।

“কাকে চাই?”

“গায় কিধার ভইল বা? সুই লগানে আয়া।”

“সুই?”

“হাঁহাঁ, সুই। নিনজিশান। দুধকা ওয়াস্তো।”

“আপনিই কি ভেটরিনারি সার্জন?”

“কেয়া ভিটরিনিটিবি? মেরে পাস ছে-ঠো ভৈস ওব চাবঠো গায়ে ভইল —মুবাকো ভিটরিনিটিবিসে কেয়া কাম? গায়কো সুই লগানা হায় কি নেহী?”

গরুব ঠাং বেঁধে-ছেঁদে দিবি সুই লাগিয়ে দুধ দুয়ে দিয়ে গেলেন ‘ভিটরিনিটিবি’ গয়লা। আবাব সেই পোয়াটাক দুধ হল। এবেলা আর পাডার কেউ কামধেনুব দুধ খেতে আসেনি, মা বাড়ির বাচ্চাদের হবিগঘাটার দুধেব সঙ্গেই ওটা মিশিয়ে খেতে দিলেন। ওভালটিনেব মতো।

বিকেলে সতু গয়লা এল না। তাব কামধেনু দুইবার সময় নেই। অগত্যা তেলব বাটি নিয়ে বসনমামা নিজেই বসলেন দুধ দুইতে। গায়ের ব্যাখাটা এবেলা কিছু কম আছে। কিন্তু সুই লাগানোর বিআকশনেই কিনা কে জানে, কামধেনু আজ ভয়ানক বেগে উঠেছে। তাব হাবভাবে ক্রোধটাই প্রকাশ পাচ্ছে বেশি করে। কেবল গাঁক গাঁক করে বিশ্রী একটা আওয়াজ করছে, আর টারারোখ দুটো পাকিয়ে পাকিয়ে কী একরকম করে চাউনি দিচ্ছে, যেটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।



হাবাণজ্যাঠা বললেন, “থাক বসন্ত, এবেলা আব দুধ দুইতে হবে না। একটু ববং জমুক। কাল সকালে তোমাব ডান্ডাব এসে দুয়ে দেবে এখন।”

বসনমামা সেটা শুনবেন? “কী যে ক’ন না আপনে, জামাইবাবু। দুধ দেবেলা না দুইয়া নিলে চলব?” তাবপব তৈলান্ত হাতে বাঁটে হাত দেবামাত্রই গৰু জোড়াপায়েব লাথিতে বসনমামাকে শূট কবে পেনালটি কৰ্ণাবেবও বাইবে পাঠিয়ে দিল ড্রেনে। বঞ্জ-সণ্টু-পচা-সদা সবাই মিলে ধবাধবি কবে তাঁকে তুলে প্রথমে নিয়ে গেল কুয়োতলায়; বেশ কবে গা ধুইয়ে, সোজা খাটে। আব হাবাণজ্যাঠা ছুটলেন ডান্ডাবখানায। মা বসন্তমামাকে আবনিকা খাইয়ে বললেন, “না ভাই বসন্ত, এব চেয়ে হবিণঘাটাই ভাল ছিল। এ বড অলক্ষুনে গৰু।”

শুয়ে-শুয়ে কুঁই কুঁই কবে বসনমামা বললেন, “ছি। মেজদি, ছি। অমন কইবা বলে না—মা ভগবতীবে কুবাকা কইতে নাই, ভগবতী কুপিতা হইতে পারেন।”

মা ভগবতী ইতিমধ্যে দড়ি আলগা কবে পবম কুপিত একখানি বদনচন্দ্রিমা জানলা দিয়ে ঘৰেব মধ্যে গলিয়ে দিয়ে বসনমামাব কচি কলাপাতা বঙেব লুঙ্গিটা আলনা থেকে টেনে নিয়ে চপব-চপব কবে চিবিযে চলেছেন। দেখতে পেয়েই মঞ্জু টেঁচিয়েছে, আব তিনিও চটপট লুঙ্গিসুদ্ধ মুখটি বেব কবে নিয়েছেন। এখন গৰুব মুখ থেকে লুঙ্গি কেড়ে নেয কে? কাব এত সাধি? এব চেয়ে বাঘেব মুখ থেকে হবিণ কেড়ে নেওয়াও সোজা। সে কী ভয়াবহ কদ্দ মূর্তি। কুপিতা বলে কুপিতা? মাথা নিচু কবে সিংহেব মতো ফুঁসছে, আব থেকে-থেকে লেজটাকে পতাকাৰ মতো উচু কবে, ঘবে ঘবে গোববছড়া দিচ্ছে সাবা উঠোনময। তাব ধাবে কাছে এগোনো যাচ্ছে না। লুঙ্গি খেতে খেতে বাত্তিৰ হয়ে গেল। গৰুব ফোঁসফোঁসানি কমল না। অন্ধকাৰে চোখ দিয়ে যেন সবুজ আগুন ঠিকবে বেকতে লাগল। গৰুব ভয়ে অস্থিৰ হয়ে মা দুৰ্গানাম জপতে জপতে দোব-জানলায় খিল দিয়ে শুলেন। বাতবিবেতে কে জানে কী ঘটে?

ভোব হতে না হতেই ট্রিং ট্রিং ঘণ্টি বাজিয়ে ভেটেবিনাবি সার্জন বালতি সমেত হাজিৰ। কিন্তু গৰুব দেখা নেই। সামনেব বাগান, পিছনেব উঠোন, এপাশেব গলি, ওপাশেব জমি গৰুখোঁজা খুঁড়ে অবশেষে সার্জন সায়েব শান্তকণ্ঠে বায দিলেন, “এ বাবু, আপকা গায় ভাগল বা।”

দেখা গেল লোহাব খোঁটা উপড়ে, পাচফুট উচু সলিড ইটেব পাঁচিল টপকে বাত্তিৰ বেলায় গৰু হাওয়া। চিহ্ন বলতে কেবল কয়েক কুচি লুঙ্গি পড়ে আছে। আর কিছু ফুয়েল। নাঃ, মূলতানী গৰুই বটে, সুন্দেহ নেই আব। মেস্তী বলল মহা খুশি হয়ে, “এই গৰুটাকে নিয়েই ইশকুলে নার্সাবি বাইম পড়াচ্ছে আমাদেব, জানো কাকিমা? দ্য কাউ জাম্পড ওভাৰ দ্য মুন।”

হাবাণজ্যাঠা সংকোচে শ্যালকেব ঘুম ভাঙালেন, “বসন্ত ও বসন্ত, ইয়ে হয়েছো,

তোমার কামধেনু তো পাঁচিল উপকৈ পালিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিনশো টাকা—”

আবামে হাঁপ ছেড়ে মা বললেন, “বেশ হয়েছে, আপদ গেছে। টাকা যায় যাক দাদা, প্রাণটাও যেত যে। সাক্ষাৎ ভগবতী তো নয়, সাক্ষাৎ মহিষাসুর। বাব্বাঃ!”

বসনমামা পাশ ফিবে ওয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন, “যাইতে দ্যান জামাইবাবু, যাইতে দ্যান। ‘যাইতে দ্যাও গেল যাবা।’ বোঝলেন মেজদি, দুষ্ট গরুব চাইত্যা শূন্য গোহাল ঢেব ভাল। ফাব বেটাব।” তাবপব পাশবালিশ জাপটে চোখ বুর্জে বললেন, “এইবাব কুকুব পোষেন জামাইবাবু—কুকুব। বড়ই প্রভুভক্ত জীব। মানস বেস্ট ফ্রেন্ড। এই গরুব মতো বেইমান জাত ওয়ার্ল্ডে নাই।”

দাড়ি কামাতে কামাতে হাবাণজাঠা আডচোখে একবাব দুষ্ট হেসে শ্যালকেব স্নান মুখটি দেখেন, তাবপবে বলেন, “কেন, হর্সও তো ভাল। হর্স ইজ এ নোবল আনিমাল।”

শুনেই বসনমামাব একচোখ খুলে যায়। বলেন, “তা কইসেন কথাডা মন্দ না। হর্সকে সইতাই নোবল আনিমাল কওন যায়।” তাবপবেই দুই চক্ষু মেলে হঠাৎ নতুন উৎসাহে পেলায় হাঁক পাডেন, “বঞ্জ-মঞ্জ-সংটু। পচা-সদা-মেস্ত্রী। ঘোডায চডবা নাকি? টগবগাবগ-টগবগাবগ পক্ষীবাজ? স্কুলে যাবা বোজ-বোজ ঘোডাব পিটে কইব্যা? লাইক দি প্রিন্স অব ওয়েইলস? বাগানে তো জংগাব অভাব নাই। সইত্যা-সতাই এই ভাংগা ঝড়ঝড়া বাসগুলান শিশু-স্নাত্ত্ব এক্কেবে বটেন কইব্যা দায, ফিনিশ কইব্যা দায, মেজদি।”

## ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী বা যোগবিভূতি

“বসন্তমামা এবাবে সত্যি সত্যি দাকুণ একটা কোয়াটাব পেয়েছেন দেখলাম, শালবনের মাঝখানে।” বঞ্জন জানালো।

“ব্যান্ডালোর থেকে গোমো গিয়েছিলি? ওটা কলকাতাব পাথে পড়ে?”

“অফিসেব কাজেই গোমোব দিকে গিয়েছিলাম, ভাবলাম মামামামী-তুতুমিতুকে দেখে যাই। বাব্বাঃ যা জবব ঠাণ্ডা পড়েছে ওখানে। বাড়িটা কিন্তু দাকুণ। ঘূবে এসো একবার।”

“কেমন আছেন ওঁবা?”

‘একটা নভেলটি দেখলাম এবারে। মামামামীতে প্রলয়ঙ্কব ঝগড়া হচ্ছে। বসনমামাব গুলতাপ্পি বসনমামী আর সহ্য করছেন না। নারীমুক্তির বাতাস লেগে

মামী এখন হককথা শোনাতে আরম্ভ কবেছেন। যতই হককথা বলেন, ততই দেখি নাহক যুদ্ধ বাঁধে। একেবারে লংকাকাণ্ড চলেছে বাড়িতে।”

“সে কি বে? মামী তো—মানে, মামী কী কবেই বা”—

“কীরকম শুনবে? বলছি। এই ধবো, আমি যাবামাত্র বসনমামা জানালেন আগেব বাড়িব চেয়ে ঠাণ্ডাটা এবাড়িতে বেশি হবাব কাবণ এবাড়িটা শালবনের মধ্যে। বনেজঙ্গলেই শীত বেশী পড়ে। আগেব বাড়িটা ছিল ফাঁকা মাঠের মধ্যে। তাই ঠাণ্ডা কম পড়ত। একথা শুনেই বসনমামী বললেন—‘বাজে কথা বাখো। ফাঁকামাঠে কনকনে বাতাস বয়ে যায় কোথাও বাধা পায় না, ঠাণ্ডা সেখানেই ঢেব বেশি।’ আব মাঝে কোথায়? বসনমামা একেবারে খেপচুবিয়াস! শুক কবলেন—‘আছিলো তো কইলকাতা! শহবে, শীত-গ্রীষ্মেব তুমি জানোটা কী? গাছ বাইয়া বাইয়া শীত নামে তা জানো? আমি জানি। আমি নিজ চক্ষু দিয়াই দ্যাখসি, যখন সেই ফবেস্ট ডিপার্টমেন্টে সার্বিস কবতাম, গাছ বাইয়া বাইয়া, গাছ বাইয়া বাইয়া গুড়ি গুড়ি শীত নামতে আছে, আউটবস্টেইস হইতে এই আর্থে। গাছই টাইন্যা শীত নামায়।’ সঙ্গে সঙ্গেই মামী বললেন, ‘তবে মকভূমিতে বাতিবে অতো শীত নামে কী কবে? সেখানে কটা গাছ।’ বসনমামা বললেন—‘তস না মাইয়ামানযেব বুদ্ধি। ডেজার্ট ক্লাইমেইট। ডেজার্ট ক্লাইমেইট, ডেজার্ট হইল গিয়া অন্য কথা। গাছ নাই বইল্যা শীতও হেইখানে লামে না, শীত ওঠে। বালুকণাব থিক্যা বাস্পাকাবে শীত উইঠ্যা আসে, ইল্লাব স্পেইস হইতে। ফবেস্টে শীতেব ডাউনওয়ার্ড মুবমেইন্ট আব ডেজার্টে আপওয়ার্ড। বোঝলো? এট্টা লামে আউটার স্পেইস থিক্যা, অন্যটা উঠে ইননার স্পেইস থিক্যা, তুমি আব কী বোঝবা সাইস? বলদাছাতা?’ মামী তাতে না দমে বললেন—‘কিন্তু সুমেক কুমেকতে? গাছও নেই, বালুকণাও নেই, তবে ঐ দোদণ্ড শীতটা আসে কোথা থেকে? ওখানে শীত নামে, না ওঠে? তোমাব পাঁজিতে কী বলে?’ বিবল্ল বসনমামা এবাব বলেন, ‘তুমি কি গাডল? এইটাও জানোনা যে মেক অঞ্চলে শীত উঠেও না, লামেও না, থাকে? ওই দ্যাশে শীত আসেও না যায়ও না। থাকে। হেইডাই হইল শীতেব পার্মানেন্ট বেসিডেস। হেইখানেই শীত গজায়। আবাং দিকে দিকে সার্কিউলেইট কবে।—একদিন তুতুমিতুব মাপটা লইয়া বইস্যা সব ফ্যাক্টস আণ্ড ফিগার্স এক্সপ্লেইন কইবা দিম্ম অনে। স্কুলে জিওগ্রাফি পড় নাই?’ মামী—‘ধুং যভো বাজে কথা।’ বলে চুল বাঁধতে বসেন।

নেক্সট, কনিটিকে হাতী আছে কি না এই প্রসঙ্গে বসনমামা বললেন—‘হাতী এনিমেল হিসাবে মন্দ না। ক্যাবল লেজে অণুমাত্র হাত লাগলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এই যা। ক্ষিপ্ত হইয়া চাট মাবে, আব হাতীব চাট যে খায়, তাবে আব অন্নজল খাইতে হয় না।’

শুনেই মামী আপত্তি জানালেন, ‘দুব দুব। হাতীতে আবাব চাট মাবে নাকি?

হাতী কি দুধেল গাই ? না ঘোড়া ? হাতীতে কক্ষনো চাট মারে বলে কেউ শোনেনি !'

বসনমামা শান্তগলায় বললেন—'তুতুর মা, হাতী হইল এক বিশাল প্রাণী। যেমন কি না ভারতবর্ষ। তুমি তবে একপ্রকাব জানো, আমি আর একপ্রকাব জানি। এইবকম তো হইতেই পাবে। পাবে না ? সেই অন্ধ, কালা, আব খঞ্জের কাহিনী শুন নাই ? অন্ধ, কালা, আর খঞ্জ গেল যাদুঘবে হাতী দেখেনব লগে। যাইয়া হইসে কি, শালা অন্ধ তো শুঁড়টা চাইগ্যা ধবসে, ধইবা ভাবতাছে হস্তী হইল বৃদ্ধি ববাবের নলেব তুলা, দীর্ঘ, নবম, সর্পবৎ—আব কালা ? কালাডা, কালাডা ভাবে কি...' কালাব প্রসঙ্গে এসে হোঁচট খেয়ে যান বসনমামা, তাবপবেই সামলে নেন, 'কালা অন্য এক ডিফাবেণ্ট ভিউ দিল, আব খঞ্জের হইল গিয়া আবও এক, থার্ড ওপিনিয়ন। অন্ধ, কালা আব খঞ্জের তো ফিলজফি অব লাইফ এক হইতে পাবে না, সূতবাং অগো হস্তীদর্শনও ভিন্ন ভিন্ন হইবেই। ঠিক কি না কও ? আমাগো সিচুয়েশনও অনুরূপ—তুমি হইলে গিয়া তুতুমিতুর মা, ফেমিনাইন, আমি অগো বাবা, মাসকুলাইন—দুই জনাব ভিউ তো এক হইতেই পাবে না। ঠিক কি না তুমিই কও ?'

'যতো পাগলের কাণ্ড।' বলে মামী বেগে ঝনাৎ করে চাবিটা পিঠে ফেলে আপনমনে গজগজ কবতে কবতে বান্নাঘবে চলে গেলেন।

তখন এমনিতেই মামীর দৃষ্টিভ্রান্তি যাচ্ছিল, পোস্টাল স্ট্রাইকে অনেকদিন বাপেব বাড়িব চিঠি পাচ্ছিলেন না। তাবই মধ্যে বসনমামা সিম্প্যাথি জানাতে গিয়ে বলে বসলেন—

'নাঃ, তুতুর মা, আগেব দিনকালই ছিল ভাল, বানরেব পায়ে পত্র বাইক্কা, ছাইড্যা দিত যুদ্ধেব টাইমে—আব বাতাসে উইড্যা, সরি শুন্যে লম্ফ দিয়া সেই বানব ঠিকই মেসেজ পৌঁছিয়া দিত। আমাগো পি-এণ্ড-টি-এব যা অবস্থা, অগোও উচিত বানবেব মেসেঞ্জার সার্ভিস এভেইল কবা।'

হেসে ফেলে মামী বললেন, 'এত শিল্পিব ভীমরতি ধরলে বাকি জীবন চাকবি কববে কেমন কবে ? একটু আগে বললে অন্ধ, খঞ্জ আব কালাব হস্তীদর্শন, আবাব বলছে বাঁদবেব পায়ে চিঠি বেঁধে উড়িয়ে দেবাব গল্প। ওটা পায়বা হবে।'

এই হাসিটা বসনমামাব একেবাবেই সহ্য হলো না। ক্ষেপে অস্থির হয়ে উনি অপিসে বেবিযে গেলেন পানটান না নিয়েই। যাবাব সময়ে বললেন, 'উঃ গিল্লি তো না, উকীল। উকীল। তুমি ববৎ কোটে যাইয়া সওয়ল করো, ভালোই পয়সা পাইবা বোঝলা তুতুমিতুর মা ? মাইয়া মানুষেব এত মুখরস্ভাব ভাল ন! আমি ফিকুমই না আব এই পোড়াঘবে। লাইনেই গলা পাইত্যা দিয়ু আইজ—হ। তুমি ইনসুরান্সটা লইয়া বেনাবসী কিনতে পাববা।'

'হ্যাঁ ওইটাই তো বাকী আছে। বেনাবসীটা না কিনলেই চলছে না।' বলে মামী লুচিভাজা কণ্ঠিনিউ কবেন।

আমিই উদ্বিগ্ন হয়ে মামীকে ঠেলতে থাকি, 'অ মামী ! মামা যে বললেন ফিরবেন

না? অ মামী! মামা যে বললেন লাইনে গলা পেতে দেবেন?’

‘বলুক গে,’ মামী খুস্তী নেড়ে বলেন, ‘অমন বোজই বলে। তুই খা। আব দুখানা লুচি নিবি?’

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বসনমামা আপিস থেকে ফিবলেন না। মামী দিবি নিশ্চিত মনে কটি বেলছেন, সেকছেন, গল্প করছেন। আমি অস্থির।

‘অ মামী, বসনমামা যে ফিবলেন না?’

‘ফিববে, ফিববে, ক্ষিধে পেলেই ফিববে। ধোঁকাব ডালনা হচ্ছে জানে তো।’

রাত নটা নাগাদ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বসনমামা হাজিব। ঢুকেই ডানহাতে নিজেব গলাটি চেপে ধবে বাঁহাতে মামীব সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ধবাগলায় বললেন, ‘মাফলাব।’

মামী দৌড়ে ওঘব থেকে মাফলাব এনে দেন। বসনমামা কদকণ্ঠে বলেন ‘ডেটল! গবমজল! গামছা।’

তুতুমিতু দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে। কী ব্যাপাব? কী ব্যাপাব?

বসনমামা বললেন—‘নুন গবম জল। আদা-চা। দুই পীস বিস্কিট।’

আস্তে আস্তে সব পবিক্কাব হলো। অফিস ফেবৎ বাজাবে না গিয়ে আজ বসনমামা অন্ধকাবাব পব লাইনে মাথা দিতেই গিয়েছিলেন এবং দিয়েওছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরেও যখন কোনো ট্রেনব নামগন্ধ নেই, তখন উনি উঠে এসেছেন। কিন্তু এই শীতের বাতে অতোক্ষণ হিমশীতল লোহাব বেলব ওপব গালগলা পেতে বেখে গলায় মোক্ষম ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সবভঙ্গ, গলায় ব্যথা ও কাশি শুরু হয়েছে। এছাড়া বেললাইন ব্যাপাবটাই অত্যন্ত নোংবা। মাথাটা অতোক্ষণ ঐ ডাটি প্লেইসে বেখে দিয়ে বসনমামা খুব বিচলিত। ডেটল-গরমজলে স্নান না কবলে অন্য যে কোনো অসুখ ওঁর হয়ে যাবেই।

মামী ছুটলেন আবও গরমজল চডাতে। গলায় মাফলাব জড়িয়ে। নুনজলে গার্গেল কবে। ডেটলে হাতমুখ ধুয়ে দুটো বিস্কিট দিয়ে গবম গবম আদা-চামে চুমুক দিতে দিতে তৃপ্ত বসনমামা বললেন—‘দেখলা তো বনজন, ম্যাবিড লাইফে কত জ্বালা। ডোট গেট ম্যাবিড। স্বাধীনতা হীনতায় কে মরিতে চায়বে কে মরিতে চায়।’

মামী আবাব কাবেষ্ট কবতে আসছিলেন—আমি ছুটে গিয়ে বাধা দিলাম।—বঙ্গন এতদূর বলে। নিজেই এককাপ চা চাইল। তারপবে দেয়ালেব বামকৃষ্ণ কালেণ্ডারের দিকে চেয়ে বলল, ‘পবেরদিন সকালে দেখি বসনমামাব ঘবে কুলুঙ্গিতে এক কালীঠাকুরের ছবি, তাতে বসনমামা ফুলচন্দন দিয়ে ধূপ জ্বেলে দিচ্ছেন। আমি তো ট্যাবা! মামীমাই লক্ষ্মীপূজা কবেন দেখেছি। বসনমামা তো এসবের ধাব দিয়ে যেতেন না। কালীঠাকুর আবাব কবে আমদানি হলো? আমি বলেই ফেললাম, ‘মামা, তুমি আবাব পূজা ধরলে কবে থেকে?’ ‘তগো মামী আগে স্টাট কবসিল বটে কিন্তুই আমিই ফার্স্ট হইয়া গ্যালাম।’ মামাব মুখে বিশ্বজযীর হাসি—মামা বললেন,

‘মনে আছে তো তব? সেই যে, বিশপের সেই প্যারাবোলাটা? কচ্ছপ আব খবগোশের সেই নিমন্ত্রণ, কে আগে লঙ্গা গলা বাড়াইয়া কলসী থিক্যা মাছেব খোল খাইতে পাবে? খাইল গিয়া খবগোশ, যদ্যপি কচ্ছপেব গলা। —এও হইল গিয়া সেই কাহিনী। সাধনমার্গে বহুৎ দূব এডভাস কইবা গেছি কি না?’ আমি আব ট্রশপ প্রসঙ্গে না গিয়ে, শুধু বললাম, ‘আবে তুমি সাধক নাকি?’

‘অল্প।’ লাজুকমুখে বসনমামা উত্তব দেন।

‘তুমি সাধনা টাধনা কবো, সতি, সতি?’

‘গোপনে।’

‘কদিন কবছে?’

‘লং টাইমা। লং প্র্যাকটিস। সাধনা তো প্র্যাকটিসেব ব্যাপাব।’

‘সাধনাব তো কীসব স্তব-টব আছে শুনেছি—তুমি এখন কোন স্টেজে আছে?’

‘ফেইজ নামাব থি। ফাইনাল স্টেইজটা সংসাবে বইস্যা হয় না। শ্মশানে যাইতে হয়।’

‘ও বাবা। সে কি শবসাধনা-টাধনা নাকি? ওসব কবে কাজ নেই বাপু। তা এখন তুমি কী কী স্তব পাব হয়েছো? মোট কটা স্তব আছে?’

‘ফেইজ চাইবটা। আব স্তব হইল তোমাব টোটাল টুয়েন্টি নাইন। উনত্রিশটা। আমি ক্রস কবসি একুশটা।’

‘এ-কু-শ? বাপবে। তো, সেগুলো কী কী?’

‘শোনাবা? শুইন্যা, বোঝবা কিছু? উত্তমত্তেব লাইনে পড়াশুনা কবসো কিছু? কবো নাই? শুইন্যা ফল নাই তাইলে। আমি অহন অবধি শিখছি—মাবণ, উচাটন, বজ্রদংশন, বেচক, কুম্ভক, অর্ধকুম্ভক—জলের উপব দিয়া গমনাগমন, হিপ্লিটজিম, মেসমেবিজিম, নিহিলিজম—এইডা অদৃশ্য হইয়া সাওনেব উপায়,—আসনসিদ্ধাই, ব্যাসনসিদ্ধাই—কমডা হইল? বদ্ধপ্রাণায়াম, মুক্তপ্রাণায়াম, ভূজঙ্গপ্রযাত, অগ্নিভুক, বায়ুভুক, ট্রশবেব সহিত কথোপকথন এইযাবই নাম সেউল কালচাব, এইটা মার্কিন দ্যাশে খুব চলে, যোগবিভূতি আব ই-এস-পি। সেউলকালচাব স্টেইজটা আমি বিগত আঠাশে ত্রুন তাবিখেই কমপ্লিট কবছি—আব যোগবিভূতি? সেও হইয়া গেছে তোমাব গিয়া উনিশে আগস্ট—অহন আছি ই-এস-পিতে। আব বাকী ক্যাবল লাস্ট এণ্ড ফাইনাল ফোর্থ ফেইজ তাহিতে আটটি স্টেইজ আছে—একই গ্রুপেব অষ্টক সাধনা, তাবে কয় ডিভাইন পাওয়াব অব এটর্নি। হেইডা পাওয়া হইয়া গেল, তো বাস। তুমিই বামকৃষ্ণ, অববিন্দেব লহ নমস্কাব হইয়া গ্যালে।’

‘বাববাঃ। এত? আচ্ছা বসনমামা, যোগবিভূতি ব্যাপাবটা কী— আমাকে দেখাবে?’

‘হইবো, হইবো। দ্যাখবি অনে। তাডাটা কীযের?’

‘যোগবিভূতি তোমাব বপ্ত হয়ে গেছে?’

‘হয় নাই? জলবৎ। জলবৎ!’

‘স্লীজ বসনমামা। যোগবিভূতি দেখাতেই হবে। আচ্ছা, ব্যাপাট ঠিক কী বোলো তো? ম্যাজিক ট্যাজিক?’

‘সিম্পিল। এই, যেমুন ধব ... তুমি এটা ধানী লংকা লইয়া কচাকচ কচাকচ চিবাইলে, তোমাব কিছুই হইলো না। কিন্তু যাব যোগবিভূতি নাই, সে চিবাইলে জ্বলনে মুখ-প্যাট থিক্যা রক্ত বাইবাইবে। আব যোগবিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি? অবিচল।’

‘বসনমামা, যোগবিভূতি দেখাও, স্লীজ। আমি যোগবিভূতি কক্ষনো দেখিনি।’

‘দেখামু অনে। লাঞ্চটাইমে বিমাইনডাব দিয়া দিস। ও কিছুই না। সিম্পিল।’

দুপুরে বসনমামা আব আমি পাশাপাশি দুটো পিড়িতে খেতে বসেছি। সামনে ভাতের থালা। আমি মনে কবিয়ে দিলাম, ‘বসনমামা, যোগবিভূতি?’

বসনমামা হাঁকলেন—‘তুতুমিতু। উঠান থিক্যা ধানীলংকা তুইল্যা আনো তো মনা? এক ডজন?’

তুতুমিতু অমনি ছুটলো চুপড়ি হাতে। মুহূর্তের মধ্যে লালসবুজ একচুপড়ি ধানীলংকা নিয়ে হাজির। তারপবেই ছুটলো হাত ধুয়ে ফেলতে। আমি তো দেখেই ভয়ে কাঁটা। এতগুলো চিবাবেন—কি সর্বনাশ।

বসনমামা বললেন, ‘দ্যাখবা? যোগবিভূতি? দেইখ্যা লও মনোযোগ দিয়া। এই লইলাম দুইডা লংকা—এই দিলাম মুখে—এই আমি চিবাইলাম—কচাকচ। কচাকচ। যেন আইসক্রিম—ইহাবেই কয় যোগবিভূতি। বোঝা? খুব কঠিন!’

লংকা চিবুতে চিবুতে এই কথাক’টি বলা হয়েছিল। তাব পবেই যেন কেমন-কেমন হয়ে গেল সব। বসনমামাব জিভ জড়িয়ে উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে গেল, চোখ লাল হয়ে উঠল, দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্ব, মখভঙ্গি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ল। নেক্সট স্টেজে চোখ থেকে অবিলম্বে জল ঝরতে লাগলো। কোনো বকমে বসনমামা তখনও বলে চলেছেন, ‘এইবাব—এই লইলাম এক মুষ্টি অন্ন, এই ভইবা দিলাম মুখগন্ধুবে—এই চিবাইলাম।... তাবপব একঘটি জল—এ্যাঃ এয়াইভাবে...চকচক কইবা গিলিয়া ফালাইলাম...এইবাব ফাইনাল স্টেইজ... চক্ষুমুদিয়া পদ্মাসনে স্থির হইয়া বসবা, বইসা। ঠিক এইভাবে মুক্ত প্রাণায়াম কববা অর্থাৎ মুখ হাঁ কইবা বাতাস টানবা, ছাডবা, টানবা...ছাডবা, ...হুস-হাস হুস-হাস ...এই হইতাসে তোমার বিয়্যাল যোগবিভূতি’...

বলতে বলতে তাঁব কানদুটোও টকটকে লাল হয়েছে, তুতুমিতুও ততক্ষণে গলা ছেড়ে ‘ওগো বাবাগো তোমাব কী হলো গো’ বলে ডুকবে কেঁদে উঠেছে, আব মামী একবাটি দুধের সর এনে বলছেন, ‘শিগগিব এটা খেয়ে নাও তো, জিভে ননীব প্রলেপ দিলে জ্বালাটা বন্ধ হয়ে যায়—’

এক চোখ বন্ধ, তা থেকে অবিশ্রাম জল ঝরছে, অন্য চোখটা একটু খুলে বসনমামা মার্মাব হাত থেকে বাটি নিয়ে বললেন, ‘বাকী ক্যাবল লাস্ট ফেইজ—ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী—’

## দি নেস্ট

বজ্রন ঢুকতেই আমি উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, “কী রে, কেমন বেড়ালি গোমো ? বসনমামার বাড়ি ?”

“আব বোলো না নবনীতাদি, বসনমামার ব্যাপার।”

আমি উৎসাহিত। এই শুরু হয়ে গেল আবেকখানা বসনমামার গল্প। বজ্রন বলতে পারে আমার চেয়ে ঢেব ভাল করে তার মামার ব্যাপার-স্বাপার।

একদিন বসন্তমামা এসেই শুরু করলেন, “বাংলো পাইসি, বাংলা। কোয়াটাঁব। ও মেজদি, শোনেন, আমাগো দৈন্যদশা ঘুচাইসে বেইল কোম্পানি—আপনের বৌমাগো লইয়া গেসি গোমো। ওঃ, ইলাহী কাণ্ড, প্রাসাদোপম গৃহ, বোঝলেন মেজদি ? ইনডিয়ান কোয়াটাঁব খালি নাই, ইউরোপীয়ান কোয়াটার্স দিয়া দিসে। আর চিন্তা নাই। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু, যাইস অখন, দেইখ্যা আসিস, কোয়াটার্স কাবে কয়। পাঠাইয়া দ্যান মেজদি পোলোপানগুলোরে—হেলথডা ফিরাইয়া আসুক— ওঃ, যা চ্যাহারা হইসে এক-একখান—মনে হয় পঞ্চাশের মনস্তর থিক্যা সূভেনির বাখছেন ঘবে—তাকান যায় না—কাঠি-কাঠি হাত-পা—ওঃ, দেখবি গিয়া তুতুমিতুব কী স্নাইস্ব—দেখিস নাই তো, মামাত ভাইবোন দুইভাবে কোনোদিন—বোঝলেন মেজদি, খাইয়া-দাইয়া স্নাইস্বডা ফিরাইয়া আসুক—গায়ে গতি লাগাইয়া ফিরাবি খনে—তদেব মামি বন্দনে দ্রৌপদী, আর ঘবে তো চড়ুইপাখিব মতো মূবগিব দৌরাত্যা। ধব, কাট, খাও। ধব, কাট, খাও। বাস। যত না মানুষ, তত মূবগি। পালকেব পাহাড় হইসে কোয়াটার্সেব পিছনে। আব যত মূবগি তত ডিম। আব সে কী কোয়াটাঁব, পেলেইশিয়াল বিলডিং মেজদি, থাইক্যাও সুখ. দেইখ্যাও সুখ। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। শোন, ডাইবেকশন দিয়া দেই—মন দিয়া শোন। গোমো স্টেশনে নাইম্যা, ধববি বিকশা। শত শত বিকশা লাইন দিয়া খাড়াইয়া আছে পেসেনজাবের লেইগ্যা। বলবি—‘বসন্ত বটব্যালকা বাংলামে চলো—দি নেস্ট।’ বাস। আব কিসুই কইতে লাগব না। চডবি বিকশায়। সিধাই লইয়া যাইব। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু, কনসেনট্রাইট কইবা শুইন্যা ন্যাও—ইস্টেশন থিক্যা বাইরইয়াই অনন্তবিস্তার বাস্ত্র লাল সুবকি বিছান, বাঙ্গামাটিব পথ—সিধা চইল্যা যায় দিগন্তেব পানে—দুই পাশে ফলেব বাগান, ফুলেব বাগিচা, ইউকালিপটাসেব বনানী। আব শালবীথিকা—আব ক্যাকটাসেব জঙ্গল। আব তার ফাঁকে ফাঁকে ফুট্যা আছে সব বিশাল বিশাল বাংলা-বাড়ি, ধনীলোকেব বসতবাড়ি। বিচম্যানস বেসিডেনশিয়াল কোয়াটাবাস। তাবই একটা হইল ‘দি নেস্ট’। মানে আমাগো বাসস্থান, মানে কোয়াটার্স আর কী। সামনেই লোহাব আলপনা-দেওয়া গেইট, শ্বেতপাথরেব ফলকে নাম ল্যাখা আছে—”

মঞ্জু বলল, “বসন্ত বটব্যাল ?”



বসনমামা চোখ পাকালেন, “না, ল্যাখা আছে ‘দি নেস্ট’—গেইটটা ঠেলা দিলেই খুলিয়া যায়, আব গেইট বরাবর গারডেন পাথ—গারডেন পাথ বুঝ ? গারডেন পাথে বিকশাসুন্দা ঢুকবা না কিন্তু, অল ভিহিকলস প্রহিবিটেড, সাইকেল বাদ। গারডেন পাথে সারথানে পা ফ্যালবা, নুড়িপাথরগুলান আনটাইডি হইয়া যায় না য়ান—ইউরোপীয়ান কোয়ারটারস—ভেবি ভেবি কেয়াবফুল। ঢুক্যাই দ্যাখবা ফাউনটেইন। মার্বেল পাথরের ফাউনটেইনে টগবগ টগবগ কইবা জল বাইয়া পডতাসে পবীর মাথার কলস থিক্যা। জল গেইখানডায় পড়ে, হেইডা আবাব গোল চৌবাচ্চাব মত, তাইতে হরেক রঙেব বিলায়তি গোল্ড ফিশ খেইল্যা বেডাইতাসে। গোল্ডফিশ খেলে, আব বোদে-জলে চোখে ঝিলিক মাবে—য়ান ইন্দ্রধনু। বেইনবো। হেই ফাউনটেইনেব সাইডে দুইডা ফুটফুইট্যা শিশু খেলা কবতাসে (আমাবই বাচ্চা দুইডা আব কী), হরীপরীব লেইগ্যা চাহাবা (তুতুমিতু আর কী) এটা তুলাব কুকুব লইয়া। তুলাব না কিন্তু ! রিয়্যাল, বিলায়তি পোট ডগ—ফোব হানড্রেড রুপিজ। ভয় নাই, কামড দিব না। ডেস্টিস্ট দিয়া দাঁতগুলি ভোঁতা কইবা দিসি। মেজদি। চিত্তা নাই, চিত্তা নাই। ট্রেইনে বসাইয়া দিবেন, সিইধা গোমো স্টেশনে নাইয়া বিকশায় বইস্যা ক্যাবল কওনেব অপেক্ষা—‘দি নেস্ট’। বাস। বঞ্জু-মঞ্জু-সণ্ট। তবা যাইস নিশ্চয়, ছুটি হইলেই !”

বসন্তমামাকে বিশ্বাস কবে এমনিতে এতবার ঠকেছে বঞ্জুনেবা, সেই যে ‘মূলতানী কামধেনু’ কেলেক্কারি, ‘স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার’ নিয়ে আবেক কেলেক্কারি, ‘দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ’ নিয়ে কী ঝামেলা পাডায়, তাবপব ‘কোটের’ জন্যে প্রায় পুলিশেই তো ধবছিল—বঞ্জুনের তাই সাহস হছিল না। কিন্তু কেমন যেন সতি-সতি মনে হছিল বাড়ির ব্যাপারটা এবাবে। এভাবে কেউ নেমন্তন্ন কবতে পাবে, সতি না হলে ?

মঞ্জুটা কিন্তু কিছুতেই বাজি হল না। কিন্তু বঞ্জুন আব সণ্ট একদিন ট্রেনে চড়ে বসল। সিধে গোমোয় গিয়ে নামল। সতি, গাদা-গাদা বিকশা ছিল স্টেশনে। একটায় উঠে বসে সণ্ট বলল, “বসন্ত বটব্যালকা বাংলামে চলো।”

সে হাঁ করে তাকিয়ে বইল মুখেব দিকে।

“বসন্ত বটব্যালকা বাংলা নেহি জানতা ?”

বিক্সাওয়াল মাথা নাডল, “নাহি জানতা বাবু।”

এবাব রঞ্জন বলল, “দি নেস্ট জানতা ? দি নেস্ট ?”

এতক্ষণে একগাল হেসে প্যাডল কবতে শুরু কবে দিল বিক্সাওয়াল। ‘নতুন বদলি হয়েছেন তো, তাই বসনমামাব নামটা এখনো চেনে না এবা’ ভেবে নিল বঞ্জু-সণ্ট।

সতিই অনন্তবিস্তার রাস্তা, রাঙামাটিব পথ, দু’পাশে শালবন, ইউক্যালিপটাস-বাগান, বডলোকদেব বাগানবাডি, ফুলেব বাগান, ফলেব বাগান, ফণিমনসাব ঝোপ, ঠিকঠাক মিলে যেতে লাগল বসন্তমামাব বর্ণনা। এক সময়ে এসে পডল ‘দি নেস্ট’।

নাঃ বসন্তমামা এবাবে গুল মাবেননি। মঞ্জুটা বোকা, সন্দেহ করে কবে কিছুতেই এল না। সত্যিই, লোহাব আলপনা দেওয়া গেটটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

সত্যি সত্যি শ্বেতপাথরের প্রাসাদের মতো বাড়ি। চারদিকে জাফবি কাটা দালান। চমৎকাব কেয়াবি-কবা ফুলবাগানের মধ্যখানে খেলনার মতো বসানো, যেন একটা ছোটখাটো ভিক্টোরিয়া মেমোবিয়াল। এই তো। এই বাড়ির কথাই তো বলেছেন বসনমামা। সুবকিব পথে দু'পা এগুতেই গোলাপ ফুলের গন্ধে প্রাণ ভবে গেল। আঃ। গাবডেন-পাথই বটে।

সামনেই ফোয়াবা। ঐ তো শ্বেতপাথরের পবী মাথায় কলসি ধবে আছে, আব কলসি দিয়ে জল ঠিকবে পডছে নীচেব গোল চৌবাচ্চায়। বঞ্জু-সন্টু এগিয়ে গেল। গোল্ডফিশ দেখতে। কই, বোদে-জলে বামধনু বঙ ঠিকরে পডছে কোনখানে? এমন সময়ে একটা সাদা কুকুর নিয়ে খেলতে খেলতে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা বেবিয়ে এল ফোয়াবাব ওপাশ থেকে। কুকুবটা যেন তুলোব তৈরি একটা পুতুল—কুকুব না বেড়াল ঠিক বোঝা যায় না। নেহাত খিউ-খিউ কবে ডাকছে, তাই কুকুব বলে বিশ্বাস হয়।

“ফোর হান্ড্রেড কপিজ।” সন্টু বলল বঞ্জুব কানে-কানে। বাচ্চা দুটোও ঠিক পুতুলবেই মতো। দেখলেই আদব কবতে ইচ্ছে করে। কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালি চুল গালে মুখে ঝাপাঝাপি কবছে, নীল চোখ—ধবধবে ফর্সা, যেন সাহেব বাচ্চা। এই তাদের বসনমামাব তৃত-মিত ? বাঃ। বঞ্জু-সন্টু স্তব্ধ। বসনমামাব মেয়েবাই ওদেব আগে দেখতে পেল। দেখেই একগাল হেসে দিল। বড়টা হাত নেড়ে ডাকল, “হা-ই।” ঠিক যেন সাহেবেব মতো উচ্চাবণ।

“আমাদেব এক্সপেক্ট কবছিল মনে হয়।” বঞ্জন বলল সন্টুকে। তাবপব ওরাও হেসে বলল, “হা-ই।”

সন্টু বলল, “বাপ বে। বসনমামাব বাচ্চাগুলো নিশ্চয় সাহেবদেব ইস্কুলে পড়ে। এইটুকু বয়সে এমন প্রোনাসিয়েশন?”

বঞ্জন বলল, “মঞ্জুটা আসেনি ভালই কবেছে। এখানে কেমন যেন বাঙাল-বাঙাল ঠেকছে নিজেদেব।”

সন্টু বলল, “ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার্স কিনা, তাই।”

মিষ্টি বাচ্চা দুটো কুকুর নিয়ে এদিকে আসছে দেখে ওরাও পায়ে পায়ে এগোতে থাকে তাদের দিকে। কেবল মুখেব হাসিটা একটু ক্যালেনডারেব ছবির মতো ফিক্সড হয়ে থাকে সন্টু-বঞ্জুব ঠোঁটে। ভেতবে-ভেতবে কেমন একটা অস্বস্তি দানা বাঁধতে থাকে। এমন সময়ে পিঠেব ওপবে এক প্রবল থাবড়া, সঙ্গে বসন্তমামাব হুঙ্কার, “আরে-আরে-আরে! কী আনন্দ—কী আনন্দ—কী আনন্দ! সন্টু-বঞ্জু—আইস্যা পডছস? মঞ্জু কই? সদা-পচা-মুস্তী? অরা আসে নাই? চল চল—”

বঞ্জনদেব ধড়ে প্রাণ এল। বাব্বা। একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে, “বাঃ কী সুন্দর

তোমাব মেয়েবা বসনমামা ?”

“হ্যাঁ, চল এদিকে চল—” বসনমামা তাড়া লাগান।

বঙ্গনবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জুনিয়াবেব দিকে এগোতে থাকে। বসন্তমামা হাত ধবে হ্যাঁচকা টানেন, “আঃ হা, এদিকে কই যাও ? এদিকে না, এদিকে না। এইদিকে আসো, এইদিকে—”

কে জানে কোনদিকে এনট্রাস ? গাবডেন পাথটা দূরভাগ হয়ে একটা বাস্তা বাগানেব পিছন দিকে চলে গেছে। ওবা সেইটে নেয। পেছন দিকে বুম্বি এনট্রাস ? হবেও না। ওবা অন্যদিকে বেঁকে যায়। পবীব বাচ্চা দুটো হাত নেড়ে নেড়ে হাসতে থাকে দূর থেকে “বাই-বাই” কবে না “আয়-আয়” কবে—কে জানে ?

বঙ্গন বলে, “তুতুমিতুবা আসবে না ?”

বসনমামা বললেন, “আঃ। তাড়াডা কিয়েব ? আঃ ? আইব, আইব। টাইমলি আইব।”

হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদ পাব হয়ে যায়।

সন্ট বলে, “এনট্রাসটা ঠিক কোনদিকে বসনমামা ? গোটা বাড়িটাই তো পেবিযে গেল।”

“আঃ। আইব, আইব। তাড়াডা কিয়েব শুনি ?”

বঙ্গন বলে, “বাচ্চাবা তো কই এল না, বসনমামা ?”

বসনমামা এবাব বললেন, “কাগো কথা কও ? ওই নীলচক্ষুগুলান ? ঐ গুলো হইব আমাব তুতুমিতু ? ওই বিডালচক্ষু কটাকেশ ? ছোঃ। ওইগুলান আমাব মাইয়া নাকি ? স্নেচ্ছ। স্নেচ্ছ। সব কয়ডাই স্নেচ্ছ। আমেবিকান ছ্যামডিব পোলাপান। অন্য বাড়িডায় থাকে।”

সামনেই প্রবল ধোঁয়াব পাঁচিল। বঙ্ক-সন্ট দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বাগানে আগুন লেগে গেছে। সন্ট বলে, “মালীবা বোধহয় শুকনো পাতা জ্বালাচ্ছে—না বসনমামা ?”

বসনমামা অনামনস্কভাবে বলেন, “ওই হইবখনে কিস্ একটা।”

এমন সময় ঐ ধোঁয়াব পাঁচিল ভেদ কবে আস্ত আস্ত পান্ডুভূতব জ্যান্ত ছানা বেবিযে এল একজোড়া। তাদেব নাকে সর্দি, চুলে জট। ছুটে এসে তাবা বসনমামাব হাঁটু জড়িয়ে ধরে “বারা বারা” বলে, নাকি সুবে নাচতে থাকে। তাদেব পেছ পেছ হালপাতাব পাখা হাতে উদ্ভিত হন তাদেব মা। তোলা উনুনটাকে এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। ঐটুকুনি জিনিসেব এমনি ধোঁয়ার জোব ? ক্রমশ ওবা ধোঁয়া পেবিযে এল। পিছনে ‘কোয়ার্টার্স’ উদ্ভাসিত হল। লাল ইটের তৈরি মিলিটাবি ব্যাবাকেব মতো পাশাপাশি ছ-সাতখানা ঘর, দালান। প্রত্যেকটিব সামনে বাগানে একটা কবে উনুন ধবানো হচ্ছে। কয়েকটা খাটিয়া ইতস্তত ছড়ানো। একটি খাটিয়ায় বসে একজন গুঁফো ব্যক্তি খৈনি ডলতে ডলতে মন খুলে ‘রামা-হো’ গাইছেন। ওপাশে একটি

টিনেব ছাউনি দেওয়া জ্বালেন খাঁচা ভর্তি মূবগি ঠাসা। মূবগিৰ ক্যাচবম্যাচর, ভোজাপুরী 'বামা-হো' আব তৃত-মিতুব 'বাঁবা ! বাঁবা !' ছাপিয়ে বলসে উঠল বসন্তমামিৰ গলা, "তুতুমিতু ! এক্কেবাবে চূপ ! নইলে গলা কেটে ফেলব।" ওদিকে কান না দিয়ে বসন্তমামা বঞ্জনেব কনুইটা ঠেলে বললেন, "মূবগি দ্যাখছস ? মূবগি ? কইসিলাম না, যত মানুষ তত মূবগি ? ওই দ্যাখ। ঠিক কিনা ?" তাবপব মামিকে বলেন, "শুনছ, চাইয়া দ্যাখো কাগো ধইবা আনসি—আমাগো বঞ্জ-সংটগো। তুমি অবশিা আগে আগে দ্যাখ নাই—দিদিমণিব—"

বসন্তমামি শুধু একজনেন দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাই বা দেখলাম আগে। খব বুঝেছি। তোমাব সেই মবা দিদিব জ্যাস্ত দেওবপোব দল তো ? তা, এঁদেব ক'দিন থাকা হবে ?"

তাব পবদিন সবুজ ফ্যাগ নাডতে নাডতে যে ট্রেনটাকে বসনমামা খববদাবি কবে হাওডা নিয়ে এলেন, সেই ট্রেনেব গার্ডেব কামবাত্তে বঞ্জ-সংটকেও বসে থাকতে দেখা গেল মামমুখে।

সেই থেকে বঞ্জন আব বসনমামাব গল্প বলে না।

## গুনিয়া ভাই

আমি মানুষ হয়েছি কোন আয়া নয়, গুনিয়া ভাইয়েব কোলে। আমাকে অ-আ লিখতে পডতেও শিখিয়েছিল সে-ই। বাংলায় নয়, উড়িয়ায়। গুনিয়া ভাইই ছিল আমাদের ছোটদেব একচ্ছত্র হিবো। সংসাবেব গৃহিণী এবং সচিব।

তক্কা কবিসনি বলচি তাঁতিবউ। পনেবো বলিচি ওই পনেবো। আব একটা পয়সাও নয়। ভদ্রলোকেব এক কতা।

মতি-তাঁতিনীও এক কতা—মা-ঠাগবোন।—দিম্মাব চেয়ে আবেক কাঠি গলা তুলে চেঁচাচ্ছে তাঁতিবউ। বউ মানে সেও দিম্মার সমবয়সীই হবে। নাকে সবুজ পাথবেব নাকছাবি, পাকা চুলে তেল-সিঁদূব, লালপাড কাপড়ে দিবি সেজে-গুজে আসে। —এ ঝা বলে দিইচি, তাই। স'পাঁচ টাকা জোডা হিসেবে খোকাব দু' জোডা ধুতি, আব খুঁকি কাপডখানা তিন টাকা বারো আনা। ব্যস। পাই-পয়সাও আব কম হবেনি। হ্যাঁ :

মহা উৎসাহে আমবা নাতি-নাতনিবা সব দালানে ভিড কবে ঝগড়া দেখছি। মনে মনে সব্বাই হিসেব কষে ফেলেছি, বুঝে গেছি যেমন আমাদের দিম্মাটি অঙ্কে

ওস্তাদ তেমনিই তাঁতিবউ। কিন্তু দিম্মাব সামনে মুখ খুলব, এত দুঃসাহস কাকুব নেই।

এমন সময়ে খুস্তি-হাতে, গামছা-কাঁধে, এক টোপলা পান ঠাসা গালে, ফর্সা ধুতিটি হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে, ধবধবে বোগা পিঠে মাজা পৈতেটি ঝলমলিয়ে গুনিয়া ভাইয়ের আবির্ভাব হল বান্নাঘব থেকে। লাল টুকটুকে ঠোঁটে একগাল হেসে বলল, কী হেইছে? কী হেইলা কী? কঁড হল? এত্তে পাটি ককচ্ছ কাঁইকি মতিদিদি?

চাবানা বাদ দিতে চাইচে কত্তামা—তাঁতিবউ বলে—চাবানা কেন, পাই-পয়সাও ছাড়বুনি। বাবা। বাজাবে আগুন নেগেচে।

আচ্ছা, আচ্ছা। সব হেবে। পাঞ্চ টংকা চাবি আনা কিবি দুইজোড়া ধুতি, আউ, তিনঅ টংকা বাবো আনা গুট্টে শাড়ি। বাস? তমকু কত্তামা কেত্তে দিউছি? পুবা পন্দবো? আচ্ছা, মূ দেখুছি, কিচ্ছি চিন্তা নাই, মূ সব্বু ঠিকঅ কবি দেবি। গজবাতে গজবাতে তাঁতিবউ ততক্ষণে তাব পুঁটলি বেঁধে ফেলেছে। ওদিকে দিম্মাব তাকিয়াব নিচে থেকে গোল বাকবাকে পেতলেব টিফিন-বাক্সটাও বেবিযেছে। বাক্সটা খুলে দিম্মা ফর্সা কাপড়ে বাঁধা খুচরো টাকাব পুঁটলিটা বেব কবলেন। একটা দশেব নোট আব গুনে গুনে পাঁচটা কপোব টাকা গুনিয়া ভাইয়ের হাতে দিতে দিতে তাঁতিবউকে শাসালেন, তোব বড্ডো আশ্পন্দা হয়েছে তাঁতিবউ, চাবানা পয়সাব জন্যে পুবা খন্দেব ছেড়ে দিচ্চিস। আসিস পুজোব সময়ে, দেকবো কে তোব কাপড কেনে? আজই আমি অন্য তাঁতিব ব্যবস্থা কচ্ছি, দাঁড়া।

গুণনিধি ঠাকুব তাঁতিবউকে নিয়ে দালানেব ওধাবে গিয়ে বলে, এই নিয়, ধুতি দুই জোড়া সাড়ে দশ, আউ শাড়ি তিন টংকা তিন সিক্কা, চৌদ্দ টংকা চাবি আনা। মিলিলা হিসাব?

তাঁতিবউ গুনল—স' পাঁচ স' পাঁচ, সাড়ে দশ। দু'জোড়া ধুতি। সাড়ে দশ আব তিনে—সাড়ে তেবো। আবও বাবো আনা, মানে তিন সিকে। তেবো টাকা আব পাঁচ সিকেতে হল মোট চৌদ্দ টাকা চাবানা—

ঘাড কাং কবে হেনে তাঁতিবউ বলল, হ্যাঁ ঠাকুব, ঠিকই মিলেছে।

তবে তিন সিক্কা ফিবৎ দে।

দুবুনি তো কি? মেবে দোব? মতির কাছে ও সব পাবেনি। হুঁ—তাঁতিবউ বান্নাং কবে তিনটে সিকি ফেলে দিলে মার্বেলের মেবোব ওপবে।

গুনিয়াভাই কুড়িয়ে নিয়ে নিজেব ট্যাকে গুঁজল দুটো আব একটা এনে দিদিমাকে এলল, নিয়, চাবি আনা ঘুবাই কিবি আনুচি। ছড়া কম বদমাস? দিতেই চাহে না। বলে দিম্মাব পান সাজাব থালাব ওপব ঝনন কবে বাখলে সিকিটা।

গুণনিধিব গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে দিম্মা বললেন, বাঃ! আবার? আবো চাবানা? সেই চাবানা তো ছাড়লেই, আবার আবও চাবানা ফিরিয়ে দিলে? বলিস কি গুণো? ফোকলা গালে ভুবনমোহিনী হেসে দিম্মা বলেন, তুই সত্যি পাবিসও বাপ। তোব কাছে কেউ ট্যা-ফোঁটি কত্তে পাবে না। এই নে, এই চাবানাটা তুই-ই বেখে দে। তোকেই পান খেতে দিলুম।

একগাল হেসে গুনিয়া দিম্মাকে বিরাট এক পেন্নাম ঠুকে, সিকিটা তুলে নিয়ে বান্নাঘবে চলে গেল।

বেডালের পিঠে-ভাগের মতন মীমাংসাব কায়দাটা আমবা ছোট্টবা সববাই দেখলেও কেউ কিচ্ছুই বললুম না। কেননা জানি, ওই পয়সা থেকে আমাদেরই নকুলদানা চীনেবাদামের সাপ্লাই আসবে। আব, ওঃ—যে অশান্তিটা হচ্ছিল সকাল থেকে। এই ব্যবস্থায় দিম্মাব কথাও বইল, তাঁতিবউয়ের কথাও রইল, সবাই খুশি। এই হল আমাদের গুনিয়াভাইয়ের প্রধান গুণ। মুশকিল আসানের রোলে সতি তাব জুড়ি ছিল না। সাবা পাডাব ছোটদের একচ্ছত্র গার্জেন এই গুনিয়া। অমন একজন মুশকিল আসান ছিল বলেই বোধ হয় আমবা পড়তুমও নানা জাতের নিতি নতুন মুশকিলে।

বাস্ত্য খেলতে খেলতে কোন বাড়িতে ফুটবল পড়েছে, কাচ ভেঙেছে, বেগে উঠে তাবা ফুটবলটা ছাড়ছে না। ডাকো গুনিয়াভাইকে। সে গিয়ে হাতে পায়ে ধবে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছেলেদের হয়ে অনেকবাব ক্ষমা চেয়ে ফুটবল ফেবত এনে দেবে। কোন বাড়ি ছাদেব এরিয়েলে ফার্স্ট ক্লাস একখানা ঘুড়ি আটকে আছে, তারা পাড়াব ছেলেদের পাল্লা দিচ্ছে না। গুনিয়াভাই যাবে। ছাদে উঠে ট্যাঙ্কে চড়ে যেমন কবে হোক ঘুড়িটা ঠিক ছাড়িয়ে আনবে ছেলেদের জন্যে।

ছোট ভাইয়ের আংটি জোব কবে নিজেব আঙুলে গলিয়ে, বাচ্চব আঙুল ফলে উঠে হাতের অবস্থা সঙ্গীন। গুনিয়াভাই ছুটল বাচ্চকে নিয়ে স্যাকবাব বাড়িতে। তাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে আংটিটাকে কাটিয়ে আঙুলকে বিপদমুক্ত কবতে। বাচ্চর মা তো কৃতজ্ঞতায় আশীর্বাদ করে আংটিটাই গুনিয়াকে দিয়ে ফেললেন।

বাঁদব নাচ দেখতে দেখতে হঠাৎ কি বাঁদুবে দুর্বুদ্ধি, বাঁদবীটা তেড়ে এসে কটাস কবে কামড় বসিয়ে দিয়েছে মুন্টিব পায়ের গোছে। বাড়িব বড়বা অফিসে—কী হবে এখন? যদি ধনুংকাব হয়? মুন্টিব মায়ের কান্না জুড়ে দেওয়া দেখেই অমনি গুনিয়াভাই মুন্টিকে কাঁধে কবে ছুটল। দুপূর্ববেলায় ডান্ডাবখানা বন্ধ হলে কী হবে, জোব কবে শ্রীহরি ফার্মেসিব ডান্ডাবকে ঘুম থেকে তুলে, তাব দোকান খুলিয়ে, কী একটা অ্যাসিড দিয়ে ওই দাঁত বসানোব জায়গাটা পুড়িয়ে, বিষমুক্ত কবে দিয়ে একটা ইঞ্জেকশন লাগিয়ে মুন্টিকে বাড়িতে নিয়ে এলো। দু'হাতে গোলাপী বস্তের দু-দুটো বড়িব চুল খাচ্ছে—মুন্টিব চোখে জল। ঠোটে হাসি, গুনিয়াভাইয়ের কাঁধে লাল ফ্রক পবে বসে আছে। যেন মুন্টিব ঝাঁকায় মা লক্ষ্মী। বীবগর্বে গুনিয়াব সে কী মার্চ কবে পাড়ায় ফেবা।

পাডাব বড় বড় মেয়েবা আমাদের বহুবিধ প্রশংসা বাক্যে ভুলিয়ে গাছে উঠিয়ে কাঁচা আম, জামকুল পেড়ে খেত অনেক দিনই। তারপব এক সময়ে খেজুর পাড়ানো শুরু কবলে। আমি তো অহংকারে মটমট কবছি। আমার মতন গাছে উঠতে কেউ পারে না। খেজুর গাছে তো ছেলেরা পর্যন্ত চড়তে চায় না, খেজুর পেকে থোকা থোকা ঝুলে থাকে ক্লাবের মাঠে। বড় দিদিদের তেলে ভুলে, যেদিন বুক হাত

ছড়ে, নতুন ফ্রকের বুক ছিঁড়ে সগর্বে তিনটে খেজুর হাতে বাড়ি এলুম, বেগেমেনে গুনিয়াভাই ছুটল ক্লাবে। এইসা দাঁত খিঁচিয়ে উড়িয়ায তাদের শাসিয়ে এলো, যে বড় মেয়েবা যেন পালাতে আব পথ পায় না। সেই থেকে আব কখনো ওবা খেজুর গাছে চড়তে বলেনি আমাকে।

মুখজোদের বাঁধুনিব ছেলে মশ্চুব বুদ্ধিটা কম। তাব গেঞ্জী প্যাণ্ট খুলে নিয়ে তাকে বিছুটিব ঝোপে ঠেলে ফেলে গাডাগডি দিইনেছে পাডাব কয়েকজন ছেলে। কেঁদেই আকুল হচ্ছে বেচাবা মশ্চু—শুনেই গুনিয়াভাই ছুটল। যে ক'জন দুষ্ট ছেলে এব পাণ্ডা ছিল, প্রত্যেকের জামা খুলে গায়ে বেশ কবে বগড়ে বিছুটি ঘষে দিয়ে এলো।

নে, দাখ বেঁটাবা একটু নেচে-কঁদে কেঁদে-ককিয়ে। দাখ, কেমন লাগে—

ছেলেদের বাপ-মা'বা বেগে গেলেও, কিছুই বলতে পাবলেন না। একে তো ছেলেবা দোষ কবেছে, তাছাড়া গুনিয়াভাইকে যে কিছু বলা যায় না। কখন যে কাব কোন দুঃসময়ে কী কাজে লাগবে? দুষ্ট ছেলেদের শাস্তিটা তো অন্যায়াও হয়নি। বটব্যাল সায়েবেব বাড়িতে প্রচুর কাঁচা আম হয়েছে। বটব্যাল একা মানুষ, বাড়িতে ছেলেপুলে নেই, পাডাব ছেলেদের ঢুকতে দেন না, পাছে বাগান নষ্ট কবে দেয় বলে। ধবো গুনিয়াভাইকে। বটব্যালকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ধুতিব কোঁচড ভর্তি কাঁচা আম এনে ছোটদের মধ্যে বিলি কবলে গুনিয়াভাই। তেমনি বাগচী বাড়িব পেয়াবাও। খেতে চাও? বেশ তো পাঁচিল ডিঙিয়ে অমন জোব কবে ভেতবে ঢুকো না। কেবল গুনিয়াভাইকে একবার বল। সে গেলে বাগচীগিনি নিজেই চূপড়ি ভবে উঁশা পেয়াবা তুলে দেবেন তাব হাতে। গুনিয়াভাইয়ের মত এমন 'গুডউইল' দুনিয়ায কম লোকেবই কপালে জোটে।

শুনেছি, আমাব জন্মের সময়ে আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক মোটরবেব পাম্প ছিল না, হ্যাণ্ডপাম্প কবে জল উঠত তিনতলায়। গুনিয়াভাই নাকি এই জল তোলবাব একটা চমৎকার উপায় বেব কবেছিল। পাম্পটা দেখতে ঠিক টিউবওয়েল-এব মতন। হাতলটা ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং কবতে হয়। কিন্তু নল দিয়ে জল পড়ে না। জলটা তাব বদলে ওপবে উঠে যায়। পাম্পটা ছিল আমাদের উঠোনে, বিজার্ভাবেব পাশেই। খিডকি-দোবেব গা ঘেঁষে। ঠিক তাব সামনেই দেডতলাব ঘবে গুণনিধিব নিজস্ব বাজভবন। জানালাটা খোলা থাকা মানে রাজাপাল বাড়িতে আছেন, আব বন্ধ মানে নেই।

কলকাতা শহবে গুণনিধিব দেশেব লোক গিজগিজ কবেছে, যত পান-বিড়িব দোকানদার, যত কলেব মিস্ত্রী, মালী, রাঁধুনী বামুন, নাপিত, বেয়াবা, পিয়ন—দলে দলে উড়িয়াবাসীবা আসত গুনিয়াভাইয়ের কাছে। সাবাদিন বাবাব কাছে যত সাক্ষাৎপ্রার্থী আসেন, গুনিয়ার ভিজিটবেব সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়। গুনিয়া তাদের সকলকে বলে বেখেছিল—

খববদার বেল টিপবি না। রিং কবলে বাড়িব সবাই জেনে যাবে, আবাব আমাব

কাছে বন্ধ এসেছে। তোরা ববং খিডকি-দোরে গিয়ে ভাঙাচোরা টিউবওয়েলটা খটাং খটাং করিন, ওই শব্দ পেলেই আমি ছুটে চলে আসব।

জলেব অভাব ছিল না; সাবাদিন ধবেই হাতলটা ঘটাং ঘটাং হত। গুনিয়া বান্না কবতে কবতে শুনতে পেয়ে হাসি হাসি মুখে চুপ কবে থাকত। সাড়া দিত না। মিনিট দশেক বাদে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উকি দিত—বলত, আবে, কৌ বে? নাটিয়া? মূ এবে যাই পাবিবিনি, দ্বিটাব সমো টাইম মিডিব।

গুনিয়াব পৰোপকাৰেব নেশাব জনো তাব বাজাবে খুব পাব ছিল। একজনোব কাছ থেকে ধাব নিয়ে আবেকজনেক দানধ্যান কবাব বিক্ৰী স্ভাবটাব জনো অনববত মা'ব কাছে বকুনি খেত গুণনিধি। এইজনো দিবাৰাত্ৰি তাব কাছে পাওনাদারেব অশ্রান্ত আনাগোনা। কেউ আসে ধাব চাইতে, কেউ বা আসে শোধ কবতে। এই দু'বকমেব ভিজিটাবদেব দৌলতে গুনিয়াব স্পেশাল কলিং বেল সাবাদিনই বাজত, আব তিনতলাব টাংকে জল উপচে পড়ত।

গুনিয়া অর্থলোভী ছিল না, কিন্তু যশে তাব খুবই লোভ ছিল। মা'ব ভাঁড়াব ঘৰ থেকে লুকিয়ে চালটা ডালটা সবিয়ে প্রায় দবাজ হাতে পাডাব ডোমেস্টিক হেল্লাবদেব বেকাব ভাতা সাপ্লাই কবত সে। মা ধবে ফেলতে পাবলেই 'ম্যাট গুনিয়াভাই একগাল হেসে, সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে যাত্ৰাব চঙে মা'ব দুই পা জড়িয়ে ধরত—তুমি তো মা অল্পপূৰ্ণ। কত বডলোকদেব অকাবণে নেমন্তন্ন কবে খাওয়াচ্ছ বোজ বোজ। না হয় দুটো দিন গবীবেব পেটে দু'মুঠো অন্ন দিলেই—ওদেব আশীৰ্বাদে খুকুভাইয়েব মঙ্গল হব মা—

পা ছাড... পা ছাড... উঃ, কি যন্ত্ৰণা—মা'ব তখন হয়েছ মহা মুশকিল—সঙ্কোচেব একশেষ। মাকে বিবত কবাই গুনিয়াব উড়ে-যাত্ৰাব উদ্দেশ্য। গুনিয়াব কাঁধে চড়েই আমি ছেলেবেলায় উড়ে-যাত্ৰা দেখতে গেছি; তাই চংটা চেনা।

এই যশেব লোভেই গুনিয়াভাইকে প্রায়ই নানা ঝগড়াটে পড়তে হত। চাল মাৰাটা ছিল তাব স্ভাবসিদ্ধ। চালিয়াতিব জোবেই গুনিয়া পাডাব সব গৃহভৃত্যদেব সৰ্বধিনায়ক, গিন্নিদেব একচ্ছত্ৰ মন্ত্ৰণাদাতা এবং ছেলেমেয়েদেব গণ-অভিভাবক হয়ে উঠেছিল।

নানা ভাবে অন্যোব উপকাৰ কবা গুনিয়াব নেশা, তাতে নিজেব ক্ষতি সীকাৰ কবেও। লোকে ধনা-ধন্য কবাবে, ওতেই তাব সবচেয়ে আনন্দ। গুনিয়াব মন্ত্ৰ গৰ্ব ছিল, তাব মতন দাকৰণ বাজাব কবতে আব ত্ৰিভুবনে কেউ পাবে না। এব জনা যে কোন কষ্ট সীকাৰে বাজী ছিল গুনিয়া। একবাব হল কি, বোববাব সকালে বৈঠকখানায় কথা হচ্ছে, পোনা মাছেব বাজাবদব আগুন, আট টাকা সেব হয়েছে। পচিশ বছৰ আগেকাৰ কথা। গুনিয়াভাই চা দিতে ঢুকে সে-কথা শুনতে পেয়ে বলে উঠল, আঠঅ টংকা—কৌ ষডা কহিচি? বডা মিছা কথা কহিচি পবা? মূ পাক্কা টংকা কবি আনি দব।



গুনিয়াব কথা শুনে কাকাবাবুব বাগ হয়ে গেল। তিনি বোজ নিজেই বাজাব কবেন। মিথ্যে কথা মানে? প্রথমে শালা, তাবপবে মিথ্যাবাদী সম্ভাষণে কাব বুক আহ্লাদে ফলে ওঠে? খচাৎ কবে পকেট থেকে কডকডে দশ টাকাব নোট বেব কবে দিয়ে কাকাবাবু গুনিয়াকে বললেন, বেশ তো, গুণনিধি, তুমি আমাকে দু'সেবেব একটা পোনা মাছ এনে দাও দিকিনি?

দিয়, মতে দসঅ টংকা দিয়। মূ আনি দউচি—বলে ঝটকা মোবে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে, ধুতিটা একবাব ঝেড়ে নিয়ে, পৈতৈব ওপব গেঞ্জী চড়িয়ে, থলে হাতে, গুনিয়াভাই তক্ষুণি ডাঁটসে বেবিযে গেল। খানিক বাদেই একটা টাটকা চমৎকাব স্নাত্ত সমুজ্জ্বল প্রায় দু' সেবি কই মাছ হাতে কুলিয়ে ফিবে এলো। কাকাবাবুব চোখ বাগাঘাটেব ছানাবড়া, আব গুনিয়া? গুনিয়াব চোখ-মুখে নাযাগ্রা ফলসেব মত থবল গৰ্ব আব আহাভৃষ্ণি উছলে পডছে। কই মাছ হ্যাওওভাব কবে দিয়ে, গুনিয়াভাই ছোটখাট একটা বক্তৃতা দেয বৈঠকখানায় সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে—যাব মূল বক্তব্য আপনাবা দব কবতেও জানেন না, মাছও চেনেন না। নইলে কেউ কখনো আট টাকা দবে পাঁচ টাকাব মাছ কিনে আনে? বাবাব বন্ধুমহলে গুনিয়াব অসামান্য ক্ষমতা নিয়ে আবো একবাব ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। কেবল সবাই চলে যাবাব পবে মা বললেন—গুণনিধি, তুমি আজকে মাইনে থেকে পাঁচ টাকা যে আগাম নিলে, সৌটাব হিসেব আমি গণেশবাবুকে মাছ খাওয়ানো বাবদ খবচা বলে লিখে বাধি। গুনিয়াভাই স্কুল পালিয়ে ধবা-পড়া বাচ্চা ছেলেব মত লজ্জিত মুখে বলল, মিছা কথা কহিবিনি মা। সাতঅ টংকা লাগিলা। মা জানেন লেগেছে আট টাকাই। কিন্তু ও সব টাকাকড়িব আসল হিসেবেব মধ্যে গুনিয়াভাই যাবে না কিছুতেই।

ওদিকে বাবা আবেক অসংসারী—এবাব বাবাই বাধ্যলেন ঝামেলা। সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, তোমবা যে যখন বেশি কবে মাছ কিনবে, গুণনিধিকে বোলো, খুব শক্তায় এনে দেবে। আট টাকাব মাছ পাঁচ টাকাতে। ফলে বাবাব বন্ধুবান্ধববা থাযই মাছ কেনবাব জন্যে গুনিয়াভাইকে অগ্রিম টাকা গছিয়ে দিয়ে যেতে লাগলেন। গুনিয়াও মাছেব সাপ্লাই দিতে লাগল মহানন্দে।

মা টের পেয়ে আকাশ থেকে পড়লেন—নাঃ। গুনিয়া, এ চলতে পাবে না। তোমাব পয়সায় তোমাব বাবুব বন্ধুবা বোজ বোজ মাছ খাবেন, আর আমবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, তা হয় না। আমি এবাবে ওঁদেব বলে দেব।

গুনিয়াভাই প্রায় কঁদে পডলো। মা'ব কাছে এবাব থ্রেস্টিজ পাংচাব হয়ে যায় বৃথি।—কিচ্ছি কহিবাব হবনি মা, কিচ্ছি কহিবাব নাই। মূ সব্ব মেনেজ কবি নেবি --কালি সব্ব ফিটফট হেই যিব পবা।

পৰদিন বাবাব বন্ধুদেব চা দিতে বৈঠকখানায় নামিয়েই গুনিয়াভাই কপাল চাপড়ে হাহাকাব কবে কঁদে উঠল—এতদিনেব চেনাশুনো মাছওলাটা, হাযবে তাব সেই দেশোয়ালী ভাইটা, কলেবা হয়ে হঠাৎ এক বাত্তিবেই মাবা গিয়েছে! আব কোন

দিনও আট টাকার মাছ পাঁচ টাকাতে পাওয়া যাবে না তাই। বাবুদেবও সুখের দিন ফুরুল। জীবন বড় অনিতা!—

## ইয়াং সায়েবের গাড়ি

ঠাকুদাদার এক বন্ধু ছিলেন, লক্ষ্মা দাড়িওলা বুড়ো সাহেব। পাদবি নন, কিন্তু তাঁর জীবনটা ঠিক পাদবিদের জীবন যেমন হওয়া উচিত, তেমনি ছিল। বিয়ে করেননি, সাবাটা দিন কাটাতেন বস্তিতে। গবির লোকদের ওষুধ বিলিয়ে, খাবার বিলিয়ে, বাচ্চাদের দুধ বিলিয়ে বুড়োদের চাদর কম্বল, এমন কি বিড়ি পর্যন্ত ইয়াং সায়েব নিজে থেকেই দিয়ে যেতেন। ইংবেজবা আমাদের দেশকে শোষণ করে যে পাপ করেছে, উনি একাই নিজের পকেট থেকে সময় ও টাকা এবং বৃকের ভেতর থেকে ভালবাসা ঢেলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করতেন।

ঠাকুদাও তো বস্তির লোকদের মিনিমাগনা চিকিৎসা করতেন (বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন তিনি), সেই সূত্রেই হয়তো তাঁর ভাব জমেছিল ইয়াং সায়েবের সঙ্গে। ভেবেবেলা দু'জনে একসঙ্গে হেঁদোয় হাঁটতেন। ইয়াং সায়েবের বিবাট বিলিতি কুকুঁবটা আগে-আগে ছুটত। সন্ধ্যাবেলা অনেকসময়ে দু'জনে দাবা খেলতে বসতেন বৈঠকখানায়। ইয়াং সায়েব চমৎকাব বাংলা বলতেন। তাই আমবা ওঁকে ভয় পেতুম না।

আসতেন একটা ছোট্ট টু-সীটার কনভার্টিবলে চড়ে। লোকে বলত “ইয়াং সায়েবের ডিবে”। গাড়িটার গডন সতিই অনেকটা পানের ডিবেব মতন, বংটাও ছিল কম্পোলি। কনভার্টিবলের ছাদটা কালো ক্যানভাসের। গাড়ি ঘাডেব কাছে গলাব চাদবেব মতন ওটা ভাঁজ করাই থাকত চিরকাল, বোদে-বর্ষায় সেটাকে কেউ উঠতে দেখেনি। গাড়িটা চালাতেন সায়েব নিজেই। আব গাড়ি যাত্রী ছিল একটিই মাত্র। পিছনেব ছোট্ট অর্ধচন্দ্রাকার সীটে গম্ভীর হয়ে সোজা বসে থাকত নিউটন। সোনালি বগের দীর্ঘ লোমে ভরা বিবাট বিড়িভাব। ইয়াং সায়েবের পিছু-পিছু বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরত যখন, নিউটনকে দেখাত যেন একটা বাঘের মতন। তেজী কী! বস্তির বাচ্চাবা একটা ঢিল পর্যন্ত মাবতে সাহস করত না নিউটনকে। আমরা কেউই ঠিক জানি না কবে ইয়াং সায়েব ঠিক কী কাজের জন্য প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন। কোনো কোম্পানির কাজেই, না ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। কিন্তু একদিন তাঁর কলকাতাব কাজ ফুরোল। অবসর নিয়ে দেশে যাবার সময় হল। ইয়াং সায়েব রিটারার করলেন।

ঠাকুর্দাকে এসে বললেন, ভয়ানক সমস্যা হয়েছে। নিউটনকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বিলেতেব কুকুব এখানে নিয়ে আসা যায়, কিন্তু এখানে এলেই তাব জাত যায়। সে কুকুবকে আব এ-জন্মে বিলেতেব মাটিতে ফিবতে দেওয়া হয় না। তাব প্রবেশ নিষেধ। কে জানে এখান থেকে কোন বোগবালাই নিয়ে যাবে? অতএব, হুড খোলা গাডিব পিছনেব সীটে খোলা হাওয়ায দটি কান ভাসিয়ে দিয়ে বেডাত যে নিউটন, ইয়াং সায়েবেব সঙ্গে তাব স্বদেশে ফিবে যাওয়া আব হবে না। নিউটনকে অন্য কাকুব হাতে দিয়ে যাওয়াও ইয়াং সায়েবেব পছন্দ হল না, কে জানে তাব ঠিকমতন যত্ন হবে কিনা? তাব চেয়ে সায়েব তাব ডান্ডাবকে দিয়ে নিউটনকে জন্মাব মতন ঘম পাডিযে দেবেন, ঈশ্ববেব কোলে আব তাব অযত্নেব ভয় নেই।

জামাকাপড, বইপত্ৰ, আসবাব, বাসনকোসন, সামানা সংসাব যা কিছু তাব ছিল, বস্তিতে সমস্তই বিলিয়ে দিয়ে, সায়েবেব মনে পডল, গাডিব কথা। গাডি হেন গুণনিধি কাবে দিয়ে যাব? বস্তিতে তো তাব উপযুক্ত বক্ষক নেই।

ছোট্ট পানের ডিবেব মতন গাডি, স্ট্রীয়াবিংয়ে ঝুঁকে পড়ে চালাচ্ছেন বুডো সায়েব, সাদা চুল সাদা দাডি বাতাসে উডছে। পিছনে বসে আছে সোনালি নিউটন। সোনালি কান, সোনালি লোম বাতাসে উডছে। এ-পাডাব অতি পবিচিত দৃশ্য। ডান্ডাব দিয়ে গাডিকে ঘুম পাডানো যায় না, তাই অতি প্রিয় গাডিটি যাবাব দিনে ইয়াং সায়েব তাব প্রিয় বন্ধুকে সমর্পণ কবে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ঠাকুর্দাকেই দানপত্ৰ কবে গেলেন গাডিব চাবিটি। গাডি পার্ক কবা বইল বাস্তায়, আমাদের বাড়িব দোব-গোডায়। চকমেলালো উঠোনেব ভেতবে অনেক জায়গা থাকলে কী হবে, গাডি ঢোকানোব মতন বাস্তা তো নেই।

ইয়াং সায়েব চলে গেলেন, তাব গাডি পড়ে বইল পথে। আমাদেরই বাড়িব সামনে। ঠাকুর্দা, বাবা, কাকা, কেউই গাডি চালাতে জানেন না। বুডো বহিম কোচোয়ান অবশ্য জানে, কিন্তু সে তো অন্য বকমেব গাডি। বাইবে পড়ে-পড়ে অত সাধেব গাডি বোদে-জলে নষ্ট হতে লাগল। আব সেই দেখে পাডাব লোকেবা হায-হায কবতে লাগল প্রতিদিন। বাবা তখন ঠাকুর্দাব অনুমতি নিয়ে পাশেব গলিতে ভবানীবাবুব লোহালক্কেবেব দোকানেব (যাব সামনে ‘ভওয়ানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস’ লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো) ভেতবে তুলে বেখে দিয়ে এলেন ইয়াং সাহেবেব গাডি। তবু তো ঢাকা জায়গায় থাকবে। যাক। এবাবে ঠাকুর্দাও নিশ্চিত, পাডাব লোকও। আব ভবানীবাবুব বাচ্চাদেব তো পোয়াবাবো। আমাদের গাডিটাব ভেতবে বসে বসে কত কিছুই তারা খেলা কবে। আমবা মাঝে-মাঝে রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে উকি মেবে খবব নিয়ে যাই। দিবা খেলাঘব হয়েছে ওদেব। আমাদের একটু-একটু হিংসে হয়। যাব ধন তাব ধন নযকো, নেপোয় মাবে দই।

কিছুদিন বাদে আমাদের সাহেবি মেজোমামা এলেন দিল্লি থেকে। মেজোমামা গাডি-পাগলা লোক। এসেই খোঁজ কবলেন, “কই, কই, ইয়াং সায়েবেব গাডিটা

কোথায় গেল জামাইবাবু ?” তক্ষুনি ‘ভওয়ানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে’ পাঠিয়ে দেওয়া হল মেজোমামাকে। ঘণ্টা কয়েক বাদে নাচতে-নাচতে এলেন মেজোমামা—“চলবে, চলবে—গাড়ি ইঞ্জ ইন ফাইন কনডিশন—দুটো দিন সময় দিন জামাইবাবু, আই শ্যাল টেক ইউ ফর আ ফাইন লং ড্রাইভ।”

দুদিন ধবে ঘাড গুঞ্জে ভবানীবাবুর মিস্ত্রিদেব নিয়ে কী সব যেন কবতে লাগলেন মেজোমামা, গাড়ির কাজকর্ম। তাবপব বাবা গিয়ে ঠাকুর্দার অনুমতি চাইলেন, মেজোমামা কি ইয়াং সায়েবেব গাড়িটা চালাতে পাবেন ? ঠাকুর্দা তো খুব খুশি। নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাজে লাগাই তো ভাল। এ কি সোনা যে সিন্দুকে তোলা থাকবে ? না ঘবেব বউ যে অন্দবমহলে তোযাজ কবে বসিয়ে বাখবে ? যন্ত্রপাতি হল হাত-পায়েব মতন, সদাসর্বদা চালু বাখতে হয়। তবে ঠাকুর্দাকে চডতে যেন বোলো না কেউ। ঠাকুর্দা ওই ‘কুকুবেব সীটে’ বসে পাডা বেডাতে বাজি নন। “নিজে চালাতে জানলে চডতুম।”

তা ঠাকুর্দা না যান, আমবা বাজি। আমবা পাচভাই এবং তিন বোনই বাজি। “অল ইন গুড টাইম”, মেজোমামা হাত তুলে বললেন, “ডোস্ট বাশ, টু বাই টু যাবে সব, ট্রিপ বাই ট্রিপ।”

ও হবি, এটা তো টু-সীটাবই। “পেশেস প্রীজ।”

অবশেষে ভবানীবাবুর দোকানেব সামনে গাড়ি একদিন বাস্ত্রয় নামল। মেজোমামা ড্রাইভার। তাঁব পাশে ঘেষে বডদা। পিছনে ছোট্ট অধচন্দ্রাকৃতি কুকুবেব সীটে ঠাসাঠাসি কবে সগর্বে বসে আছি মেজদা আব আমি। পরেব ট্রিপে মণি-শুভো-অভু-খুকুবা যাবে—ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে ওবা। বড-থেকে ছোট, এভাবে টার্ন আসবে। তাবপব যতই চাবি ঘোবানো হয়, গাড়ি কেবল ঘোঁত-ঘোঁত কবে: নড়ে আব না। ব্যাটাবিতে পবিত্র জল, গাড়িতে তেল, জল, মবিল, চাকায় বাতাস, কোথাও কিচ্ছুর অভাব নেই। গাড়ি তবু স্টাট নিল না। আমাদেব মুখ চুন। মেজোমামা বললেন, “নো প্রবলেম, বসে বসে জং ধবেছে, জাম হয়ে আছে যন্ত্রপাতি—ঠেলা মাবলেই গডিয়ে যাবে। চলবেই।”

সতি। ভবানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসেব কালিবুলি মাখা কয়েকজন মণ্ডামার্কী কুলি-মজুর এসে “হেইয়া” বলে ঠেলা দিতেই অমনি গো-গো কবে গাড়ি স্টাট নিল। তারপব সতি-সতি চলতে লাগল ইয়াং সায়েবেব গাড়ি। আহ্বাদে দোকানেব লোকেরা হেই-হেই কবে হাততালি দিয়ে উঠল, আমবাও জোবসে ঢেঁচালুম, মেজোমামা সকলকে সগৌববে হাত নাডতে-নাডতে এগিয়ে চললেন; যেন বিশ্বপরিক্রমায় বেকচ্ছেন একচাকাব সাইকেলে।

আমবা গলি থেকে বেরিয়ে, আমাদেব বাড়িব সামনে দিয়ে, বড বাস্ত্রর দিকে যাব। তার জন্য আগে থেকেই নানান প্রস্তুতি হয়েছে। ঠাকুর্দা, বাবা, কাকা ফুটপাতে নেমে ফতুয়া পবে, চটি-চটি পায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ। দোতলাব

ঝুলবারান্দায় পিসিমাব দল এসে ভিড় করেছেন। এমন কী, ঠান্ডা আব কর্তামাকে বাবান্দায় এনে, মাদুব বালিস দিয়ে আবাম কবে বসানো হয়েছে। মোকেষ বসে-বসেও লোহাব বেলিঙেব ফাঁক দিয়ে পথেব গাড়ি-ঘোড়া দিবি দেখা যায়। এ-বাড়িব ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজস্ব মোটরগাড়িটি আজ বাস্তব নামছে। ‘শুভ মহববত’ উৎসব, নাকি ‘উদ্বোধন’? প্রথমা পথপ্রবেশ সোজা কথা? সবাই মহা উত্তেজনাগ প্রতীক্ষমাণ। দূর্গা শ্রীহবি, দূর্গা শ্রীহবি। ভালয় ভালয় উত্তবে দিও ঠাকুব।

গাড়ি চলবামাত্রই প্রচুব হাততালি পড়ল। এ-হাততালিব ক্রেডিট অবশ্য আমাদেব নয়, তবু গর্বে আমাদেব বুক ফুলে উঠল। ক্রমশ গলি থেকে বেবিযে মোড ঘূবে গাড়ি আমাদেব বাড়িব কাছাকাছি এসে পড়ল। ইন্দিবা গান্ধী বাস্ত্র দিয়ে গেলেও এই গলিতে এমন ভিড় হবে না। এখন আমাদেব বাড়িব সামনে পাড়াব লোকজন সবাই জড়ো হয়েছেন, কী তীব্র গভীর উৎসাহ। মোডেব পার্মানেন্ট ছেলেদেব মধোও মনেযোগেব একটা স্তম্ভ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। খুব আন্তে-আন্তে গাড়ি বাড়িব দিকে এগোচ্ছে। আমাদেব চুলগুলো কুর্বটাব লগ্না কানেব মতোই বাতাসে লুটোপুটি কবছে। আমবা সগৌববে ঘাড় স্টিফ কবে বাস্ত্র-টাস্ত্র দেখছি। হুডখোলা গাড়ি, খুব আবামেব। “হাওয়া খেতে বেকনো” কথাটাব মানে বোঝা গেল এতদিনে। গাড়িটা যেই বাড়ির সামনে এল, আহ্বাদেব চোটে আমরাও চোঁচালুম, মেজোমামাও চোঁচালেন। গাড়ি দেখামাত্র ফুটপাতে কিউ কবে দাঁড়ানো আমাদেব ভাইবোনেবাও হৈ-হট্টগোল শুরু কবল। মেজোমামা গাড়ি চালাতে-চালাতেই দিবি স্মার্টলি বিলিতি সিনেমাৰ নায়কদেব কায়দায় হাত নেড়ে “ওয়েভ” কবতে লাগলেন দর্শকদেব দিকে। উজ্জ্বল মুখে ঠাকুর্দা, বাবা এবং কাকা সজোবে সাদা-সাদা কমাল নাডতে লাগলেন তাব উত্তবে। দারুণ উত্তেজিত অবস্থা সাবা পাড়টাব। আমবা বাড়িব সামনে দিয়ে যাবপবনাই অহংকৃত মুখে পাস কবাব সময়ে হঠাৎ দোতলাব বাবান্দা থেকে মাল্লিক ফুল-বেলপাতার এক পুঁটলি উড়ে এসে আমাদেব মাথায় ঝপস করে পড়ল। মা-কাকিমাৰা পর্যন্ত বাবান্দায় উল্লাসে হৈ-হৈ শুরু কবে দিয়েছেন। নতুন গাড়িটাকে নতুন ববেব মতই বরণ কবে ঘবে নেওয়া হচ্ছে। কী বিসেপশন।

গাড়ি যখন মোড ছাড়িয়ে বড় বাস্ত্রাব দিকে চলেছে, হঠাৎ বাবা চোঁচিয়ে মেজোমামাকে বললেন, “বডবাস্ত্র অবধি যেও না নির্মল, এখানেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নাও—”

“হবে, হবে।” মেজোমামা সান্ত্বনাৰ ভঙ্গিতে হাত নাড়েন। গাড়ি চলতেই থাকে।

এবাব ঠাকুর্দাব গলা এল, “ভাঙা গাড়ি নিয়ে বডবাস্ত্রয যেও না নির্মল, ঘুরিয়ে ফ্যালো—”

“হবে, হবে।” মেজোমামা হাসিমুখে ফেব হাত নাড়েন, গাড়ি চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। থামাব কোনো লক্ষণ নেই, যেন গড়িয়ে দেওয়া মার্বেল। আমবা মহা খুশি। বৃকের মধ্যে নিঃশব্দ লাউডস্পীকাৰে “চল চল চল। উর্ধ্বগগনে বাজে

মাদল, নিম্নে উতলা ধবণীতল, অকণপ্রাতেব তকণদল” গান হচ্ছে। এমন সময়ে গঞ্জীব সবে মেজোমামা বললেন, “স্কোয়াড, ডু নট প্যানিক! মন দিয়ে শোনো। আমি যেই বলব ‘স্কোয়াড, জামপ অফফ; অমনি তোমবা তিনজনেই গাড়ি থেকে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়বে, বুঝলে? ওপরে হুড নেই, লাফাতে কিছু অসুবিধে হবে না। আব বাঁদিকেব দবজাটাও খুলে দেব।”

“কিন্তু কেন লাফ দেব মেজোমামা?” টামলাইন আব দূবে নয়, স্পষ্ট ট্রাক, টাক্সি, দোতলা বাস যাতায়াত কবছে পঞ্চাশগজের মধ্যে। অবাধ্য হুপিং কাশিব মতন, ইয়াং সায়েবেব নসিার ডিবেব মতন গাড়িটা চলছে তো চলছেই, কিছুতেই থামছে না।

মেজোমামা বললেন, “ব্রেকটা নেই কিনা।”

ততক্ষণে ভয় পেয়ে গেছি। ঠাকুর্দা, বাবা দুজনেই পিছনে ডুয়েটে চোঁচাচ্ছেন, “বড বাস্তাটা আভয়েড কবো নির্মল, ওখানে বড ঝামেলা।”

মেজোমামা আপনমনেই স্বগতোক্তি কবলেন, “ব্রেকটা থাকলে অবিশ্যি অনেক সুবিধা হয়—তবে না থাকলে আব কী কবা? যাক, ওই দুবেব লাল পাঁচিলটার গায়ে আমি খুব লাইটলি একটা ধাক্কা দেব, আব বাঁদিকেব দবজাটা খুলে তোমবা সব বাইবে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু এখনই নয়—আমি যখন বলব ‘ওয়ান, টু, থ্রী—স্কোয়াড জাম্প অফফ...’ সেই তখন। এখন, স্কোয়াড, গেট বেডি—”

সামনেই শুরু হচ্ছে মহেশ গাঙ্গুলিদের আম বাগান। সেই টানা লম্বা লাল ইটের বেঁটে পাঁচিলটার দিকে মেজোমামা খুব আন্তে কবে সাবধানে এগিয়ে গিয়ে একটা ক্যালকুলেটেড টু মাবলেন, বেশ আলতো কবে। “নো অফেন্স টু এনিবডি।”

কিন্তু বিলিতি গাড়ি বলে কথা। তার তেজই আলাদা। মুহূর্তেই পাঁচিল ফুটো কবে একটা ল্যাংডা আমেব গাছেব গুঁড়িতে ধাক্কা মেবে, তবে গাড়ি থামল।

“স্কোয়াড, জা-ম্প অফফ—” বলে টেঁচিয়ে, একমাত্র মেজোমামাই লাফিয়ে পড়েছেন গাড়ি থেকে। ডানদিকেব দবজা খুলে। বাঁয়েবটা আব খোলেননি। আমবা কেউ লাফাতে পাবিনি। উলটে বডদা গুঁটি-সুঁটি শুয়েই পড়েছে। মেজদা আবার আমাকে আশ্রাণ জোবসে জাপ্টে ধবেছিল ভয়েব চোটে। লাফাব কী। চোখ বন্ধ কবে যে যাব কোলেব ভেতবে মাথা নাগিয়ে ফেলেছিলুম তিনজনে। কারুব কিছু হয়নি অবশ্য—কেবল গায়ে ঝরঝর কবে কিছু চুনসুবকিব বৃষ্টি হয়েছে। কী ভাগ্যি, পাঁচিলটা কোমব পর্যন্ত। মহেশ গাঙ্গুলিব আমবাগানে নাকটি, আব ফুটপাতে লেজ (অন্তর্গত আমবাও ফুটপাতেব অংশেই), কোমবে পাঁচিলের অর্ধ-চন্দ্রহাব পরে পার্বতীব মতো সলজ্জ দাঁড়িয়ে বইল ইয়াং সায়েবেব ডিবে—ন যযৌ ন তস্তৌ। স্ক্রীন ভেঙে চুরমাব। কিন্তু আমাদেব কোনো ক্ষতি হয়নি, এককুঁচিও ভাঙা কাচ গায়ে পড়েনি কারুব। বাঁব-গর্বে মেজোমামা বললেন, “এব নাম হচ্ছে ফাইনার টাচেস। বুঝলি?—কাব ব্রট আনডার ফুল কনট্রোল, উইদাউট এনি হার্ম টু দ্য প্যাসেঞ্জারস।” যাত্রী

কেন, স্ক্রীনটি ভিন্ন গাড়িৰ নিজেৰও কোনো ক্ষতি হযেছে বলে মনে হল না। বাকিটা বেশ তো অক্ষতই দেখাচ্ছে। প্যাটন ট্যাক্সেব মতো শব্দ-পোন্দ।

মহেশ গাঙ্গুলিৰ বাগানেৰ মালি কিন্তু 'ফাইনাৰ টাচেস'টা মোটেই বুঝল না। তেঁদে এসে ভয়ানক মুখভঙ্গি কৰে প্রচণ্ড বেগে তেজী ভাষায় সে আমাদেৰ চতুৰ্দশ পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰতে লাগল। তাৰ মথো সাক্ষাৎ দুই পুৰুষ ঠাকুৰ্দা এবং বাবা-কাকা অবিলম্বেই সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠাকুৰ্দা বাস্তব হয়ে বললেন, "গাড়িৰ ব্ৰেকটা কখন গেল, নিৰ্মল?"

"ব্ৰেক তো যায়নি, তাই-মশাই?"

"তবে গাড়ি থামছিল না কেন?"

"ব্ৰেক ছিল না বলে।"

"মোটে ছিলই না? নো ব্ৰেকস আট অল?"

"নাঃ।"

এবাবে বাবা মুখ খুললেন। "অমন গাড়ি তুমি বাস্তব বেব কবলে কী বলে, নিৰ্মল? আব বাচ্চাদেবই বা চডালে কেমন কৰে?"

"কিন্তু আমি তো ওদেৰ প্ৰিপেয়াব কৰেই নিয়েছিলুম। আব ইচ্ছে কৰেই তো বেছে-বেছে এই পাঁচিলেৰ গায় লাইটলি গ্ৰেজ কৰিয়েছি। এটা কাকৰ বেসিডেসও নয়, দোকানপাটও নেই, বাস্তব ব্লক কৰবে না। অসুবিধেটা কী হযেছে জামাইবাবু?"

বাবাবও একই কথা। "বিনা ব্ৰেকে তুমি গাড়ি বাস্তব বেব কবলে কী বলে?"

"আবে, ব্ৰেক দিয়ে কী হবে? আমবা তো দেখছিলুম যে গাড়িটা ঠিকঠাক চালু হবে কি না। গাড়িটা ঠিকঠাক থামবে কি না, এটা তো দেখা উদ্দেশ্য ছিল না? বলুন? লেট আস বি লজিক্যাল।" মেজোমামা স্মার্টলি প্যাণ্টেৰ পকেটে হাত গুঁজে অল্প ঘাড় বেকিয়ে, গ্ৰেগবি পেকেৰ মতো দাঁড়ান। মুখে হাসি।

"লজিক্যালই বটে।" এ-লোককে নিয়ে বিতৰ্ক অসম্ভব। বাবা তাঁৰ শ্যালকটিকে ভাল কৰেই চেনেন। তিনি ক্রুদ্ধ ঠাকুৰ্দাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমাদেৰ সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কাকাকে পাঠালেন মিস্ত্ৰি ডাকতে। মেজোমামা বাবাব সঙ্গে-সঙ্গে বইলেন, হেলপ দেবাব জন্যে, না লজিক বোঝাতে, ঠিক জানি না।

পুত্ৰেৰ বডকুটপ বলে কথা। দাকগ চটে গেলেও ঠাকুৰ্দা মেজোমামাকে কিছুই বললেন না। বাবাও চুপ কৰে গেলেন। মালিকে প্রচুব প্রণামী দিয়ে এবং তক্ষুনি বাজমিস্ত্ৰি ডেকে পাঁচিলটা মেবামত কৰিয়ে তবে ছুটি পেমেছিলেন বাবা। হৈ-হৈ কৰে পথে লোকজন তো আগে থেকেই যথেষ্ট জমেছিল। তাদেৰ দিয়ে ঠেলিয়ে বাবা গাড়িটাকে আবার ভবানীবাবুৰ সেই লোহালক্কডেৰ দোকানেই তুলে দিয়ে এলেন। ঠাকুৰ্দাৰ মনটা খাবাপ হয়ে গেল। আমাদেবও। ইয়াং সায়েবেৰ গাড়ি আমাদেব সইল না। ঠান্ডা বললেন, "গাড়ি চড়বার জন্যে আলাদা কপাল কৰে আসতে হয়।" ঠোঁকবটা মাকে, যেহেতু গোলমাল বাধিয়েছেন তাঁবই ভাইটি। কোথায় ভেবেছিলুম এক-এক দিন এক-একটা নতুন-নতুন জায়গায় বেডাতে যাব। জাদুঘৰ, চিডিয়াখানা, শিবপুৰ,

মল্লিকবাড়ি। টু বাই টু, ট্রিপ বাই ট্রিপ! মেজোমামা থাকতে-থাকতে শিখেও নেব গাড়ি চালানোটা। সব ভেঙ্গে গেল। কিছুই হল না। মেজোমামাবই সামান্য ক্রটিব জন্যে সব নষ্ট। ত্রেকটা ঠিক কবিয়ে নিলেই তো হত। কিন্তু শুভলগ্নটি কেটে গেল।

ভবানীবাবুই নতুন ব্যাটারিটা খাব দিয়েছিলেন পূর্বনোর বদলে। দুটোই ফেবত নিয়ে নিলেন এইবাবে। হবিয়া বিকশাওলা তাব গাড়িব জন্যে সামনেব সীটখানা চেয়ে নিয়ে গেল খুলে। সেই দেখে ভবানীবাবু পিছনেব গদিটাও খুলে নিয়ে বেঞ্চিতে পেতে রাখলেন, খদ্দেবদেব বসানোব জনা। “ঘৃষূল...ঘৃ...ঘৃ...” হর্নটি মেজোমামাব খুব প্রিয় বলে ঠাকুর্দা ওটা খুলে মেজোমামাকেই প্রেজেন্ট কবলেন, তাব দিল্লিব গাড়িব জন্যে।

ইয়াং সায়েবেব গাড়িব কথা প্রায় ভুলেই গেছি, এমন সময় পাডাব আটাকলেব হিন্দুস্তানী মালিক, ওই বামদক্ষপ তেওয়ারিজি, পঁচিশ টাকাত্তে গাড়িব আন্ত ইঞ্জিনটা কিনে নিয়ে গেলেন, আটা পেয়াইয়েব কলটা চালাবেন বলে। হাট ট্রান্সপ্লান্টেব কাযদায় এক অর্থে ইয়াং সায়েবেব গাড়ি কিন্তু এখনও জীবিতই আছে আমাদের পাডায়। গম ভাঙিয়ে ঘবে-ঘবে আটা মযদা সাপ্লাই কবছে সে নিত্য নৈমিত্তিক।

ঠাকুর্দাব কাছে প্রতি বডদিনে ইয়াং সায়েবেব কার্ড আসে—‘গাড়ি কেমন চলছে?’

সত্যবাদী ঠাকুর্দা এব একটা জবাব বানিয়েছেন, অনেক ভেবেচিন্তে। ঠাকুর্দা প্রত্যেকবাবই এই উত্তরটি তাঁব বন্ধুকে নিশ্চিত চিন্তে লেখেন, “শুনে সুখী হবে যে, নানাভাবে তোমাব প্রিয় গাড়িটি এখনও এ-দেশে যথাখই সমাজসেবাব কল্যাণকর্মে লাগছে।”

## চোর-চোর

বোববাব সকালে সবাই মিলে মণিদাব বাড়িতে গুলতানি হচ্ছে, এমনি সময়ে দাদুভাই এসে হাজিৰ। হাতে এক থলে ভর্তি কচি কচি কষুটে আম। দাদুব বাগানে ফার্স্টক্রাস ল্যাংডা হয়। সেগুলো এমনি কাঁচায় তুলে ফেললেন? হায়। হায়। ঝড়ঝাপটা কিছুই হয়নি যে আপনি ঝবে পড়বে। দাদুর কি মাথাখাবাপ হলো? দাদু বললেন:

—“আব বলিসনি, যা কেলেংকারী হয়েছ পাডাতে। কাজ নেই আমাব ল্যাংডা আম খেয়ে। কাঁচা আমেব ফটিক ঝোলই খেয়ে নে। শেষে কি ফাঁসি যাবো, আম খেতে গিয়ে?”



—“ফাঁসি ? নিজের বাগানেব আম নিজে খাবে, এতে তোমায় ফাঁসি দিচ্ছে কে ?”

—“আবাব কে ? মহামান্য সরকারী বিচারশালা। পাশেব বাড়িব কেনটা তো শুনলি ? কর্নেল বাসুব কী হলো ?”

—“সেই গেল বছবে তোমাদেব পাডায় কী সব যেন হয়েছিল, না ?”

—“কী-সব-যেন নয়, খন। খন হয়েছিল। এই আমেব জন্যে। পাডাব ছেলেবা বোজ বাড়িবে আমবাগানে দৌবাতি কবতো, একটা আমও বাখতো না। বাবাবাব বাবণ কবেছে বুড়ো। ছোঁড়াবা কথা শোনেনি। গাছ ভেঙে তচনচ। তাবপব এক বাড়িবে এক বাটা বাদব ছেলে এসে পটকা ফাটিয়েছে—আব কর্নেল বাসুকে কী সব থ্রেটন কবেছে, ইনসালটিং অঙ্গভঙ্গি কবেছে, শেষে এইসা খেপিয়ে দিয়েছে যে মিলিটারী বুড়ো ছুটে গিয়ে ঘব থেকে বাইফেল নিয়ে এসে মাস্তানটিকে শুট করে বসেছে। ছেলেটা পাচিলেব ওপবেই শট ডেড। তাবপব থানা-পুলিশ-কোট কাচাবি, ম্যানসলটাবে দিচ্ছিল ঠেলে পাঁচবছব, বুড়োব উকীল “সেলফ-ডিফেন্স” বঝিয়ে সৃজিয়ে বঝি এক বছব কবেছে। ছেলেটা ওব বাড়িব পাচিল ডিঙিয়ে ভেতবে এসেছিল, কোমবে গোজা ইয়া বড ছুবি, পুলিশ ডেডবডিতে ছুবিটা পেয়েছে। সেইজন্যেই বেঁচে গেল বুড়ো। নইলে হতো ফাঁসি কি যাবজ্জীবন। বুড়োমানুষ, এক বছব জেল খাটতে গেল তো ? ওদিকে একটা ইয়াং ম্যানেব প্রাণটা চলে গেল শুধু শুধু। ওয়েস্টেড। দেখে শুনে আমি শিক্ষা পেয়ে গেছি বাবা। আমাবও বাগানে প্রচুব আম—সাবাদিন বাড়িব ধবে মাস্তান ছেলেদেব দৌবাতি। কারুব সন্তানকে আমি মাবতেও চাইনে, নিজেও মবতে চাইনে, আমও খেয়ে কাজ নেই। ঢেব খেয়েছি, যখন সময়কাল ভাল ছিল। কলা, আম, কিছুই আব পাকতে দেওয়া যাবে না। পাডার ছেলেবা কার্নিশ দিয়ে দিয়ে চলে আসছে বাড়িও ভেতবে—বাইবেব চোবে আব কী কুকীর্তি দেখাবে ? সেদিন বাড়িববেলায় দেখি কাব একটা হাত, জানলাব গবাদে,—আমি— “কে ! কে !” করে যেই চোঁচিয়েছি অমনি ধপাস কবে কে পড়ে গেল বাইবে, সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ কবে কান্না—আমি আব বাইবে বেকই ওনি, দেখিওনি কে পড়ল, কে কাঁদল। তাব পবদিনে ঘুম থেকে উঠে শুনি পাডাব দুটো ছেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দবওয়ানকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেছে—বকে ছুবি ধবে বলেছে—“গেট খলে দাও শিগগিব—আমবা বেকব।” কার্নিশ বেয়ে ঢুকেছিল। কিন্তু পড়ে গিয়ে পা জখম হয়েছে। জখম পা নিয়ে আব কার্নিশেব ওপব চড়তে পাবেনি, —একটা ছেলে অন্য ছেলেটাব ঘাড়ের ওপব পড়ে, দুটোই বেশ জখম। কী কাণ্ড বল দেখি ? প্রতিবেশীর ছেলে সব, কিছু বলতেও পাবব না।”

—“দরওয়ান ঘুমুচ্ছিল কেন, দাদুভাই ?”

—“ঘুমবেনা তো কি জেগে থাকবে ? যতক্ষণ আমি জেগে থাকবো, জেগে জেগে দরওয়ানকে পাহারা দেব, ততক্ষণ সেও জেগে থাকবে, জেগে জেগে বাড়ি

পাহাৰা দেবে। সে যে সাবাদিন টুলে বসে খৈনি টিপবে, বিকশাওয়ালাদের সঙ্গে আড্ডা মাববে, আব পাডাব ঠিকে ঝিদেব সঙ্গে বসলাপ করবে, তাতে বুঝি ক্লাস্তি নেই? বাস্তিবে যেই আমি শুয়ে পড়ব, অর্থাৎ ঘবেব বাতিটি যেই নিববে, অমনি আমাব দবওয়ানও গোঁফে তেল দিয়ে শুয়ে পড়ে।”

—“তুমি জানো? তবে ওকে বাখে কেন? শুধু শুধু?”

—“আমি জানি, কিন্তু চোবেবা তো জানেনা যে ও ঘুমোয়? তাবা দ্যাখে ইয়া গোঁফওলা, মোটা লাঠি হাতে বিবাট ভোজপুৰী দবওয়ান গেটে বসে থাকে। দেখে ভয়ে আব এ বাডি আসেনা।”

—“তোমাকে বলেছে। চোবেবা ঠিকই জানে কোন বাড়িব দবওয়ান ঘুমোয়। —আচ্ছা দাদু, সুলতানকে ছেড়ে বাখেনা কেন?”

—“ছেড়ে রাখি, আব বেচাবী মক্ক? যা লোভী কুকুৰ তিনি। আগেই তো চোবেবা ওকে বিষমাখানো মাংস খাইয়ে মোবে দেবে বে? না বাবা থাক, তাব চেয়ে চেন বাঁধাই থাক, আব চৈচাক।”

—“ভালো। দবওয়ান ঘুমোবে, বিলিতি অ্যানসেশিয়ান বাঁধা থাকবে আব আমাব দাদু ল্যাংডা আম কাঁচাই তুলে নিয়ে ফটিক বোল বেঁধে খাবেন। ভালো। তুমি যেন কী বকম, দাদুভাই।”

—“কিন্তু দ্যাখ, গিবিডিভে আমাদেব মহলানবীশ মশাইয়েব চেয়ে আমি অন্তত ভালো আছি দিদি। তিনি তো বিটাযাব কবে নিজেব বাড়িতে থাকতেই সুযোগ পেলেন না। কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া কবে থাকেন।”

—“কেন?”

—“ওই ফলচোবেব দৌরাতিতে। আবাব কেন। ওঁদের বাগানে গবমকালে প্রচুব আম হয়, লিচুও হয়। আর ভয়ঙ্কৰ চুবিও হয়। ওঁব দবওয়ান আবাব খুব বিবেকবান —সাবাবাত ধবে মশাল জ্বেলে হৈ-হল্লা কবে চোব তাডায়। ব্রহ্মজ্ঞানী মহলানবীশের এত অশাস্তি সহ্য হয়না। উনি দবওয়ানকে বললেন—এবাব থেকে সে গ্রীষ্মেব তিনমাস বাড়ি চলে যাবে, অ্যানুয়াল লীভে। ছুটি কাটাতে উনিও কলকাতায় চলে আসেন, যাতে চোবেবা নির্বিঘ্নে কাজটাজ সাবতে পারে। বেশ চলছিলো, কিন্তু তাবপবেও আবাব ঝামেলা বাঁধতে লাগলো। পূজোব ছুটিতে চেঞ্জারবা সব আসে। তখন ওঁব বাগানে খুব আতা হয়। আব পেযাবা পাকে। চেঞ্জারবেব উৎপাতে দবওয়ান পুনবায় ভয়ঙ্কৰ হৈ চৈ আরম্ভ কবে দিলে। মহলানবীশ এতই ভদ্মলোক, চোবেদের ডিস্টার্ব কবাব ভয়ে উনি এখন শীতেও গিবিডি যান না, গ্রীষ্মেও গিবিডি যান না।”

মণিদা বলে উঠলেন—“দাদুভাই, তোমাব মহলানবীশের চেয়ে আমার শ্বশুরমশাই কিছু কম যান না। দেওঘৰ বেড়াতে গিয়ে সে বছর কী কেলেংকারী। রুবি এদিকে নেই তো? শুনলে চটে যাবো।”

—“নেই, নেই, বৌদি রান্নাঘরে। বলো, মণিদা বলো। কী হয়েছিল দেওঘরে?”

—“শোবার আগে বোজ বোজ উনি নিয়মিত আমাদের কাউকে ডেকে বলতেন—‘একটু দ্যাখো দিকিনি খাটের তলাটাঘ টর্চ ফেলে, কেউ লুকিয়ে নেই তো? আমরা আবার কোমবে বাত নিচু হতে পারিনে।’ তাবপব আমবা লাইন ক্লিয়ার সিগন্যাল দিলে তিনি গিয়ে মশাবীতে ঢুকতেন। পাশেই থাকতো লণ্ঠন। সায়েন্সেব প্রফেসরব বলে কথা। কী সব হিসেব কবে দেখেছেন যে বিশেষ বিশেষ আঙ্গলে লণ্ঠনটা দুলিয়ে-দুলিয়ে দেখলে, খাটের নিচেয কোনো জিনিস থাকলে ওদিকে দেয়ালেব গায়ে তাব ছায়া ফেলা যায়। বাত দেউটা নাগাদ ওঁকে নিয়মিত একবার বাইবে যেতে হতো। তখন উনি আগে লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে খাটের পাশে দোলাতেন। দুলিয়ে দুলিয়ে দেখতেন দেয়ালে চোবেব ছায়া পডছে কি না। পডছে না দেখে নিশ্চিত হয়ে তবে পা দুটি নামিয়ে চটি গলাতেন। বেকবাব সময়ে বাইবে হুডকো টেনে দিতেন, যাতে কেউ ঢুকতে গেলে শব্দ হয়। একদিন আমবা ওঁকে জিজ্ঞেস কবলুম, ওঁব এত চোবেব ভয় কেন, সঙ্গে তো তেমন দামী কিছুই নেই। শ্ৰুংবমশাই মুচকি হেসে বললেন—‘চোবে চুবি কববে, তাতে আমার কী? আমার ভয় অন্য। সে যদি খাটের নিচে ঢুকে বসে থাকে, আব আমি পা দুটি নিচে নামালেই যদি টেনে ধবে? চোবে হঠাৎ পা ধবে হাঁচকা টান মেবে আমাকে আছাড় খাওয়াবে, এ আমার সহ্য হবেনা বাপু, আমি কোমবে বাতের কণী।’

তখন আমবা বললুম—‘কিন্তু চোব আপনাব পা ধবে টেনে জানান দেবে কেন যে সে ঘরে ঢুকেছে? আপনি বেকলেই সেও মনেব আনন্দে চুবি কববে। তাবপবে আপনি ফিবে এসে শুয়ে পডলে, সে চুপিচুপি পালিয়ে যাবে।’ শ্ৰুংবমশাই একগাল ঝকঝক হাসি হেসে বললেন—‘এসব তো লজিকের কথা। চোবেব কি লজিকের জ্ঞান আছে? সে তো সর্বদা প্রাণভয়ে ভীত, টেনশনেব শিকার, সে কী কবতে কী কবে ফেলবে তাব কিছু ঠিক আছে? মানুষ জেগে উঠেছে টেব পেলে চোবেব কি আব কাণ্ডজ্ঞান থাকে?’

একদিন ওঁকে পবীক্ষা কবাব জন্যে আমি আব স্বপন, আমার শালা, একটা যৌথ প্ল্যান কবলুম। স্বপন খাটের তলায় নিচে ঢুকে থাকবে, আমি দেখে বলবো ‘খাটের তলায় কেউ নেই বাবা।’ তাবপব বাপ শুয়ে পডলে খানিক বাদেই ছেলে হাচকা কবে জানান দেবে। তখন শ্ৰুংবমশাই কী কবেন, সেটাই আমাদের দৃষ্টব্য। বদিকে কিছু বলা হলো না, সে বাগড়া দেবে বলে। শ্ৰুংব তো শুয়েছেন। একটু বাদেই খাটের নিচে খচ মচ শব্দ। শ্ৰুংব লণ্ঠনটা বাডালেন, যথাবিত্তি সায়েন্টিফিকালি দোনাতেও লাগলেন এবং দেয়ালেব গায়ে ছায়া পডলো, খাটের নিচে গুটিগুটি মেবে থাকা মানুষেব।

শ্ৰুংব গলা-খাঁকবি দিলেন।

খাটের তলায় তাব ছেলেও গলা-খাঁকারি দিল।

শ্ৰুংব তখন বললেন—‘এই যে চাবীটা ফেলে দিচ্ছি, ট্রান্সেব ডান-দিকে টাকাকড়ি

আর কাপডচোপড। বাঁদিকে আমার ফাইলপত্র গোছানো আছে, ওতে যেন হাত দেবেন না। আমি একটু বেরুচ্ছি। দোব খোলাই রইলো, কাজ সাবা হলেই আপনি চলে যাবেন, যাবার আগে লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে যাবেন। আমার হাতে টর্চ থাকছে। তাহলেই আমি বুঝবো, আপনি আব এ ঘবে নেই। এখন আমি চটি জুতো পবতে পা-টা নামাচ্ছি। আপনি দয়া কবে আমার পা ধবে টানবেন না যেন, এই মাত্র একটাই বিকোয়েস্ট।’ গভীরভাবে শশ্ববমশাই চাবী ফেলে দিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে বাইবে চলে গেলেন। তাবপব টর্চ হাতে কবে অনেকক্ষণ পিছন ফিবে উঠোনে দাঁড়িয়ে বইলেন। চোবকে চুবি কববার টাইম দিতে। এক সময়ে ঘবে উকি মেবে দেখলেন লণ্ঠন নেবানো। তিনি এবাব নিশ্চিত হয়ে ঢুকে দোব বন্ধ কবে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে দেখেন তাব চাবীও বালিশেব তলায়, ট্রাক্সও বন্ধ। কিছুই চুবি যায়নি। তখনই কিন্তু তাব নার্ভাস ব্রেকডাউনের মতন ভয়ানক অবস্থা হলো। তবে কি সবটাই স্বপ্ন? খাটের নিচে, কেউ গলা-খাঁকাবি দেয়নি? দেয়ালের ওই ছায়াটাও কি তবে তাঁবই কল্পনাব? উনি কি তবে চোবকে চাবী ছুঁড়ে দেননি? অথচ স্পষ্টই মনে পড়ছে, চাবীটা ছুঁড়লেন। লণ্ঠনটাই বা নেবালো কে তাহলে? লণ্ঠন তো নেবানো হয়েছিল নিশ্চিত।

তবে কি চোব নয়? ভূত?

এই বয়সে নতুন কবে ভূতে বিশ্বাস কবতে হবে? না—এ আবো ভয়ানক ভাবনা। শশ্ববমশাই সত্যি অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়লেন। ওঁব অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আমি আব স্বপন তাড়াতাড়ি কনফেস কবে ফেললুম—সত্যি সত্যি কোনোদিন চোব এলে উনি কী কববেন সেটা জানতে ইচ্ছে হয়েছিল বলে আমবা এই কুকর্মটি কবেছি। উনি কিন্তু একটুও বাগ কবলেন না। খুব হাসলেন, উপভোগ কবলেন। একটা ক্রাইসিস নিজেই বা কী ভাবে ফেস কববেন জানতে পেরে নিজের ওপবেও তখন খুব প্রীত উনি। বাবাব বলতে লাগলেন,—‘নাঃ, বিপদে যে আমার মাথাটা এখনও ঠিকই থাকে সেটা স্বীকাব কবতে হবে বৈকি।’

‘‘তোমবা কেবল এইটাই প্রমাণ কবলে যে বিপদে আমার বাবা তোমাদের মতন বৃদ্ধি হাবনা না।’’ চা নিয়ে বাবাকে সাপোর্ট কবতে কবতে কবি বৌদিব প্রবেশ। নৌদি শেষটুকু শুনেই ধবতে পেবেছেন পুবো ব্যাপাবটা কী। মণিদাব দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন—

—‘‘বাবাব নামে লাগানো হচ্ছে? আমি তবে তোমাব নিজের কথাটা বলে দিই? ভূপালে তুমি কী কবেছিলে?’’

—‘‘কী? কী কবেছিল মাগদা?’’ সকলেবই প্রবল কৌতূহল, প্রচণ্ড উৎসাহ, কী ছানস্পৃহা। দাদবও উৎসাহ আছে বলে মনে হলো—‘‘মণি আবাব কী কবেছিলো, ডাকাতি নাকি? ওখানে তো সবাই ডাকাত!’’

—‘‘ডাকাতি, না আবও কিছু। ওব নিজের কি চোবের ভয় বাবার চেয়ে কিছু

কম নাকি? কলকাতায় থাকলে ওব নাকি ভয় কবে না। কলকাতায় যেন চোব নেই। কিন্তু কলকাতাব বাইবে একদিনেব জন্যে গেলেও তিনি চোরেব ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন। কোথাও কোনো বাংলায় রাত কাটালে তো আমাব প্রাণান্ত। সাবাবাত ধবে সবকাটা জানলা দবজা কেবলই টেনে টেনে ডাবল চেকিং হচ্ছে। ভূপালেব বাড়িটায় মোট এগাবোটা দবজা ছিল বাইবে বেকনোব। তোমাদেব মণিদাব কষ্ট বঝতেই পাবো। মাঝবাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো কবে তাবপব শোবাব আগে ওঁকে ঘুবে ঘুবে এগাবোটা দরজাই বোজ হডকো টেনে 'ডাবলচেকিং' কবে তবে শুতে হয়। আবাব একবাব কবে টানলেই হবে না। তিনবাব কবে খিল ধবে টেনে দেখা চাই। ব্যাপাবটায় আমাব তিতিবিরল্লে লাগতো। আমি আধখানা ঘুমিয়ে উঠে শুনতুম হডকো টানটানি হচ্ছে। বোজই বাবণ কবি, শোনে ন। বলবেন:

—‘নাঃ, এ বাবা মধ্যপ্রদেশ. এখানে সব চন্দ্রলেব ডাকাতগুলো ঘোবায়েবা কবছে —কবি, খুব সাবধান’ —এমনিভাবে বাতেব পব বাত। একদিন মাঝ বান্তিবে যেই ‘খিল চেকিং’ কবতে গেছেন হটাৎ একটা খিল কজাসুন্ধুই উপড়ে ওঁব হাতে খলে এলো। দোব আব বন্ধই হয়না। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘবে কালিয়ে যেতে লাগলো। মহা মশকিল। উনি তো আমাকেই ডাকাডাকি শুরু কবেছেন। ‘ওঠো, কবি, উঠে ব্যবস্থা কিছু কবে দাও।’ একেই শীতেব বান্তিব. তায এই হডকো টানটানি আমাব দৃচ্কেব বিষ—আমি কেন উঠবো? আমি পাশ ফিবে শুয়ে লেপমডি দিয়ে বললুম—‘কী আব হবে. এখন সাবাবাত দোবে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো—তোমাব লেপটা ববং নিয়ে যাও—মুডিসুডি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কম কষ্ট হবে। বোজ বলি তো? খিল তো মানুষ নয়, আমাব মতন, যে বোজ বোজ তোমাব অভ্যাচাব সহ্য কববে?’

এইখানে মণিদা বললেন,—‘আহা থাক না ওসব পুবনো কাসুন্দী’—

—‘থাকবে কেন? তাব পবেবটাও শুনক ওবা? তাব পবেবটাই বা বাদ থাকবে কেন?’

—‘কী হয়েছিল? তাব পবে কী হয়েছিল?’

—‘তোমাদেব মণিদা তখন দোবেব মুখে বেখে দোব বন্ধ কববেন বলে একখানা আলমাবী টেনে আনতে গেলেন। ওইবকম ব্যায়ামকবা শবীবে আলমাবী টেনে আনাটা কিছুই নয়। কিন্তু আলমাবীটা ছিল আমাব যত তোলা কাচেব বাসনে ভর্তি। যেই হিচড়ে টানা—অমনি সব দামী বাসনকোসন পড়ে গিয়ে ঝন ঝন কবে ভেঙেচবে কেলেংকারী শব্দ শুরু হয়ে গেল। মোঝেব ওপব মালভর্তি আলমাবী টানাবও তো শব্দ আছে? পাশেব ফ্ল্যাটেব বাসিন্দাবা ঘুম-টুম ভেঙে হৈ হৈ কবে উঠল—‘চোড়া। চোড়া। ডাকু। ডাকু।’ —বাস্তা দিয়ে পাহাবাওলা যাচ্ছিল, সেও এসে পডল. ‘কৌন হায বে—ক্যা হ্যা বে’—ওদিকে তোমাদেব ভাইপোটিব ঘুম ভেঙে উঠে ভীষণ বিবল্লে হয়ে গিয়ে গাঁক গাঁক কবে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু কবে দিলো। গণ্ডগোলে বাস্তাব নেডিকুণ্ডাবা ভয়ানক খেউ খেউ কবতে লাগলো—তোমাদেব মণিদা তখন

সেই প্যাণ্ডিমোনিয়ামের মধ্যে প্রতিবেশীদের সবাইকে বোঝাচ্ছেন যে খিলটা চেকিং কবতে গিয়ে খুলে এসেছে মাত্র, আব কিছুই হয়নি।”

—“আব তুমি নিজেবটা বললেনা? কাচের বাসন ভেঙেছি বলে আমাকে কী প্রচণ্ড হেনস্তাটাই কবেছিলে সকলের সামনে?”

—“তা বলবোনা?” বউদি কাঁদো কাঁদো —“তোমবাই বলো বিয়েতে আমাব বাবাব দেওয়া সেই অমন দামী জার্মান ডিনার সেটটা? উনিই তো সেটাব আদ্বেক ভেঙে ফেললেন, সেদিন, আব ও-সেট কমপ্লীট হবে না। আব জাপানী সেই বঙ্গিন কফি সেট, যেটা তোবা জাপান থেকে এনে দিয়েছিল—সেটাও মাত্র তিনটে কাপ আছে। একটাও প্লেট নেই—সব উনি শেষ কবেছেন। ফিনল্যান্ডের সববৎ সেট খতম। তোবাই বল, চোবে এসে এর চেয়ে আব বেশি কী ক্ষতি করে যেতো আমাব?”

এবার দাদুভাই হাসিহাসি মুখে বললেন,—“তবেই দ্যাখ, ল্যাংড়া আমেব চেয়ে ফটিক ঝোলই ভাল। ঠিক বলিনি দিদু?”

## মেজকাকিমার গল্প

মেজকাকিমার অনেক গল্প। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। এই কালকেবটাই আগে বলা যাক। ছোটকাফু অফিস থেকে দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে বাড়ি আসেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস কবছেন, “মেজবৌদি, আমাব কোনো চিঠি এসেছে?”

মেজকাকিমা বললেন, “চিঠি? তা তুমি আসছো না, আসছো না, আমি তো বান্নাবান্না সেরে তোমাব জন্যে বাবান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি পিয়ন আসে কি তুমি আসো, এমন সময় পাশের বাড়ির সোমাব মায়েব দেখা পেলুম। সোমাব মায়েব খবব তো জানো? তাব ভায়েব চোখে অপাবেশন হয়েছে, ম্যাড্রাসে গেছে। সেই সময়েই আবাব তাব মায়েব হলো হার্ট আটাক। সেও হাসপাতালে। বেচারী একলা ভেবে ভেবে অস্থির। ম্যাড্রাসে ভায়েব খবব নেবে, না পি. জি-তে মাকে দেখতে যাবে, সে এক বিতিকিচ্ছিব অবস্থা। তা সোমা অবিশ্যি খুব শক্ত মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন হলে লোকে অমনি শক্ত হয়ে যায়। সে বললে, মা, তোমাকে ম্যাড্রাসেব কথা ভাবতে হবে না, তুমি পি. জি-তেই যাও। কী সুবুদ্ধি, ভেবে দ্যাখো একবাব ঠাকুরপো? অতটুকুনি মেয়ে, কলেজে পড়ছে মান্ডব। তারপব সোমাব মা তো চলে গেল, আমি ভাবলুম সোমার জন্যে তো পান্ডর দেখা উচিত এবাব।

মেয়ে বেশ বড় হয়ে গেছে। বাস্তা দিয়ে উমেশবাবু যাচ্ছিলেন। দেখেই মনে হলো উমেশবাবুর চাব ছেলেব তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিলেতে, না আমেরিকায়, খড়গপুরে না দুর্গাপুরে, কোথায় না কোথায় যেন ছেলে চাবটেই দূরে দূবে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বয়েছে। কোনোটা পড়ছে, কোনোটা বা চাকবি করছে। কে যে কেমন পাত্তব হয়েছে, ঠিক জানি না। উমেশবাবুকেই ববং ডেকে জিজ্ঞেস করি। তা উমেশবাবু তখন পোস্টাপিসে যাচ্ছিলেন বিলেতেব না আমেরিকাব চিঠি ডাকে দিতে। তাঁকে বলে দিলুম ঐ সঙ্গে আমার জন্যেও খান দুই পোস্টকার্ড এনে দিতে। বললুম, দাঁড়ান, তিবিশটা পয়সা নিয়ে যান, তা উনিও দাঁড়াবেন না, আমিও ছাড়বো না। ঐ কতকতে ছেলেবা কে কী কচ্ছে, কে কী পড়চে সেসব জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেলুম। বয়েসেব দোষ আব কী, তা উমেশবাবু—”

ছোটকাকু ডাল শেষ কবে চচ্চডি মাখতে মাখতে বললেন, “মেজবউদি, আমাব কি কোনো চিঠি এসেছে?”

“সেই কথাই তো বলচি, তা পিয়নেবও দেখা নেই, তোমাবো দেখা নেই, বাবান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম মাথায় তেলটা মোখে নিই। তা তেলের যা অবস্থা হয়েছে। জবাকুসুম-কাস্ত্রুবাইডিন তো মাখিইনি, একদম প্লেন নাবকেল তেল। তাতেই কী খর্চা, কী খর্চা। মাঝে মাঝেই ভাবি, দুব ছাই চুলে তেল দেওয়া ছেড়েই দেবো। তা পাকা-কাঁচা যাই হোক চাট্রিখানি চুল তো আছেই মাথায়, তেল না দিলে মাথা যেন ফেটে যায়, বাগ কবে দুদিন তেল না মাখলেই প্রেসাব চড়ে যায়। সে আবেক কেলেঙ্গাবী। তা আজকাল সিংঘী মার্কী বদল কবে পাবাসুট মার্কী কিনছিলুম, এখন আবাব সেটাও বদল কবে—”

এবাব মাছেব কাঁটা বাছতে বাছতে কাকু বললেন “মেজবউদি, আমাব কোনো চিঠি এসেছে?” চিবপ্রশান্ত চিবসুস্থিব ছোটকাকু ধৈর্যভবেই প্রশ্ন করেন।

“আহা-হা, সেই কথাই তো হচ্ছে। এতটুকুতে এত অধৈর্য হলে চলবে কেন? ওই চিঠিব কথাই তো হচ্ছে। তা, আমি ভাবলুম পিয়নেব তো দেখা নেই, ববং তেলটা একটু চাঁদিতে ঘষেই নিই, তাবপব তেল মাখতে মাখতে দেখি, কি সব্বোনাশ। ও-বাডিব চাঁদুব ছেলেটা ন্যাডা ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওবে বাবা বে—এই ন্যাডা ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোব মতন এতদূর ডেনজাবাস খেলা আর নেই। আমি তো অমনি চেঁচাতে শুরু কবেছি। অ চাঁদু! অ চাঁদু। তাব ছেলে যে পড়ে মোলো বে। কী কচ্চিস? আগে ছেলেকে নামা। তা চাঁদু বাড়ি ছিল না, সকালবেলায় এই সময়ে অবিশ্যি সে থাকে না কোনোদিনই, তাব তো বোজই আপিস—সেই সূযোগেই ছেলেটা ছাদে উঠেছে, তাদের ইঙ্কল সব বন্ধ কিনা? গরমেব ছুটি দিয়ে দিয়েচে এব মধ্যেই—ইঙ্কলগুলো যে ক’টা দিনই বা খোলা থাকে, আব কটা দিন বন্ধ—”

“মেজবউদি?” ছোটকাকু কাঁচা আমেব ফটিক ঝোলে চুমুক দিয়ে গোফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন “আমাব কি কোনো চিঠিপত্তব এসেছে?”

“আহা, চিঠির কথা বলছি না তো কী কথা বলছি আব ? ভাবলুম তেলটা যখন মাখা হয়ে গেল, একেবারে গামছাটা নিয়ে, কাপড়-চোপড় নিয়েই নিচে কলতলায় নাবি। তোমার ডাকবাক্সটাও দেখা হবে, চানটাও সাবা হবে—এমন সময়ে সাবিব টেলিফোন এলো। সাবিব শাশুড়ি যায়-যায় জানোই তো ? সাবিবের বাড়ি টেলিফোন নেই, খবর যা কিছু আমাব এখানেই দেয়। আমি তখন কী কবি ? কেমন কবে সাবিকে ডেকে পাঠাই ? ঘবে তো কেউই নেই, তখন বললুম—তা খবরটা বরং আমাকেই দিয়ে দাও। দুপূর্ববেলা যখন ছোট্টাকুবপো ভাত খেতে আসবে তাব হাতে সাবিকে খবর দিয়ে দেবো। তা, হাতে তেল নিয়ে ফোন ধবা যদি বা যায়, কলম ধবা বডই শব্দ। তখন সাবির দেওবকে বললুম, ধব, তেল হাতটা ধুয়ে আসি।”

দইয়ের বাটিটা নামিয়ে বেখে ছোট্টাকু বললেন, “মেজবৌদি, আমাব কি কোনো চিঠি—”

“আহা, শোনই না সবটা, এত অধীর হলে কি সংসারে চলে ? আপিসেব কাজকর্ম কবেই বা কেমন কবে তোমাবা ? তাড়াতাড়ি তেলহাত ধুয়ে সাবিব দেওব যা যা বললে সব একখানা কাগজে লিখে নিলুম। সেই চিঠি লিখে ওকে বললুম, ছোট্টাকুবপোকে দেবো—সে ঠিক ভাত খেয়ে আপিসে যাবাব পথে সাবিকে দিয়ে যাবে তাব শাশুড়ীব খবরটা। চিঠি চিঠি কবে যে পাগল কবে দিচ্ছে, তা সেই চিঠিব কথাই তো বলছি। শুনলে তো ?”

ছোট্টাকু হাত ধুয়ে মেজকাকিমাৰ হাত থেকে মশলা নিয়ে খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, “তাহলে, মেজবউদি, সাবিব চিঠিটাই দিয়ে দাও। যাবাব পথে দিয়ে যাচ্ছি।”

“সে কি আব আছে ? বাস্তা দিয়ে তক্ষুণি মনমোহন ছুতোব মিস্ত্রিবি যাচ্ছিল, সে তো সাবিবের পাশেব বাড়িতেই কাজ কবছে। তাব হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তখন তখনই পেয়ে গেছে। ওসব খবর ফেলে বাখতে হয় ?”

ছিটকিনি খুলতে খুলতে ছোট্টাকু বললেন, “তাহলে আজকে সকালেব ডাকে আমাব কোনো চিঠি আসেনি ?”

মেজকাকিমা পিছু পিছু গেছেন দেওবকে এগিয়ে দিতে। ফস কবে জ্বলে উঠলেন, “কে বললে আসেনি ? আমি কি বলেছি একবাবও যে তোমার কোনো চিঠি আসেনি ? কেন আসবে না চিঠি ? আমি পিয়নকে দেখতে পাইনি বলেই যে চিঠি আসবে না তেমন কি কোনো নিয়ম আছে ? এই তো তোমাব দ'খানা পত্ৰব এসেছে। এই দবজাব কাছেই টেবিলেব ওপব খববেব কাগজ চাপা দিয়ে তুলে বেখেছি, পাছে উড়ে যায়।”

খববেব কাগজেব গোছা তুলে বীবদর্পে মেজকাকিমা দুটি খাম এগিয়ে দিলেন ছোট্টাকুর হাতে।



## (২) অতিথিসংকার

কেউ যদি কড়া নেড়েছে তবে তাব আব বন্ধে নেই। অমনি মেজকাকিমা চেঁচাবেন, “বউমা, বউমা, মিষ্টি আনো, শববং করো, অতিথিনারায়ণকে অমনি ফেবাতে নেই।” তাবপব তো দবজা খোলা হলো। মেজকাকিমা ছুটে এসে মোড়া পেতে দিয়ে পাখা খুলে বলবেন, “কাকে চাই আপনাব ?” যদি অচেনা হয়, তবু—“বউমা, শববং করো, মিষ্টি আনো।” তিনি হয়তো কোনো সেলস বিপ্রেজেনটেন্ট। ভাব দেখে লজ্জা পাচ্ছেন। এখন অতিথি বলতে সব বাড়িতেই এঁবাই প্রধান। এবোপ্লেনেব স্টকেস, ইলেকট্রিকেব বাঁটাবালাতি, গ্যাসেব উনুন, বাসনকোসন, তেল, সাবান, খাবাব-দাবাব, কী না আনেন এঁবা ? এমনকি অস্তর্বাস পর্যন্ত। মেজকাকিমা সব কিছুই দেখা চাই। শোনা চাই। তাবপব অতিথিকে মিষ্টিব থালা দিয়ে শববং খাইয়ে জিনিসপত্র কিনে, বিদায় করা চাই। জিনিস লাগুক না লাগুক মেজকাকিমা কিনবেনই। যদি না বড্ড বেশি দামী হয়। শ'খানেকেব মধ্যে হলে তাকে খালি হাতে ফিবতে হবে না এই বাড়ি থেকে। মেজকাকিমা কল্যাণে বাড়ি খেলো সাবানে, জোলো ফিনাইলে, বেফিট অস্তর্বাসে, স্যানিটাবি ন্যাপকিনে, শ্যাম্পুতে, পাউডাবে, ম্যাগিতে, বোনিভিটাতে ভর্তি। অতিথিকে ফেবাতে কষ্ট হয় মেজকাকিমা। এত বোদুবে আহাবে লোকেব দোবে দোবে ঘুবছে, ওদেব বুঝি কষ্ট হয় না ? কিছু না কিনলে চলবে কেন ? আজ দবকাব নেই ? কাল হবে। যাকে বাখে সেই রাখে। মেজকাকিমা লক্ষ্মীব ভাণ্ডাব। বডবউদিব মতো এমন পুত্রবধু জগতে হয় না। বডবউদিব সহোব সীমা নেই। ভালোবাসার অন্ত নেই। আমবা অধৈর্য হয়ে যাই, বউদি গুধু হাসেন। দাদাব মৃত্যব পব থেকে বডবউদি একদম এক। দিনেব বেলাটা ইস্কুলে পড়ান, বাকি সময়টা মেজকাকিমাকে নিয়ে। মেজকাকিমা তাঁব অতিথিদেব গলা নীচু করে বলেন—“বডবউমা আবাব একটু কৃপণ আছে, ছোট্ট ছোট্ট গেলাসে শববং দেয়, আটআনা দামেব বসগোল্লা আনায, তবু দেয় তো। আমাব মেয়ে হলে ? ও বাবা, এ যদি সন্ধ্যাবানী হতো, কিছু দিতোই না। এই দিচ্ছি মা দিচ্ছি মা কবেই সন্ধ্যা উংবে দিত। তোমবা চলে যোতে। চিবকাল কি কেউ জলখাবাবেব লোভে লোভে বসে থাকতে পাবে ?” তখনও জলখাবাবেব আশায়-বসে-থাকা, অথবা জলখাবাব-খেতে-বাস্ত অতিথিরা এই অতি স্পষ্ট কথোপকথনে যারপবনাই অসন্তি বোধ করেন, কিন্তু অনুপায়। না খাইয়ে ছাড়বেনও না মেজকাকিমা। লৌহভীমচূর্ণ কবাব মতো যত্ন তাঁব। “হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে বলত, ‘মা, তোমাব সবটাতে বাড়বাড়ি। এসেছে জিনিস বেচতে। তোমাব আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়, জ্ঞাতপুত কেউ নয়, তাকে মিষ্টিব থালা ধবে দেবাব কী দবকাব।’ আমি বলি, কী দবকাব সেটা তুই কি বুঝবি বে সন্ধ্যা ?, বুঝি আমি আব বোঝে তাবা। আমার এতেই পুণি। অতিথি, অতিথি। কী জনো

এসেছে, চাঁদা চাইতে না সাবান বেচতে, সে আমাব জেনে কাজ নেই, যেই এ বাড়িতে পায়েব ধুলো দেবে, সেই নারায়ণ, তাকে সেবা কৰা অবশ্যকর্তব্য।” বক্তৃতাব পৰ বৈশিব ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু শববৎ খেয়ে চলে যান, মিষ্টিৰ থালায় হাত দেন না অতিথিবা। এতো গেল অচেনা অতিথিদেব বেলায়। যখন সতিা চেনা ‘লোক, মেজকাৰুিমা উচ্ছসিত। “এসো, এসো বউমা, খাবাৰ সাজাও, বুলু-বাচ্চু এসেছে, বউমা, খাবাবটা সাজাতে কত দেবি কবছে। বুলু-বাচ্চুকে আৰ কতক্ষণ বসিয়ে বাখবে। বউমা খাবাব থালাগুলো তুলে নাও, বুলু, বাচ্চুকে হাত ধোবাৰ জল দাও, ওবা এবাব চলে যাক, ভীষণ ঝাড উঠবে মনে হছে আব বসে কাজ নেই।” অথবা, বুলুব বাচ্চা ছোট, বাড়িতে বেখে এসেছে আব কতক্ষণ বসবে এখানে। অথবা বাচ্চু বাস্তায় গাডি পাৰ্ক কবে বেখেছে, কেউ না চুবি কবে নিয়ে যায়। ওদেব ছেড়ে দাও ট্রামবাসে ভীষণ ভিড হয়ে যাবে এবাব, ওদেব এক্ষুণি না গেলে নয়। অথবা কান্তিক মাসেব কাঁচা হিম লেগে যাবে মাথায় আবও দেৰি কবে গেলে। অথবা বুলুব ময়েব শরীৰ ভাল নয়, বেশিক্ষণ বাড়িব বাইরে থাকা উচিত নয় ওব অথবা এই বেলা না গেলে রোদটা আবও চড়ে যাবে, ওবা বৰং বেলাবেলি চলে যাক—মেজকাৰুিমাৰ বাড়িতে ওজবেৰ সংখ্যা অগুস্তি। ঋতুমায়িক রোদ আসা, হিম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, ঝাড, বিষ্টি, চোব-ডাকাত, নয় তো বাড়িতে মা, শশুৰ, ছেলপুলে, নয় তো চাকৰি-ৰাকৰি, নয় তো, গাডিতে ভিড, শেষ অবধি গাডি চুবিব ভয় পৰ্যন্ত দেখান মেজকাৰুিমা। আত্মীয় বন্ধুদেব খাওয়া হলেই আব এক মিনিটও নয়, তক্ষুনি বিদেয় কৰা চাই। বসতে দেন যতক্ষণ খুঁশি কেবল সেলসগার্ল-সেলসম্যানদেব। ওবা তো ‘বেডাতে’ আসেনি, ‘কাজে’ এসেছে। ওদেব কথাই আলাদা। সতিা কথাই তো।

### (৩) পয়া-অপয়া

“এই যে, এই কাপডটা আব পৰবো না বউমা, তুলে বাখো”—মেজকাৰুিমাৰ হাতে ফৰ্না কালাপোড়ে শান্তিপূৰী ধৃতি একটি। মেজকাৰুিমা বললেন, “বড বিস্তী কাপড এখানা বউমা, এটা পবে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ওপাশে একখানা বিকশা উন্টে বিয়েবাড়িব বাসনকোসন সব বাস্তায় ছড়িয়ে পডল। কি কাণ্ড বলো দেখি? ওই বাঁড়ুয়োদেব বাড়িব বিয়েব ভিয়েন বসছে, তাব জন্যেই যাচ্ছিল মনে হয়। আসলে হয়েছে কি, একটা গাডি একটা কুকুরকে থায় চাপা দিচ্ছিল, যেই গাডিটা এদিকে হঠাৎ সবে এসেছে, অমনি এই বাসনভৰ্তি বিকশাটা উলটে পডল। কেউ কাউকে

থাক্কা মারেনি। সব আপনি-আপনি, সব এই কাপড়খানার জন্যে। সেদিনই এটা তুলে বাখা উচিত ছিল। মনে আছে, সেদিন এইটে পবে ভাত খাচ্ছিলুম, আব বিন্দুব মা পা হডকে পড়ে গেল কলতলাতে ?” বড়বউদি কিছু বললেন না। তবে আব ওই আলমাটিতে জায়গা কুলোচ্ছে না। ঠাসা হয়ে আছে অপয়া শাড়িতে। তা দিয়ে বাসনও কেনা চলবে না। অপয়া বাসন হয়ে যাবে সেসব। পবাও চলবে না। মেজকাকিমা চেনেন যে। প্রত্যেকটা কাপড় তাঁর মনে থাকে। এত অপয়া শাড়ি কি আব একদিনে জমেছে ? তা নয়, পচিশ বছর ধবে জমেছে। মেজকাকা মাঝা যাবার দিন থেকেই। সেই প্রথম অপয়া শাড়ি বাছা শুরু হলো। যেটা পবা অবস্থায় মেজকাকার মৃত্যু ঘটল। তাবপব থেকেই অপয়া ঘটনা বড় বেড়েছে। “পাশেব বাড়িব মেয়েটা যে গলায় দড়ি দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে ফিবে গিয়ে, সেই খবরটা এই কাপড় পবে শুনতে পেলুম। এটা বড় অপয়া।” —“এই কাপড়টাই পবেছিলুম যেদিন পদ্মপুকুবে সেই ভীষণ মাঝামাটি হলো।” —“এই কাপড়টা আমি পবেছিলুম যেদিন মিত্তিবদেব কন্ডা-গিল্লিতে বেদম ঝগড়া হয়েছিল—গিল্লি বাপেব বাড়ি চলে গিয়েছিলেন চিবদিনেব জন্যে। শেষে মিত্তিবমশাই নিজে গিয়ে বহু সাধ্য-সাধনা কবে দশ দিনে ফেবৎ আনলেন।”—এরকম কত। কত।

“এই কাপড়টা পবা অবস্থায় ছোটখোকার বউয়েব প্রথম বাচ্চাটা নষ্ট হবাব খবর পেয়েছিলুম।”

“এই কাপড়টা পবা অবস্থায় বুলুব ছেলেব ডিভোর্সের খবর শুনলুম”, “এটা পবেছিলুম যেদিন রামু ধোপা ট্রাম চাপা পড়েছিল”, “এই কাপড়টা পবা অবস্থাতেই সেজ ঠাকুরপোর চাকবি যাবার খবর এল।”

“এই কাপড়টা পবেছিলুম যখন বেডিওতে ইন্দিবা গান্ধীব মৃত্যুসংবাদ দিলে।”

এমনি, নেহরুব মৃত্যুসংবাদেব শাড়ি, উভয়কুমাবেব মৃত্যুদিনেব শাড়ি, ভোলাদ্বীপ-উড়িব চবে প্রবল বন্যা হবাব দিনেব শাড়ি, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনােব শাড়ি, ‘কগিল্ল’ প্লেন বিপর্যয়েব শাড়ি, বিপুব ঠাকুরমােব পা পিছলে পড়ে কোমব ভাঙবাব দিনেব শাড়ি, পাড়ার ভূতো কুকুর চাপা পড়বাব দিনেব শাড়ি, দ্বিজুব বাবাকে পুলিশে ধববাব দিনেব শাড়ি, শূভেন্দ্র বাড়িওয়ানােব হুজুরি কবাব দিনেব কাপড়, প্রতিমােব ফেল কবাব দিনেব, ফেলুব শ্বশুরেব হাট আটাক হবাব বাড়িবেব, বেঁটে শিবুব নামে হলিয়া বেকনোর দিনেব, ফুলবাগানেব বাড়িতে চুবি হবাব দিনেব, দেওঘাবেব বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবাব দিনেব, সবোজ্জেব বউয়েব পালিয়ে যাবাব দিনেব, কুমাবেব বাপেব পক্ষাঘাত হবাব দিনেব। এরকম অজস্র মন্দ দিন-বাতের স্মৃতিতে ভর্তি মেজকাকিমােব অপয়া শাড়ির আলমাটিটা। বড়-বউদি মাঝে মাঝে পুনো দুটো-একটা চুপিচুপি বেব কবে বিলিয়ে দেন আমাদেব। আমবাও চুপিচুপি ছাপিয়ে নিয়ে পবি। নইলে জায়গায়

আঁটবে কেন ? অপয়া ঘটনা তো জগৎজুড়ে বোজাই ঘটছে ! কানপুরে তিনটে কচি কচি মেয়েব গলায় দড়ি দেবাব দিনেব শাড়িটাও ওতে উঠে গেছে। সকালবেলা উঠেই কাগজে ঐ ছবি দেখাব পবও সে কাপড় কি আব পবা সম্ভব ? যে-কোনো মানুষেব পক্ষেই ?

## (৪) ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে

জগতে কিছু কিছু মানুষ বেড়িও-আকটিভ হন। সূর্য্যব যেমন। মেজকাকিমাও খুব বেড়িও-আকটিভ প্রাণী। চব্বিশ ঘণ্টা বেড়িও শুনতে ভালবাসেন। চিবটাকাল। গ্রামাফোন ? হ্যাঁ, তা মন্দ কি ? তবে বেড়িওব মতন নয়। ওই বেকর্ড লাগাও বে, পিন লাগাও বে, ওসব পঞ্চাশটা ঝনঝাট নেই রেডিওব। চাবি ঘোরাও আব গান শোনো। শুধুই কি গান ? সংবাদ, আবহাওয়াব খবব, ধর্ম আলোচনা, নাটক, যাত্রা, কী নেই। বেড়িও একখানা ঘবে থাকলে আব ঘরে মানুষ লাগে না। মেজকাকিমা ঘুমিয়ে থাকলেও বেড়িওব চলা চাই। ছ'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত, অল্পাধিক বেড়িও চালক মেজকাকিমা। কখনও 'ক', কখনও 'খ', কখনও 'বিবিধ ভারতী', কখনও 'ঢাকা' চাবি ঘুরিয়ে দিবি এদিক-সেদিক শোনে। প্রায়ই শুনি ইংরিজি ঝিনচাক বাদি বাজছে বেড়িওয়, আব মেজকাকিমা তাকিয়া মাথায় ফুফু ফুফু নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, বেড়িওটি মাথাব কাছে নিয়ে। যখন থেকে ট্রানজিস্টার চালু হয়েছ, গাঁয়ে-গঞ্জেব বাখাল বালকবা শুনেছি একটি কবে ট্রানজিস্টার হাতে ঝুলিয়ে গরু চবাতে যায়। আব মেজকাকিমাও ট্রানজিস্টারটি সমেত রান্নাঘব, জানেব ঘর সর্বত্রই বিচবণ কবেন। সর্বভূতে আকাশবাণীব সাহচর্য মেজকাকিমার পক্ষে অত্যাৱশ্যক। তিনি রেডিওর অত্যাগসহন সঙ্গী এবং বেডিওর মতিবুদ্ধি মতোই তিনি জীবনযাপন করেন।

সেদিন বাড়িতে ঢুকেই দেখি মেজকাকিমা দবজা জানলা বন্ধ করছেন। ভাবি সুন্দব একটা হালকা ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস বইছিল। এরকম বাতাসকেই বোধহয় 'মলয় পবন' বলে, আমি মেজকাকিমাকে বাবণ কবি দবজা জানলা বন্ধ করতে। এত সুন্দব হাওয়াটা বন্ধ কবে দেবাব কোনো মানেই হয় না। গম্ভীর মেজকাকিমা বললেন, "এখন মিষ্টি হলে কি হবে, ও যে প্রচণ্ড লোকসান সঙ্গে নিয়ে আসছে বাবা।"

"মানে ?"

"মানে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা আসছে। তুমিও বাড়ি চলে যাও। আব এখানে থেকে না।"

“যাব মানে? এই তো এলুম।”

“কিন্তু এত ঝড়-বাদলে বাইবে থাকলে তোমাব শাশুড়ী ভাববেন। তুমি বাড়ি যাও।”

“কোথায় ঝড়-বাদল? শুকনো তো!”

“আসছে। ভয়ঙ্কর ঝড় আসছে।”

“মোটাই আসছে না। বাইবে পবিত্রাব আকাশ, খটখটে। আমি তো এই এলুম বাইবে থেকে।”

“বেড়িওতে বলেছে। সতর্কবাণী দিয়েছে। তুমি জানবে কোথেকে? তোমবা তো বেড়িও শুনবে না। প্রবল বান ডেকেছে। এখানেও এলো বলে।”

“কোথায় বান? অক্লি? না বাংলাদেশে?”

এই দুটো দেশকে প্রতিবছর সমুদ্র একবার কবে মাঝ দিয়ে যায়। শয়ে শয়ে পশুপাখি, ঘরবাড়ি সমেত মানুষ মবে।

“অক্লি আব চাটুর্গা ছাড়া কি আব দেশ নেই? প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে চীনে। চীন তো আমাদের গায়েব ওপব। চীনে ঝড়-ঝঞ্ঝা মানেই সেটা কলকাতাতে এসে পড়লো বলে!”

মেজকাকিমা দ্রুত হাতে জানলা বন্ধ কবতে থাকেন, চীনের ঝড় থেকে সাবধান হওয়া দবকার।

বডবউদি চুপিচুপি বলেন, ‘চীন তো ভালো। হনলুলুতে ঝড় হয়েছিল বেড়িওতে শুনেই তো মা ছাদ থেকে সমস্ত ভিজের কাপড় তুলে ফেললেন। আব ফ্লোবিডাতে সেই যে একটা সাইক্লোন এসেছিল তাব নাম ওবা দিয়েছিল ‘সোনিয়া’। তাই থেকে মাঝ কী ধারণা হয়েছে কে জানে? বেড়িওতে ‘সোনিয়া’ নাম উচ্চারণ হলেই দৌড়ে গিয়ে জানলা দবজা বন্ধ কবেন।’

টেলিভিসনটাকে মেজকাকিমা এখনও মেনে নিতে পাবেননি। টেলিভিসনের ঘবে উনি ঢোকেনই না। কেবল ‘বামায়ণ’ হলে শুধু ওটা দেখতেই ইদানীং যাচ্ছেন। টি. ভি.-কে বেড়িওব সতীন বলে মনে কবেন মেজকাকিমা। টি. ভি.-ব ওপবে মনে মনে তাই তাঁব বাগ। টি. ভি. এসে বেড়িওব যেন মান-মর্যাদা নষ্ট কবেছে। ছোটকাকুব মতো বডবউদিও মেজকাকিমাকে স্নেহেব প্রশয় দেন। তাঁব সব অযৌক্তিক কাণ্ড-কাবখানাই মেনে নেন। আব হাসেন। আশ্চর্য মানুষ বউদি।

## (৫) ত্রিফলা

মেজকাকিমা খুব ভক্তিমতী। মেজকাকিমাব ইচ্ছে আমরাও সকলে ভক্তিমতী হই। কিন্তু কাউকেই মানাতে পাবেননি। এমনকি ওঁর ওই অদ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবিকা ‘ওয়ান উওয়ান ভলান্টিয়ার ফোর্স’ বডবউদিকেও না।

বাত্রে সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে খোলা রেডিওর পাশে শুয়ে মেজকাকিমা ঘুমিয়ে পড়েন। আব এগাবোটাঘ বেডিও বন্ধ হলেই উঠে পড়েন। বডবউদি ততক্ষণে স্কুলের খাতা-টাতা দেখে সবে এসে শুয়েছেন। মেজকাকিমাকে বাত্রে দেখতে হয়, পাশে একজনের না শুলেই নয়। ওঁর ব্যস যদিও সত্ত্ব হয়নি, কিন্তু হাটটা ভালো নয়। দুবাব আটাক হয়ে গেছে। পেসমেকাব বসানো আছে। সে আবেক গল্প। ঘুম থেকে উঠেই মেজকাকিমা ঘড়ি দেখেন। তাবপর ডাকেন, “ও বউমা ? বউমা ? ঘুমোলে ? বলি ঘুমোলে নাকি ? ঘুমোলে ?”

বডবউদি বলেন, “কি মা ? কিছু বলছেন ?”

“না মা, না। কিছু বলিনি। বলছি ঘুমোও। ঘুম তোমাব দবকার। সাবাদিন খেটেখুটে আসো। বাড়িতেও তো বুড়ি শাশুউটাকে নিয়ে তোমাব বিশ্রাম নেই। ঘুমোও মা, ঘুমোও। ঘুম না হলে তোমাব শরীবে দেবে কেন ? এত কাজ মানুষে পাবে ? ঘবে খাটনি, আবার বাইবে খাটনি। বিশ্রামেব সময় বলতে তো এই বাতটকুনি। তা না ঘুমোলে কি চলে মা ? তাই বলছি ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম মানুষেব দেহে খাদ্য, পথ্য, ওষুধেব মতই জরুরী। ওটা তোমাব দবকার।”

বডবউদি চুপ করে শুয়ে থাকেন। উত্তর দেন না।

“অ বউমা ! বউমা ! বলি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? অ্যা ? এ যে দেখি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। তেষ্টা পেয়েছে, অ বউমা, জল খাবো।”

অকস্মাৎ মেজকাকিমা মবিয়া হয়ে ওঠেন।

বউমা যে ঘুমোননি, তাও প্রমাণ হয়ে যায়। বউদি উঠে পাশেব টেবিল থেকে পাথবেব গেলাসটি শাশুড়ীর হাতে তুলে দেন। মেজকাকিমার হাতের কাছেই ছিল গেলাস ভর্তি জল। জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে মেজকাকিমা বলেন, “নাও, শুয়ে পড়ো। ঘুম তোমাব দরকার।”

বউদি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েন। একসময়ে ঘুমিয়েও পড়েন, মেজকাকিমার মুখে নানান গল্প শুনতে শুনতেই। মেজকাকিমা ঘুমোন না—দাদার ছেলেবেলার গল্প কবেন বউদির কাছে। মেজকাকিমাব ওই একই ছেলে ছিল। আব একটি মেয়ে আছে। বপ্পেতে থাকে। তাব ছেলেবেলাব গল্পও শুনতে হয় বউদিকে। তারপর ভোর তিনটে বাজতেই ঘড়ি ধরে, “অ বউমা ! বউমা ! উঠে পড়ো, ওঠো, ওঠো, শীগগির

বাথরুমে যাও। হিসি কবে এসো, নইলে শরীব খারাপ হবে যে। এতক্ষণ বাথরুমে না গিয়ে থাকতে হয়? শরীবেব বিষ শরীরে বসে যাবে যে? ওঠো? বাথরুমে যাও। কিডনি শেষ হয়ে যাবে। যাও বাথরুমে যাও।”

“আপনি যাবেন মা? চলুন, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।”

“আমি তো যাবোই। সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি তুমি যাও। এই যে তোমার একটানা ঘুমুনো, বাথরুমে না গিয়ে, এটা কিন্তু স্নাত্ত্বের পক্ষে ভালো নয় একটুও। খুব খারাপ অভ্যাস।”

মেজকাকিমার অনুবোধমাফিক বডবউদির স্নাত্ত্ববন্ধাব প্রথম পর্ব শেষ হয়। বউদি ফেব ঘুমোতে যান।

চাবটে বাজে দেয়াল ঘড়িতে। মেজকাকিমা ডাকেন, “অ বডবউমা, বডবউমা। ওঠো মামগি ওঠো, চাটে বেজে গেল যে— বডবাইবে ফিবে আসবে না? এব পব যে অনিয়ম হয়ে যাবে। শরীব শুদ্ধি না কবলে কি চলে মা? যাও, বডবাইবে যাও। চাবটে বেজে গেছে।”

মেজকাকিমার এক্কেবাবে কড়া নিয়ম। বডবউদির ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বা শারীরিক প্রয়োজন, তাঁর বাথরুম যাবার কোনো ভিত্তিই হতে পারে না। এ ব্যাপারে মেজকাকিমার ঘড়ি দেখাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এতেও বউদির হাসি মোছে না।

বাথরুম থেকে এসে বউদি আবার শুতে চেষ্টা করেন। মেজকাকিমার নাম হওয়া উচিত ছিল ‘কমলি’। উনি ‘নেহি ছোডেগী’। ঠিক পাঁচটার সময়ে মেজকাকিমা উঠে কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পবে ধূপ জ্বেলে ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে ধূপ নেড়ে নেড়ে, ঘরময় দেয়াল ভর্তি টাঙানো ক্যালেন্ডার থেকে বাঁধানো অপূর্ব সব দেবদেবীর ছবিতে এবাবে আরতি কবতে শুরু কবেন। হেঁটে হেঁটে ঘরময় ঘুরে ফিবে মন্ত্র পডতে পডতে।

“অ বউমা, বউমা। ওঠো। ওঠো। শাঁখটা ধরো। বাজাতে হবে না, কেবল ধবে ধবে এমনি নাডলেই হবে। যাও, বাসি কাপড়টা আগে ছেড়ে এসো। তাবপব শাঁখটা নাডাও। এই ব্রাহ্মমূর্ত বড জাগ্রত মূর্ত। এই সকালে দেবতাদের আভিব সময়ে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়। ওঁরা সব সশরীবে এসে পূজো নেন। এই সময়টাই স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যেব, দেবতাব সঙ্গে মানুষেব যোগাযোগেব প্রকৃষ্ট সময়। এই মূর্তটো ঘুমিয়ে নষ্ট কবতে নেই মা, উঠে পডো। দ্যাখো কি সুন্দব সৃষ্টি উঠবে এবাব। ছাদে যাও। ছাদে গিয়ে পূবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড কবে বলো ‘ও জবাকুসুম সঙ্কশং’—ওঠো বউমা? ও কি? পাশ ফিবছো কেন? অ বউমা? ওঠো?”

পিঠে জোবসে ঠেলা খেয়ে বড বউদি ঘুমচোখে এইবাবে বলেন, “এই যে উঠছি। উঠছি মা। আপনার ত্রিফলাটা ভেজানো আছে, এই আমি উঠেই দিচ্ছি।”

হঠাৎ আশ্চর্য পটপরিবর্তন হয়। নবম সুবে মেজকাকিমা বলেন, “ত্রিফলা? এবার তুমি ত্রিফলা ভিজিয়েছ? কোববেজ মশাই বুডো হয়েছেন, কি বলতে কি বলেছেন—আমি বলেছি, না, আমি ত্রিফলা খাই না, ত্রিফলা খাবো না আমি।”

“না মা, তা হয় না। কবিবাজ মশাই রাগ করবেন।”

“তুমি শোও তো ততক্ষণ। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই মেয়েব। ভাব হতে না হতে উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগে গেছো? ‘মা, ত্রিফলা খাও’। শুধু শুধু এফুনি ওঠাবাব কোনো দবকাব নেই। তোমার তো মবনিং ইস্কুল নয়, বউমা? তুমি বরং আব একটু বেস্ট নাও। বিশ্রাম করো। আবেকটু ঘুমোও দিকিনি, বউমা। ঘুমটা খুবই জব্বী। তোমাব শবীবের পক্ষে ঘুমটা খুবই দবকাব।” বলতে বলতে মেজকাকিমা একা একাই ছাদে পালান।

বড বউদি মৃদু হেসে পাশ ফিবে শুয়ে আবাব ঘুমিয়ে পড়েন। এখন দু’ ঘণ্টা নিশ্চিত। সেই সাতটায় সুরবালা আসে। এসে চা তৈরি কবে। চান কবে, পুজো কবে, চা খেয়ে কাগজ পড়ে একেবারে তারপবে মেজকাকিমা এসে চায়েব কাপ হাতে আদব কবে বউদিকে তুলবেন. “বউমা। অ বউমা? ওঠো, ওঠো, চা খাও। আব কতক্ষণ ঘুমোবে? তোমাব ইস্কুলেব বেলা হয়ে গেল যে?” মেজকাকিমাব বেড়িওতে তখন লোকসঙ্গীত চলবে। ত্রিফলাব টাইম ওভাব।

## মেজদির কেছা

আমাদের ভবানীপুরেব পাড়াতে এবাড়ি-ওবাড়িতে খুব যাতায়াত। তোমাদের বালিগঞ্জ নিউ-আলিপুরেব মতন নয় বাপু। বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি, ধবো আমাব তেমন ভাল শাড়ি নেই. তাতে কি? সামনেব বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, অনেক ভাল শাড়ি. একটা চেয়ে নিয়ে পবে যেতে কোনই বাধা নেই। শাড়ি তো আমি খেয়ে ফেলব না? ছিড়ে খুঁড়ে কিংবা দই-কালিয়া মাথিয়ে নষ্টও কবব না—বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। আমাদের পাড়ায় এসবেব চল আছে। তোমাব বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে পড়েছে—ঘবে কিছু নেই. আমাব ঘবে যা আছে. চটপট সেই নারকোল নাড়ু নিমকি দিয়ে তুমি চা দিয়ে দিলে তোমাব অতিথিকে। ধবো কল্লিগিনি সিনেমায় যাচ্ছি—শাঙডিমা বাড়িতে নেই—দেওবেব কাছে গেছেন। আমাব বাচ্চাবা তোমাব বাড়িতে ঘুমিয়ে বইল। দিবিা ফেবাব পথে আমবা ওঁদেব তুলে সঙ্গে কবে নিয়ে বাড়ি গেলুম। না, ফ্লাট বাড়ি না হলে কী হবে—এবাড়ি-ওবাড়ি ভাব আছে। তোমাবা ফ্লাটবাড়িতে একসঙ্গে থাকো। অথচ এ ওব মুখ দেখো না. নাম জানো না। আমাদের ভবানীপুর, কালীঘাট ঢেব ভাল পাড়া। মানুষেব সঙ্গে মানুষেব দেখাশুনো হয়, কথাবার্তা হয়, সুখে দুঃখে খোজখবব নেয় সবাই। পাড়ার লোকেবা দূব-পব নয়।

সুবিধে যেমন আছে অসুবিধেও যে নেই একেবারে, তা বলব না। শাঙডি



যদি দেওবেব বাড়িতেও থাকেন, তবু, সামনেব বাড়িব জ্যাঠাইমা তো আছেন ? গুৰুজনেব নজ্জবেব বাইবে থাকা চলে না। “বৌমা।” বলে হাঁক পাডবাব কেউ না কেউ আছেনই। আমাব যখন নতুন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে আগমন হল, সে অনেককাল আগেব কথা, তখন ঠিক সামনেব বাড়িতে আমাব শাশুড়িৰ এক “প্ৰাণেব বন্ধু” ছিলেন। শাশুড়িমা তাঁকে ‘মেজদি’ বলে ডাকতেন। কেন ‘মেজদি’ তা জানি না। মেজদিব বয়েস নাকি শাশুড়িমাৰ চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু মেজদিই অনেক বেশি চটপটে ছিলেন। (তাঁব উকিল স্মাৰী বেঁচে, এবং জমজমাট পসাব ছিল তখনও যদিও তিনি মেজদিব চেয়েও বয়েসে অনেক বড়।) আমাব বিয়েব কিছু আগেই আমাব শ্বশুর পবলোকগমন কৰেছেন। তাঁকে কখনও চোখে দেখিনি। শাশুড়িমাৰ থান-পবা বিষণ্ণ মূৰ্ত্তিই আমি প্ৰথম থেকে দেখছি। এদিকে মেজদিব কপালে মণ্ড বড় গোল সিঁদূৰ-টিপ, চওড়াপাড শাড়ি, বেঙ্গতিবাবে আলতা-পবা পা, একগাল পান, একগাল হাসি, আব সিঁথেভৰ্তি লঙ্গা-চওড়া সিঁদূৰ। মেজদিকে আমবাও মেজদি ডাকতুম। আমাব স্মাৰী তাঁকে ছোটবেলা থেকে ‘মেজদি’ বলেই ডেকে এসেছেন, আমাবও আব মাসিমা-টাসিমা বলা হয়নি। মেজদিব নাম আহুদী হলেই বেশি মানাতো। —এক-গা সোনাৰ গয়না, দিনবান্তিৰ পাডাসুন্দ বামবামিয়ে বেড়াচ্ছেন, ভয়ডব নেই। মেজদিব স্মাৰী, জামাইবাবুব (তাঁকে আমবা বাড়িসুন্দ সবাই ‘জামাইবাবু’ ডাকতাম) অনেক টাকা বোজগাব, তিনি দুঁদে উকিল ছিলেন।

অত বয়েস হয়েছ, তবু মক্কেলেব কমতি নেই। বাবান্দাতে পর্যন্ত বেঞ্চি পাতা ছিল, মক্কেলদেব ঘৰেব মধ্যে আঁটত না। মেজদিব তিন মেয়ে, দুই ছেলে। ছোটছেলে বিলেতে ডাল্কাব। বড় ছেলে-বউ এক নাতনি, দুই নাতি সমেত ভাঁদেব কাছেই থাকত। মেজদিব সঙ্গে বউয়েব বিন্দুমাত্র অশান্তি ছিল না। বউই সংসার দেখত, বউই গিনি, মেজদি শুধু হাসিমুখে পাডা বেড়াতেন আব নাতি-নাতনিদেব সঙ্গে আড্ডা দিতেন। নাতি-নাতনিদেব সঙ্গে মেজদিব বয়েসেব খুব একটা তফাত আছে বলে মনে হত না। যেমন গলায় গলায় ভাব, তেমনি ঝগড়া বেঁধে যেত মাঝে মাঝে। বউমাকে গিয়ে মোটাতে হত। এমনিতে অবিশি মেজদিব পাড়াব ছোটদেব সঙ্গে খুব ভাব। মেজদি তো গল্পো বলতে ওহাদ কিনা। বুড়ো-বুড়িৰ গল্পো, কানা-কনিৰ গল্পো, বোবা-বুবিৰ গল্পো, ন্যাডা-নোঁড়িৰ গল্পো, চড়াইকড়া-চড়াইগিনিৰ গল্পো, তোতা-ভুঁতিৰ গল্পো, পিঠেগাছেৰ গল্পো। “আশিমণ ময়দাব দো-বোট খায়া”—। পাডাব বাচ্চাবা মেজদিকে একবার পেলে, আব ছাড়তে চায় না। আমাবও খুব ভাল লাগত মেজদিকে। মেজদি যা-তা কাণ্ডকাবখানা কবতেন, এবং একেবাবেই অনায়াসে। মেজদিব বৰটি মেজদিকে ভীষণ আহুদ দেন—পাডায় এমন একটা কথা ঢালু ছিল। ছেলে-বউয়েব কাছেও তিনি প্ৰবল প্ৰশ্নয় পেতেন, সেটা চোখেই দেখতুম। আহুদী দুলালী বলতে যা বোঝায় মেজদি ছিলেন ঠিক তাই। মেজদিব স্মাৰীৰ বয়েস তখন নব্বুই বছৰ। কিন্তু মেজদিব মোটে চুয়ান্ধব। হাসিখুশি মেজদি মোটেই বড়ি হননি।

কপালের দু'পাশে কিছু কোঁকড়া কোঁকড়া সাদা চুল ছাড়া, মেজদিব মধ্যে বার্ষকোর কোন লক্ষণই ছিল না। ওই নামেই যা চ্যাম্পন। একপিঠ কালো চুল, বলমলে হাসি, চমকিলি চোখ, যুবতীর সমান মেজদি জামাইবাবুকে “আপনি-আজ্ঞে” কবতেন। আমাদের বাবা-মাদের মধ্যে কাউকেই এটা কবতে দেখিনি, তাই খুব অবাক লাগত। তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে আমাব। বয়েস নিতান্তুই অল্প। কৌতূহলের চোটে একদিন মেজদিকে তো জিজ্ঞেসই কবে ফেললুম—“মেজদি, আপনি জামাইবাবুকে আপনি-আজ্ঞে কবেন কেন? অসুবিধে হয় না?” শুনে মেজদি প্রথমে খানিকটা হেসে নিলেন। তাবপব হাতের রূপোব বাটাটি খুলে একটা জর্দা-পান মুখে গুঁজে, সুগন্ধ ছড়িয়ে ধীবে সূঁছে বললেন—“সে দুঃখের কথা তোকে কী বলব! শুনবি? তবে শোন। বিয়ে তো হল। চাদের আলোব মতন ফুটফুটে মেয়ে ছিলুম, তাদেব চেয়েও ঢেব ছেলেমানুষ—চোদ্দ বছবেব মেয়ে তিবিশ বছবেব বুড়ো ববেব সঙ্গে বিয়ে হল। না, না বুড়োব সেই প্রথম বিয়ে। দোজববে নই। উকিল হয়ে গুছিয়ে বসে নিয়ে, কাঁডি কাঁডি টাকা বোজগাব কবতে শুরু কবে দেবাব পবে, তবে না কত্তাব খেয়াল হল, এত টাকা দিয়ে কববটা কী, যদি সংসাবই না বইল। তখন দ্যাখ-দ্যাখ শিগগিব পাত্রী দ্যাখ। তিবিশ বছবেব ববকে কে আব মেয়ে দেবে? বিধবা মাযের শেষ মেয়েটা ছাড়া, আব কাকেই বা পাবে সে? তবে হ্যাঁ, বুড়োর কপাল ভাল ছিল, বল? বউটা মন্দ পায়নি। অবিশ্যি আমিও বলব বাপ, বুড়ো শিবঠাকুর ববটি আমাবও কপালে জুটেছেন ভালই। ওই নন্দীভূঞা, অর্থাৎ মক্কেল, আর বউ। বউ আর মক্কেল। এই দুটি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। মোটেই বাবমুখো নন। ববঞ্চ একটু বেশি ঘবকুনো। কোটে বেকুনো ভেন্ন আব কোথাও বেকবেন না। এক আমাব মা যতদিন ছিলেন, শশুববাডিতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে খুব ভালবাসতেন। আমাব মাব মতন বান্নাব হাত খুব কম লোকেব হয় কিনা। ব্যাস। মাও চলে গেলেন, উনিও আব কোথাও যাবেন না। আমাব বড বড দিদি সব কত ডাকতো, আদব কবে—তাব বেলা গা কবতেন না। কেবল কাজ। কেবল কাজ। এখন তো আমার এক ছোডদি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। ছোডদি নেমন্তন্ন কবেও না, তাব শরীর মন ভাল না।”

—“মেজদি! আপনাবও ছোডদি আছে? আপনি তাহলে মেজবোন নন?”

—“দূব, আমি কেন মেজবোন হব? আমি তো সবাব ছোট।”

—“তবে সবাই আমাবা আপনাকে মেজদি বলি কেন?”

—“তোবা কেন বলিস আমি তা কেমন কবে জানব বল? ববং তোব শাশুডিকে জিজ্ঞেস কব। তাদেব জামাইবাট্টি মেজভাই— আমাকে তো উনি ‘মেজবো’ বলেই ডাকেন, শুনিসনি? তোব শাশুডি হঠাৎ নতুন বউ হয়ে এসে আমাকে ‘মেজদি’ বলে ডাকতে শুরু কবে দিলে। সেই ডাক শুনে শুনেই বাকিরা সবাই! এমনকি তুই সদ্ধ। তোব ছেলেও তাই ডাকবে।” ভবিষ্যৎ ছেলেব প্রসঙ্গে নতুন বউয়েব

যতটুকু লজ্জা পাওয়া উচিত, তা পেয়ে, আমি আবাব বলি—“কিন্তু আপনি কেন? আপনার ববকে ‘আপনি’ বলেন কেন সেটা কিন্তু এখনও বললেন না।”

—“ও, বলিনি বুঝি? তা, যেটুকু বলেছি, তাই থেকেই তুই বুঝে নিতে পারবি না? তবে কেমন বি-এ পাশ তুই? ইশকুলেব চোদ্দ বছরের মেয়ে, হঠাৎ একটা ত্রিংশ বছরের কভাবেল্লি উকিল মানুষকে তুমি-তুমি কবে কথা কইতে পারে? পাবে কি? তুই-ই বল। তুই পারতিস? ববই হোক আব যেই হোক। আমি তো তাকে চিনতুম না। বাড়িব ছোট মেয়ে, হঠাৎ অন্য বাড়িতে গিয়ে অতবড় দামড়া খেচনা লোকটাকে গায়ে পড়ে ‘ওগো-হ্যাগো তুমি কি কচ্ছো গো’ বলতে পারে? ফলে এ-জীবনে আমার আব ওগো-হ্যাগো বলাই হল না। ‘এই যে’, ‘শুনুন’, ‘গুনচেন’, বড় জোব ‘ও মশাই’ পর্যন্ত। ছেলেপুলে বড় হবাব পব এখন ‘কভামশাই’ বলেও ডকি। তা, তুইই বল। কাজটা কি আমার ঠিক হয়নি? বলি, দায়টা কাব ছিল? বয়েসে যে বড় তাব, না আমার? যাব বাড়িতে আমি নতুন এসেছি, তাব, না আমার? দায়টা কাব ছিল?”

—“মানে?”

—“মানে? তবে খুলেই বলি শোন। আমারও কি দুঃখু নেই? উনিই তো আমাকে আদব কবে, চিবুকটি ধবে, কোলে বসিয়ে একদিন কানে কানে বলবেন—‘হ্যাগো, তোমাব-আমাব যে-সম্পর্ক, তাতে কি অমন দূব-পবেব মতন আপনি বলা মানায়? তুমি আব আমাকে অমনি আপনি-আজ্ঞে কোব না তো? এবাব থেকে তুমি বলবে। কেমন?’ বল তুই, এটা কি ওঁবই বলা কর্তব্য ছিল না? আমিও ঘাড় নেড়ে ‘তুমি-তুমি’ কভুম। উনিই নিজে থেকে যদি আমাকে ‘তুমি’ বলতে কোন দিনও না বলেন, তবে আমি কেমন কবে সেধে ‘তুমি’ বলব ওঁকে? যোলো বছরের বড়ো গুরুজন মানুষটাকে? ওঁবও তো বসকষ কিছু কিছু থাকতে হয়? বউয়ের মুখে ‘ওগো, হ্যাগো, আব দুটি ভাত নেবে গো?’ শুনেও তো সাধ হয়? তা নয়, ওব প্রাণে কোনই শখ সাধ হল না ‘হ্যা কভামশাই, আপনি কি আব দুটো ভাত নেবেন’ এই শুনেই তাব আনন্দ। বউয়ের মুখ থেকে এমন শুকনো-শুকনো কাঠ-কাঠ কথা শুনে কভাব নিজের প্রাণে কোনই দুঃখু নেই। বউ তো নয়, যেন বাঁধুনীবামুন কথা কইছে। আমার তো নিজের কানেই কেমন কেমন ঠেকত। কিন্তু জীবন কেটে গেল, ‘তুমি’ বলতে আব উনি বললেনই না। তাই যেই বড়বউমা এল ঘবে, আমি ওকে বলে দিলুম—‘দ্যাখো বউমা— আমার শুনে শুনে তুমিও যেন আমার ছেলেকে আপনি-আজ্ঞে কোব না বাপু! স্বামী-স্ত্রীতে ওবকম ডাক শুনেও বড় বিচ্ছিবি শুকনো-শুকনো লাগে।’ অবিশ্যি মেজবউমাব বেলা অন্য কথা। তাব শিক্ষাদীক্ষা তাব দেশেব মতন, আমাদের সঙ্গে ঠিকমতন খাপ খায় না। যদিও সে-মেয়েব চেষ্টার অন্ত নেই। তাকে কিছুই শেখাতে পডাতে হয়নি। মেম বলে কথা? মেমসাহেবদেব আপনি তুমি নেই—সব সময়ে ‘হানি’ আব ‘ডার্লিং’ মুখে

লেগেই আছে—“মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

—“বউয়ের আদিখ্যাতায় ববং ছেলের গোড়ায় গোড়ায় খুব লজ্জা কবত, আমিই বললুম— লজ্জা কিসেব ? ওটা হচ্ছে তোদের ইংবিজিতে ‘ওগো-হ্যাগো’—তাই নয় ? ছেলেরও এখন অভোস হয়ে গেছে। দেশে যখন আসে, সেও দেখি ডার্লিং বলছে। ছোটবেলায় সত্যি আমার দুঃখ ছিল রে, বরের সঙ্গে দুটো মিঠে বুলি কানে কানে কে না বলতে চায় ? তা কপালে থাকলে তো ?” মেজদিব চোখ উদাস হয়ে গেল। এটা বড় দেখা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি বললুম—

“আচ্ছ—যদি জামাইবাবু এখন আপনাকে ‘ভূমি’ বলতে পাবমিশান দেন ? আপনি পাববেন ?” মেজদিব ফর্সা নাক আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। মেজদি আস্তে আস্তে মাথাটি ডাইনে-বাঁয়ে হেলিয়ে তেমনি বাইবেব দিকে চেয়ে থেকেই বললেন—

“এখন ? এখন... নাঃ—পাবলেও, বলব না।”

সেদিন মেজদিব বাড়িতে গেছি, হঠাৎ দেখি হুডমুডিয়ে মেজদি জামাইবাবুর টেবিলে এক বান্ধু সন্দেশ নিয়ে হাজির—আমাকে ফিসফিস কবে বললেন—“যা তো বুলু, চট কবে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে আয় তোব জামাইবাবুর জন্যে”—বলেই আমার হাতে জামাইবাবুর বড় কপোর গেলাসটা ধবিয়ে দিলেন। তাবপব জামাইবাবুর মুখেব কাছে দুটি বড় বড় হলদে-গোলাপি সন্দেশ ধবে, তেমনিই ফিসফিস কবে বললেন— “এই যে নিন ? নিন ? দু’চাবখানা এইবেলা মেরে দিন দিকিনি, টপাটপ মুখে ফেলে ? খুব ভাল সন্দেশ দিয়েছে বাপু আপনাব মক্কেল”—মেজদিব এমন আকস্মিক ফিসফাস ষড়যন্ত্রী টাইপের হাবভাবটি দেখে দুঁদে উকিলও ঘাবড়ে গেলেন। জামাইবাবুর মুখেব চেহারা দেখে কষ্ট হল। ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে উনিও ফিসফিসিয়ে মেজদিকে বললেন—“বউমাকে বান্ধুটা দাও গে, জলখাবাবেব সঙ্গে তো দেবেই—এত তাড়াব কী আছে ?” একটি হাত ঘুবিয়ে, মেজদি বাজাব মুখ কবে বললেন—“আববেঃ ? সে তো ভা-গে-ব ? তখন গুনে গুনে দুটিমাত্র দেবে কিন্তু, বলে দিচ্ছি আব চাইলেই বলবে, ‘বাবা, আপনাদের বয়েস হয়েছে এখন বেশি মিষ্টি খেতে নেই’—তাব চেয়ে এইবেলা দুটো একটুটা পাচ্ছেন, খেয়ে তো নেবেন ? কীবকম বে-আক্কেলে মানুষ বে বাবা ? এমনি কবে আপনি মামলা চালান ? দেখি দেখি হাঁ— ? হাঁ দেখি ?”...জামাইবাবু হাঁ কবলেন। আমি জল আনতে চলে গেলুম।

আবেকদিন। লোডশেডিং হয়েছে। ঘোব অন্ধকারে মেজদি চাবি-গয়না ঝুমঝুমিয়ে এসে হাজির। হাতে টর্চ। —“দ্যাখ না ? তোদের জামাইবাবুটার রসকষ কিছুটি নেই। এত মন খাবাপ লাগছে। একটা শখও যদি মেটাতেন।”

—“কেন, কী হল আবাব ?”

—“হবে আব কী ? অন্ধকারে বসে আছেন, আজ কী ভাগ্যি—মক্কেল নেই। বাস্তায় কোনো আলো নেই। বললুম—‘এই যে শুনচেন ? বলি শবুরের মুখে ছাই

দিয়ে আপনাবও একানববুই, আমাবও পাঁচাত্তব হয়ে গেল, এ জীবনে একটা দিনও তো হাত ধরাধরি করে পার্কে বেড়ানো হল না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো সাঁঝবেলাতে হবদম হাত ধবে ঘুরছে দেখতে পাই। এইবেলা ববং রাজিা সন্ধ্যা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কেউ কিছুটি দেখতে পাবে না, চলুন না মশাই, আমবা দুজনে হাত ধবাধরি করে একটু ওই পার্কে বেড়িয়ে আসি? আপনাব মক্কেলবাও দেখতে পাবে না—থোকাব ছাত্রছাত্রীবাও দেখতে পাবে না, নাতি-নাতনিদেব বন্ধুবাও দেখতে পাবে না—চলুন না বাবা একটু বাস্তব হাত ধবাধরি কবে দুজনে মিলে হেঁটে বেড়িয়ে আসি? আপনাব কি প্রাণে একটুও শখসাধ হয় না? প্রথমে উনি তো হেসেই গড়ালেন—যেন কতই একটা ছেলেমানুষী কথা বলেছি। তাবপব বললেন—‘মেজবউ, অন্ধকাবে বেবলে আমবাও যে পথে কিছু দেখতে পাব না। এই বযসে হোঁচট খেয়ে যদি পড়ে যাই, কোমবাটি মট কবে ভেঙে যাবে, আব এ জীবনে জোড়া লাগবে না। বাস্তবঘাটে কত খানাতন্দ, গর্ত, ইটপাটকেল, ঠেলাগাড়ি, বিকশা, কুকুব, অন্ধকাবে ইঁটা সোজা নয়। শুধু যে আমাদের কেউ দেখবে না তাইই তো নয়? আমবাও যে হাতিঘোড়া কিছুটি দেখতে পাব না গো? টর্চ নিলে তোমাব উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না, আব টর্চ না নিলে দুজনে মিলে পথে হোঁচট খাব। তাব চেয়ে এস, ববং ঘবেই হাত ধবাধরি কবে বসে জানলা দিয়ে বাস্তব দেখতে থাকি দুজনে। থাকগে, লণ্ঠনটা জ্বলে কাজ নেই।’ সে কি সম্ভব? বউমা লণ্ঠন নিয়ে এল বলে। ‘জ্বালতে হবে না’ বলা যায়? ওঁব যত অসম্ভব কথা। হোঁচট। টর্চ নিয়েও হাত ধবাধরি কবা যায়। যায় না? বাগ হয়ে গেল। আমি বললুম ‘বয়েই গেছে আমাব আপনাব সঙ্গে হাত ধবাধরি কবে মক্কেলদেব পথ চেয়ে হা-পিতোশ কবে অন্ধকাবে ওঁত পেতে বসে থাকতে। আমি চললুম বুলুদেব বাড়িতে।’

মেজদিব জন্যে আমাব সতি খুব কষ্ট হল। মেজদি ভুল কবে সম্ভব বহুব আগে জন্মেছেন। যদিও ওঁদেব নিমগাছেব ডালে মেজদিব নাতনিব জনো দড়িতে পিড়ি বেঁধে দোলনা টাঙিয়ে দেওয়া হল, নাতনিকে কোলে নিয়ে সবাব আগে মেজদিই বসে গেলেন দোলনায় দুলতে আব বউমা শাওড়িকে দোল দিতে লাগল। সে দৃশ্য আমবা সবাই দেখেছি, মেজদিকে চিনি বলে কেউই অবাক হইনি। অথচ বয়েসে অনেক কম আমাব শাওড়িকে ওই দোলনায় বসে দোল খাচ্ছেন এটা কল্পনা কবতেও ধনুবিধে হয়। মেজদি মেজদিই। তাব নিজস্ব একটা ব্যাপাব আছে। বহুব দুয়েক আগেব কথা—চৈত্রমাসেব সেল হচ্ছে, মেজদি সেলে সম্বন্ধেব জনা ৬ খানা ৮৫ডাপাড নতুন শাড়ি কিনেছেন—প্রত্যেকটা খুব সুন্দব। পয়লা বৈশাখেব আগেই এদিকে বিপর্যয় ঘটল বাড়িতে—জামাইবাব হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবোনাবি থ্রোসিস। বউমাকে ডেকে মেজদি বললেন—‘বউমা। তোমাব স্বপ্নব তো চললেন এখন। এই যে ৬ খানা নতুন শাড়ি কেনা হল? কবে আব পবা হবে? এ গিম্বান্নি বুড়ো বয়েসেব শাড়ি তোমাকেও মানাবে না। ববং এবেলা ওবেলা

কবে পবেই ফেলি সবগুলো ?” বউমা আব কী বলবে—“তাই পরুন”—ছাড়া ? বাড়িভর্তি লোকজন, ডান্ডাব হাসপাতালের আয়া, মেয়ে জামাইবা সবাই এসে পড়েছে, বিলেত থেকে ডান্ডাব ছেলেও এসে পড়ল, পাড়াপড়শীবা সাবাদিন ছুটোছুটি করছি, জামাইবাব অঞ্জান অট্টেতন্যা—তাকে অক্সিজেনে বাখা হয়েছে, মেজদিব নিশ্বাস ফেলবাব সময় নেই—প্রচণ্ড টেনশন—কিন্তু তাবই মধ্যে ঠিক মেজদি এবেলা-ওবেলা/ওবেলা-এবেলা কবে তিনদিনে ছ’খানা নতুন কোবা শাড়ি ঝটাপট পবে ফেললেন। বলাবাহলা খুবই অদ্ভুত দেখাল কাজটা। ইতিমধ্যে ঈশ্বরের দয়ায় জামাইবাবও আস্তে আস্তে সামলে উঠলেন। মেজদি বললেন—“বউমা ? সব নতুন শাড়ি তো ভেঙে ফেলেছি। ১লা বৈশাখে কী পবব ? যাও দিকি, আব একখানা কিনে আনো। লালপেড়ে। সপ্তম্ভবের দিনে সধবা মেয়েমানুষকে নতুন কাপড় পবতে হয়। নইলে সংসাবে অমঙ্গল।” বউমা ছুটল নতুন কাপড় কিনতে। সেবে ওঠাব মাস খানেক মাস দেডেক পবেই আবাব জামাইবাব চেপ্তারে এসে বসলেন।

যেমনি মেজদি, তেমনি জামাইবাব। অতবড় অসুখের পবও যথেষ্ট বিশ্রাম না নিয়েই কাজে লেগে গেলেন বলে ছ’মাস যেতে না যেতে জামাইবাব আবাব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছেলেবউ, মেয়েজামাই, এমনকি মেজদি পর্যন্ত তাঁকে কিছুতেই বিশ্রামে রাখতে পাবেননি। এবাবে দ্বিতীয় অ্যাটাক—বাড়িতে বাখা চলল না, জামাইবাবকে এবাব নার্সিং-হোমে দিতে হল। ঘব-নার্সিংহোম মেজদি সাবাদিন ছুটোছুটি করছেন। বলতে নেই মেজদিবও তো বয়েস খুব কম নয়। স্ট্রেন হচ্ছে বাড়িসুদ্ধ সকলেবই। মেজদিব হাবভাবে কিন্তু হতাশাব চিহ্ন নেই। শুধু চুলটা একটু কক্ষসুক্ষ্ণ, চোখটা একটু চঞ্চল এই পর্যন্ত। নয় নয় করেও তাঁব বয়েস এখন উনআশি হয়েছে, জামাইবাবব পাঁচনব্বই। দু’জনেই দেহে-মনে সচল আছেন এই যা। মেজদিব চুলেব শুভ্রতা খানিক বেড়েছে, কয়েকটা কুঞ্জন দেখা দিয়েছে গালে-গলায়, এই পর্যন্ত।

“তোদের জামাইবাব তো আরাম কবে শুয়ে আছেন হাসপাতালে, আব আমারই হয়েছে জ্বালা”—বললেন মেজদি। “নাওয়া-খাওয়া না হয় চুলোয় যাক, তাতে ক্ষতি নেই। পুজো-আচ্চা পর্যন্ত চুলোয় গেছে। অথচ ঠাকুবকেই তো ডাকতে হয় এখন। এই পঁচানব্বই বছরের বুড়ো যদিবা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিবে আসে, সে তো ডান্ডারের গুণে নয়, ঠাকুবের আশীর্বাদে। তাই না ? তা ঠাকুবঘবে ঢুকতেই বাত ন’টা দশটা বেজে যাচ্ছে। তখন ঠাকুবের ঘুম পেয়ে যায়। কী যে বলি, ঘুমোতে ঘুমোতে গোপাল কিছুই শোনে কিনা কে জানে ?”—মেজদিব অতি আদুবে এক গোপাল ঠাকুর আছেন, তিনি রূপোব খাটে সোনাব ছাতা মাথায় দিয়ে সোনাব নাড়ু খান। অর্থাৎ মেজদিদিবও ওপবে আর-এককাঠি। আহ্বাদে নন্দদুলাল। মেজদি তাঁকে ডেকে কী যে বলেন, জানি না। তবে আমাকে ডেকে একদিন বললেন—“শোন বলু। তোকে একটা জরুরি কথা বলে রাখি। তোদের জামাইবাব গত হলে আমি কিন্তু আর আমার চওড়াপাড় কাপড়গুলো পবব না। তোর জামাইবাব

পূর্বনো ধুতিগুলোও পবব না। আমাব ছটা ফাইন থান চাই। খোকাকে আমি সোজাসুজি বলতে চাই না—ওকে মনে কবে তুই বলবি যে, আমি তোমাকে বলে বেথেছি, চণ্ডাপেড়ে শাড়ি-পবা বুড়ি বিধবা দেখতে আমাব ভালো লাগে না। নকন পেড়ে ধুতি পবা বিধবাও বিতর্কিচ্ছিবি লাগে। বেশি বয়েসে বিধবা হলে বাঙালি মেয়েদের থান-কাপড়েই মানায়। যে বয়েসেব যেটা ফ্যাশান। বুঝনি না? মনে কবে কিন্তু বলবি খোকাকে যেন কিনে বাখে—তোব জামাইবাব্ব এটা তো সেকেন্ড হ্যাণ্ড। ছিয়ানব্বই হতে চলল। যদিও বা এবাব সেবে ওঠেন, থার্ড হ্যাণ্ডকেই নির্ঘাৎ যাবেন। তখন যদি শোকে তাপে আব গোলমালের মধ্যে কাপড়চোপড়ের মতো তুচ্ছ কথাটা আমাব বলতে মনে না থাকে? তাই তোকে আগেভাগেই বলে রাখলুম। আব শোন বউমাকে বলবি আমাকে যেন মাছফাচ ধবাস না অশৌচের পবে। আশি বছর বয়সে বিধবা হলে মাছ-মাংস খাওয়া কেবল লুভিষ্টিপনা ছাড়া কিছু নয়। সাপাজীবন ঢেব মাছমাংস খেয়েছি। গেসব বুড়ি বিধবাব দাঁত নেই অথচ মাংস খায় আমাব মনে হয় তাবা সাবা জীবন খেতে পাখনি। হ্যা অল্পবয়সে বিধবা হতুম যদি, সে এক কথা ছিল। কিন্তু বয়েস তো এখন আশি? সাধ আহ্লাদ বাকি থাকাব দিন নেই।”

“আশি তো আপনাব হয়নি, মেজদি। আব বিধবাও তো আপনি হননি। দুটোবই দেবি আছে। দেখুন—জামাইবাব্ব সেবে উঠবেন নিশ্চয়। খুবই ভালো ডাক্তাবেব হাতে বয়েছেন। আচ্ছা মানুষ তো। আপনাকে আশি বছরে যে বিধবা হতে হবেই—এটা কে বলেছে?” আমি প্রায় ধমকেই ফেলি মেজদিকে। তাবপব যোগ কবি—“আব সাধ আহ্লাদ? আপনাব না থাক, আমাদেব আছে, দাঁড়ান না আপনাব আশি বছরেক বার্থে কবব আমবা, ব্যাণ্ডপাটি বাজিয়ে, বাস্তব প্রসেশন কবে: ঘাড়ে কবে বওয়া আলোব স্ট্যাণ্ড জ্বালিয়ে, আপনাকে আব জামাইবাব্বকে হাত-ধবার্থ্য কবিয়ে হাটিয়ে পার্কে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব—আসুক অত্নান মাস—তবে তো আশি হবে? আব বৈধব্য অনেক দূবে, মেজদি, শুধু শুধু অত অলক্ষণে কথা বলবেন না তো।”

“অলক্ষণে কথা? বটে?” বলেই মেজদি দুট্ট হেসে আমার কানেকানে গোপন কিছু বলবাব জন্যে মাথা নিচ কবে এগিয়ে এলেন। কানেব কাছে মুখ নিয়ে বললেন—“কেন এত অলক্ষণে কথা বলছি বল তো? তবে শোন। ছাতা নিয়ে বেকলে যেমন বিষ্টি পড়ে না, তেমনি আমাব কেমন মনে হয়, গোপালের কানেব কাছে অত থান-কাপড়ের গল্পো কবলে, কি জানি, হয়তো আব বিধবা হতে হবে না। বুঝনি বোকা? ঠকচ্ছি। ঠাকুবকে এমনি মিছিমিছি কবে ঠকচ্ছি বে—” মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গোপালঠাকুর মেজদিব কথা ঠিকই শুনতে পান। এযাত্রাতেও জামাইবাব্ব সেবে উঠে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এলেন—মেজদি আহ্লাদে হালকা হয়ে যেন ঠিক চাঁদেব জমিতে নীল আর্মস্ট্রং—ওজনহীন হয়ে উড়ে বেডাতে লাগলেন। উডতে উডতে একদিন সেই নববর্ষের লাল কস্তাপেড়ে ধনেখালিটা পবেই

ভবসন্ধেবেলায় মেজদি স্নানের ঘরে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন।

অতএব ছুখানা ফাইন থান কেনবার জরুরি কথাটা তাঁর ছেলেকে মনে করিয়ে দেবাব দায়িত্ব আমার ঘাড় থেকে নেমে গেল !

মেজদি চলে গেলেন কার্তিক মাসে, আব অস্থান মাসেব এক বাত্তিবে হিমের মধ্যে জামাইবাবু একা একা লোডশেডিংয়ের অন্ধকাবে টর্চ ছাড়াই হঠাৎ বাস্তায় কী কবতে যে বেরুলেন, কে জানে ? মাঝখান থেকে খানাখন্দে পড়ে গিয়ে ডান পা খানা ভেঙে ফেললেন। বেচাবি। সেই যে জামাইবাবু নার্সিংহোমে গেলেন, এবাবে আব তাঁকে সেখান থেকে ফিবিযে আনা গেল না।

—বলি, আনবোটা কে ? মিছিমিছি থান-কাপডেব গুলগপ্পো শুনিযে গোপালঠাকুরকে ঠকানোর কেউ ছিল না যে।

## মেসোমশায়ের কন্যাদায়

ভদ্রমহিলার পাতে মাছটা প্রায় দেওয়া হয়েই গিয়েছে, হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে পড়লেন মেসোমশাই—

—“তুইল্যা ফালাও, তুইল্যা ফালাও।” পাতের ঠিক এক ইঞ্চি ওপরে তখন কইমাছেব পেটি ত্রিশঙ্কু—

—“ওনারে জিগাইসিলা ?”

—“না তো।”

—“ওই তো দোষ। পবিবেশনেব একটা কলস আছে না ? জিগাইয়া লইয়া তবে দিতে হয়। পয়লা কইতে হয়—“আপনি কি মাছ নিবেন ?” মহিলা এই সময়ে বললেন—“হ্যাঁ।” মেসোমশাই সেটা কানে তুললেন না। আমাকে বললেন—“বল ? কষ্ট বল ? আপনি কি মাছ নিবেন ?” মহিলা পুনরায় স্পষ্ট গলায় বললেন—“হ্যাঁ।” আমি আর না পেরে ঝুলন্ত মাছটা ওঁর পাতে দিয়ে ফেলি। মেসোমশাই যাবপবনাই হতাশ মুখে বললেন—“আইজকালকাব ইয়ংম্যানদেব মেইন ডিফেক্ট তো এই। ঠিক গেইটা কইলাম তাব অপোজিটটা করলা তো ? না জিগাইয়াই দিলা। এইভাবেই ওয়েইস্টেজ হয়। সবকার তো এইটাই মানা কবে। যেমন সৌম্য ডিসওবিডিযেন্ট, তেমনই তাব বন্ধু।” আমি এবাবে আরো বোকার মতো, ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন কবে বসি—



—“আপনি কি মাছ নেবেন?” মহিলা আবার বললেন—“হ্যাঁ।” মেসোমশাই  
অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন।

—“বাইট। জাস্ট লাইক দিস। জিগাইয়া লইয়া তবে সেটা পাতে দিতে হয়।  
দ্যাও দ্যাও ওনাবে আরো দুইখান মাছ দ্যাও দেহি—মনে হয় মাছটা উনি ভালই  
খান। মাছ যাবা ভাল খায়, তাবা আবার অনেকেই খাসিব মাংসটা তত ভাল খায়  
না।”

মহিলা বললেন—“আমি কিন্তু মাংস খেতেও ভালোবাসি।”

এবার জিভে একটা অধৈর্য শব্দ কবে মেসোমশাই অভয় হস্ত উত্তোলন করেন—

—“আহাঃ আপনার কথা হয় নাই। জেনাবেল ডিসকাশান হইতাসে। আপনার  
লাইগ্যা মাছ-মাংস সবই আছে, ভয় নাই, তাড়াহুড়া কইবা লাভ কি? অল ইন  
গুড টাইম। মাছটা খাইয়া লন, মাংসও ঠিকই পাইবেন। আরে ও সৌম্য, চিংড়িমাছটা  
এইধাবে আনস নাই?” হাঁকতে হাঁকতে ব্যস্ত হয়ে অনাদিকে যেতেই পথিমধ্যে  
মাসিমা সব সঙ্কে মুখোমুখি। ফুটন্ত কেটলিব মতো মাসিমা বললেন—

—“কী বলছিলে তুমি? কী উচ্চারণ কবলে এইমাত্র?”

—“কইতাসি যে চিংড়িমাছটা—”

—“চিংড়িমাছ? চিংড়িমাছ হয়নি, তা জানোনা?” মেসোমশায়েব মাথায় হাওড়া  
ব্রীজ ভেঙে পড়ে।

—“হয় নাই? স্ট্রুইনজ। সেইদিন যে মেনু হইল?”

—“মেনু হলো, খাওয়াও তো হলো। খেলে না সেদিন ইয়া বড বড গলদচিংড়ি?  
চিনুর পাকাদেখাব দিনে? বিয়েতে চিংড়িমাছেব কথা কবে হলো?”

—“আলবৎ কথা হইসিল।”

—“কক্ষনো হয়নি।”

—“সার্টেনলি হইসিল।”

—“কখনো হয়নি। হয়নি। হয়নি।”

—“ইউ শাট আপ।”

—“কেন, কিসেব জনো আমি শাট আপ? তুমিই ববং একদম মুখ খুলবে  
না আজকে। ছি ছি। গুলিখোব-গাজাখোবের মত কী বলতে কী যে বলছ। কী  
লজ্জা কী লজ্জা।”

—“ক্যান? লজ্জাব হইলটা কী শুনি? চিংড়িমাছ খাওয়াইতে না পাবলেই লজ্জা?  
এইগাব মধ্যে লজ্জাব আছেটা কী?”

—“লজ্জাব এই যে, তোমাব বাকি শুনে সকলে ভাবলো যে মেনুতে চিংড়ি  
থাকা সত্ত্বেও আমবা ইচ্ছে কবেই এই ব্যাচে ওটা দিলুম না। এটাই ভাবলো সকলে।  
ছি ছি—”

—“অত ছি-ছি-যেব কী আছে? মোটেই কেউ তা ভাবে নাই। সকলেই জানে

আমি সার্ভিস কবি, সার্ভিস। বোঝালা ? আমি কি বিজনেস কবি, যে হোর্ডিং ককম ? হোর্ডিং কবা আমাগো নেচাব না।”

বোধহয় এই ‘হোর্ডিং কবা’ শব্দটাতে মাসিমাব ইংবিজি হোঁচট খায়। তিনি বলেন—“ওসব জানি না বাপ, লোকে যা ভাবাব তাই ভাবলো। বাস। সে তোমাব নেচাব যেমনই হোক।”

—“আবে, ভাবে নাই, ভাবে নাই। আব যদি ভাইবাই থাকে, আমি অহনই যাইয়া অগো কইয়া দিতাসি যে, মশয়, আইজ কিন্তু চিংড়িমাছ হয় নাই।”

এই সময়ে বুড়োদা এসে মা-বাবাব মধ্যস্থলে দাঁড়ান। বাফাব স্টেট হয়ে। বুড়োদা মধ্যপ্রাচ্যে শাসালো চাকরি নিসে চলে গেছেন। বছব দুই বাদে এই তাঁব প্রথম ঘবে ফেবা। মাত্র তিন হপ্তাব ছুটিতে, বোনেব বিয়ে উপলক্ষে। প্রচুব সাড়া জেগেছে, আত্মীঃ ‘মহলে (বুড়াব ঘড়িটা দেখসস ?) ‘বুড়া কোন-দিকে ?’ বমবমা পড়ে গেছে। কিন্তু মেসোমশাই কিছুতেই ঠিক মত বুড়োদাকে পাতা দিচ্ছেন না। যেন কোনোদিনই বাইবে যায়নি ছেলে, ভাবখানা এমনি। বুড়োদাব সেটা সহ্য হচ্ছে না। তাই চাপ পেলেই তিনি বাবাব কাছে জোব কবে ইম্পটাস আদায় কবছেন। বাবা-মামেব মধ্যবর্তী হয়ে বুড়োদা বললেন:

—“থাক, বাবা, লেট ইট এনড হিয়াব। ডোন্ট ক্রিয়েট আননেসেসাবি কমপ্লিকেশনস।” অবশ্য বুড়োদা বিন্দু-বিসর্গও জানেন না বর্তমান, সমস্যাটা কী। অথবা সমস্যা আদৌ আছে কি নেই।

—“বুড়া, তুমি থামো তো দেহি। কমপ্লিকেশন কি আমা কং ? নেভাব। হেইডা যে কবাব সেই কবসে। তোমাব গর্ভধাবিনী।” মাসিমা চোখ কপালে তুলে বিপুল এক হাঁ কবতেই বুড়োদা এব কাঁধটা খামচে ধবে সাদবে একটি গুল সার্ভ কবেন—“চলো মা, ওষবে চলো, চিন্ তোমায় খুঁজছিলো।” সাপেব ফণায় মন্ত্রপড়া জল পড়লো। মাসিমা ছুটফটিয়ে কনেব কাছে চলে যান।

সৌমাব বাবা, আমাদেব পড়শী এই মেসোমশাইয়েব দেশ পূর্ববঙ্গে, আব মাসিমা খাস ঘটি। চল্লিশ বছব একটানা কলকাতায় বাস কবাব ফলে মেসোমশাই এখন নিভীকভাবে সর্বত্র এক জগাখিচ্ছি বাঙলাভাষা বলেন। কিন্তু তাতে মাসিমাব মুখেব মিঠে শান্তিপূবী বুলিব নডচড হয়নি। পাডায় যখন ঘটিবাঙালেব ঝগড়া হতো, চিন্দি আব মিতুন নিতো ঘটি পক্ষ: ওবা মামাববাডিব আঁচলধবা মোহনবাগান সাপোটার—কিন্তু বুড়োদা আব সৌম্য বাপ-ঠাকুদাব বংশমর্যাদা বক্ষা কবতে, ফবএভাব ইন্টবেঙ্গল। সেই চিন্দিব বিয়ে আজ। সৌম্য বলল—“কন্টু, তুই বাবাকে আজ একটু চোখে-চোখে বাধিস বে—আমি তো নানদিকে ব্যস্ত থাকবো, বাবা ওদিকে ফিলড খালি পেলে হেভী কেলেক্কাবী কববেন।” এ কাজটা পাড়াগুদ্ব সকলেবই অভোস আছে। পাড়াতে যখনই কোনো সামাজিক কাজ হয়, কাউকে না কাউকে তখন মেসোমশায়েব দিকে ‘চোখ’ রাখতে হয়। মেসোমশাই কী কবতে কী কবে বসেন ?

আব আজ তো একেবারে চব্বম সামাজিক মুহূর্ত সমাগত—স্বয়ং মেসোমশায়েবই কন্যাদায়। অথচ মহামান্য কন্যাকর্তা হিসেবে মেসোমশাই নিজের ডিউটিটা সম্পূর্ণে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পাবছেন না। সম্প্রদান কববেন কনের জ্যাঠা, নিমন্ত্রণ পত্রেও তাঁবই নাম। বান্না-বান্নাব, ‘খাওন-দাওনেব’ চার্জে আছেন কনের কবিতকর্মা সেজকাকা। কেনাকাটাৰ দিকটা সম্পূর্ণ দেখছেন কনের বডলোক মামা-মাসীবা, বাড়িভাড়া, বাড়িসাজানো বড়োদাব, বিবাহেব আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কনের ছোটকাকা এবং কাকীদেব দেখাব কথা। বিসেপশানেব দিকে আছেন কনের পিসিবা। উৎসব বাড়িতে মেসোমশাই কিছুতেই একটা নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি যে অলস, অক্ষম, অথবা এলিয়েনেটেড, অর্থাৎ কিনা পাটিসিপেশনে নাবাগ—এ একেবারেই না। অতএব চৰ্কিবাজিব মতো সাবা বাড়ি ঘূৰে তিনি “কন্যাকর্তাব যোগা” কাজ নিজেই যোগাও কৰে নিচ্ছেন এবং এখানেই সকলের উদ্বেগেব কাবণ।

আপাতত মেসোমশাই বিসেবাড়িব ঘৰে ঘৰে ঘূৰে ভাঙা চেযাব, এবং ফবাসপাতানো ইসপেকশন কবছেন। একটা ঘৰেব ফবাসেব ওপৰে গোটাকষেক বাচ্চা আপনমনে খেলছিল। হেনকালে মেসোমশায়েব আকস্মিক প্রবেশ। ঢুকেই তিনি বাচ্চাদেব বললেন—“তোমবা মনু, অই ঘবটায় বস গিয়া। ঐ ঘৰে কিনা ফবাস নাই, দেখবা ক্যাবল চেযাব আয শতবন্ধ।” তাবপব আমাব দিকে চেয়ে চোখটা টিপে—

—“অ্যাতগুলো কাসসা বাসসা—দুই-চাৰিটা প্রসসাৰ কইবা দিলেই হইল—বাস। সাধেব বিয়াবাডি ফিনিশ।” এও অপমান? মুহূর্তেব মধ্যে বাচ্চাবা সব উঠে অন্যত্র পালায়। বছৰ বাবো-তেবোব ধৃতি-পাঞ্জাবি—চন্দন কাঠেব বোতাম-পৰা দুটো পাকা ছেলে কিন্তু বাচ্চাদেব সঙ্গে উঠে গেল না। মেসোমশাই তাদেব বললেন—“তোমবাও মন উইঠা ঐ ঘৰে যাও। এই ঘব ফব এডাল্টস ওলি।” তাবপব আমাদেব দিকে তাকিয়ে, “পোলাপানগো কথা। কওন তো যায না। প্রসসাৰ কইবা দিতে কতক্ষণ?” গোঁয়াব গোবিন্দ ছেলেগুলি এবাবেও উঠে দাঁডালো না। একটা সম্মুখ সমবেব প্রস্তুতি হব-হব দেখে আমি কেটে পড়তে চাইছি, এমন সময়ে হৈ-হৈ কৰে দুই মিষ্টি এসে পড়লো। সামনেই মেসোমশাই।—“বাবু মিষ্টি কোথায় বাখবো?” মেসোমশাই গভীৰ হয়ে বললেন—“সো-ও-জা উপবে তিন তলায় লইয়া যাও, স-ব অ্যাবেনজমেন্ট কবাই আছে। কষ্টু, তুমিও সাথে সাথে যাও।”

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে দেখি সেখানে ছাদে প্যাণ্ডেল বাধা, ছাঁদনাতলা সাজানো হচ্ছে, মিষ্টি বাখাব কোনও ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু সেখানে অন্য সমাসা—ছাঁদনাতলাব জন্য কলাগাছ কিনতে ভুল হয়ে গেছে।

মিষ্টির ঝুড়িওলাদেব নিয়ে আবাব নিচে এলাম, মেসোমশাই সেখানে ভাঙা চেযাবেব ডাঁইয়েব পাশে একটি আন্ত চেযাবে বসে আছেন। আমাদেব মুখ দেখেই বললেন—“জাগাটা পাইলা না বুঝি? যাও তবে ভাড়াবেই লইয়া যাও।”

—“ভাঁড়াবটা কোনদিকে?”

—“সেইটাও আমাবেই কইয়া দিতে লাগবো? এই বাড়িটা কি আমি প্লান কইরা বানাইসি? এইখানে তুমিও যেই, আমিও সেই। দুইজনাই আউট-সাইডার। এটু কমনসেন্স ইউজ কববা তো রুশ্ট? কমনসেন্স লাইফে খুবই দরকার হয়। যাও তোমাব মাসিমাবে জিগাও গিয়া।” মাসিমা যেন এখানে আউট-সাইডার নন। যদিও প্রত্যেকেই আজ সকালে একইসঙ্গে এ বাড়িতে প্রথম পদক্ষেপ কবেছি। মিষ্টিওয়ালাদের নিয়ে আবার ওপরে উঠছি, মেসোমশায় আবেকজনকে ডাকলেন—

—“এই যে লম্বোদব শুইন্যা যাও।” গণেশ সৌম্যব আবেক বন্ধু। —“তুমিও যাও. গিয়া মিঠাইটা গার্ড দাও গা। তুমি তো মিষ্টান্নটা ভালই বোঝ, এই ডিউটি তোমারেই ঠিক সুট কববো, ভাডাবঘবের সামনটায়া খাড়াইয়া থাকবা. হাতে একটা ছড়ি লইয়া। কেও যান চুবি কইবা খাযনা, কুকুব-বিবাল, কি পোলাপান—বি কেয়ারফুল, বোঝালা? খুব সাবধান। যাও।”

খানিক পবে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল—“কশ্টুদা, তোমাকে গণেশদা শিগগিব ডাকছে।” গিয়ে দেখি ভাঁড়াব ঘবে সারি সারি দই মিষ্টিব হাঁড়ি-খালার সামনে ককণ বিষণ্ণ গণেশ ছড়ি-হাতে দণ্ডায়মান। যেন জ্বলন্ত জাহাজের ডেকের ওপবে কাসবিযাক্ষা। একবাব বাঁ পায়ে ভর দিচ্ছে একবাব ডানপায়ে। আমাকে দেখেই বলল—“যা তো কশ্টু, সেজকাকাব কাছে. শিগগিব একটা তালা নিয়ায়, এটা কি মানুষেব কাজ? এতগুলো টাটকা মিষ্টিব সামনে...এভাবে...মোস্ট ইনহিউম্যান সাইকিক টবচাব।”

গণেশেব নাম গণেশ নয়, ধ্যানেশ। বেচারী খেটে-টেতে একটু বেশি ভালবাসে। এই বয়সেই দিবিা একটু ভুঁড়ি বানিয়ে ফেলেছে বলে মোশোমশাই ওকে আদব কবে ডাকেন “গণেশ”। সেটাই পাডায় চাল হয়ে গিয়েছে।

সেজকাকা ভো শুনে অবাক।—“মিষ্টিব সামনে ছড়ি হাতে লোক পাহারা? এঁয়া? এটা কি ক্ষেত. না খামাব?” তালা মজুতই ছিল হাতে. সেজকাকা নিজে যখন তালা মাাবাব তোডজোড কবছেন অর্থাৎ টেকনিকালি গণেশের ডিউটি অফ হয়ে গিয়েছে, সেই সূক্ষ্ম কযেকটি মাত্র সেকেন্ডেব মধ্যেই লুকিয়ে গোটা চাবেক সন্দেশ সটাসট সেন্টে ফেলল গণেশ। এত ফাইন এবং ফাস্ট ওয়ার্কার সচবাচব দেখা যায় না. এবং গণেশেব মতে, এতে নীতিগত কোনো বিবোধও নেই।

এই সময়ে ওদিকে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেলাম।

—“আঃ হা—কলাগাছ আনে নাই তো হইসেটা কী?” মেসোমশায়ের গলা।

—“চাইব চাইব খানা কলা গাছ দিয়া হইবোটা কী? জানবা যে আমাগো ফেমিলিতে ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগে না, নেভাব। আমাগো গুরু মানা। বোঝালা? কলাগাছেব লাইগ্যা বাজাবে গিয়া কাম নাই. সিধা ছাদে চইল্যা যাও, চাইর কর্নাবে চাইরখান ইটা লাগাইয়া দ্যাও। ব্যাস। ফার্স্ট ক্লাশ”—উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মেসোমশাই প্রায়

কনভিস করিয়ে ফেলেছেন, গণেশ আর আমি ইট খুঁজতে যাব, এমন সময়ে সৌম্যব ছোটকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে হাজিব, দুই বগলে চারটে কলাগাছ।—“এই যে, খোকন, হে-ই যাইয়া কলাগাছ কিইন্যা আনছস ? যেইটাব দবকাব নাই ঠিক সেইটাই।’ টোটালি আননেসেসারি ওয়েইস্টেজ !” বলতে বলতেই দ্রুত স্থানত্যাগ করছিলেন মেসোমশাই, কেননা ওদিক থেকে মাসিমা’র ‘মঞ্চে প্রবেশ’ ঘটছে। কিন্তু শেষবক্ষা হলো না। মাসিমা মৃদু ডাক দিলেন—“কই ? শুনছো ?” আর না শুনে উপায় আছে ? মেসোমশাই দাঁড়িয়ে পড়েন।

—“তুমি নাকি বলেছো ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগাতে হবে না ? তোমাদের গুরুব বাবণ ?”

—“আবে ধব। কে কইল ? আমি তো কইলাম ‘কান—কলাগাছে কামাডা কী ? এইডা কি মা দুর্গাব পুত্রব বিবাহ, যে কলাগাছ না হইলেই ওয়েডিং কানসেল ? জামাইবাবাজী কি গণেশ ঠাকুর ? নাকি এইডা বৈষ্ণবের কালীপূজা ? অবা পাঠাব বদলি কলাগাছ বলি দেয়, থোড দিয়া ভোগ বামা কবে শুনসিলাম। অগো লেইগ্যা কলাগাছ ইনডিসপেনসিবল। কিন্তু আমাগো ঘবে তো চিনুই আছে।” মাসিমা এবাব বললেন—

—“হ্যাঁগা, তোমাব জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেব ?” লম্বা জিভ কেটে মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বলেন—“তুমি আব ফাঁস দিবা ক্যামনে ? তুমি নিজেই তো ফাঁস। আমি তো তোমাবেই গলায় পইবা ফাঁসি লাগাইসি। দবিব কি গলায় দবি হয় ? হয় না !” এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক মেসোমশাইকে বাইবে ডাকলেন। মেসোমশায়ে’র মুখটি মলিন হয়ে গেল।—“অহনই আইতাসি,”—বলে উপবে উঠে গেলেন হস্তদন্তভাবে। যাবাব আগে মাসিমা’র কান বাঁচিয়ে আমাকে সিঁড়িতে ডেকে এনে বলে গেলেন—“দাখলা তো ? মেজো ভাইবা গাডি-ড্রাইভাব ধাব দিসে কিনা। তাই তখন থিক্য কাজ নাই কাম নাই আমাবে ডাইক্যা ডাইক্যা কাবল ফালতু কথা কইতাসে। য্যান সেই আইজ কন্যাকর্তা। কতবড ভি আই পি লোক। হঃ। আমি আব যামুই না নিচে !” বলে, সোজা ছাদে পালালেন, যেখানে কলাগাছ লাগানো হচ্ছে। খানিক বাদে আমিই ওপবে গেলাম মেসোমশাইকে ভাত খেতে ডাকতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সৌম্যব বড়মামাব সঙ্গে দেখা। পান চিবুতে চিবুতে উঠছেন। মেসোমশাই হঠাৎ ভদ্রতার অবতার হয়ে হাত জোড কবে বললেন—“খাওনদাওন ঠিকমতো হইসে তো ?” সৌম্যর মামা টেকুব তুলে বললেন,—“ব্যবস্থা তো চমৎকাব, কেবল ডালে নুনটা একটুখানি বেশি পড়ে গেছে, ওটা”—

“তাইলে আপনি এটু ঠাকুরগো লগে থাকলেই পারতেন ? খাইবেন তো আপনারাই ! ভাইলে লবণটা আপনাব স্নহস্তে দিয়া দিলেই ঠিক হইতো।” হতবাক শ্যালকেব মুখটি কালো কবে দিয়ে বীবদর্পে মেসোমশাই নেমে আসেন।

কলকাতাব বনেদী বড ঘব সৌম্যব মামার বাড়ি। উদ্বাস্তু মেসোমশাইকে ভাল

ছাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যব দাদু। কিন্তু মেসোমশাই নিজের শশুববাড়িকে দৃচক্ষে দেখতে পাবেন না। তাদের অপবাধ, তারা একেই ধনী, তায ঘট।—“কলকাতার কাষেত তো,” প্রায়ই বলেন তিনি মাসিমাকে—

—“তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাচ। জিলাবীব প্যাচ। বোঝা ? ওইটাে তো ভদ্রতা কয় না, কয় কুটিলতা।” চাপ পেলই তিনিই শশুববাড়িকে ডাউন দ্যান। নিচে আসা মাত্র আবাব মাসিমাব একেবাবে মুখোমুখি পড়ে গেলাম দুজনে। সাক্ষাৎ মাত্রেই প্রেমালাপ। মেসোমশাই এবাবে ট্যাকটিকস বদল কবেছেন। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

“এই যে, আইলেন। তোমাগো লাইগাই যত না গোলমাল। খালি হই হই। খালি হই হই।”

—“আমি আবাব হেইহেটা কী কবলুম শুনি ? গোলমালের বাজা তো তুমি ? তোমাব বাধানো গোলমাল সামলাতে সামলাতেই...কী ? কী বলেছে তুমি কৃষ্ণাব ভাইকে ?”

—“কী আবাব কইলাম ? কৃষ্ণাব ভাইডা আবাব কেডা ?”

—“জান না ? জান না তো অত কথা বলা কেন ? কাজেব বাড়িতে, একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি-ছি-ছি। কী লজ্জা। কী লজ্জা। ঘরে বসেছিল, তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘব থেকে জোব কবে তাড়িয়ে দিয়েছ, আবাব বলেছ কিনা ফবাসে নাকি হিসি কবে দেবে ?”

—“কে কইল ? আবে—সমস্ত বাজে কথা। কী কইতে কী যে কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান ? আমি তো কাবল কইলাম কাসসাবাসসা গিশগিশ কবতাসে, কওন তো যায় না ? প্রসসাব কইবা দিতে কতক্ষণ ? ফবাসটা শ্যায় কইবা দিত কি না, তুমিই কও ? আকসিডেন্টালি, পোলাপানগো কথা কওন তো যায় না ?”

“আকসিডেন্টালি ? কৃষ্ণাব ভাই ক্রাস এইটে পড়ে। সে আকসিডেন্টালি ফবাসে হিসি কবে দেবে ? এটা একটা কথা হলো ? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে।—তাব ভাই তো আব জানে না তুমি কী বস্তু ? নতুন কুটুম—ছি-ছি”—কৃষ্ণা সৌম্যব ছোট কাকীমাব নাম, কাকাব নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছব ঘোবেনি। মেসোমশাই সতাই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হলে।

—“আমি কী কইবা জানুম সে ছামবা কুটুমবাড়ির পোলা ? সবকয়ডা এগুগ্যাগুই তো আসে দেহি তোমাব বাপেব বাড়ি থিক্যা। আমি তাই—”

—“ও, আমাব বাপেব বাড়িব লোক ভেবে তুলে দিগেছিলে ? এবাবে বোঝা গেল।”

—“না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি—সইতা বলতে কি—”

এমন সময়ে বৃড়োদাব আবির্ভাব, তাঁর দীর্ঘদেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে।

দুজনেব চাইতেই একমাথা ওপব থেকে বুডোদা বললেন,—“এটা কিন্তু খুবই সেলফ কন্ট্রাডিক্টিব কথাবার্তা হচ্ছে বাবা। প্রথমত, আমি স্পষ্ট শুনেছি যে তুমি বলেছিলে—” অমনি মাসিমা ফুঁপিয়ে ওঠেন—

—“দেখলি তো বুডো, দেখলি তো, তোব বাবা কী কবেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মা বলেন চিবটাকাল”। মায়েব কাঁধে হাত বেখে বুডোদা সম্মেহে বলেন,—“যাক গে, বাবাব কথা বাদ দাও মা, চলো, এবাব তুমি খেতে না বসলে—”

খেয়েদেয়ে সবাবই একটু ভাবী ভাবী লাগছে, কিন্তু মেসোমশাই হালকা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন এ-ঘব ও-ঘব, এ-বাবান্দা সে-বাবান্দা। একবাব আমাকে ডাকলেন—“শোনো, কণ্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও”—কোনো জকরী কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গেছি মেসোমশাই আমাব কানে-কানে ফিসফিস কবলেন—“যে-যাব বউবে। বোঝালা কণ্টু? যে-যাব বউবে।” আমাব মুখেব বিভ্রান্ত চেহাৰা দেখে এইবাব দযাবশে উল্লিটি প্রাঞ্জল কবে দেন—“মেজো-ভাযবাও তার গাডিটা দিসে, আবও একটা গাডি আমি বেইন্ট কবসি। চিনুব মামাঙলা, সব শালাবা ওই গাড়ি কইবা যে-যাব বউবে আনাইতাসে। এভেবিওয়ান ব্রিংগিং হিজ ঔন ওয়াইফ। য্যান ওই জনাই দ্যাশে কাব-বেন্টাল-সিস্টেমটা চালু আছে। যত সব সেলফ-সেণ্টাবড ঘটি।”

এমন সময়ে সুন্দবী, সুবেশা, মোটামোটা, এক মধ্যবয়সিনী, ঘামতে ঘামতে এসে ধপ কবে চেযারে এলিয়ে পড়ে আত্মদে-গলায বললেন—“উঃ, বড্ড চা-তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু, জামাইবাবু।” সাধাবগত সুন্দবী গ্যালিকাব প্রতি ভগ্নীপতিব যে মনোভাব থাকাব কথা, এক্ষেত্রে তাব ঘনঘোব ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীৰ স্ববে বললেন—“ঠাকুবগুলিবে আব অহন আপসেট কইবা কাজ নাই, পযসা দিতাসি, এই লও”—বলতে বলতে প্যাণ্টেব পকেট থেকে একটি চকচকে আধূলি বেব কবে অন্তত তিন ছেলেব মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটিব দিকে বাড়িয়ে ধবলেন—“বাস্তা থিক্যা চা খাইয়া আস গিয়া। বেশিদূবে না। বাইবাইলেই দাখবা ফুটপাতে সাব সাব চাযেব স্টল। সাব সাব। সাব সাব।” মহিলা মুখেব অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দেখেই তাডাতাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাব হাত এগিয়ে গিয়ে আধূলিটা নিয়ে নেয। নিলে কী হবে? খপ কবে আমাব হাতটি ধবে ফেলেছেন মেসোমশাই।—“কণ্টু, তুমি নিলা ক্যান? তোমাবে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায মলিনা। মলিনাব লগে দিসি।” আমি তাডাতাড়ি ব্যাখ্যা কবি। পযসাটা আমি মেবে দিচ্ছিলাম না, নিচ্ছি ঐ মহিলাব জন্য চা এনে দেব বলেই। উনি কী কবে মিছিমিছি নিজে কষ্ট কবে...ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ একট্রীমলি আনন্দিত হয়ে উঠলেন—“খাডাও, ইউ আব আ গুড বয, কণ্টু। ভেবি কনসিডারেট। আবও দশ-পযসা লইয়া যাও, দুই খুবি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আব আমাব লগেও একটা আইন্যা দিও।” এবাব মলিনা মাসিমা হেসে ফেলেন।

—“আপনাব আব আমাব কি একটা খুবি থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?” লজ্জা পেয়ে মেসোমশাই বলেন—“ওঃ হো, তিনজনাব তিন খুবি চা! থ্রি কাপস।”

বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন—“কী, চা আনা হচ্ছে নাকি” বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বেখাদি, তাবপব সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি আর তিন টাকা নিয়ে সৌম্য আব আমি বেরুলাম। ফিবে দেখি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দরী শালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুরবাই চা বানিয়ে ট্রে ভবে ভবে পাঠাচ্ছে। মেসোমশাই যাবপবনাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদের দেখে বললেন—“বাইখ্যা দ্যাও বাইখ্যা দ্যাও। কাজে লাগবেই—পবে গরম কইবা খাইলেই হইবো। কি কও. মলিনা?” মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়ে বাড়িতে আব কে কবে মনে কবে তিন টাকার ফুটপাতে কেনা চা গরম কবে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত কপচর্চা-বিশাবদ গোপকুমার এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন—(এই সঙ্গে বাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে) এব আসটা মেসোমশাই পছন্দ করেননি। তাই গলা তুলে বললেন—“আমাগো টাইমে তো মা-মাসিবাই চুল বাঁধা দিত। কিন্তু চিনুব মা তো তা দিবে না। অলস। তাই ফাইব হানড্রেড কপিজ জলে ফালাইল।” মাসিমা ধাবে-কাছেই ছিলেন। হৈ-হৈ কবে এসে পড়লেন—“কে বললে আমি চুল বাঁধতে পারি না? তোমার ভায়েদেব বৌভাতে কে বৌ সাজিয়েছিল? আমার ননদদের বিয়েতে কোন ভাড়াটে লোক এসে চুল বেঁধেছে. শুনি? এটা আলাদা। এ হলো চিনুর একটা স্পেশাল শখ। তা, এব খবচাও তো তোমার নয়, ওটা দিয়েছে আমার ভাই। তোমার তাতে এত গা জ্বালা কিসেব?”

—“আবে—যে-হালায়ই দিক না ক্যান ওটা কোনো কথাই না। কথাটা হইলো ওয়েইস্টেজের। ওই পাঁচশত টাকা দিয়া তোমার আমার দুইজনাবই চন্দন কাঠেব চিতা হইতে পাবতো জান?” কোথেকে বুড়োদার উদয়। পুনরায় ব্যাফলওয়ালেব মতো মাসিমা কে আডাল করে দাঁড়িয়ে বললেন—“খুবই ইললজিকাল কথা বললে কিন্তু বাবা। যদিও সাজসজ্জায় একবারে পাঁচশো টাকা খবচ কবাটা মব্যালি সাপোট কবি না, তবু আমি মনে কবি. একজন জীবিত ব্যক্তির মনস্তত্ত্বিব জন্য পাঁচশো টাকা খবচ করাটা অনেক বেশি ওয়ার্থ হোয়াইল এক মৃতদেহেব পিছনে ঐ অর্থ ব্যয় কবার চাইতে। তাছাড়া যখন পনেবো টাকাতেই বৈদ্যতিক চুল্লীতে সিভিলাইজড উপায়ে একটা—”

—“পনেবো আব নাই বে বুডা, হেই দিনকাল নাই। এই বাপেবে পুডাইতে তোমার কিন্তু চল্লিশ টাকা লাগবে। আব তোমার মায়েব বেল'য় নির্ঘাত আবে বেশি, বাই দেন অস্ত্রত পঞ্চাশ-ষাট তো বটেই”—এবার মাসিমা খুবই মুষড়ে পড়েন। —“ভালো! বাপব্যটায মিলে তোমরা আমার চিতাব হিসেবটাই কবে তাহলে আজকের দিনে”—মেসোমশাই পলকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন—“তোমাগো লেইগ্যাই তো এই কমপ্লিকেশন শুক। ও গোকুলচন্দ্রেব আনলো কেডা? তোমাগো বড়লোক বাপের



বাড়ি থিকাই তো”— বুড়োদা আবাব শুধরে দেন—“গোকুলচন্দ্র না বাবা, গোপকুমাৰ।”  
 —“ওই একই হইল, যিনিই গোকুলচন্দ্র তিনিই হইলেন গোপকুমাৰ, কোনো ডিফাৰেন্স নাই”—

—“না, ডিফাৰেন্স তোমাৰ কিছুতেই কি আছে, কেবল আমাৰ বেলায় ভিন্ন।  
 মুন্ডি-মিছবি তোমাৰ কাছে একদৰ—যত যত্না সবই কেবল এই একটি জায়গায়”  
 —বেগতিক বন্ধে আমি বুড়োদাৰ দাওয়াইটা অ্যাপ্লাই কৰি।

“মাসিমা, চিন্দি বোধহয় আপনাকে ডাকছিলেন।” কী কৃষ্ণণেই যে বললাম।  
 বলবামাত্র মাসিমা দৌড়ে ও ঘৰে যান এবং ততোধিক দৌড়ে প্রত্যাবর্তন কৰেন।  
 বণং দেহি মূর্তিতে।

—“তোমাকে কে বলেছিল শত্রুতা কৰে মেয়েটাকে এক্ষুনি হবলিক্স। আব দই  
 গেলাতে? কেন খাইয়েছ? কেন ওব অতো দামী বেনাবসীতে দই ফেলে দিলে  
 তুমি? অত কষ্টেব সাজগোজ নষ্ট কৰে দিযেছ, কিসেব জন্যো? কে বসেছিল  
 তোমাকে? কে?”

চিবুক উচু কৰে প্যাণ্টেব দু' পকেটে দুই হাত গুঁজে, মাস্তান ভঙ্গিতে একটু  
 ব্যাকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহাবাব মধোই ডিফাব্যান্ট ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন  
 ফাঁসির মঞ্চে সূৰ্য সেন।

—“কইবো আর কেডা? আপন গৰ্ভধাবিনী জননী যাবে দেখে না, হিউজ  
 নেগলেণ্ট কৰে, তারে দেখবো তো বাপেই।” ব্যাপাব কী? না পাঁচশো টাকাৰ  
 সাজসজ্জা কমপ্লিট হয়ে যাবাব পৰে, সহসা স্নেহ-প্লাবিত হয়ে মেসোমশাই চিন্দিদিকে  
 জোৰ কৰে হবলিক্স আব দই খাইয়ে এসেছেন নিজেব হাতে। ফলে সেই সব  
 সমুদ্রপাববতী অমূল্য কিসপ্রুফ লিফস্টিক, লিপগ্লস, লিপশাইনাব, লিপ-লাইনাব ইত্যাদি  
 ড্রেফ লেহা পেয হয়ে গিয়ে, কনে সৰ্বস্বান্ত। গুণ্ঠাধৰে এখন প্রধানত যাদবেব দই  
 লেগে আছে। হৃদয় হা হা কৰে উঠলেও বেচাবা চিন্দি একঘৰ কুটুম্বেব সামনে  
 বাপেৰ অবাধ্য হতে পাবেনি।

—“এই হবলিক্স আব দইটুক এটু খাইয়া লও মা জননী, এ হইল গিয়া বোগীব  
 পইখা, উপবাসেব মধো খাইলে দোষ হয় না। আহা, মাইগাভাব মুখখানি শুকাইগা।  
 এই এভোটুক যে!” ফলে চিন্দিৰ মুখ আবো বেশি শুকিয়ে খুবই কৰুণ হয়ে  
 গেল। কিন্তু পিতাব সেন্টিমেণ্টাল আ্যাকশনে বাধা দেয, এমন বৃক্বেব পাটা কোনো  
 আত্মীয়ের ছিল না। যদিও ত্রাত্যেকেই পাঁচশো টাকাৰ প্রসাধন অংশত খেয়ে ফেলা  
 নিয়ে যৎপবোনাস্তি উদ্বেগে ভুগছিলেন। চিন্দিৰ অসীম সহ্য। বুক ফাটলেও চোখ  
 ফাটেনি—কেননা তাতে নয়নেব টিয়ার প্রুফ-মাস্কাৰা এবং কপোলেব ফিযাবপ্রুফ  
 ‘রাশাব’ পেইণ্টও ধুয়ে যেতে পাবতো, কে জানে? খাওয়াবাব সময় এক চামচ  
 দই আবার কনের কোলে পড়ে গিয়েছে। পডবামাত্র মেসোমশাই সেখানে একমগ  
 জল এনে মুছেছেন। ফলে এখন কনেব কোলেব কাছে লাল বেনাবসীৰ বেশ খানিকটা

অংশ বং পালটে ঘোরতর খয়েরি এবং জব্টিরি ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে। চিনুদি চৌট ফুলিয়ে সেইখানটা অনববত ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে রাখবাব চেষ্টা কবছে। এই অবস্থায় আমি কেটে পড়াই ভাল মনে কবি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সৌম্য আব আমি একটা ঘরে ঢুকে সিগারেট খাচ্ছি। চারদিকে এত ফ্রি সিগারেট অথচ এমনই গুরুজনদেব ভিড যে না-লুকিয়ে খাওয়াটা সম্ভবই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘবেই মেসোমশাইয়ের প্রবেশ।—“কুটু তুমি না ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার?” ভাগ্যিস আমাব সিগারেটটা ততক্ষণে শেষ। “এখনও ফাইন্যাল পবীক্ষা হয়নি মেসোমশায়।”

—“এ হইল গিয়া একই কথা। বিয়াতো এখনও হয় নাই, তবুও তো চিনু অহনই কনেবউ। তুমি হইলা গিয়া কনে-এঞ্জিনিয়ার। বোঝালা? ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েসগুলি তো বুঝ? বেকর্ড প্লেয়াবে তুমিই বস গিয়া। যাও। যত আনট্রেন্ড লে ম্যানগো হাতে পইবা মেশিনটা শ্যাম হইয়া যায় আব কি। ঘটিবা মেশিন-টেশিনেব সাবজেক্টটাই বুঝে না,—ব্রেনটা ডাল তো?” সৌম্যর মামাতো ভাইবোনেরা যে সাবাদিন বেকর্ডপ্লেয়াবে শানাই লাগাচ্ছে, এটা এই মাত্র মেসোমশায়েব খেয়াল হয়েছে। —“আব শুন—বি কেয়াব-ফুল, বেকর্ড দুইখান অলটাবনেইটলি লাগাইবা। অলটাবনেইটলি, অর্থাৎ একবার এইটা, আবেকবার ওইটা। বোঝালা তো? সৌম্য কই?” —সৌম্য তখন দরজাব পিছনে মেঝেয় ঘষে ঘষে সিগারেট নেভাতে দারুণ ব্যস্ত। ঘবময় ফবাসপাতা অথচ আশট্রে নেই। ফবাসে ছাই যাতে না পড়ে তাই অতি-সতর্কতা অবলম্বন কবেছি। ঘবেব এককোণে ঢুকে একফালি ফাঁকা মেঝেয় ছাই ঝাড়া হচ্ছিল। কিন্তু মেসোমশাইয়ের চোথকে ফাঁকি দেবে কে?—“এ ধাবে ধোয়ার মতন দেখতাসি না? ওহানে কেডা? সৌম্য নাকি?” সৌম্য কাশল। —“হঃ। ঘবময় ছাই ঝাবতাসো। অ্যা? চাদবটা ময়লা কবতাসো। অ্যা, কামেব বেলায় দেখা নাই, ক্যাবলই আকামা কামেব বাজা?” বলতে বলতেই মেসোমশাইয়েব সবেগে নিষ্ক্রমণ এবং পবমহুর্তেই কোথেকে একটি স্নানস্থান নতুন মুডোঝাটা হাতে পুনঃপ্রবেশ।—“ছিঃ ছিঃ, যতত ছাইভস্মা ঝাইবা পবিষ্কাব-ঘবটাকে দিল শ্যাম কইবা”—গজবাতে গজবাতে তিনি ঝাটা বুলিয়ে বুলিয়ে ধবধবে ফবাস থেকে কাল্লনিক ছাই ঝাড়তে থাকেন। মেসোমশায়েব নিজের পায়ে অবশ্য যথেষ্টই ময়লা ছিলো। ফবসা চাদবে সেই ময়লা পায়ের ছাপ পডতে লাগলো, অস্মান ববফে ইয়েতিব পদচিহ্নেব মডো। আশ্রাণ চেষ্টাতেও ঝাট দেওয়ার পুণ্যকর্ম থেকে মেসোমশাইকে নিবৃত্ত কবতে পাবা গেল না। ফবাসটাকেও পবিচ্ছন্ন বাখা গেল না।

ইতিমধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়িব হর্ন শোনা গেল, গেটে শাঁখ বেজে উঠলো, হলুধবনি হলো। অমনি, “—দেয়ার! দি ববযাত্র! দি ববযাত্র ফাইনালি আরাইভড!!!” বলে চীৎকাব কবে উঠে মেসোমশাই ঝাটা হাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পেছন

পেছন আতঙ্কিত সৌম্য আব আমি—“বাবা। ঝাঁটা। ঝাঁটা।” “মেসোমশাই, ঝাঁটা। ঝাঁটা।” বলতে বলতে ছুটি, কিন্তু সমবেত গোলমালে আমাদের কাতুব আকৃতি ডুবে যায়। কে কাব কথা শোনে। মুহূর্তের মধ্যে হাস্যবদন প্রফুল্যকাস্তি মেসোমশাই মুডো ঝাঁটা হাতে ববযাত্রী অভ্যর্থনায় সদর গেটে বেডি। এই ক্রিটিকাল মোমেন্টে মিতুন, সৌম্যর ছোট বোন ছুটে এসে বাবাব হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দ্বে ঝুঁড়ে ফেলে দিল। এবং মেসোমশাইকে চাপা গলায় একটি ধমক লাগালো।

অমনি তাঁব মুখেব হাজাব পাওয়াবেব হাসিটি দপ কবে নিভে যায়, এবং মুড-মেজাজ খুবই খাবাপ হয়ে যায়। মেসোমশাই এবাব হাত জোড কবে, বিষণ্ণ গম্ভীৰ মুখে, ঠিক শ্রাদ্ধসভাব কর্মকর্তাব মতো দাঁড়ান। গাড়ি থেকে ববযাত্রীবা নামতে শুরু কবে। মেসোমশাই গম্ভীৰ। নির্বাক। জোডহস্ত। শাড়িপবা, সুন্দরী মিতুন আব তাব একটি কিশোরী বান্ধবী বেলফুলেব মালা আব একটি কবে গোলাপ ববযাত্রীদের উপহাব দিচ্ছে। একটি মিষ্টি হাসি সমেত। স্মিতহাস্য সুন্দর্শন এক যুবক মিতুনকে নিচুগলায় কী যেন বলতেই, লজ্জায় লাল হয়ে মালা না দিয়ে মিতুন তাকে দুটি গোলাপফুল দিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাৎ মেসোমশায়েব মুখ খুলে যায়।

—“দুইটা কইয়া গোলাপফুল কাবেও দিবা না, মিতুন। সব একটা একটা, ওয়ান টু চ। বোঝালা? মালা দ্যাও।”

সপ্রতিভ যুবকটি বলে—“আমিও তো ঠিক তাই বলেছিলাম, মালা দিতেই তো বলছিলাম। উনি কিন্তু দিলেন না—” এবাব মেসোমশাই ছোকবাটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ব্যালে ডান্সেব পিকয়েৎ কবাব ভঙ্গিতে। এক মুহূর্ত বন্ধ জলকবা চাউনি, তাবপব বললেন—“আপনেব এটু মিসটেইক হইয়া গেসে না? আইজ তো আপনেব মালা পাওনেব ডেইট না? আপনেব ফ্রেইণ্ডেব।” তাবপবে—“মিতুন, অমন যাবে-তাবে মালা দিবানা এই কইয়া দিলাম, হউক সে ববযাত্র, যত সব ফাজিল ছামবা।” কুটুপ যুবকটি বিভ্রান্ত, মিতুন লজ্জিত, আমবা উদ্বিগ্ন, সৌম্য ভাড়াভাডি গিয়ে ছেলেটির ক্রোধে ফুলন্ত পিঠে সৌভাত্রেব হাত বাখে এবং ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভিতবে নিয়ে যায় এবং অচিবেই অকুস্থলে বড়োদাব অভ্যদয় ঘটে।

—“আবাব তুমি কন্ট্রাডিকটাবি কথাবার্তা বলছো বাবা? এই তুমি নিজেই বললে মালা দাও—মালা দাও, আবাব এই বলছো মালা দিও না—মালা দিও না। মিতুন তা এতে একদম কনফিউজড হয়ে যাবে।”

মেসোমশাই চোখ তুলে মনুমেণ্টেব মতো উঁচু মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী পুত্রের মুখেব দিকে তাকান। তাবপব তাব বুকেব গোলাপফুলটির দিকে। তাবপব বলেন—“মিতুন, তোমাব দাদাব বুকেব থিক্যা ওই গোলাপটা খুইল্যা লও তো দেহি। যত ওয়েইস্টেজ।” ইতিমধ্যে বব-ববণ করতে কুলো-ডালা-শ্রী সমেত মাসিমাও গেটে উপস্থিত। চওড়া জবিব দাঁতওয়ালা টুকটুকে লালপাড় দুধে-গবদেব ঘোমটাব নিচে তাঁব গোলগাল ফর্সা মুখখানি আধোখুশিতে, আধো কান্নাতে, উদ্বেগ উত্তেজনায় আশ্চর্য বঙীন।

মাসিমার মুখের সেই লালচে আভার দিকে খানিক স্থির চোখে তাকালেন মেসোমশাই। তারপর বললেন—

—“মিতুন, বুড়ার বৃকের থিক্যা গোলাপফুলটা খুইল্যা লইয়া তোমার মায়েব খোপায় গুইজ্যা দাও তো দেহি!”

সেই মুহূর্তেই বর নিয়ে ঢুকলেন বরের পিসেমশাই। যিনি মেসোমশায়ের অফিসের ইনকামটাঙ্ক অডিটর। চেনামুখটি দেখতে পেয়ে অকূলে কূল পাবাব মতো পরম উল্লসিত মেসোমশাই বরের দিকে দৃকপাত মাত্র না করে বরের পিসেকে জড়িয়ে ধরে বললেন—“আবে—আসেন স্যার—আসেন, আইজ তো আপনেরই দিন।” উলু এবং শঙ্খধ্বনিতে মেসোমশায়ের মহৎ উল্লাস চাপা পড়লো।

বরপক্ষ বড় বেশি ধনী। মেসোমশাই সেই কারণে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা চলছে না। কেননা বাড়ি আর সকলেই খুশি। বড়লোক হলেই বা। তাবা লোক খারাপ নয়। একেবাবে কিছু চায়নি। “হ্যাঁ, একটা বিয়েব মতো বিয়ে কবেছে বটে চিনু। প্রেম তো কত লোকেই করে। বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই করে। কিন্তু এমন একটা বিয়ে ক’জনে পায়?”—অতএব বালিগঞ্জে ভাল পাড়ায় বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে, টুনিবালবেব ঝর্ণাধাবায় আর টাটকা ফুলের তৈরি বাজকীয় তোরণে বাজীমাৎ কবে বাড়ি সাজানো হয়েছে। এই শখ, এবং খবচ সব বুড়োদাব। কিন্তু এই এলাহি ব্যাপারটা মেসোমশাই একদম পছন্দ কবছেন না। তাঁব ইচ্ছে ছিল গড়িয়ায় তাঁর “নিজ বাসভবনে” ছাদে প্যাণ্ডেল বেঁধে যেমনভাবে সেদিনও তাঁর ছোটভায়েব বিয়ে হলো, তেমনি করেই মেয়ের বিয়ে দেন। “চিনুব বিয়ে” বলতে যে স্পষ্টটা তিনি চিবিদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এসব কাণ্ডকারখানা ঠিকঠাক কিছুই মিলছে না। আজকের এই বিয়েবাড়ি তাঁব যেন নেহাত অচেনা। এর মধ্যে তাঁব ভূমিকাটা কোথায়? পাত্রও তাঁকে খুঁজতে হয়নি, চিনু নিজেই খুঁজে পেয়েছে। পণও নিচ্ছে না তাবা একটি পয়সা, খাটবিছানা, দানসামগ্রী কিছুই নেবে না, বাখবাব জায়গা হবে না নাকি তাদেব। সবই আছে। কেবল নমস্কাবী কাপড তিপ্পান পীস, আর আশীর্বাদে বরের একসেন্ট হীরের বোতাম হলেই হবে বলেছিল—নইলে নেহাত আত্মীয়দেব কাছে পাত্রের মুখ থাকে না, তাই। তাই সেই বোতামটা ছেঁটে ফেলে একটা হীরেব আংটিতে বফা করে নিয়েছে চিনুই। (চিনুর মতো কনসিডারেট মাইয়া ওয়ার্ল্ডে কয়জনাব হয়?) কিন্তু এতেই মেসোমশায়ের গচ্ছিত প্রতিভাও ফাণ্ড উঠে গেছে, বন্ধুদেব কাছে ধার হয়েছে। এখনও মিতুনেব বিয়ে বাকি, সৌম্যর ডান্ডবি পড়া শেষ হয়নি। অথচ পাঁচশো টাকার খোঁপা, চাব হাজাবেব ফুল এবং আলো (সে যে-হালায়ই দিউক না ক্যান), মেসোমশাইয়ের মাথার মধ্যে কেবলই এগুলো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সূতবাং বরষাত্রীরা যেই সভা-সাজানোর প্রশংসা কবেছে, অমনি মেসোমশাই বলে ওঠেন—“তাইলে শোনে স্যার, অই যে টুনিবালব

আব ফুলের গেইট, তার দ্বারা কিন্তু বিয়াডা হয় নাই। তার জন্য প্রভিডেও ফাও উঠাইতে হয় নাই। হ্যাঁ, মন্দ কি আর? ফেক্সী ব্যাপার, লাইট, ফ্লাওয়ার, এ সকল তো ভালই। ঐ যে বাইবেলে কয় না, ‘লেট হানড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম’—লেট দেয়াব বি লাইট?’—সকলই সইত। কিন্তু পার্সে কুলাইলে তবে তো? মাও সে-তুং যে কইসেন না, চাইনিজ পিপলদের লগে—‘কাট ইওব কোট একর্ডিং টু ইওব ক্লথ? আমিও তাই কই। খাটি কথা।’

বরযাত্রীবা মেসোমশায়েব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েন। আমি কী করে যে ওঁকে সবিয়ে নেব, ভেবে পাই না। এর পব মেসোমশাই উদাস দার্শনিককণ্ঠে বলেন—“এইজনাই তো ঠাকুর কইসেন—সর্বদা সমানে সমানে কাজ কবা উচিত। পূর্ববাংলায় আমাগো এক প্রবচন আছে—উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমেব সাথে, যিনিই মধ্যম তিনি চলে তফাতে। আমবা হইতাসি গিয়া সেই মধ্যম। বোঝলেন?” বরযাত্রীবা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। তাঁবা ঠিক বুঝতে পাবলেন না। তাঁদেব উত্তম বলা হচ্ছে, না অধম বলা হচ্ছে। কিন্তু মেসোমশায়েব তাতে কোনো উদ্ভাপ নেই। এবার তিনি—“এক্কিকিউজ মী, আমি একটু বিফ্রেশমেন্টের দিকটা দেয়খ্যা আসি” বলে উঠে গেলেন।

আসলে বরযাত্রীদের সঙ্গে কন্যাকর্তাব বাক্যলাপ ব্যাপাবটার সঘন সামাজিক গার্ভীয় বিষয়ে মেসোমশাই পর্যন্ত সচেতন এবং সেই কারণেই নার্ভাস হয়ে পড়লে কেউ কেউ যেমন তোৎলা হয়ে যায় মেসোমশাই তেমন নিজের কথা খুঁজে পান না। কেবলই কোট কবতে থাকেন। কিন্তু কোটেশনের উৎসগুলো তখন সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনটা প্রবাদ কোনটা মাও সে-তুং কোনটা বাইবেল কোনটা ববীন্দ্রনাথ, সে সমস্তই তখন ইমমেটরিয়াল হয়ে যায় ওঁর কাছে। এই যেমন বিয়েব আগের দিনের দুপুরবেলা গড়িয়াব বাড়িতে। বিয়েবাড়িব হট্টগোলে বাড়িব কুকুরটি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে এনতাব তাড়া কবেছিল লোকজনকে। তাড়া খেয়ে বাচ্চা চাকব কেঁদে ফেলেছে। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত। উদ্বিগ্ন।

—“কী হইসেটা কী?”

—“কুকুবঅ কামডাইখিলা।”

—“একচুয়ালি কামড দিসে কি?”

—“না, কিন্তু—”

—“না, তবে কানসিলা ক্যান?”

—“মোর নতুন নুগা ছিডি দিলা।”

—“ঈশশ—।” দুমিনিট—লুঙ্গিব জন্য মৌন শোক। তাবপব—

—“তুই অবে উল্টাইয়া মাবলি না ক্যান?”

—“বাবু আপনি মতে মনা কবিখিলে। কহিখিলে কুকুরকু মাবিলে মোব গোডঅ ভান্দি দিবে—”

—“আরে থো—। আমি হেইটা কইসিলাম তুই অরে মিছামিছি খাপাইতিস বইল্যা। কিন্তু ফোঁস কবতে তো মানা কবি নাই?”

—“ফোঁস? ফোঁস কঁড় বাবু?”

—“আবে হেইটাও শোনস নাই? লাঠিব ঘায়ে মব মর সাপটারে দেইখ্যা সেই যে গান্ধীজী কইসিলেন—আরে, তোবে কামড় দিতে মানা কবছিলাম, কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা কবি নাই? মহাত্মাজীর সব থিক্যা ভেলুয়েবল অ্যাডভাইজ হইল এইটা। সর্বদা স্মরণে রাখবা। বোঝলা?”

তক্ষুনি বুডোদা বললেন,—“বাবা, ওটা কিন্তু মোটেই গান্ধীজী বলেননি, ওটা তো বামকৃষ্ণের কথা।” মেসোমশাইও ভ্রুবিতে জবাব দেন,—“আঃ—কথাটা যে হালায়ই কউক না ক্যান, কইসে তো? গ্রেট মেন থিংক এলাইক।”

বরযাত্রীদের কাছে ছুটি নিয়ে মেসোমশাই বললেন,—“চল রুণ্টু, ঠাকুরগো কামকাজ একটু ইম্পেক্ট কইবা আসি?” হালুইকবদেব কাছে উপস্থিত হয়ে যেই কন্যাকর্তাব উপযুক্ত জলদগন্তীর স্ববে গলা খাঁকাবি দিয়ে—“মাছ ভাজাটা হইল কেমনি? দ্যাখাও তো দেহি—” বলা, অমনি বামুনের সাফ জবাব—“এখন ওসব হবে না। ফালতু ঝামেলা কববেন না। হ্যাঁ। শুনলে বাবু কিন্তু রাগ কববেন” রান্না-বান্নার চার্জে আছেন সৌম্যব সেজকাকা। মোটাসোটা, কর্মঠ, ভুঁড়িতে তোষালে বেঁধে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সব চুল সাদা। মেসোমশায়ের একটি চুলও পাক ধরেনি, নেহাত ছোকরা-চেহাবা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্মের মতো হাতপুরো সাদা শার্ট সাদা জিনের প্যাণ্টে গুঁজে পরা। উদ্বিগ্নে চিহ্নমাত্র নেই মুখে। (ধৃতি পাঞ্জাবি কন্যাকর্তাকে কিছুতেই পবানো যায়নি। ধৃতি খুলে গিয়ে কেলংকারি হবাব ভয়ে। অবশ্য মুখে বলেন—ধৃতি নাকি বিধবা মেয়েদের ড্রেস, পুরুষমানুষের পোশাকই নয় মোটে!) হালুইকব ঠাকুর জানে সব বিযেবাডিতে ঢের ফালতু মান্তান থাকে, তাদের প্রশ্রয় দিতে নেই। সে তো আব মেসোমশাইকে দেখেনি, চেনেও না। মেসোমশাই কিন্তু সত্যি বেগে গেলেন।—“দুলু। দুলু।” সেই কণ্ঠস্ববে সেজকাকা আক্ষরিক অর্থে দৌড়ে এলেন—

—“কী? হইল কী মেজদা?”

—এই বাস্কেলটাে ক্যান বসাইছস? এ বাস্কেল আমারে বাবু দ্যাখাইতাসে, আবাব কয় কিনা ফালতু ঝামেলা কববেন না। আমাগো মাইয়াব বিয়া, আব আমারেই কয় কিনা ‘ফালতু’? গোট আউট। গোট আউট। অহনই আমি অন্য ঠাকুর ডাইক্যা আনতাসি। আমাগো গড়িয়ায় শয়ে-শয়ে হালুইকর পথে পথে ঘুবতাসে।” ঠাকুরটি অতি চালু পাটি। মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটার তাৎপর্য—বিশাল এক লুচিভাজা ঝাঁঝরি হাতেই দৌড়ে এল তক্ষুনি, পেছু পেছু দৌড়ালো তার যোগাড়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু’ হাতের অঞ্জলিতে কলা পাতায় মুড়ে একডজন মাছভাজাব গরম গরম নৈবেদ্য নিয়ে।—“এবারকাব মতো মাপ কবে দিন বড়বাবু। অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারই

মাছের পীস রক্ষা কবছিলাম আমি। বিষেবাড়িতে কত ফালতু লোকও তো থাকে” —আবার সেই শব্দ—ফালতু ? মেসোমশায়ের রাগ কমল না। মাছ ছুলেন না। স্তব্ধ। আস্তে করে দুলুবাবু ঠাকুবদেব প্রম্পট কবলেন—“আবেকবার !” এবাব দুই ঠাকুব গলা মিলিয়ে কোবাসে বাববাব আকুল হয়ে মাপ চাইতে লাগলো এবং মেসোমশাইকে মাছভাজা খাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি কবতে লাগলো। তখন ওদের ক্ষমা কবে দিয়ে মেসোমশাই নিজে দয়া কবে খানছয়েক খেলেন, আমাকেও গুনে গুনে ছখানাই খাওয়ালেন এবং—“দুলুবে, অ দুলু। শোনো, তুমিও অহনই খাইয়া লইও খানকয় মাছভাজা, ভাল পীস আব কিন্তু পবে পাইবা না। বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন—“হাঃ, আমাব মাছের পীস বক্ষা কবে কে ? না হালুইকব ঠাকুব। যেই না poacher সেই হইল গিয়া gamekeeper. হাঃ !” তাবপবেই মনে পড়ে গেল—“আহা, চিনুব মা-ডাবেও দুইখান গবম মাছভাজা খাওয়াইলে হইতো !” যেমনি মনে পড়া অমনি কাজ—“কন্টু, শোনো, বান্নাঘবে আমি যামু না, তুমিই যাও।” দুলুব থিক্যা দু’খান মাছভাজা চাইয়া লও, নিয়া তোমাব মাসিমাবে খাওয়াও গা যাও। কইবা, আমি পাঠাইসি। বোঝা ? না খাওয়াইয়া আসবা না কিন্তু ! ঠিক যেইডা আমি দেখি না হেই দিকেব টোটাল কনফিউশন। আরে, চিনুর মায়েরে যে মোটেই মাছভাজা খাওয়ানো হয় নাই, হেইটাই বা দ্যাখে কে ? যাও, যাও—” বলতে বলতে উনি দ্রুত লোক-খাওয়ানোব দিকটায় চলে গেলেন। আমি ছুটি মাসিমাৰ জন্য মাছ-ভাজাব ব্যবস্থা করতে। মাসিমা তো প্রথমে হাসলেন, তারপর এক ধমক দিলেন, মোটেই মাছভাজা খেলেন না। সেই বার্থ দৌত্যেব পবে পুনরায় মেসোমশায়ের খোঁজে খাবার জায়গায় এসে দেখি চপ দেওয়া হচ্ছে। ববযাত্রীরা খেতে বসেছে। মেসোমশাই সৌম্যকে বলছেন—“বডদেব দুইটা কইবা, ছোটদেব একটা। না চাইলে একদম বিপিট কইরো না। ওয়েইস্ট য্যান হয় না। বোঝা ?” এসব সংশিক্ষা বান্নাঘব থেকেই পই-পই কবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছ প্রত্যেকটি পবাবেশককে। কিন্তু মেসোমশাইকে চপ কবানোব প্রয়াস বৃথা। কানে কানে শেষটা (“এটা কিন্তু ববযাত্রীদেব ব্যাচ, মেসোমশাই”) বলে দিতেও তিনি ঘাবড়ালেন না।

—“আরেঃ, তয় হইসেডা কী ? হউক না বরযাত্র, ওনাবা তো আব পব না ? আমাব চিনুবই ঘরেব মানুষজন—ওনাবা শোনলেই বা দোষটা কোথায় ? ওয়েইস্টিং ফুড ইজ আ ক্রাইম ইন ইনডিয়া—কী কন বেহাইমশায় ?” বলে, যে শুক্লকেশ গুত্রবাস কাঁধে মুগাব চাদব ভদ্রলোকের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিক্ষেপ কবেন মেসোমশাই —তাকে দৃশ্যত যে-কোনো বিবাহেই ববকর্তাব ভূমিকায় মানাতো বটে কিন্তু আজ এখানে তিনি মোটে ববযাত্রীই নন, চিনুদির কলেজের প্রফেসর। ‘বেহাই’— এই অনর্জিত প্রিয়সম্বোধনে বিব্রত প্রফেসর গুপ্ত হ্যাঁ-না দুইই হয়, এমন একটি হাসি দিলেন। ফলে, যথেষ্ট কুটুম্ব-কর্তব্য হয়েছ মনে কবে, হুটুচিভে মেসোমশাই ববযাত্রীদেব সদ্র পবিত্যাগ করে নিচে নেমে আসেন।

নেমেই অফিসের এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। আর অমনি —‘খুলিল হৃদয়দ্বার খুলিল !’

—“বাঃ! সুধীরচন্দ্র যে আইস্যা পড়সো তাইলে? শেষমেব পৌসাইলা? যাক। তা-রপব? নিউজ কী? আইজ অফিসে গেসিলা? আমি তো এক্কেরে প্রিজনাব হইয়া আছি। মাইয়ার বিবাহ কি য়ামন ত্যামন ব্যাপাব? ওহ!” বলতে বলতে বেশ মৌজ করে মেসোমশাই বরযাত্রীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা গদি আঁটা সোফায় জমিয়ে বসে হাঁক পাড়েন —“কই পানসিগ্রেটের ট্রেটা গেল কই?” ট্রেসহ একটি ছেলে এগিয়ে আসতেই, আবার—“কোকাকোলা চাবিটা কার কাছে?” এবার চাবিসহ আবেকজন সবিনয়ে উপস্থিত হয়। “একটার বেশি কারেও দিবা না। আর তাও ক্যাবল ববযাত্র। ভেরি এক্সপেনসিভ হইয়া গেছে। ওনলি ওয়ান ঙ্গেচ! তুমি নিজে কয়টা বোতল খাইলা, মনু? ওনলি ওয়ান তো? বা, বা, বেশ, বেশ। এইবার এইদিকে দুইটা বোতল আনোতো দেহি! ঠাণ্ডা দেইখা”—বন্ধুকে কোকাকোলা দিয়ে বললেন. “আইজ লনডন নোটবুকাটা পড়সিলা? কী কাণ্ড কও তো দেহি? কোথায় ছিল জেমস কাউলি, আর কোথাক্যা আইসে এই চান্দে, আর ঙ্গে-তে। হেঃ!” তারপর নিজের বোতলে একচুমুক দিয়ে বেশ রিল্যাক্স করে বসে ভুরু পাকিয়ে বেদম উদ্বিগ্ন মুখে কন্যাকর্তা বললেন তাঁর নিমজ্জিতকে—“বোঝা সুধীর, ইংলণ্ডের প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা সত্যি ভেরি ক্রিটিকাল। অগো ইমিগ্রেশন পলিসিটা লইয়া আমাগো চিজার ডের কারণ আছে—থাউজ্যাণ্ডস অব কালার্ড পিপলের ফিউচার—”

সেই মুহূর্তে ছাদের ওপরে চিনুদির ফিউচার নির্ধারিত হচ্ছে—জ্যাঠামশাই কন্যাসম্প্রদানে বসেছেন। শাঁখের শব্দ মেসোমশাইয়ের বিশ্বমানবিক উদ্বেগকে বিপর্যস্ত করতে পারলো না।



সীতা থেকে শুরু



## ভণিতা

এই বইয়ের গল্পগুলি সবই মেয়েদের নিয়ে। ‘সীতা থেকে শুরু’ নামের কিশিঃ ভণিতা দবকাব। মহাকাব্য পডতে পডতে আমাব কেবলই মনে হতো, এই বীৰ্য-বাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষেব যুদ্ধকাব্যেব জগতে নাবীব ঠাই বড ককণ। সে লক্ষ্মীই হোক আব অলক্ষ্মীই। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাডকাই হোক বা শূৰ্পনা, যেন দুঃখ পেতেই তাদেব জন্ম। তাদেব দুঃখেব মলোই মহাকাব্যেব নাযকদেব বীবোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়। এডাবেই কয়েকটি গল্প লেখা হয়ে গিয়েছিল (আবো হয়তো হবে) মহাকাব্যেব মেয়েদেব ঘিবে। ধ্রুপদী কাহিনীর অন্তর্গত কোন বদবদল হয়নি, কেবল কিছু কল্লিত ঘটনা যুক্ত হয়েছে। আবাব কাহিনীর নিজগুণেই তা বিযুক্ত হয়ে গেছে। নতুবা মহাকাব্যেব কাহিনীব গতিপ্রকৃতি বদলে যেতে পাবতো। গল্পগুলি শুধু পাঠকেব মনে এক-একটা বিকল্প সম্ভাবনাব বং ধবিযে দেয মাত্র। এ বইয়েব প্রথম পর্ব ‘পৌৰাণিকী’তে এবকম ছ’টি কাহিনী আছে। যা হলেও হতে পাবতো।

তৃতীয় পর্ব ‘আধুনিকী’। এতে বযেছে আজকেব শব্দেব মেয়েদেব জটিল বন্ধুব জীবনের যাত্রাপথ নিয়ে পাচটি কাহিনী। এতে ঘটনাব চেযে ভাবনাব অংশই হয়তো বেশি। নারীহৃদয়েব অনুভূতিব দিকটিই বোধহয় নারীজীবনেব সিংহভাগ দখল কবে থাকে।

আব এই দুই পর্বেব মধ্যে সেতুবন্ধেব মতো রয়েছে মধ্যবর্তী দ্বিতীয়পর্ব, ‘মাতৃয়ার্কি’। ‘মাতৃ+ইয়ার্কি’ অথবা ‘ম্যাটিয়ার্কি’ দুটোই ধবতে পাবেন। এক প্রবল প্রতাপাসিতা কিস্ত শয্যাশায়িতা বিধবা মা। তাঁব বিবাহবিচ্ছিন্না চাকুরে মেযে, আব দুটি ইন্স্কুল কলেজ পডুয়া নাতনি—তিন প্রজন্মেব নারীব এক মাতৃতান্ত্রিক সংসাব। পুরুষবিহীন একক নারীব ঘরসংসাব মাত্রেই যে বিবৰ্ণ, মলিন, ‘সুখহীন নিশিদিন’ হয় না, উজ্জ্বল, মননশীল, ব্যস্ত, মাযাবী, হাসি-ঝলমলেও হতে পারে, তাবই ছোট্ট ছোট্ট বাবোটি চিত্র এখানে বইল। আমাব মা গল্পগুলি পডে বাগ করতে পাবেননি, যদিও তাঁকে নিয়েই সব ইয়ার্কি, কেননা এতে একটি চিত্রও কাল্পনিক নয়। প্রথম ও তৃতীয়পর্বে যেমন সবই কাল্পনিক পবিস্থিতি।

গল্পগুলি রচনাব অথবা প্রকাশেব ক্রম অনুসাবে সাজানো হয়নি। আমি যে-কোনো লেখাই লিখে ফেলে বাখি, অনেক কাটাকুটিব পর হয়তো ছাপতে দিই,



## মূল-রামায়ণ

“সেই সত্য, যা বচিবে তুমি।

ঘটে যা. তা সব সত্য নহে।”

সুগ্রীব বললেন, “সার্থক তুমি হবেই। তোমার গতি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্ব বিয় অতিক্রম কবে। তুমি নীতিজ্ঞ, বলবুদ্ধিবীৰ্য, কোনোটাতেই তোমার তুলনীয় কেউ আমাদের মধ্যে নেই। হে বানবকুলশ্রেষ্ঠ, আমি নিশ্চিত, তুমি পূজনীয়া সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে ফিববেই, চাইকি তাঁকে উদ্ধারও করে আনতে পারো।”

হনুমান বিনীত হেসে বললেন, “মহারাজ! এ আপনাব অতিবজ্ঞান মাত্র। যাই হোক, আমি শ্রীবামচন্দ্রের মনে শান্তি বিধানের নিমিত্ত এই মুহূর্তেই সীতা অন্বেষণে বেকছি, কিন্তু আমাব একটা পরিচয়পত্র চাই তো? সীতাদেবীৰ কাছে আমার লোকাস স্ট্যানডাইটা আমি প্রমাণ করবো কেমন করে? একটা আইডেনটিটি কার্ড জাতীয় কিছ—যদি অযোধ্যাধিপতি দিতে পারেন। কিঙ্কিঙ্কার আই. ডি. কার্ডে সীতাদেবীৰ কাছে কাজ হবে কি?”

শ্রীরামচন্দ্র এতক্ষণ মন খারাপ করে চূপচাপ বানবদের আলোচনা শুনছিলেন। লক্ষ্মণ তো অতি কষ্টে প্রবল গালমন্দ কবে সুগ্রীবকে টেনে এনেছেন রানীদের মহল থেকে। সময় বয়ে যাচ্ছে। সীতা-উদ্ধাবে বেরুনেই হলো না। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র নিঃশব্দে মধ্যমা থেকে রাম-নামাঙ্কিত, সূর্যবংশের চিহ্ন-সংবলিত, বহু-মূল্য বত্ৰখচিত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি খুলে নিয়ে পবনপুত্রের দিকে বাড়িয়ে ধবলেন। “এই অঙ্গুরীয় সীতার অতি পরিচিত। এটি নিয়েই বিবাহের পব তিনি আংটি-খেলা খেলেছিলেন বাসবধবো।”

হনুমান আংটি মাথায় ছুঁইয়ে বিরাট এক সেলাম কবে বললেন, “তবে আজ্ঞা করুন, রওনা হই?”

রামচন্দ্র ও সুগ্রীব একসঙ্গে বললেন, “শুভমস্থ, সফল হয়ে এসো মহাবীর!”

সুগ্রীবের রাজসভা থেকে একলক্ষে হনুমান বনমধ্যে উপস্থিত হলেন। অঙ্গদ সেখানে বানর সেনাপতিদের লক্ষ্যনের মাপ নিচ্ছিলেন।

সম্প্রতি বলেছেন সীতা আছেন শতযোজন দূবে সমুদ্রপারে লঙ্কাদ্বীপে দক্ষিণ সমুদ্রের মাঝখানে। বাবণরাজা তাঁকে হরণ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে গেছেন। নীল,

মৈদ, সুহোত্র, জাম্ববান—প্রত্যেকেরই লংজাম্পের স্প্যান কত, অঙ্গদ জানতে চাইলেন—শতযোজন লাফিয়ে পাবাপার দুবাব কবতে কে পারবেন? দেখা গেল কেউ দশ-বিশ, কেউ আশি-নব্বই—শতযোজন আব কেউই পারেন না। তখন মহাবীর হনুমানকেই ভয়ে ভয়ে অনুবোধ কবা হলো। তিনি পবনপুত্র। সহস্র যোজনও তাঁব কাছে তুচ্ছ। হনুমান সঙ্গে সঙ্গে বাজী। অঙ্গদকে দেখালেন অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় নিয়ে তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। জাম্ববান বয়স্ক, জ্ঞানী, তিনি বললেন, “দেখবেন, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় যেন মাছেব পেটে চলে যায় না!”

হনুমান মৃদু হাস্যপূর্বক উত্তর দিলেন, “আমি কি বিবহবিধূবা, অনামনা, গর্ভবতী আশ্রমবালিকা, জাম্ববান, যে আংটি তিমি-তিমিজিলে গিলে ফেলবে?”

বয়োবৃদ্ধ বানবদেব নমস্কাব কবে, আকাশেব সূর্যচন্দ্র, পবনদেব, অগ্নি, বরুণ, ধরিত্রী, সমুদ্র ও শ্রীবামচন্দ্রকে প্রণাম কবে হনুমান তো বেড়ি হতে লাগলেন। বেড়ি হওয়া মানে সমুদ্র লঙ্ঘনেব যোগ্য আকৃতি ধারণ করতে হবে তো। তিনি শ্বাসবৃদ্ধ কবে যোগবলে ফুলতে শুরু কবলেন। ফুলতে ফুলতে তাঁর আকৃতি হলো ঠিক রকেটের মতো, তখন তিনি “জয় বামচন্দ্র” বলে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

কিন্তু মহেন্দ্র পর্বত তো কেপ কেনেডি নয় যে বকেটেব টেক-অফ কবা সহ্য কবতে পারবে। সেই প্রবল ইমপ্যাক্টে চড়চড় কবে মহেন্দ্র পর্বতের বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হয়ে হনুমানের পিছু পিছু শূন্যে ধাবিত হলো। পাথব ফেটে উষ্ণস্রোত উচ্ছ্রিত হলো, শিলাখণ্ড উৎক্ষিপ্ত হলো শূন্যে, “হেঁইও” বলে তো হনুমান শূন্যে ভেসে গেলেন। সেই সমহান দৃশ্য দেখে দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নব-মুনি-ঋষি সকলে “কেয়াবাৎ। কেয়াবাৎ।” বলে হাততালি দিয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। অঙ্গদ ও অন্যান্য বানবন্দ তখন মহানন্দে ফুল কুড়োতে শুরু করলেন। আকাশ থেকে বর্ষিত সেই ফুলের নাম আকাশকুমুম।

হনুমান তখন অনুকূল পবনের আশ্রয়ে (অর্থাৎ স্নেহময় পিতৃজ্ঞেডে) নিশ্চিন্ত নির্ভার উড়ে গিয়ে হ-শ কবে সোজা লঙ্কাদ্বীপের উপকূলে নামলেন। পাসপোর্ট ভিসাব ব্যাপার তখনও ছিল, কিন্তু নামটা আলাদা। লঙ্কার দ্বাররক্ষা করতেন শ্রীমতী লঙ্কাদেবী। তিনিই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং লঙ্কাব রক্ষয়িত্রী। তাঁব সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী না হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করা অসাধ্য। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনিই লঙ্কাব ইমিগ্রেশন অফিসার।

বিবাসী সিঙ্কাব এক হনুমানী থাপ্পড়ে লঙ্কাদেবীকে মুহূর্তমধ্যে ভূলুপ্তিতা করে হনুমান শিস দিতে দিতে লঙ্কায় ঢুকলেন। গালে হাত বুলুতে বুলুতে লঙ্কাদেবী টের পেলেন এবার লঙ্কাব শেষের দিন সমাগত। কিন্তু তিনি কাউকে সতর্ক করতে পারলেন না, কেননা তাঁর ওয়াকিটকি ছিল না। ক্যাসাবিয়াংকাব মতো, তিনি নিজের স্টেশনেই ফিক্সড হয়ে রইলেন।

স্বর্ণলঙ্কায় ঢুকে হনুমান বিস্ময়ে হতবাক, রুদ্ধশ্বাস। শিস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল। কিঙ্কি ক্যা নগবীর ধনদৌলত কম নয়, কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার সঙ্গে তুলনীয়

একমাত্র ইন্দ্রসভা, আব ময়দানব নির্মিত পাণ্ডবদেব হস্তিনাপুরেব রাজপ্রাসাদ। তার কোনোটাই হনুমান দেখেননি। তিনি তো বাজবাড়ি দেখাব আগে, বাস্তাঘাট, পার্ক আব মালটিস্টোরিড 'বিমান'গুলি দেখেই পবমাশ্চর্য। সোনার তৈবি ঘববাড়ি—কী তাব এলিভেশন, কী তাব আর্কিটেকচাবাল একসেলেস। হনুমান ভুলেই গেলেন তিনি কেন এসেছেন। নিজেকে টুবিষ্ট মনে কবে তিনি হালকা মেজাজে ঘূবে বেডাতে লাগলেন। এমন সময় বাজপ্রাসাদেব সামনে এসে, তিনি একলাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলেন। এবং সীতাব খোঁজ শুরু কবলেন।

বাবণেব প্রাসাদ দেখে স্বর্ণবাসী দেবতাদেবই মাথা ঘূবে যায়। তো বনবাসী হনুমান। কী উদ্যান, কী ফোয়াবা, কী কুঞ্জবন, কী নাচঘব, কী দীর্ঘ ডাইনিং হল, কী উজ্জ্বল সভাকক্ষ, কী স্পন্দমদিব শয়নমন্দিব। আব কী সব পবমা কপবতী সঙ্গিনী পবিবৃত হয়ে মহাবল মহাশুফধারী দশমুণ্ড বাবণবাজা, তাঁব বিশটি উদয়সূর্যনিভ বিশাল গোলাকার মদমত্ত বক্তচক্ষু অধনিমীলিত কবে গভীব নিদ্রামগ্ন। স্পন্দেও তাঁব চক্ষুতাবকা ডাইনে-বামে ছুটোছুটি কবছে না—তিনি এতই অঘোবে ঘুমুচ্ছেন। তাঁব বিশটি হাত বিশটি নিদ্রিত সুন্দবীর গলায মালাব মতো জডানো। হনুমান মুন্ধনযনে দেখছেন। হঠাৎ তাঁব খেয়াল হলো অকৃতদাব সচ্চবিত্র বানবদেব পক্ষে ঘুমন্ত নাবীদেহেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবা অনৈতিক, তবু তিনি বিস্ময়ে দেখলেন, স্বর্ণপুত্তলী কপসী যন্ত্রমানবীবা বিশাল সব বত্নখচিত মুক্তাব ঝালবযুক্ত পাখা নিয়ে সাবাবাত্রি সাবি সাবি অগুস্তি বানীদেব বীজন কবে চলেছে রাবণবাজা সমেত। যদিও চতুর্দিকে উন্মুক্ত বাতায়নপথে মলযবাতাস বয়ে আসছে পুষ্পচন্দনেব গন্ধ মেখে বাগান থেকে।

আবে, বাবণবাজাব ঠিক বাঁপাশে ঐ সোনার খাটে ও কে ঘুমিয়ে? ওই তো সীতাদেবী। কী তাঁব স্বর্ণবর্ণ, কী তাঁব শ্রাবণমেঘেব মতো কুঞ্চিত কেশভাব বত্নজালে শোভিত, কী তাঁব অঙ্গেব গঠন, কী পেলব তাঁব আঙুলগুলি, প্রতিটি আঙুলে বত্নাসুবীয ঝলসে উঠছে, দেহেব সর্বত্র উপযুক্ত বত্নালঙ্কারেব শোভা, বেশবাস একটু অবিন্যস্ত হসে পড়েছে, কেননা বোঝাই যাচ্ছে তিনি প্রমত্তা অবস্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, ঘবময় সোনার পানপাত্র ছড়িয়ে আছে, তাঁব টুকটুকে লাল ওষ্ঠাব অল্প ফাঁক হয়ে আছে, মুক্তোব মতো দাঁত দেখা যাচ্ছে দু'চাবটি। মুন্ধনযনে দেখতে দেখতে হনুমান ভাবলেন বেশ তো আছেন সীতা এখানে। তিনি কি আব বনে-বাদাডে ফলমূল ভোজন আব কৃশাসনে শয়ন কববাব জন্যে ফিবতে চাইবেন? মহাবানী কুমাদেবী বা তাবাদেবী হলে নিশ্চয় থেকেই যেতেন। কে জানে অযোধ্যা কেমন? যতই ভালোমানুষ হোন, যতই নাবায়ণেব অংশে তাঁব জন্ম হোক, বামচন্দ্র তো এক জটাজুটবাঁধা চীববসনপবা গৃহী, সন্নিহিতাইপেব বাজাহীন বাজা—বাবণবাজাব মতো জস্পেশ চেহাবা তাঁব নয়। মাত্র একটাই মাথা। দু'খানা মাত্র হাত। বাবণেব ব্যক্তিত্ব কী। আহ। ঘুমন্ত অবস্থাতেও দৃশ্য পৌরুষ যেন ফেটে বেকুচ্ছে। জ্যোতিব মতো অহংকার নিঃসৃত হচ্ছে তাব নিদ্রিত ভ্রুঙ্গ, দান্তিক ওষ্ঠেব ঈষৎ বন্ধিম বেখায়, উদ্ধত চিবুকে, পবিপাটি গোঁফে,

জুলপিতে। বাম তো কেঁদেই ভাসাচ্ছেন—হা সীতা। হা সীতা! কবে। নেহাতই হনুমান বামভক্ত এবং সং লোক, তাই বাবণভক্ত হয়ে পড়লেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, সীতা কি আর ফিববেন। তারপর মনে পড়লো, অবশ্যই রাবণ লোক ভালো নয়। পরেব বউকে চুরি করে আনে যে, সে চোর এবং বদমায়েস। সীতাদেবীকে তো সবাই বলে সতীলক্ষ্মী, ইচ্ছে করেই শ্বশুরগৃহের বিলাসবাসন ত্যাগ কবে সেধেই স্বামীর সঙ্গে বনে এসেছিলেন। তবে কি কোথাও হিসেবে ভুল হচ্ছে হনুমানের? লক্ষ্য করে দেখলেন, যে-নারীকে তিনি সীতাদেবী মনে কবছেন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ কটি সম্ভানের মা হয়েছেন—চিবুকে, নাকের পাশে, চোখের কোণে বিলাসী জীবনের ও বয়সের ছাপ ধরতে শুরু কবেছে, যদিও কপসৌবনে ভাঁটা পড়েনি। কিন্তু সীতাদেবী তো বেশ ক'বছর বনে বনে ব্রহ্মচার্য পালন করে বেড়াচ্ছেন, তৃণশয্যা, ফলমূলে জীবনধারণ করছেন। তাঁর রূপে মেদবাহুল্য থাকবে না এবং কৃশাঙ্গী হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি এখনও সম্ভানধারণ করেননি। তাছাড়া সীতা যদি গহনা এতই ভালোবাসবেন তবে তিনি বনময় সব অলঙ্কার ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসেছিলেন কেন, পথনির্দেশ দিতে? নাঃ, মানুষের নীতিবোধ অন্য, সীতাদেবী হয়তো রুমাদেবী তারাদেবীর মতো না হতেও পাবেন। হঠাৎ মদ্যপান কবে রত্নাংকারভূষিতা হয়ে নমলীলা কবতে রাবণের পাশে শুয়ে পড়বেন দশরথের পুত্রবধু, জনকদুহিতা সীতা, এটা ঠিক নয়। মানুষদের সমাজে মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে বড্ডো কডাকডি, ইচ্ছে করলেও চট কবে সাহস পাবে না মেয়েরা পরপুরুষ গমন করতে।

অনেক ভেবেচিন্তে হনুমানের মনে হলো—নাঃ, এই রূপবতী আর কেউ হবেন হয়তো, সীতাদেবী নন। এব মুখে শোকতাপ উদ্বেগ দুর্ভাবনার ছাপ নেই, শুধুই পরিতৃপ্তি! ইনি হয়তো পাটরানী মন্দোদরীই হবেন।

তখন হনুমান প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরুলেন। ভাবলেন, যাই, একটু বনে-উপবনে ঘুরে ফলমূল ভোজন কবে আসি, ক্ষুধাব উদ্বেগ হয়েছে বেশ। লম্পবাম্প তো কম কবিনি। শত যোজন বলে কথা! এই বলে তিনি ফলের বাগানে ঢুকে মনেব সুখে ফলপাকুড় পাডছেন আর খাচ্ছেন। পাডছেন আর খাচ্ছেন। ইচ্ছেমতো এদিক ওদিক খোসা ফেলছেন, বীচি ফেলছেন, আঁটি ফেলছেন, ডাল ভাঙছেন, পাতা ছিঁড়ছেন। যথাসাধ্য নোংরা কবছেন, নষ্ট করছেন বাবণরাজ্যব সাজানো বাগান।

হঠাৎ দেখেন একটু দূবে লাল ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে বয়েছে এক অপূর্ব অশোকবন। হনুমান এক লক্ষ্যে অশোকবনে উপস্থিত হলেন। খাবার জন্যে নয়, বাঁদবামির জন্যে। গোছা গোছা ফুলপাতা ছিঁড়ে অশোকবন ধবংস করতে লাগলেন। সীতা মিলুক না মিলুক রাবণের বনসম্পদ তো নষ্ট হোক!

হঠাৎ দেখেন অশোকগাছের ছায়ায় চীরবাসপরা এলোচূলে এক দেবীমূর্তি। কিন্তু তাঁর পা মাটি ছুঁয়ে আছে এবং তিনি অঝোরে অশ্রুবিমোচন করছেন। দেখে দেখে হনুমানের চোখ ফেবে না। কী জ্যোতির্ময়ী কপ তাঁব! উপবাসে কৃশাঙ্গী, চূলে তেল



নেই, রক্ষ কেশ। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে লাল, অঙ্গে গহনা নেই। আবে! ওই তো দেবীমূর্তির একপায়ে নূপুর। অন্য নূপুরটি হনুমান বামেব কাছে দেখেছেন।

আহ্লাদে হনুমান কিচিরমিচির কবে উঠলেন। এবং মহোল্লাসে অশোকগাছের ডাল থেকে ধপাধপ লাফ দিয়ে দিয়ে মাটিতে পড়তে লাগলেন বারংবার। সেই হপ হপ শব্দ সীতা তো কান্না বন্ধ করে অবাক চোখ তুলে তাকালেন। অমনি হনুমানের একলাফে তাঁর সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে বললেন, “মা জননী! আমি আপনাব স্মারী শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমান। আপনাকে পতিগৃহে ফিবিষে নিয়ে যেতে এসেছি। দয়া করে আপনি আমার স্কন্ধে আবোহণ করুন। আমি এক লহমায় শত যোজন অতিক্রম কবে রাবণের পুষ্পকবত্থেব চেয়ে ঢেব দ্রুতবেগে আপনাকে শ্রীবামচন্দ্রের পদতলে উপস্থিত কবে দেবো।”

সীতা তো হনুমানের কথাবার্তা শুনে হাঁ। বলে কি বান্দবটা? ক্ষ্যাপা বান্দব নাকি? কামড়ে দিলেই ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, আবো কী কী হবে কে জানে? ওবে বাবা। এক তো ছিল ক্ষ্যাপা বাঙ্কসের অত্যাচাব। তায আবার ক্ষ্যাপা বান্দব? নাকি এ বাবণ ব্যাটাবই নতুন কারসাজি? যেমন সাধু সেজে এসেছিল সেবাবে। অমনি চোখ মুছে ভুরু কুঁচকে ভীষণ রেগে সীতা বললেন, “হ্যাট। হ্যাট। যাঃ। ভাগ। পাজী বাঙ্কস। আবার জ্বালাতে এসেছিস। ও মাগো। এবাবে বান্দব সেজে এসেছিস? তোব মায়াতে আমি আব ভুলি? হায় পতি শ্রীবামচন্দ্র! হায় দেবর লক্ষ্মণ। তোমবা কোথায়?”

তখন হনুমান মৃদু হেসে বললেন, “হে দেবি। বৃথা বিভ্রান্ত হবেন না। আমি যথার্থই বানরী অঞ্জনাব গর্ভজাত, পবনপুত্র শ্রীহনুমান। এই দেখুন, এই অঙ্গুবীযটি আপনি চিনতে পাবেন?”

আংটি হাতে কবে সীতা আহ্লাদে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসলেন। এব নাম আনন্দাশ্রু। হনুমানও সৌজন্যবশত তাতে যোগ দিলেন। খানিক আনন্দাশ্রুপাতেব পব সীতা বাম-লক্ষ্মণেব কুশল প্রশ্ন কবলেন।

সৌজন্যবিনিময় সাজ হলে হনুমান বললেন, “মা জননী! আব বিলম্ব নয়। চেড়ীদের নিদ্রান্ত হলে বৃথা যুদ্ধে কালক্ষেপ কবতে হবে। ভয় নেই। আমার ঘাউটি ধবে শব্দ হয়ে পিঠে বসুন। শ্রীবামচন্দ্র বড়ই অস্থির হয়ে বয়েছেন। আপনাব জন্য উদ্বেগে তাঁব স্নানাহাব নেই, নিদ্রা-বিশ্রাম নেই—শুধু একবাব কবে লক্ষ্মণকে ধমকাচ্ছেন আর একবাব কবে হাহাকাব কবছেন। বেশি দেবি কবলে তাঁব মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘট্যে অসম্ভব নয়।”

সীতাদেবী তাই শুনে কালবিলম্ব না করে গাছকোমব বেঁধে, “তবে চলো, বৎস হনুমান” বলে উঠে বসলেন। হনুমানও যোগবলে পুনবায় বকেটাকৃতি হয়ে, “হেইওঃ” বলে টেক-অফ করলেন।

হনুমানের সেই অমানুষিক উল্লসফনে যে প্রচণ্ড বায়বীয় সংঘর্ষ হলো আকাশে

বাতাসে, সেই এলোমেলো বায়ুচাপের ফলে স্বর্ণলঙ্কায় অকস্মাৎ আগুন ধরে গেল, অশোকবৃক্ষগুলি উৎপাটিত হয়ে শূন্যে ছুটলো, ভিত্তিপ্রস্তর নড়ে গিয়ে সাততলা বিমান বিলড়িংগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো, লঙ্কানগরীতে হাহাকাব পড়ে গেল। কেউ বুঝতেই পারলে না কী হয়েছে। কেউ বলে ভূমিকম্প, কেউ বলে উল্কাপতন, কেউ বলে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হয়েছে, নাকি কোনো অস্ত্রকাবখানায় বিস্ফোৰণ ঘটেছে? লঙ্কায় তো অস্ত্রস্বাতমূলক কাজকন্মো হয় না, সেখানে সবাই সুখী। বাবণ বাজত্বে কাকব দৈন্য-দাবিদ্য-দুঃখ-তাপ নেই। যা কিছু অন্যায় অত্যাচাব সব অন্যদেব বাজত্বে গিয়ে কবে আসেন প্রজাপালক বাজা বাবণ।

এদিকে হনুমান তো নিজেব চাবিপাশে মায়াময় বাষ্পজাল বুনে নিয়েছেন যাতে মাজননী সীতাদেবী দৃশ্যমানা না হন। তাবপব মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র পাব হয়ে তিনি এসে মহেন্দ্র পর্বতে অবতবণ কবলেন। শত যোজন তাঁব অকল্পনীয় বেগেব কাছে কিছুই নয়। মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় তাঁকে বিদায় দিয়ে মহাবল বানবগণ তখনও ফিবে যাননি। তাঁবা এবই মধ্যে হনুমানকে প্রতাবর্তন কবতে দেখে আহ্বাদে আটখানা হয়ে কিলকিলা রব শুক কবে দিলেন। অত্যাঙ্কুল বাষ্পজালে আচ্ছাদিতা সীতাদেবীকে দেখা যেতে তো তাঁদের উল্লাস শতগুণ বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁদের চীৎকাবে মহেন্দ্র পর্বতেব সব পক্ষিকুল বন ছেড়ে উড়ে গেল, ছোটো ছোটো জীবজন্তুবা ভয় পেয়ে ইতস্তত ছোটোছুটি কবতে লাগলো এবং বৃহৎ জন্তুবা গুহামধ্যে প্রবিশ্ট হলো। বানরবা পবষ্পবেব দীর্ঘ লাজ্বল চন্দনপর্বক নৃত্যগীতে মেতে উঠলেন। আকাশপথে আবাব দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নব ইত্যাদি ইত্যাদি আবির্ভূত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি কবলেন। যুববাজ অঙ্গদ তখন বানবদের ধমকে বললেন, “চন্দনকাঠেব পালকি বানাও।” সেই পালকি কবে সীতাকে নিয়ে বানববা শোভাযাত্রা করে সূগ্রীবেব সভায় শ্রীবামচন্দ্রেব সন্নিকটে চললেন। অহো! সে কী মধুব মিলনদৃশ্য। বান্মীকি তা লিখে বাখেননি বলে জগজ্জন সেই স্বর্গীয় শোভাব বর্ণনা থেকে চিববঞ্চিত থেকে গেছে।

বাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে ঘিবে বানবগণ তখন প্রচণ্ড আনন্দ উৎসবে মত্ত—তাঁবা ইতিমধ্যে মধুবন ধবংস কবে মধুপান কবে সকলেই পানোন্মত্ত হয়ে এসেছেন এবং বামচন্দ্র সে অপরাধ ক্ষমাও কবে দিয়েছেন—নিজের গলাব বহুমূল্য বত্তুমাল্যটি বামচন্দ্র হনুমানেব কণ্ঠে পবিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, “হে বানবক্লশ্রেষ্ঠ! আজ থেকে আপনি অমব হলেন।” তাবপব সীতাকে বাম অঙ্কে তুলে বসিয়ে, তাঁব কপাল থেকে কক্ষ চূর্ণ অলক যত্বে সবিয়ে দিয়ে, তাঁব গোলাপ-পাপাডিব মতো কর্ণকুহরে মাঝে মাঝে কী সব অশ্রুত মৃদু গুঞ্জন কবছেন, যা শ্রবণের ফলে সীতা আহ্বাদে শিহবিত হচ্ছেন এবং তাঁব গল গণ্ড সবই বক্তিম হয়ে উঠছে—

লক্ষ্মণ অবিশি় এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কেননা তিনি তো সীতাব পা’দুটি ছাড়া কিছুই দেখেন না। তিনি অন্য নূপূরটি যথাস্থানে পবিয়ে দিচ্ছেন—

হেনকালে, সেই মধুময় মূর্তকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে একটি বন্দীকেব স্থূপ সহসা নড়ে উঠলো। এবং তদভ্যন্তর থেকে ক্রোধোন্মত্ত বান্দীকিমুনি নির্গত হয়ে যৎপবোনাস্তি বোয়কষায়িত বন্ধলোচনে কটুভাষণে শ্রীবামচন্দ্রকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। বান্দীকি বললেন—“ধিক ধিক দাশরথি, বাজীবলোচন, বামকপী লক্ষ্মীপতি শ্রীনাবাযণ। এই কি আপনাব উচিত কাজ হচ্ছে? মনুষ্য অবতাব হয়ে জন্মেছেন বলেই কি মানুষী সংস্কার আপনাব দৈবচবিত্তেব এতই গভীবে প্রবেশ কবেছে যে আপনি বিস্মৃতই হয়েছেন, আপনাব মনুষ্যজন্ম নেবাব উদ্দেশাটা কী ছিল? বাবণেব দ্বাবা সীতাহবণ কবানোবই বা উদ্দেশাটা কী ছিল? কেঁদে কেটে একশা হয়ে শেষকালে কিনা একটা বাদবকে দিয়ে সীতা উদ্ধাব কবিয়ে এনে আহ্বাদে আটখানা হয়ে সাত তাড়াতাড়ি প্রেমকুজন গুরু কবেছেন? বলি, এবাবে বামবাবণেব যুদ্ধ তবে হবে কেমন কবে শুনি। সেই কৃত যুগ, ত্রেতা যুগ দুই যুগ ধবে যে-মহাযুদ্ধেব প্রস্তুতি চলেছে স্মর্গে-মর্ত্যে-পাতালে, যাব জনো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্ববকে দশ মাথা (চাব প্লাস এক প্লাস পাচ) এক কবে প্ল্যান কবতে হয়েছে, সেই যুদ্ধটাবই তো মূলে হা-ভাত কবে ছেড়ে দিয়েছে এই বাটা অতিপক, ওভাবস্মাট বাদব। ধরিত্রী যে বাবণেব পাপে ডুবুডুবু। এখন ধর্ম সংস্থাপনই বা হবে কেমন কবে, আমিই বা বামাযণ লিখব কী নিয়ে?”

বাম লজ্জায় অধোবদন দেখে মুনি এবাব সীতাকে নিয়ে পড়লেন—“আব আপনাকেও সতি বলিহারি যাই মা সীতাদেবী। সুলক্ষণা বাজকন্যা বাজবধ হয়ে, একটা সামান্য মুখপোড়া হনুমানেব গলা ধবে ঝুলে পড়তে আপনাব লজ্জা-ঘেন্না হলো না? পবপুরুষেব স্পর্শে আপনাব কি পাপেব ভয়ও কবলো না? নাকি সে-সব বাক্ষসেব খপ্পবে পড়ে—”

সীতাদেবী তো বামচন্দ্রেব মতো ভালোমানুষ নন—তিনি আগুনেব মতো ফোঁস কবে উঠলেন—

“মুখ সামলে কথা বলবেন ঋষিমশাই। জানোযাবেব আবাব পবপুরুষ কী? বাদব কি মানুষ? পিতৃগৃহে কত অশ্রুপুষ্টে ভ্রমণ কবেছি কেবলমাত্র ব্যাযামেব উদ্দেশ্যে, তাতে পাপ হয়নি—স্বপুত্রগৃহে কত হস্তিপুষ্টে ভ্রমণ কবেছি বাযুসেবনেব উদ্দেশ্যে, তাতেও পাপ হয়নি, আজ আমি বানবপুষ্টে শত্রুগৃহ থেকে পলায়ন কবেছি, এবং স্মরীব কাছে প্রত্যাগমন কবেছি—তাতেই পাপ হয়ে গেছে? কেন? আমি বন্দীকেব এধো চাপা পড়িনি বলেই কি আমি নীতিজ্ঞ নই? অযোনিজা কন্যাকে সামান্য বমণী ভাববেন না মুনিবব। একটু সাবধানে বাগবিস্তার কববেন, মনে বাখবেন আমাবও জন্ম লক্ষ্মীর অংশে। আজ যে-হনুমানেব কাঁধে আমি চড়েছি তিনি আমাব পূত্রব। আমাকে জননী সন্মোদন কবেন। হায় সংস্কার। আজ উইপোকাব কল্যাণে আপনি মুনিঋষি বনে গেলে কি হবে, ছিলেন তো সেই চোর-ডাকাতই—মনেব মালিন্য আপনাব কাটেনি মুনিবব। অঙ্গাব শতধৌতেন ইত্যাদি।”

সীতাব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মক খেয়ে বাল্মীকি কী বলবেন ভেবে পেলেন না, বাগে তাঁর বাগবোধ হয়ে গেল। তিনি তোতলাতে শুরু করলেন। বামচন্দ্র দেখলেন সর্বনাশ। মহাকবি যদি তোতলা হয়ে যান, তবে তো আদিকাব্য বচনাই হবে না। তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাকুলস্বরে বলে উঠলেন—“থাক থাক ওসব কথা! তাহলে, সীতা, বলো তো দেখি, এখন কী কবি? সত্যিই তো আমাবই কথা ছিল তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে বাবণকে সবংশে নিধন করে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে সনাতন ধর্ম পুনঃসংস্থাপন করাব। বাবণের পাপে সৃষ্টি ডুবুডুব। এখন কী হবে? কসমিক অবডাব নষ্ট হতে চলেছে—সব যে ভঙল হয়ে গেল।”

ধনুকের মতো ভুরু দুটিকে খড়গব মতো বক্র করে সীতা বললেন—“ভঙলেন কী আছে আর্যদেব? ওই উইপোকামূর্নিব কথা ছাড়ুন তো আপনি নাথ! সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটু ভুল না হয় হয়েই গেছে, তা বলে সেটা সংশোধন করা যাবে না কেন? মহেন্দ্র পর্বত আর অশোকবন তো এইখান থেকে এইখানে। উঠলুম আর নাবলুম। চোখের পলকে পৌঁছে যাবো। চলো তো বৎস হনুমান। আবেকবাবটি তোমার পিঠে চড়ে বসি। আলসে চেড়িগুলো নিশ্চয়ই এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। তাড়াতাড়ি যাবেন কিন্তু প্রভু। অকাবণ দেবি কোবো না যেন দেবব লক্ষ্মণ। চলো বৎস ফিরে যাই। হুঃ!” বলে সীতা বাল্মীকি দিকে অবজ্ঞাব চাউনি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

“যথা ‘আজ্ঞা মা-জননি। জয় হোক শ্রীবামচন্দ্রেব।’” বলে সর্বশক্তি সংহত করে আবে একবার যোগ-বলে স্পেসবকেটাকৃতি হয়ে হনুমানজী আকাশে উড্ডীন হলেন। এবার শ্রীবামচন্দ্রেব পুণ্য উপস্থিতির কাবণে গাছপাথর সবকিছু স্থানেই বইলো। বানবগণ উড্ডীয়মান হনুমানের দিকে সাদা কমাল নেড়ে বলতে লাগলেন, “শুভ হোক যাত্রাপথ।”

বাল্মীকি দাঁতে দাঁত চেপে সব দেখলেন। আর মনে মনে বললেন—“বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ, না? আচ্ছাঃ, আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেবো। স্মার্ব কোলে বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা? হবে। হবে।—তোমার কী হাল কবি, তুমি দেখো। একেবারে আমাব সেই ত্রৌপ-ত্রৌপ্তীর অবস্থা করে ছেড়ে দেবো। কলম যাব হাতে, ভবিষ্যৎ তাব হাতে।”

তাবপর তো সবাই জানি সীতাব কী কী হয়েছিলো।

## রাজকুমারী কামবল্লী

সীতা স্নানে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ ফল-পাকুড় তুলে এনে ধূয়ে কেটে পদ্মপাতায় বেড়ে রাখবেন—সীতা এলেই তাঁরা দুপুরবেলা খেতে বসবেন। রামচন্দ্র তাঁর নীলকমলের মতো চোখদুটিকে আকাশছোঁয়া ঘন বৃক্ষবাজ্রের মাঝে মাঝে ঝলসে-ওঠা সূর্যের দিকে নিবদ্ধ করে বেলা কত বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। স্নানে গেলে সীতার সময়ের জ্ঞান থাকে না, তিনি জলে ভেসে বেড়ানো হাসদেব সঙ্গে সাঁতার কাটেন। জলের তলায় খেলে বেড়ানো মাছেদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করেন, বনের জীবজন্তু গাছগাছালি, মাছ, ব্যাঙ সকলের সঙ্গেই তাঁর ভাব কিনা? “আমিও ধবিত্রী মাতার সন্তান, ওবাও!” সীতা ওদের ভাষা বুঝতে পাবেন। গাছেব ভাষা, ফুলের ভাষা, পাখির ভাষা, মাছেব ভাষা। কিন্তু রাম তো সভ্য সুন্দর বাজপৃক্ষ। তিনি জানেন বাজসভাব ভাষা। বনের ভাষা তিনি জানেন না, তাঁর ভাই লক্ষ্মণও জানেন না। সীতা না এলে খাওয়া হবে না, এদিকে দুই ভাইয়েবই জঠবাগ্নি জাগ্রত হয়েছে। লক্ষ্মণের বদ অভ্যাস, দাদা বৌদিকে আগে খেতে দিয়ে, তারপরে নিজে খাবেন। অথচ এটা যদি বন না হয়ে অযোধ্যা হতো? তাহলে রাম-লক্ষ্মণকে বেড়ে দিয়ে, সীতা খেতেন সবাই শেষে। কিন্তু বনের নিয়ম আলাদা। এখানে বাজধানীর নিয়ম চলে না। রামচন্দ্র এখানে বানপ্রস্থে আছেন, তাঁরা না-গৃহস্থ, না-সন্ন্যাসী। তরুণ তপস্কর পোশাক তাঁদের, কিন্তু তেমন ঘোব তপস্যা কিছু করছেন না। সত্যি বলতে কি, মৃগয়া-টিগয়াও করেন। হাতে ধনুর্বাণ আছে। বাক্ষস খোঁকসদের তাড়াতেও ধনুর্বাণ দবকাব, বাঘসিংগির হাত থেকে বক্ষা পেতেও ধনুর্বাণ চাই, মাঝেমধ্যে মাংস খাবার ইচ্ছে হলেও তো তাঁর ধনুক লাগে। দণ্ডক শরণা জায়গাটি বড় চমৎকার। ছায়া-ময়, মায়াময় সবুজ। ফুলে ভরা লতাকুঞ্জে ছাওয়া, পদ্মভবা হ্রদ আছে কত। গাছেব মৌমাছিব ঢাক থেকে মধু বাবে ঝরে পড়ে, পাতায় কবে ধবে নেওয়ার অপেক্ষা। বনবাসী রামচন্দ্রের খাওয়াদাওয়া মন্দ হচ্ছে না। ফলও ফলে আছে বটে ইবেক একেবারে। সেমন সাদ, তেমন গন্ধ, তেমনি সুদৃশ্য। অযোধ্যাব জীবনের চেয়ে এখানটা অনেক শান্তিপূর্ণ, অনেক নিশ্চিত। বাজসভাব কুটিলতা জটিলতা নেই, নগবেব হট্টগোল নেই। লক্ষ্মণ, সীতা, রামচন্দ্র, সূর্যেই আছেন। বাজালোভ তাঁদের কাকবই ছিল না। লক্ষ্মণ একটু অধৈর্য, একটু বগচটা, মাঝে মাঝে বাক্ষস-টাক্সস, দত্তি-দানবদের সঙ্গে বাগড়া করে বসেন। তাছাড়া—বলতে নেই, কৈকেয়ীমাতার ইচ্ছেয় তাঁরা ভালোই—ইঠাৎ রামচন্দ্রের চিত্তব্রত স্রোতে ধাক্কা লাগলো। তাঁর সামনে এক অপকপা সুন্দরী নারী এসে দাঁড়িয়েছেন। কোথা থেকে এমন চকিতে উদয় হলেন ইনি? কই, একে তো আসতে দেখিনি? কোন পথে এলেন? নাকি আমি এতই অনামনস্ক ছিলাম যে নজর করিনি? তেবো বছর পাব হয়ে গেছে, আব একটা বছর বাকি। তাই

বামচন্দ্র অতীত ভবিষ্যৎ ভাবছিলেন। কিন্তু এই নারীর রূপের দিব্য বিভা যে-কোনো ভাবনাব বাবেটা বাজিয়ে দিতে পারে। এ নিশ্চয় কোনো অঙ্গবা, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। বাম-লক্ষ্মণের তপস্যাভঙ্গ কবতে। ভাবি তো তপস্যা। তাব আবাব ভাঙাভাঙিব কী আছে? ইন্দ্রের সবভাতেই বাড়াবাড়ি। তিনি কি জানেন না যে বামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার। তাঁব ইন্দ্রের সিংহাসনে ডিমোটেড হয়ে যাবাব কোনোই বাসনা নেই? অকস্মাৎ স্বর্গ থেকে হবী পবী অঙ্গবী পাঠিয়ে দিলেই হলো? একটা সময় অসময় নেই? এই ঠিক দুপূববেলা খালি পেটে সীতার জন্য অপেক্ষা কবছি এমন সময়ে হঠাৎ সুপথ থেকে চাত কবে কুপথে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবাব জন্য —হঠাৎ সেই সুন্দবী বললেন, “হে শ্যামল শোভন মহীকহেব মতো সতেজ, বসন্ত ঋতুব মতো উজ্জ্বল মুখশ্রী, বজ্রেব মতো শক্তিমান পূণ্য দেহেব অধিকারী শ্রীবামচন্দ্র। হে বাজীবলোচন, দীর্ঘবাহু, যেহেতু মাটিতে আপনার ছায়া পডছে, আপনি যেহেতু মেঝে স্পর্শ কবে বসে আছেন, সেহেতুই শুধু বোঝা যাচ্ছে যে আপনি দেবতা নন, মবমানব মাত্র। কিন্তু আপনাব এই দেবদুর্লভ রূপেব তুলনা পৃথিবীতে আপনি কেবল একা আমারই মধ্যে পাবেন। আপনাব সঙ্গে মিলন পবিকল্পনা কবেই আমার জন্ম দেওয়া হয়েছিলো। তাই আপনাকে দর্শনমাত্র আমি স্বামী কপে গ্রহণ কবেছি, হে বাম, আপনার প্রেমে আমি জবজব। আমাকে গ্রহণ করে দয়া করে ধন্য ককন। আমি অনন্যাপূর্বা, কুমারী কন্যা।”

রামচন্দ্র দেখলেন। যেন আকাশ থেকে খসে পড়া স্থিব বিদ্যাংলতাব মতো স্বর্ণবর্ণা একটি তন্ত্রী তকনী, তাব পদ্মফুলেব মতো আনন থেকে সরলতা এবং মাধুবীব দিব্য বিভা বিচ্ছুবিত হচ্ছে চন্দ্রকিবণেব মতো—মযনাপাখিব চোখেব মতো টানা টানা দুটি চোখে তাব শাগিত তরবাবিব মতো ধাব, মযুবেব মতো গর্বিত ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে, তাব কথা থেকে যেন মধু ঝবে পডছে আব সুবভি ছড়িয়ে পডছে। উজ্জ্বল—ঠিক যেন স্বর্গেব আলোকলতাব মতো। কল্পতরুব মতো পুরুষেব ইচ্ছাপূবণেব আধার তার সর্বশবীব। বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রেব দেহে গোপন বোমাপ্ত হলো। তিনি সহসা কাম-শিহবিত হলেন। এত রূপ, এত আকর্ষণ, এ কী নশ্বব শবীবে সম্ভব? বামচন্দ্র বললেন—“হে কন্যা, তুমি কে? তোমার নাম কী? তোমাকে দেবলোকবাসিনী বলে মনে হয়। তোমার পরিচয় কী? এই ঘোব অবণো তোমাব মতো কপবতী তকনী একা একা কেমন কবে এসে পডতে পারে?”

তকনী উত্তর দিলেন—“আমি কামবল্লী, ব্রহ্মার প্রপৌত্রী, বিশ্ববার কন্যা, লক্ষ্যপতি বাবণ, ধনপতি কুবেব, মহাবলী কুন্তকর্ণ, মহাজ্ঞানী বিভীষণ এঁবা সবাই আমার দাদা হন। আমি প্রভাবশালিনী, সচ্ছন্দগামিনী, আব্রপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীন। আমার দীর্ঘ তপস্যালব্ধ বলেব ফলে আমি যেমন চিরযৌবনা, আমি তেমনই অজেয়া। আমি সর্বত্রই একাকিনী বিচরণ করতে পাবি, কেননা স্বেচ্ছায় দুর্বল না হলে দেব দানব যক্ষ রক্ষ মানুষ বা পশু কেউই আমার বল হরণ করতে পারে না। কায়মনোবাক্যেই আমি কুমারী,

সেখানেই আমার শক্তির মূল।” কামবল্লীৰ মধুর বাক্য ও মধুবতব কপে বিমুগ্ধ বাম বললেন—“কিন্তু বাক্ষসীবা কপহীনা হয়। তুমি বাক্ষসী হয়ে এত কপ কী কবে পেলো? তাছাড়া স্ত্রীলোকেব দেহে তো বল এবং কপ একত্রে থাকে না? বলবর্তী হলে সে কবালদর্শনা হবে। নতুবা মোহিনী।” কামবল্লী জনস্থলে বোমাঞ্চ তলে মৃদু হেসে বললেন—“হে দিবাকান্তি, মহাবল বামচন্দ্র, আমার তপস্যাব ফলেই আমার এই দিবাত্রী এবং এই অলৌকিক বলপ্রাপ্তি ঘটেছে। শুধু আপনাকে লাভ কবাব আশাতেই আমার তপস্যা। স্বামী, এতদিনে আপনি এসেছেন। আমার বিলম্ব আর মোটে সইছে না প্রভু, আপনার দীর্ঘবাহুতে আমাকে গ্রহণ কবে ঐ বলিষ্ঠ উরুতে আমাকে বসিয়ে ধন্য করুন। তীব্র কামজ্বরে আমি পীড়িত।” শুনে একটু বিচলিত হুবে শ্রীবামচন্দ্র বললেন—“হে কন্যা আমি তো মানুষ মাত্র। তুমি দেবতাদেবতা কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ কবি কী উপায়ে? আমি সচ্চবিত্র পুরুষ দিবাহ না কবে কোনো নবীকে যে আমি অধঃশায়িনী কবতে পাৰি না।” কামবল্লী বললেন—“ওঃ এই? আমিও তো সতী নাবী, আমিও কি আপনাকে বিয়ে না কবে জাব কপে চেয়েছি? এই যে শতযোজনগন্ধা পানিজাত কুসুমের মালাদুটি আমার হাতে কেন আছে? গান্ধৰ্ব বিবাহ কবে আমরা এখানেই মিলিত হবো।”

বামচন্দ্র মালাবদল কবে বিয়েৰ কথাটা দু’মিনিট চিন্তা কবে বললেন—“কিন্তু তুমি কী কবে হয়? তুমি ব্রাহ্মৰ নাতনি ব্রাহ্মণী। আমি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় পুরুষ। স্ত্রীবত্ত দুক্লাদপি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণী বিবাহ ঠিক নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে এ-কৰ্ম আমি পাৰি না।”

আকুলসবে তৰুণী জবাব দেন—“কিন্তু আমার জাননী তো বাজকন্যা এবং ভাইবা তো ক্ষত্রধৰ্ম পালন কবেন, তাঁবাও বাজা। এক্ষেত্রে আপনার বাধা কিসেব? আমি তো নিজেকে ব্রাহ্মণী বলে জানি না। আমি তো মৃগয়া কবি, আমি ক্ষত্রিয়। আসুন, স্বববাজ।”

শ্রীবামচন্দ্র তৰুণী বাক্ষসীৰ বাকচাতুৰ্যে আবও মোহিত হয়ে পড়লেন। তাৰ সাহচর্য শ্রীবামকে বনের মধ্যে যেন বাজসভাব নাগবিক আবহাওয়া স্রবণ কবিয়ে দিলো। কিন্তু সংযম পালনে অভ্যস্ত, চতুৰ এবং চতুৰ্বর্ণজ্ঞানী শ্রীবামচন্দ্র বললেন—“কিন্তু বাক্ষসদেব সঙ্গে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, হাবভাব, কচিটুচি কিছুই তো মেলে না। বাক্ষসবা নবমাংসভুক, তাবা চণ্ডসভাব”—শূণ্যথা তাডাতাড়ি উত্তৰ দিলেন—“কিন্তু আমি তো বহুকালই তাদেব আশ্রয় ত্যাগ কবেছি। তাদেব সাহচর্য এড়িয়ে চলেছি। তবেই তো তপস্যা কবা সম্ভব হয়েছে। এই কপ এই জ্যোতি কি অমনি অমনি লাভ কবেছি? কেবল বিত্ৰীষণেৰ মতো ধৰ্মপ্রাণ শুচিসভাব বাক্ষসদেব সঙ্গেই আমার যোগাযোগ। হে বামচন্দ্র, বৃথা ভাবনা কবে সময় নষ্ট কববেন না। আমাকে কোলে নিন, শীগগির।” অগত্যা বামচন্দ্র বললেন—“নশব মানুষ হয়ে আমি কোন সাহসে নবভুক বাক্ষসীকে বিয়ে কবি? বাগ হলে, দাম্পত্য-কলহ হলে তুমি তো

আমাকে চিবিয়ে খেয়েই ফেলবে ঘাড় মটকে?” তখন তাঁর মুল্লের মালাব মতো দাঁতে বিদ্যুতের মতো হাসিব ঝিলিক দিয়ে সুন্দরী শূর্ণখা বললেন—“এই দস্তুরটিকৌমুদী কি কাঁচামাংস চিবুনের উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে? এই পেলব পদ্মমৃগালের মতো বাহু কি আপনার ঘাড় মটকাতে পারবে?” বামচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন—“কী জানি বাবা. তোমরা বাফসী, ইচ্ছাক্রুপিনী। ইচ্ছা কবলেই মূলের মতো দাঁত, কূলের মতো নখ, আঙনের মতো চোখ বেব কবে, সিংহের মতো গর্জন কবে আমাকে মুহূর্তেই মাংসপিণ্ডে পরিণত কবতে পারবে। আমি নশ্বর মানুষ, বনবাসী ব্রহ্মচারী, আমি কি তোমার দৈববলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবো? তাবপব ধবে যদি বিয়েব খবর পেয়ে তোমাব মহাবলী বাফসদাদাব তেড়ে আসেন? ওবে বাবা।” অস্থির কামবল্লী বললেন—“হে বামচন্দ্র! ‘ওবে বাবা’ বাক্যাংশ আপনাব মুখে মানায় না। তাছাড়া ওইজন্যই তো তাড়া দিচ্ছি। চটপট বিয়েটা সেবে ফেললে আব ভয় নেই। দাদাব চাইবেন না তাঁদের বোন বিধবা হোক।” শ্রীবামচন্দ্র বললেন—“তাব চেয়ে ববং তাঁদেরই ডেকে আনো। তাঁরা তোমাকে আমাব হাতে ধর্মমতে সম্প্রদান করুন।” কামবল্লী বললেন—“হায় বাম! হায় বাম। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আমাব দাদাব কদাচ স্বেচ্ছায় আমাকে আপনাব হাতে সম্প্রদান করবেন না? কিন্তু একবাব বিবাহ হয়ে গেলে আমার জীবনে তাঁরা কোনো অনিষ্টও ঘটাবেন না। এ-বিবাহে আপনি রাফসকূলের জামাই হয়ে নিশ্চিত্তে বাজত্ব কবতে পারবেন। বাবণের ভয়ে সর্গের দেবতাবাও কাঁপেন। তাঁবাই আমাব দাদাব প্রাসাদ বাঁটপাট দেন, বাগান করেন, পাকশালে বাস্না করে দেন। বাবণের দাসদাসী দেবতাবাই। হে বাম, আসুন পৃণ্যকর্মটা সেবে ফেলি।” বাম বললেন, “কিন্তু কেউ সম্প্রদান না করলে—এভাবে গান্ধর্বমতে—এটা কি ঠিক গ্রাহ্য হবে অযোধ্যানগরীতে?” তখন কামবল্লী বললেন—“হে বামচন্দ্র, আমি তো অবলা, পুরুষশাসিতা। তুচ্ছ মানুষী নই। আমি সবলা, স্বাধীনা, মুক্ত বমণী। অন্য আমাকে সম্প্রদান কববে কেন? আমি নিজেই নিজের অধিকারিণী। আসুন, এই পারিজাত কুসুম আমাব দাদা কুবেরের বাগানে ছাড়া ফেটে না। এব সৃগন্ধ তিন ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে। এই দিব্যমালা আমাকে পবিয়ে দিন। আপনাব এত দ্বিধা আমি বুঝতে পারছি না। কবিতা ও বণিতা স্যমাগতা হলে সুখদা হয়, এ কি আপনি জানেন না?”—এই বলে সোনাব নৃপব কামবল্লীমিয়ে দিব্যমালা হাতে কামপীড়িতা কামবল্লী নয়নের ধনুকে জ্যা-বোপণ কবে মদনবাণ ছুঁড়লেন ও বামের দিকে ধেয়ে গেলেন।—“এসো, প্রভু এসো, আমাব আব বিলম্ব সইছে না।”

বামচন্দ্র মদনবাণে আহত হয়েও আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। হায়! শ্রীবামচন্দ্র যদি অর্জুন হতেন, তাহলে তাঁকে এই সমস্যায় জর্জরিত হতে হতো না। কিন্তু তিনি বাম অবতার। সীতা ভিন্ন আর দ্বিতীয় নারীকে তাঁব জীবনে ঠাই দেবার উপায় নেই। অথচ কামশরে তিনিও কি কিঞ্চিৎ উৎপীড়িত নন? স্পেদবিন্দু



কি তাঁর শ্যামল শরীরেও কণ্টকেব মতো ফুটেছে না? শরীরেব সব লোম কি খাড়া হয়ে ওঠেনি? রোম-হর্ষণ কি একেই বলে না? এই ঘোব অবগো সময় যেন কাটতে চায় না। এই অতিকপসী কন্যাটির সহজ সপ্রতিভতায়, সাবল্যে এবং মানুষ্যদেব মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব দঃসাহসে বাম বিমোহিত হয়ে পড়েছেন। কামবল্লীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর খুব ভালো লাগছে। ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে সময়টা দিবা কাটছে। সীতা স্নান থেকে য়েবেননি। লক্ষ্মণেব ফল কোটা শেষ হয়নি। লক্ষ্মণ তাঁব নিজেব কুটিরেব দাওয়ায় বসে পেছনে ফিবে, নিজেব মনে ফলমূল ছাড়াচ্ছেন, পদ্মপাতায় সাজাচ্ছেন। তিনি কামবল্লীকে দেখতেও পাননি, বামচন্দ্রেব সঙ্গে কথাবার্তাও শুনেত পাননি। এসব কাণ্ডকাব্যখানব কিছুই তিনি জানেন না। তাঁব গৌববর্ণ পেশীরহল পিঠ, সিংহেব মতো সব কোমব আর কোকড়া চলে ভবা বলিষ্ঠ ঘাড় দেখা যাচ্ছে।

এমন সময়ে সীতা স্নান সেবে ফিবলেন কলসীতে জল নিয়ে। এটাও লক্ষ্মণই ঘ্রানেন সাধাবণত। সীতািব পেছ পেছ হেলতে দুলতে এলো ময়ূবকষ্টী একঝাক হাঁস, তাদের ন্যাডা ছানাদের সাবি সঙ্গে নিয়ে। সীতাও হংসগামিনী। হাঁসেবাও তাই। সীতা খেয়ে উঠে তাদের ফলমলেব কুচি দেবেন তাই তাবা এসেছে।

কামবল্লী শূর্ণগথা সীতািব কথা জানতেন না। তাকে দেখেই বুঝলেন ইনি বামেব স্ত্রী এবং বামেব সকল দ্বিধাব কাবণ। অনেক তপস্যা করে শূর্ণগথা যে দিবা কপলাবগা অর্জন কয়েছেন, সীতা জন্মসূত্রেই সেই সৌন্দর্যেব অধিকাবিণী। শূর্ণগথা বুদ্ধিমতী, তিনি বুঝতে পাবলেন, সীতা দ্বাভাবিক নিয়মেই সেইসব গুণেও মণ্ডিতা, যা শূর্ণগথাকে তপস্যা করে পেতে হয়েছে। শূর্ণগথাব প্রচণ্ড ঈর্ষা হয়ে গেলো। নিভ্র বন্ধলে, সন্দোষিত সীতািব পূর্ণসৌবন ষোলোকলায় প্রস্ফুটিত। বাম যে এতক্ষণ তাঁব সঙ্গে বদ্ববসিকতা কবছিলেন মাত্র, শূর্ণগথাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কবাব কোন ইচ্ছাই যে তাঁব ছিল না, সেকথা বুঝতে আর দেবি হলো না বাজকুমারী কামবল্লীর। তিনি তখন কামপীড়িতা এবং প্রণয়ে কাতব, বামেব এহেন প্রবঞ্চনায় তাঁব যত্নগা দ্বিগুণ বর্ধিত হলো। অবগামধ্যেও এত সন্দবী স্ত্রী যাঁব, তিনি শূর্ণগথাকে নিয়ে তাহলে এতক্ষণ তামাশা কবছিলেন? শূর্ণগথাব হৃদয় কেঁপে উঠলো। প্রথমে তাঁব ইচ্ছে কবলো এক ঢোকে সীতাকে গিলে ফেলতে। কিন্তু সীতািব চোখে যে সাবল্য এবং নিঃশ্রয় বিস্ফাবিত—শূর্ণগথা তাঁব দ্রুপ চিনতে পাবলেন। তিনি বুঝলেন, শুধু শূর্ণগথাকেই নয়, সীতাকেও প্রভাবিত কবেছেন শ্রীবামচন্দ্র, এতক্ষণেব বহস্যালাপে কালযাপনেব সঙ্গিনী হিসেবে শূর্ণগথাকে ব্যবহাব কবে।

সীতা শূর্ণগথাকে দেখে খুবই অবাক এবং বামেব চোখমুখেব ভাব দেখে তাঁব বুঝতে বাকি বইলো না যে বাম বীতিমতোই বিমুগ্ধ হয়েছেন। সীতা যদিও শূর্ণগথাকে বাক্ষসী বলে চিনতে পাবেননি, তাঁব সঙ্গী হাসেব ঝাক কিন্তু ঠিকই চিনেছে। তাবা বাক্ষসী দেখে ভয়ে কেঁপে প্যাক-প্যাক করে চোঁচিয়ে ঠেলাঠেলি করে হ-হুশ করে পালিয়ে গেলো। কিন্তু বাচ্চাগুলো উডতে শেখেনি, তাবা প্রাণভয়ে সীতািব কাছেই

আশ্রয় চাইলো। তাবা সীতাকে বললো—“এ বাক্ষসীর কাছ থেকে তুমিই মায়েব মতো আমাদের বক্ষে কবো।” সীতা তখন বুঝতে পাবলেন। এই কপসীটি আসলে বাক্ষসী। তিনি হাঁসের ছানাদেব বৃকে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু নিজেই ভয়ে অজ্ঞান হবাব যোগাড। সীতাব ভয় দেখে বাম শূর্ণগথাব সঙ্গে যফ্টিনফটি কবা ছেড়ে, সীতাকে জড়িয়ে ধবে কুটিবে নিয়ে গেলেন। আব বামচন্দ্র সীতাকে জড়িয়ে ধবেছেন দেখে শূর্ণগথাব মনে তীব্র মাৎসর্য-যন্ত্রণা হলো। তিনি দৃশ্যাটা সহিতে পাবলেন না। দৌড়ে পাশেব কুটিবে লক্ষ্মণেব কাছে ধেয়ে গেলেন। তক্ষুনি, ঠিক তক্ষুনি অমনিই একটি কঠিন বাহুব কোমল আলিঙ্গনেব জন্য শূর্ণগথাব দেহমন দুই-ই তৃষিত হয়ে উঠলো। তিনি কবজোড়ে লক্ষ্মণকে অনুনয় কবলেন—“বে কপবান বাজপুত্র, আমাব দিকে একবাব চেয়ে দেখো। দেখো আমি সুন্দরী, সলক্ষণা ও তকরী। বাজকুলনারী কামবল্লী আমাব নাম। আমি তোমাব প্রেম প্রার্থনা কবি।” ততক্ষণে লক্ষ্মণেব ফল কোটা হয়ে গিয়েছিলো। তিনি পেছন ফিবে শূর্ণগথাব চোখ-ঝলসানো কপ দেখে বাকবদ্ধ হয়ে গেলেন। শূর্ণগথাও তা টেব পেলেন। কিন্তু লক্ষ্মণও বাজসভাব মানুষ, বামেবই মতো। তাঁবা অনেক সাজানো-গোছানো সভাসন্দব আলাপ শুনেত অভাস্ত। এমন সোজাসুজি আসল কথায় চলে আসতে কাউকেই দেখেননি।

শূর্ণগথা আবাব বললেন—“তোমাব দাদাব না হয় বৈ বয়েছে। তুমি তো একা, সঙ্গিনী বহিত। আমি অভিজাতবংশীয়, কুমারী কামবল্লী আমবা নাম। ব্রহ্মাব নাতনী, বিশ্ববাব কন্যা লক্ষ্মাধিপতি বাবণ, ধনপতি কবেব, নিদ্রাবাব কড়কর্ণ, ধর্মবাব বিতীষণ, এঁবা সকলেই আমাব দাদা। আমিও তাঁদেব মতোই মহাবলী। আমাব যে এই কপ যৌবন—এ চিবত্তা, অনশব। কেননা আমি কঠিন তপসাবলে এই বব অর্জন কবেছি। আমি কোনদিন জবতী হব না। হে পবম কপবান বাজপুত্র, তুমি দযা কবে আমাকে গ্রহণ কবা।” কিন্তু লক্ষ্মণ তখনও হাতে ছুবি নিয়ে কাটা ফলেব পাতাব সামনে প্রস্তবমর্তিব মতো ‘থ’ হয়ে বইলেন। এই মহিলা অঙ্গরী, না দেবী, না বক্ষিনী, যক্ষিনী, ভূতনী, প্রেতিনী, টেব না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্ভাবিক হতে পাবছিলেন না। এবাব বুঝলেন বাক্ষসদেব বোন যখন, তখন বাক্ষসীই। কিন্তু তিনি কিছু বলাব আগেই শূর্ণগথা অধীব হয়ে আবাব বললেন—“আমি একাই এক অক্ষৌহিণী সৈন্যাব সঙ্গে যুঝতে পাবি। তোমাদেব সকল যুদ্ধবিগ্রহে আমি সহায় হতে পাববো। কেননা আমি অস্ত্রবিদ্যাতে পাবদর্শিনী। তোমাব আমি স্যোগা সহধর্মিণী হবো। তোমাব দাদাব ললিত লবঙ্গলতা বউটিব মতো আমি ভয়ে অচেতন হয়ে পড়বো না কখনও। আমি অমিতাবিক্রমা, এবং নির্ভীক, কিন্তু স্ভাবগুণে আমি প্রণয়কুশলীও বটে। যদিও আমি এখনও অনন্যাপরী, কুমারী। হে বাজপুত্র, তুমি শুধু চোখ তুলে একবাব চেয়ে দেখো আমাব এই হবিণেব মতো চোখদুটি, আমাব এই পূর্ণকলসন্তনয়ণল, আমাব গভীব বহস্যময় নাভিকুণ্ড, আমার এই মসৃণ উকুর ভাঁজ—”

লক্ষ্মণেব অনেকক্ষণ খুব খিদে পেয়ে গেছে। আব বেশিবভাগ পুরুষ মানুষেব

মতো, লক্ষ্মণেবও খিদে পেলে আব মাথাব ঠিক থাকে না, কিঞ্চিৎ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ঘটে। তাই আজ দুপুরে ফলাহাব, মাছমাংস নেই। ফলমূল শাকসবজী বাম-সীতাব অন্ত পছন্দ হলে কি হবে, লক্ষ্মণেব পছন্দ অন্যবকম। তিনি ভালবাসেন ভাতপাতে একটু হবিণেব মাংসেব ঝোল, একটু পাখিব মাংসেব পাতুরী, কি দটো টটকা মাছ ভাজা। লক্ষ্মণেব স্তভাবটাও যেমন ক্ষত্রিয়োচিতো, বাগী বাগী, খেতেও ভালবাসেন তেমনি বাজসিক আহাব।

শূর্ণগথা যদি খাওয়া দাওয়া মিটে যাবাব পরে এসে লক্ষ্মণেব কাছে তাঁব আবেদন পেশ কবতেন, তাহলে কী হতো কে জানে। কিন্তু আপাতত, এব চেয়ে মন্দ সময় আব তিনি বাছতে পারতেন না। লক্ষ্মণ এবাব ফেটে পড়লেন। একে তো সীতা আজ জানে খুবই দেবি কপেছেন। তাই বাম আজ নিজেও শিকাবে যাননি লক্ষ্মণকেও যেতে দেননি। তাঁব আলসারোপ হচ্ছিল, দুই ভাইয়ে বসে পাশা খেলছেন। এবং লক্ষ্মণ হেবেছেন। একেই সেজন্য মেজাজ খাবাপ। তাই পেটে খিদে। এবং দুপুরেব খাওয়াটা মনেব মতন নয়। তাবমধ্যে এ আবাব কী উটকো বিপদ! এক বেহায়া বাক্ষসী বাজকনো এসে জ্বালাতন শুরু কবেছে। লক্ষ্মণেব মাথা চড়াং কবে গবম হয়ে গেল। এবং তাঁব মুখে মধব ভাষণ এল না। আবাল্য লক্ষ্মণ তাঁব কটুবাকোব জন্য সুপরিচিত। তিনি বল্লেন—“হে অজ্ঞাতকুলশীলা বমণী, আপনি যা বললেন আমি শুনলাম। আপনি খুবই সুন্দরী ও বাকপটুয়সী। এই দণ্ডকাবণো প্রায় ১৩ বছব আছি আমি কিন্তু আপনাব মতো কোন কপসী যুবতীকে এখানে একাকিনী বিচবণ কবতে দেখিনি। বিশ্ববাটি কে, আমি জানি না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মানবী নন। এতই যখন যুদ্ধপটুয়সী, তখন ভূত প্রেত বক্ষ যক্ষ কিছু একটা হবেন। সে আপনি যে-ই হোন, বামচন্দ্রেব, সীতাদেবীর এবং আমাব, কারুবই আপনাকে দিয়ে কোন দবকাব নেই। এখনই আমবা মধ্যাহ্ন ভোজনে বসবো। আপনি ববং ভালয় ভালয় চলে যান। বেশি ঝামেলি কববেন না, ভাল্লাগছে না।”—কামপীড়িতা তবণী বাক্ষসীব বাম-লক্ষ্মণেব কপদর্শনে তখন ককণ অবস্থা, তিনি বল্লেন—“হে লক্ষ্মণ, আপনি সক্ষম, সমর্থ, যুবক। আপনি পুরুষ। আপনি আমাব অভিলাষ চর্চিতার্থ কবন। আমি কামপীড়িতা, বতিচঞ্চলা হয়ে আপনাব কাছে এসেছি। দয়া কবে আমাকে প্রত্যাখ্যান কববেন না। বতিপ্রার্থিনীকে প্রত্যাখ্যান কবা পাপ। জানেন না?” ক্ষধার্ত লক্ষ্মণ একথায হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।—“তবে বে টেটিয়া ষ্ট্রীলোক। এই খিদেব মুখে বতিপ্রার্থিনী? আপনাব স্তভাবটা তো বড্ডই খাবাপ দেখছি। এইসব অসভা কথা আমাকে বলতে আপনাব লজ্জাও কবছে না? ছি ছি ছি ছি, এসব কথা কদাচ কোন বমণী কি কোনো পুরুষকে সেধে সেধে বলে? অ, আপনি নিশ্চয় বাক্ষসকূলেব বাবান্ননা হবেন—। না, না, আমাদেব কাছে অর্থ নেই। আপনি ভাণ্ডন, কেটে পড়ন—চলে যান”—শূর্ণগথা কানে আঙুল দিয়ে বল্লেন—“ছিঃ ছিঃ লক্ষ্মণ। আমি ধনলিঙ্গু কামবাবসায়ী নই। আমি বাজঐশ্বর্যবতী, স্বাধীনা। যদিও মুনিকন্যা।

কিন্তু আমি যে রাজকুমারীও বটে। বৃথা আমাকে এভাবে অপমান কববেন না।”  
 শুনে লক্ষ্মণ মুখ ভেংচে বললেন—“মুনিকন্যা! হ্যাঃ! বাজকুমারী!! বললেই হলো?  
 তবে আপনাব আচাব ব্যবহার এত নিকৃষ্ট কেন? সাধারণী সামান্যা নারীব সহজাত  
 আত্মসম্মত, লজ্জা শরম, আত্মসংযম, এসব কিছুই তো আপনাব নেই। অভিজাত  
 কন্যাব যোগ্য আচরণ দূবে থাক। সেধে সেধে অপবিচিত পুরুষকে প্রণয় নিবেদন  
 কবতে সঙ্কোচ হলো না? অযোধ্যায় আছেন আমাব ধর্মপত্নী উর্মিলা, আপনাব চেয়ে  
 তিনি অজস্রগুণ কপসী ও সশীলা। আপনাব চক্ষুলজ্জাও নেই।” মবীয়া শূর্ণখা  
 বললেন—“প্রণয়ে যখন ধর্মনারীব বন্ধ গবম কটাহে তেলের মতো টগবগ কবে ফুটেছে,  
 তখন লোকলজ্জাব প্রশ্নই ওঠে না বাজপুত্র। আব প্রণয় নিবেদনের মধো আত্মসম্মত  
 বিসর্জন দেবার কথা আসে কেন? বাজপুত্রেরা তো বাজকন্যাদেব হামেশাই প্রণয়  
 নিবেদন কবছেন। তাঁবা তাতে লজ্জাও পান না, অসম্মানিতও হন না, লোকচক্ষুব  
 ভয়ও কবেন না? আমিও তো বাজকন্যা।” অবাক হয়ে লক্ষ্মণ বললেন—“আবে  
 বে? এব যে দেখি গোড়ায় গলদ। বাজপুত্রে আব বাজকন্যায় গুলিয়ে ফেলছে।  
 বাজপুত্র তো আবও অনেক কিছুই কবতে পাবে। আপনি তো নাবী। আপনি—”

—“নাবী তো কী হয়েছ? আমি একাই এক অশ্কেহিণী সেনাব সঙ্গে যুদ্ধ  
 কবে জিততে পাবি। আমি কি আপনাদেব ওই মিনমিনে মানুষী? পৃথিবীর উচ্চতম  
 বাক্ষসবংশে আমাব জন্ম, আমি সবলে স্মাধীনা, স্বেচ্ছন্দগামিনী, প্রবল প্রতিপত্তিশালিনী।  
 যথেষ্টাক্রাপিণী। ইচ্ছে কবলেই এক্ষুনি সিংহ হয়ে আপনাকে খেয়ে ফেলতে পাবি,  
 কালসর্প হয়ে দংশন কবতে পাবি। কিন্তু এসব কিছুই না কবে, পদ্মগন্ধ দেবদর্ভা,  
 জ্যোতির্ময়ী নাবী হয়ে আপনাব প্রেম প্রার্থনা কবছি। আপনি বাজী হচ্ছেন না কেন?  
 আপনাব সেই সশীলা স্ত্রীটি তো এখানে নেই, তিনি সেই অযোধ্যায়। তিনি জানতেও  
 পাববেন না। আসুন, আসুন গান্ধর্বমতে আমবা বিয়ে কবি, আমি আব অপেক্ষা  
 কবতে পাবছি না, প্রচণ্ড কামজ্ববেব তাড়নায় আমাব সর্বদেহ স্বেদসিক্ত ও কম্পিত  
 হচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছি, জ্বলে যাচ্ছি—আপনাব সশীতল আলিঙ্গনে আমাকে অবিলম্বে  
 শান্ত ককুন। কী বলিষ্ঠ আপনাব বাহুদ্বয়, কী উদার আপনাব কপাটবক্ষ, সিংহের  
 মতো সব আপনাব কোমর, কী সুন্দর ঘন কালো আপনাব কোঁকড়া ঢুলেব ঝুটি,  
 আব আপনাব শঙ্খের মতো কণ্ঠ”—

“থাম, থাম, বাক্ষসী, ঢেব হয়েছ বেহায়াপনা। য্যা য্যাঃ—ভাগ। যদি সতি  
 কুমারী হোস, তবে বাপঠাকুর্দাব যথেষ্ট লজ্জাব কাবণ হয়েছিস, এবাব ঘবে ফিবে  
 যা, বাপ-দাদাদেব গিয়ে তোর কামজ্ববেব কথা শোনা, তাঁবা হাকিম ডাকবে। আব  
 যদি বিবাহিতা হোস, তাহলে এক্ষুনি স্মাধীব কাছে গিয়ে তোর প্রণয়গীড়াব খবর  
 বলগে যা। হুঃ! কামজ্বব। স্ত্রীলোকেব আবার কামজ্বব। ওটা কেবল পুরুষেব অস্বাচ্ছন্দ্য  
 ব্যাধি, পৌরুষজনিত ব্যাধি। ঠিক ব্যাধিও বলবো না, বংশবৃদ্ধিব জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয়  
 জায়বিক প্রতিক্রিয়া। নাবীব আবার ওসব কী? তোর দিবি গতির আছে, যা গিয়ে

আমসবু দে, বডি দে, আচাব পাঁপড তৈরি কব, কামজুব সেরে যাবে। আব যুদ্ধ কৌশল জানিস, তবে যা না বালিকাবিদ্যালয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দে, যোগব্যায়াম শিক্ষা দে, আত্মবক্ষার কৌশলবলি শিক্ষা দে—জীবনটাকে কাজে লাগা। তা নয় এসেছিস খিদের সময় বাগড়া দিতে। প্রণয় কবতে এসেছেন। ঈশ। আহ্লাদ কত। দূব হ বেটি বাক্সী কোথাকাব—”

শূর্ণখা অপমানে চোখে অন্ধকাব দেখলেন। বাক্ষসবংশীয়া হলেও তিনি প্রকৃতই সুন্দরী, এবং অমিত তেজস্বিনী। তায বাজকুমারী। একে তো প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেনই তায এত অপ্রার্থিত জ্ঞানের কথা? শূর্ণখা ক্ষেপে গেলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি আকাশ পাতাল প্রমাণ হাঁ কবে, লক্ষ্মণকে নয়, বাম-সীতাকে কপাৎ কবে গিলে ফেললেন, তাঁদের কুটিব-টুটিব শুদ্ধ। গিলে ফেলে বললেন, “দেখলি তো আমাব ক্ষমতা? আব এবাব তোকে কুটি কুটি কবে কেটে নুন দিশে চেখে চেখে খাই।” তাঁব সেই হিমালয়প্রমাণ বাক্ষসী শরীর দর্শন কবে লক্ষ্মণ সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। এ কিবে বাবা? বাম-সীতা সত্যি সত্যি এই বাক্ষসীব পেটে চলে গেলেন যে? এখন তো একে হত্যা কবাও সমস্যা। এব যে পেটের মধ্যে বামসীতা। মাবতে গেলে তাঁদের যদি ক্ষতি হয়? লক্ষ্মণ তখন মাথা ঠাণ্ডা কবে বাক্ষসীব হাঁটতে হাত বলিয়ে, অতি মিষ্টদবে তাঁকে তুষ্ট কবে বললেন—“হে প্রিয়তমা, সুন্দরীতমা, তুমি আমাব উজ্জ্বল উদ্ভাব। তুমি যা চাও, তাইই হবে। শুধু তোমাব এই ভয়ান, কবাল কপা আমি সহ্য কবতে পাবছি না। প্রেয়সী, এই ক্রোধ সংবরণ কবো—দয়া কবো। দয়া কবে ফিবিযে আনো তোমাব সেই দিব্যকান্তি, সেই দেবীদুর্লভ কপা। একটু আগে আমি যা কিছু তোমাকে বলেছিলাম সবই খিদের মুখে প্রলাপ বাক্যসব, ভুল। হে কন্যা, তুমি সত্যিই অলোকসামান্য—কিন্তু আমাব দাদাবৌদিদের তোমাব পেট থেকে আগে উগবে না দিলে। আমি কী কবে এখন তোমাব সঙ্গে প্রেম কববো? ওবা দু’জন তোমাব পেটে বসে থাকলে তো আমাব ওঁদের সঙ্গেও অতি গর্হিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে।—ওঁদের ববং তুমি আগে বেব কবে ফ্যালো। তাবপব তোমাব পূর্বকপ ধাবণ কবে আমাব কুটিবে পায়ের ধুলো দাও।” বলেই লক্ষ্মণ এক দৌড়ে নিজেব কুটিরে পালিয়ে গেলেন। শূর্ণখাব কুলোব মতো নখে তখন ছুবিব মত শাণ ঝলসাচ্ছে, যেন এক একটা বিশাল ইম্পাতেব কোদাল—ঘর্মান অগ্নিগোলক্ষেব মতো চোখ থেকে অগ্নিমাণ বিচ্ছুবিত হচ্ছে। আব নিশ্বাস থেকে আসছে একবকম মাবণ গ্যাসেব সঙ্গে প্রোতপদীব পাচা দুর্গন্ধ। সেখানে একমূর্ত্ত ও টেকা মাঝাক। পালিয়ে গিয়ে তাঁব পর্ণকুটিবের ঘাসেব দেয়ালেব ফাঁক দিয়ে লক্ষ্মণ দেখলেন, শূর্ণখা যেমন কপাৎ কবে বামসীতাকে গিলে ফেলেছিলেন, ঠিক তেমনই কপাৎ কবে তাঁদের অনায়াসেই উগবে দিলেন। বামসীতা মাদুবে বসে হেসে হেসে কটাকটি খেলছেন। যেন কিছুই টেব পাননি। “পাবেনও বাবা দাদাবৌদি।” লক্ষ্মণ ঠোঁট উলটে বলে ফেললেন। তাবপব কুটিব থেকে নির্গত হলেন। কামবল্লীব অঙ্গ থেকে তখন আবার পদ্মের নৌবভ ছড়িয়ে পড়ছে। দুই চোখে মদিবাব স্বাদ, চন্দ্রান

থেকে শুক্লাচতুর্দশীর জ্যোৎস্না উৎসবিত হয়ে দ্বিপ্রহরের বনভূমিকে সন্ধ্যাব মতো মাদকতাময় কবে তুলেছে। প্রেমের তীব্র উন্মাদনায় এবং আশাপূরণের আশ্বাসে তাঁকে আগেই চেয়েও ঢেব সুন্দরী দেখাচ্ছে। লক্ষ্মণ এই দুর্দান্ত রূপের দিকে যেন চেয়ে থাকতে পাবছিলেন না। তবু, কোনপ্রকারে কম্পিত হাতে তিনি কামবল্লীকে কোলে তুলে নিলেন।

কিন্তু কোলে ওঠার পূর্বে মোহিনী কামবল্লী লক্ষ্মণের কাছা-কোঁচা ঝেঁড়ে ঝুড়ে ‘সুবক্ষা-যাচাই’ কবে নিলেন, কোথাও কোন অস্ত্র গোপন করা আছে কি না? লক্ষ্মণের কোমরে তববাবি ছিল।—“প্রণয়ে তো এ অস্ত্রের প্রয়োজন নেই বাজকুমাৰ। সে যুদ্ধের অস্ত্র অন্যজাতের।” বলে, এক মাদকতাময় হাসিতে কামবল্লী মাত্র দুটি আঙুলে লক্ষ্মণের তববারিটি শতটুকরো কবে ফেললেন এবং হাতের পাবিজাত পুষ্পের মালাব একটি লক্ষ্মণের গলায় পবিষে দিলেন। অন্যটি তুলে দিলেন তাঁব হাতে। তাবপবে লক্ষ্মণের অন্ধশায়িনী হয়ে তাব ঠোঁটের দিকে নিজের তুষিত ওষ্ঠাধব তুলে ধবলেন। তাঁব হবিণ নয়নদুটি পবম বিশ্বাসে বুজে এলো। বিমোহিত লক্ষ্মণ শূর্ণগথাকে চন্দন না কবে পাবলেন না। কিন্তু চন্দনবত অবস্থায়, তাঁব মাথা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। লক্ষ্মণ স্পষ্ট বুঝলেন, ‘প্রাণ’ যায় যাবে, মন্দিব এই শেষ সুযোগ। “দাদাগো”—বলে চোঁচিয়ে উঠেই মবিয়া লক্ষ্মণ হঠাৎ কাঁচাৎ কবে শূর্ণগথার তিলফুলের মতো নাকটি দাঁতে কবে কামড়ে ছিঁড়ে নিলেন। হায় বে। কে যে বাক্ষস, আব কে যে মানুষ।

কিন্তু দাদাকে ডাকাব দবকাব ছিল না।

শূর্ণগথা তাঁব তপসালব্দ দৈববলের ফলেই অজেয়া ছিলেন। দৈববলের নিয়ম স্বেচ্ছায় দুর্বল না-হলে, তাঁব বল কেউই হবণ কবতে পাবে না। কিন্তু তিনি লক্ষ্মণের প্রেমে দুর্বল হয়ে স্বেচ্ছায় বাক্ষসী শবীর ত্যাগ কবে সামান্য নাবীদেহ ধাবণ কবেছিলেন। ওই মালাদানের মূহুর্তে, ওই চন্দন ভিক্ষাব লগ্নে, তাঁব দেহে বাক্ষসীব দুর্মদ শব্দি ছিল না। সেই দুর্ভ সুযোগেই লক্ষ্মণ তাঁব তিলফুলের মতো নাকটি এক কামড়ে কেটে নিয়ে থু-থু করে ফেলে দিলেন। শূর্ণগথা যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হয়ে কেঁদে উঠলেন।—“হায় লক্ষ্মণ। প্রেমিক হয়ে আজ তুমি আমার এ-কি সর্বনাশ কবলে? আমি যে এই জন্মের মতো প্রেমবিক্ষিতা হয়ে গেলাম। হায় বোধহীন শুবক, আমি এই জীবনে আব কখনও প্রেম কবতে সাহস পাবো না। কোনো পুরুষকে কি বিশ্বাস করা যাবে না? এমন কী যখন তুমি তাব অন্ধশায়িনী, তখনও নয়? আমি তোমাব কী ক্ষতি কবেছিলাম লক্ষ্মণ, যে তুমি আমাকে চিবদিনের মতো প্রেমহীনা, বলহীনা, দীনপ্রাণা কবে দিলে?”

শূর্ণগথাব আকুল কান্নায় অস্থির হয়ে সীতা দৌড়ে এলেন। বক্কলের আঁচল ছিঁড়ে তাব ক্ষতস্থানে ব্যাওজ বাঁধার চেষ্টা কবলেন। এবং দেবব লক্ষ্মণকে যাবপবনাই কঠোব ভাষায় ভৎসনা কবতে লাগলেন।—“প্রভারণা, প্রবঞ্চনা, এ তো এই নারী-

জীবনের অঙ্গ, ভগ্নী কামবল্লী, এতে ভেঙে পড়তে নেই।” বলে তাকে সাবুনাও দেবার চেষ্টা কবলেন—সীতা! ধবিত্রীকন্যা, বনের ওষধি চিনতেন। হুটে গিয়ে কী এক উদ্ভিদ তুলে এনে, শূর্ণগন্ধার ক্ষতে লাগালেন। যন্ত্রণা কমলো এবং বন্ধ বন্ধ হলো। শূর্ণগন্ধা তখন সীতাকে বললেন—“এই স্বামী, এই দেববাটি, এবা কিন্তু তোমাব লোক মোটেই ভালো নয়, সীতা। এবা কেউ তোমাব উপযুক্ত নয়। তোমাব স্বামী আমার কপেব প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আমার সঙ্গে ফটিনাটি কবেছিলেন, যখন তুমি মানে গিয়েছিলে। একবারও তোমাব কথা আমাকে জানাননি। তিনি আমাকেও যেমন প্রতারণা করছিলেন, তোমাকেও তো তেমনি প্রবঞ্চনা করছিলেন। আব লক্ষ্মণ কীবকম নীচতা কবতে পাবেন তুমি স্চক্ষেই দেখলে। ভগ্নী, চলো, তোমাকে লঙ্কায় নিয়ে যাই। স্নর্গলঙ্কায় মেয়েবা অনেক বেশি সন্ত্রিতে আছে, আমাকে দেখেই বুঝতে পাবছো, আমবা কত স্বাধীন। প্রকৃতিব কত কাছাকাছি। তুমিও প্রকৃতিব কন্যা। অযোধানগবী তোমাব জায়গা নয়। অবণ্য বনানীই তোমাব ভালো। চলো তুমি আমার সঙ্গে, যে-কোনো বাক্ষসভাইকে বিয়ে কবে অনেক সুখী হবে।” সীতা দুই কানে হাত চাপা দিয়ে শিউবে উঠে বললেন—“পাগলী, তোমাব ক্ষতস্থানের তাঁর যন্ত্রণায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে—আমি তো বাক্ষসী নই, আমার এ-জীবনে আব দ্বিতীয় স্বামী সম্ভব নয়।—তুমি যাও, তাডাতাডি ধবে ফিরে যাও, এবা তোমাব আবও কিছু ক্ষতি কবে দেবাব আগে, পালিয়ে যাও, কামবল্লী।” কিন্তু সীতাব হাতটি নিজেব হাতে ধবে কামবল্লী চপ কবে তাঁব মুখপানে চেয়ে বইলেন। তাঁব চোখে কি জল? সীতা অপ্রস্তুত সবে তাডাতাডি বললেন—“আবাব যেন বাগ কবে বিপুলমূর্তি ধবে আমার দেওবকে খেয়ে ফেলো না ভাই। দেবব লক্ষ্মণ তোমাব অশেষ ক্ষতি কবেছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তাব হয়ে তোমাব চবণ স্পর্শ কবে মার্জনা ভিক্ষা কবছি। মানুষেব সব চেয়ে বড় গুণ ক্ষমা। তুমি ওকে ক্ষমা কবে দাও।” অশ্রুপূর্ণ চোখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়ে তাঁব বক্তৃত্ত বিক্ষত মুখ বিকৃত কবে শূর্ণগন্ধা বললেন—“ক্ষমা? আমি তো মানুষী নই? ক্ষমা আমার দ্বাবা হবে না। ভয় নেই সীতা, নিজেব দোষেই আমি দৈবশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তপস্যালব্ধ অমিত বিক্রম থেকে প্রেমেব দুর্বল মূর্তে আমি বিচ্যুত হয়েছিলাম সইছায। এখন আমি সামান্য বাক্ষসী বাজকন্যা—স্বাধীন ইচ্ছাকপিনী, সচ্ছন্দগামিনী, কিন্তু দৈববলে বলবতী নই। তুমি আমার মতো ভুল কোবো না, মুক্ত হযোনা, ভগ্নী সীতা। এই স্বামী, এই দেবব, এবা কেউই নির্ভবযোগ্য নয়। এবা তোমাকে তোমার দুঃসময়ে পবিত্যাগ কবে। মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁর অঙ্কশায়িতা, আত্মসমর্পিতা, কামমুগ্ধা এক নাবীব অঙ্কহানি করলেন বিনাদোষে। কিন্তু রামচন্দ্র তো ভাইকে ভৎসনা কবলেন না? অর্থাৎ তিনিও এইবকমই তঞ্চকতা করার স্ভাবিক ক্ষমতা রাখেন। তোমার সঙ্গেও তিনি একদিন এমনই কিছু আচরণ করলে, অবাক হোযো না।”

রামমুগ্ধ সীতা, বেচারী মানুষী সীতা, দুঃদর্শিনী বাক্ষসীব কথা হেসেই উড়িয়ে

দিলেন। বল্লেন—“ভগ্নী, তুমি অসুস্থ। তাই প্রলাপ বকছো, তোমার এখন বাড়ি গিয়ে অবিলম্বে নাকের ক্ষতের কবিবাজী চিকিৎসার প্রয়োজন।”—“শল্য চিকিৎসায় এক্ষুনি নতুন নাক লাগিয়ে দিতে পাববেন লঙ্কাব নিপুণ চিকিৎসকেরা। তুচ্ছ নাকটাব থাকানা-থাকা কোনো কথাই নয়।” শূর্ণগথা অবজ্ঞার সঙ্গে সীতাকে বললেন, “এতক্ষণ তুমি আমার পরিচর্যা কবলে, শুশ্রূষা কবলে, আমিও তাই তোমাকে যথার্থ শুভবুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছি। ভগ্নীর প্রতি ভগ্নীব যা কর্তব্য। জীবনে যদি সুযোগ আসে, এই প্রতাবক বামচন্দ্রকে পবিত্যাগ কবতে দ্বিধা কোবো না। নতুবা নিজেই ঠকবে।”—বলতে বলতে শূর্ণগথা রূপ বদল কবে একটি ঝলমলে কিন্তু নাকভাঙা মাছবাঙা পাখি হয়ে বঙ্কিন ডানা মেলে উড়ে গেলেন লঙ্কাদ্বীপের অভিমুখে।

সীতা মৃদু হেসে একটুক্ষণ তাঁর যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থেকে কুটিবে ফিবলেন। সেখানে তখন লক্ষ্মণ কলাপাতায় ফলাব বেড়ে দিচ্ছেন, আব বৌদিব শ্রবণের অন্তবালে দাদাব সঙ্গে যুবকোচিত হাস্যপবিহাস কবছেন, সদা অঙ্গহীনা বাঙ্কসীব যৌবনযন্ত্রণা এবং তাব চিকিৎসা বিষয়ে। বাইবে থেকে দুই বাজপুত্রের বদ্ববসিকতায় প্রাকৃতকচিত্ত পবিচয় পেয়ে সীতাব কর্ণস্থল লাল হয়ে উঠলো। মর্মান্তত সীতা কুটিবদ্বাবে স্তব্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁব ওষ্ঠাধব দ্বয়ৎ ফাঁক হলো এবং কম্পিত হতে লাগলো, দু কুঞ্চিত হতে লাগলো। সহসা অসহায় বোধ কবে সীতা কামবল্লীব শেষ কথাগুলি স্মরণ কবতে চেষ্টা কবলেন।

## অমরত্বের ফাঁদে

সীতা অশোকবনে বসে সবমাব সঙ্গে কড়ি খেলছিলেন। ওদিকে রাম-রাবণে ভয়ঙ্কব যুদ্ধ চলছে। সীতার মুখে নিকরদ্বংগ শাস্ত্রি, তিনি জানেন শ্রীবামচন্দ্রের জয় অনিবার্য। বাবণবাজাব সবংশে নিধন অবশ্যপ্রাবী, এই আশায় তাঁব দুই চক্ষু উজ্জ্বল। হর্ষোৎফুল্ল বচনে সীতা সরমাব কাছে বামের গুণগান করছিলেন। অকস্মাৎ প্রবল কোলাহল কবতে কবতে একদল ভয়ঙ্কবী চেড়ী সেখানে উপস্থিত হলো। একজন বললে—“এই জানকী। খেলচিস কি? ওঠ, ওঠ, তোব জন্যে পুষ্পকবথ আসচে, তাতে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যা। ওঃ! সেখানে যা একখানা দাকণ দৃশ্য দেখতে পাবি না... ফাস্ট ক্লাস”—আবেকজন বললে—“বড্ড যে সার্মীব গর্বে মটমট কবছিলে? এইবাব? এবাবে কে তোমাকে বাবণরাজাব দাসী হওয়া থেকে বাঁচায় দেখি। সার্মী, দেওব, দুটো লোকই তো পটল তুলেচে। এত কবে যখন বানী হতে বললুম তখন তো বাজি হলে



না, এইবার ঠেলা বুঝবে।”

সীতা নির্ভয়ে বললেন—“তোমরা খলসভা চেষ্টা—মিথ্যা ভাষণই তোমাদের চবিত্র। বামচন্দ্রকে পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি ইহজগতে কাবোবই নেই।” বলে কড়িচ ঢাল দিলেন।

চেড়ীবা বেগে গিয়ে বললে—“হাঃ, যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ সর্গেব ইন্দ্রকেও হারিয়ে ভূত কবে দিয়েছে, ভুলে গেছিস? তাব ক’ মিনিটই বা লেগেছে বোগাপটক! বাম-লক্ষ্মণকে আচ্ছা কবে নাগপাশেব পাঁচ কষতে? দাখ গে যা দু’ভাই কেমন অন্ধা পেয়েছে। চিংপটাং হয়ে পড়ে আছে, যেন মায়েব কোলে ঘুমোচ্ছে।”

সীতা গ্রাহ্য না কবে বললেন—“তোমাদের দুর্বাকা শ্রবণেও মহাপাপ: আমি তোমাদের কুকথায় মোটেই বিশ্বাস কবি না। শত ইন্দ্রজিৎও মহাবলী মহাহা। শ্রীবামচন্দ্রব কাছে বালুকণাবৎ।”

শুনে চেড়ীবা বললে—“যা না বাপ, স্চক্ষে দেখেই আস্য না। কী সুন্দর জীব দেব কবে কাং হয়ে পড়ে বয়েছে দু’ভাই—মড়া সেজে ওদেব দাকণ মানিয়েছে কিন্তু, এটা বলতেই হবে কি বল?” বলেই মন্দচবিত্রা চেড়ীবা খলখল হাসা জুড়ে দিলে। তখন সবমার হাতটি ধবে জানকী সত্যি-সত্যিই মুঁছা গেলেন। কিন্তু নাকে লঙ্কাপোড়া দিয়ে মুহূর্তেব মধ্যেই চেড়ীবা তাঁব জ্ঞান ফিবিযে আনলে। এবং “হায়, হায়, পতি গববে গববিনী সীতাবানী এবাব যে তোকে আমবা চপ কাটলেট কবে খাবো।”—“যদি না বাবণ তোকে আগে খায়”—“যদি না বাবণরাজাব সৈন্যসামন্তবা তোকে নিয়ে লোফালুফি খেলে—” “যদি না তোব হাত পাগুলো ভাগাভাগি কবে বাবণরাজাব নাতি-নাতিদেব চুষতে দেয়” ইত্যাদি বলে খ্যাপাতে লাগলো।

সীতা আবাব জ্ঞান হাবালেন। ধমকে-ধামকে দুষ্টু চেড়ীদেব থামিয়ে সীতাব সঙ্গিৎ ফিবিযে এনে সরমা তখন বললেন—“হে জানকী, আপনি একবার স্চক্ষে দেখেই আসুন না কেন ব্যাপারটা কী? মহাবীব বাম-লক্ষ্মণ কি এত সহজে প্রাণ হাবাতে পাবেন? আপনি বুখা ভয় পাবেন না, আমি যাচ্ছি যথার্থ সংবাদ আনতে।” উদ্বিগ্নপদে সরমা চলে গেলেন। ত্রিজটা তখন এসে সীতাব হাত ধবলেন, বললেন—“কথাটা মন্দ নয়, পুষ্পক যখন এসেছে, তখন একবার বণস্থলে উপস্থিত হওয়াই তো ভালো।” যতঃপব সীতা আব ত্রিজটা বাক্ষসী পুষ্পকবথে আবোহণ কবে আকাশে অদৃশ্য হলেন। পুষ্পকবথ মনোবৎ বেগবান—মুহূর্তেই সীতা চমকে উঠলেন—কোখাস অশোকবানব সেই নিভৃত শান্তি? এ যে বণভূমি। কিন্তু কই, এখানে তো যুদ্ধ হচ্ছে না। একদিকে বাক্ষস শিবিরে বাবণসৈন্যরা মহাউল্লাসে জয়োৎসবে মত্ত। গীত-বাদো, পান-ভোজন লিপ্ত। আব একদিকে বানবসৈন্যবা ছিন্নভিন্ন, বিনষ্ট। সীতা দেখলেন, বাম-লক্ষ্মণ চেতনাহীন, প্রাণলক্ষণহীন, বভ্রান্ড শবীবে, বর্মশূনা হয়ে, সর্বাঙ্গে শববিন্ধ অবস্থায় ধলিতে পতিত। তাঁদের তৃণীব দূবে নিষ্কিণ্ড, ধনুও হাতে নেই। তাঁদেব সর্বশরীব যেন ঘন চোরকাঁটায় ভবা মাঠেব মতো। ভীবে ভীবে আচ্ছন্ন এবং তাঁদেব দৃজনকে

মোটো-মোটো বিষাক্ত সাপ দিয়ে দড়ির মতোই আঁটসাঁট শুল্ক করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। হায় হায়, তাঁদের দু'জনকেই যে যথার্থ শবতুল্য দেখাচ্ছে—জানকী একেবাবে ভেঙে পড়লেন, বৃদ্ধা ত্রিজটা বাক্ষসীও কাঁধে মাথা বেখে কাঁদতে কাঁদতে সীতা বলতে লাগলেন—“হায় হায়! দশরথাত্মজ! এই কি তোমাদের উচিত হলো? এখন আমাদের কে রক্ষা করবে? এই হতভাগ্য বাক্ষসেব দেশেই আমাদের নবীন যৌবন বৃথা বায় হবে? তবে যে জ্যোতিষীরা বলেছিলেন, আমি রাজবানী হবো? রাজগণক যা যা গণনা করেছিলেন তিনি কি মিথ্যা গণেছিলেন? হায় বাম। হায় লক্ষ্মণ। কুলস্রীব যে-লক্ষণ থাকলে তাব আমি রাজধিবাজ হয়, তাব বংশ যন্ত্রশীল উত্তরপুরুষে ধনা হয়, আমার দেহে যে সেই সকল লক্ষণই বিদ্যমান। সামদ্রিকশাস্ত্রে বলেছে মেয়েদেব কবচবণে পদ্মচিহ্ন থাকলে তাব ফল বৃথা হতে পারে না, সে-মেয়ে রাজসিংহাসনে আসীসহ অভিষিক্ত হবেই—আমাব তো হাতে পায়ে দিবি পদ্মচিহ্ন রয়েছে। হে ত্রিজটা, সে কি তবে মিথ্যা হলো? বাম, তুমি মৃত্যুবরণ করে যে সব শাস্ত্রকেই মিথ্যা করে দিলে?”

ত্রিজটা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—“আহা, জানকী, অত উতলা হচ্ছেন কেন, বাম-লক্ষ্মণের দেহ যতই শরবিদ্ধ থাক, মুখ দু'খানিতে জীবনের সব লক্ষণই স্পষ্ট। আমার মনে হয়, ওরা মবেননি।”

সীতা বললেন—“ত্রিজটা, তোমাব কথাই যেন সত্যি হয়! কিন্তু—বাম-লক্ষ্মণ দু'জনেই যে মৃতবৎ ধূলি-লুপ্তিত হয়ে আছেন? বানবগণ প্রভুবৎ স্থির, অবনত মস্তক, এবা যে শোকেই নির্বাক, স্তব্ধ? হায় হায়, মা কৌশলাব কী হবে, মা সুমিত্রাব কী হবে? উর্মিলা ভগ্নীবই বা কী হবে? তবে কি জ্যোতিষশাস্ত্রে পাবদর্শী গণকারণেবা মিথ্যা বলেছেন—? যেহেতু আমার চুলগুলি সূক্ষ্ম ঘন নীল এবং সমান; ভুরুদুটি জোড়া; এবং জঙ্ঘা বোমশূনা ও সুগোল; দাঁত সঘন ও সমান; যেহেতু আমার ললাট ঈষদুচ্চ; হাত পা চোখ নাক সব যথাযথ মাপমতন; আমি নিম্ননাভি এবং নিবিড়স্তনী, এবং যেহেতু আমার গায়েব লোম গৎসামান্য এবং নবম, আমার হাসি মৃদুমন্দ—এইসব লক্ষণ দেখেই স্ত্রী-লক্ষণ বিশেষজ্ঞেবা আমাদের মহাসুলক্ষণা, লক্ষ্মীসুকপিনী, রাজবাজেশ্বরী, পুত্রবতী এবং অবিধবা হবো বলেছেন, হে বাম, তুমি যে মাঝা গিয়ে তাঁদের সে-সকল বাক্যই মিথ্যা প্রমাণিত করলে। আমি জানি শ্রীবামচন্দ্র আমার চেয়ে বেশি কাউকেই ভালোবাসেন না, আমি জানি আমিই তাঁব নয়নেব মণি, তাঁব ধমনীর শোণিত, তাঁব ফুসফুসেব বায়ু। সেই বামই যখন মৃত, তখন আমি আব মুহূর্তমাত্রও জীবিত থাকতে চাই না—এই কপ-যৌবনই আমার কাল হলো—”, বলে সীতা পুষ্পকবচ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাপ দিয়ে পড়তে গেলেন। ত্রিজটা বাক্ষসী তাঁকে জাপটে ধরে বললেন—“আহাহা ও কি, জানকী? এত বিচলিত হলে চলবে কেন? ধৈর্য ধরুন, আমি বাক্ষসী, আমি প্রাণহীন শব আর জীবিত প্রাণীর তফাত বুঝতে খুব পারি। বাম-লক্ষ্মণ অস্বাঘাতে অচেতন্য মাত্র, মৃত নন।

তাদের মৃত্যু ঘটলে বানবদল এভাবে শান্ত থাকতো না, তাবা শোকার্ত হাহাকাব কবে ভয়ে ছুটোছুটি কবতো। বণক্ষেত্রের কপই অন্য হতো। আমি বলছি, মহাবলী বাবণ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছেন, আপনি অবধবা। ওই দেখুন, ওই তো বামচন্দ্র ঘনঘন শ্বাস ফেলছেন, ওই তো চোখ মেললেন—”

ঠিক তখনই বামচন্দ্র সতি-সতিই পদ্মপাশানে মেলো চাইলেন। যদিও তাঁব সর্ব অঙ্গ যোব নাগপাশে আবদ্ধ এবং শত শত তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ, তবু মহাবলী শ্রীবামচন্দ্র চোখ মেলে লক্ষ্মণকে মৃতবৎ শয়ান দেখেই উঠে বসলেন এবং গ্রন্থপাতপর্বক ককণ সবে বিলাপ কবতে লাগলেন। বাম বললেন—

“হায়, হায়, ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। এ যে তুচ্ছ লাভেব আশায় স্মহং ক্ষতি হয়ে গেল। আজ যদি তোমাকেই হাবালুম তবে আমার সীতাকে নিসে কী হবে? প্রাণে বেঁচেই না কী হবে? আমি কোন মুখে মা স্মিত্রাব সামনে দাঁড়াবো? হায় হায়। সীতা গেছে যাক গে, অমন কত সীতাই আমার হবে, যদি কপালে বউ থাকে: কিন্তু লক্ষ্মণ ভাইটি তো আব হবে না? পিতা মহাবাজ দশবথ যে কবেই মৃত। মা স্মিত্রা নিশ্চয়ই আমাকে অভিসম্পাত দেবেন, আমার জনাই আজ তিনি পুত্রহীনা। উর্মিলাও আমাকে অভিশাপ দেবেন, আমার জনাই তিনি পতিহারা। হায় জানকী, তোমাব জনাই আজ আমাদের পবিবাবেব এই দববহা। তুমি বাইবেব মেয়ে, পব। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আজ আমি ঘবেব ছেলেকে হাবালাম। বউ গেলে নতুন বউ হয়, এটা কোনো ব্যাপাবই নয়, কিন্তু পিতাব স্বর্গলাভেব পব কনিষ্ঠ ভ্রাতা গেলে নতুন ভ্রাতা তো আব পাওয়া যায় না। হায় জেদি জানকী, তুমি কেন উর্মিলাব মতো লক্ষ্মী বাধ্য মেয়ে হয়ে ঘবে বইলে না? বৃদ্ধ শগুণ-শাণ্ডিব সেবা কববাব ভয়ে আমার সঙ্গে বনে পালিয়ে এলে, এসে অবধিই এই দেবব লক্ষ্মণেব অক্লান্ত সেবা পেয়েছ, পাবেব ওপব পা-টি তলে বসে থেকেছ। ফলমূল আনা, বান্নাবান্না কবা, সবই যে কবেছে, সেই লক্ষ্মণ ভ্রাতাই আজ নেই। তুমি তো সীতা নিষ্কর্মা সুন্দরী, হায় বে তোমায় নিয়ে আমার কী লাভ? কেন আমি তোমাকে উদ্ধাবেব অপচেষ্টা কবতে গেলুম? তোমাব জনাই আজ আমি ভ্রাতৃহারা দুর্ভাগা—হা বাম। তুমি নাচ। তুমি কুকর্ম কবেছ। ধিক তোমাকে, শত ধিক। তুচ্ছ নারীব মোহে পড়ে তুমি ভাইকে মৃত্যব মুখে ঠেলে দিয়েছ। নিবিডন্তনী, নিম্নানভি, কোমলবোমা, উচ্চ ললাট, নীল কেশবাজি এবং সুগোল জঙ্ঘাবতী জানকী তাঁব মদ-মন্দ হাসো আমাকে এতই মোহিত বিহ্বল কবেছিলেন যে, তাঁব ছলনায় ভুলে আমি তাঁকে সুলক্ষণা ও জগতে দুর্লভা মনে কবতুম—হায়। আজকে ঠিক বঝেছি, তাঁব মতো দুর্লক্ষণা এই শ্রীলঙ্কাব কোনো বাক্ষসীও নয়—হায় লক্ষ্মণ ভাইটি, একবাব চোখ মেলে চাও—আমি সীতা-উদ্ধাব ত্যাগ কবে তোমাকেই কোলে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন কববো। চতুর্দশ বর্ষেব বেশি আব দেবি নেই—ছলাকলাময়ী সীতা চুলোয় যাক, ভাইটি আমার একবাব চোখ মেলুক—হে ঈশ্বর।”

—এতদূর শোনবার পবে শ্রবণে অসহ্য হতে ত্রিজটা বললেন—“জানকী—চলুন, আমরা এবার চলে যাই। সব তো শুনলেন? স্বর্গের এই বাক্যগুলি শ্রবণের পবেও কি আপনি রামচন্দ্রের সংসাবে ফিবেতে চান? তার চেয়ে রাবণেবই পত্নীত্ব গ্রহণ কবন—তিনি এবকম দুর্বল চবিত্র পুরুষ নন।” উত্তর না পেয়ে ত্রিজটা দেখলেন, সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তিনি আরো দেখলেন, গরুড় তাঁর বিশাল ডানা মেলে উড়ে আসছেন—ফলে আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, প্রবল বেগে বাতাস বইছে, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ এবং অবণ্য আন্দোলিত, এমন কী পর্বত পর্যন্ত প্রকম্পিত হচ্ছে—ত্রিজটা তাড়াতাড়ি পুষ্পক নিয়ে অশোকবনে ফিবে এলেন।

সীতা চোখ মেলে বললেন—“হায় বামচন্দ্র!” ত্রিজটা এবং সবমা তাঁর দৃশ্যে ব্যজন কবছিলেন। সীতা বললেন—“আমি কোথায়?”

সবমা বললেন—“আপনি এখনও অশোকবনেই, জানকী।”

ত্রিজটা বললেন—“চলুন, এবার ববং আপনাকে আমবা রাবণসভায় নিয়ে যাই। অথবা, দাঁড়ান, ববং রাবণের বথই আসুক, সাজসজ্জা, বড়ভূষণ, চুয়াচন্দন নিয়ে। আপনার যথার্থ প্রেমিক যে কে, তা আজ আমবাও জেনেছি, আপনিও চিনে গেছেন। একজন আপনাকে লাভের আশায় সবংশে নিধন হতেও পশ্চাদপদ নন। ভ্রাতা কেন, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদেব মৃত্যুও তাঁকে আপনার প্রতি বিমুখ কবে না। আরেকজন? আরো দুই ভ্রাতা বিদ্যমান থাকতেও মাত্র একটি ভাইয়ের জন্য তিনি আপনাকে স্বেচ্ছায়, সানন্দে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। হে সীতা, এব পবেও কি আপনি সেই প্রেমহীন বিবাহবন্ধনে ফিরে যেতে চান?”

সীতা দুই কানে হাত চেপে বললেন—“ত্রিজটা, তুমি স্তব্ধ হও। তোমার বাক্য আমার হৃদয় অগ্নিশলাকাব ন্যায় দগ্ধ কবছে। আমি এসব কথা সহ্য কবতে পারছি না। বণক্ষেত্রের বাম কদাচ আমাব স্বামী নন।”

ত্রিজটা অবাক হয়ে বললেন—“অর্থাৎ? তিনি তবে কে?”

সীতা বললেন—“রাবণবাজা নিশ্চয় মায়া দ্বারা কোনো মিথ্যা বামচন্দ্র সৃষ্টি কবে তাঁর মুখ দিয়ে ওইসব কুবাকা বলিয়েছে যাতে আমি বিক্ষুব্ধ হয়ে রাবণের পত্নী হই। আমাব বামচন্দ্রের প্রিয় বাক্যগুলি, তাঁর মৃদু-মধুর হাস্য, তাঁর প্রেমমদিব দৃষ্টি, সবই যে আমাব স্মৃতিকে নিত্য অলংকৃত বেখেছে। ওই কর্কশভাষী, কটবাক, অশ্রুকাভর, কাপুরুষ, অপ্রেমী, বদভাষ, পাশবিক ভুলগিত বাক্তিটি মোটেই আমাব স্বামী নন। তোমবা আমাকে এক মায়াদৃশ্য দর্শন কবিয়েছ। শুনেছি রামকে মায়া-সীতা দেখিয়েছিলে, এবাব সীতাকেও মায়া-বাম দেখানো হলো।” বলতে বলতে সীতার চোখ প্রেমময় হলো, সীতা সশ্রুনেত্র বললেন—“হে প্রিয়! মহুর্তের জন্যও আমি যে তোমাকে সন্দেহ কবেছিলাম, তোমাব প্রেমে বিশ্বাস হাবিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যথিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, সেই অপবাদের জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা কবো। আমি জানি তুমি লক্ষ্মণ-টক্ষ্মণ সঙ্কলের চেয়ে সীতাকেই বেশি ভালোবাসো। কতবার

‘প্রাণাধিকে’ বলে সম্বোধন কবেছো। তুমি তো অন্তবাক সামান্যজন নও। বৃদ্ধা ত্রিজটা, তুমি আমাকে বিভ্রান্ত কোবো না—এ সবই জুব বাবণবাজাব ছলাকলা, আমি বুঝছি।”

শুনে ত্রিজটা আব সবমা চোখোচোখি কবলেন। তাঁদের চক্ষু বিষাদপূর্ণ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হলো। ত্রিজটা বললেন—“হায়, জানকী, নিয়তিকে বাধা দেবে, কাব সাধ্য? প্রেমহীন, তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন, বাজসম্মানহীন, বিভ্র, বার্থ জীবনেই তোমাব যখন এত আসক্তি, কে তোমায় বক্ষা কববে? তোমার গণৎকাবেরা যা বলেছেন সবই মিলে যেতো, যদি তুমি প্রেমশূন্য বামচন্দ্রব বদলে প্রেমিক বাবণকেই তোমাব স্মিতি স্বেচ্ছায় ববণ কবে নিতে। কিন্তু তুমি মোহমুগ্ধা। তুমি স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস কবতে পাবছো না যে, দাসী জীবনে তোমাব চেয়েও আব কাককে বেশি ভালোবাসেন। এই অহং-ই তোমাব পতন, এই অহং-ই তোমাকে অনেক দুঃখ দেবে।”

ক্রুদ্ধা, বল্লনয়না সীতা ত্রিজটাকে তৎক্ষণাৎ তিবন্ধাব কবে উঠলেন—“দেখ তো দেবে। তোমাব তাতে কী? আমার দাসী আমাকে ভালোবাসেন কি না, সেটা আমি বুঝবো। প্রগলভা রাক্ষসী, তুমি আমার দাসী, দাসীব মতোই থাকবে। গুরুজনের মতো উপদেশ দিতে এসো না।”

সীতাব কটুবাক্য শুনে ত্রিজটা অশ্রুমোচন কবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সবমা কিন্তু সীতাকে ভৎসনা না কবে পাবলেন না।

—“ছিঃ সখী। এই নিতান্ত প্রাকৃতজনের মতো বাক্য আপনাকে মানাচ্ছে না। বর্ষিয়সী ত্রিজটা আপনাবই শুভাখিনি। এটুকুও শুভাশুভেব বোধ কি আপনাব বাকি নেই?”

এই কথায় সঙ্গিত এবং লজ্জা পেয়ে সীতা বললেন—“শোকে দুঃখে আমি কী বলতে কী বলেছি, তোমাবা আমাকে মার্জনা কবো সখি সবমা। কিন্তু ওই বাম-লক্ষণ যে ইন্দ্রজালে নির্মিত মায়ামূর্তি ছিলেন না তাব প্রমাণ কী? ইতিপূর্বেও বিদাজ্জিহ্নু আমাকে রামচন্দ্রব কাটামুণ্ড এবং কোদণ্ড দেখিয়ে বিভ্রান্ত কবতে চেষ্টা কবেনি কি? তাতে বিফল হয়ে এটা নির্ঘাৎ কুবুদ্ধি বাবণেব কোনো নতুন কৌশল।”

এবাব সবমা আব অশ্রু সংববণ কবতে পাবলেন না। জানকীকে বক্ষে ধাবণ কবে সবমা সাশ্রবচনে বলতে লাগলেন—“হায় সখি জানকী। এই কথা বলতে আমারই হৃদয় দীর্ঘ-বিদীর্ণ হচ্ছে—আজ আপনি বণক্ষেত্রে যা প্রত্যক্ষ কবেছেন, এবং যা আপনার শ্রুতিগোচর হয়েছ, তা নিতান্তই নির্মম বাস্তব। রাক্ষসেব মায়াজাল নয়। হে সবলা সীতা, কঠোব বাস্তব অনেক সময়েই মায়াব চেয়েও অবিশ্বাস্য। এই মবজীবনে প্রতি মুহূর্তেই আমরা নতুন শিক্ষালাভ করি। আপনি মন শব্দ ককন।”

সবমা যে মিথ্যা বলেন না, সীতা তা জানতেন। সবমাব কথা শুনে সীতা মৃতবৎ স্তব্ধ হয়ে ভূমিতে পড়ে বইলেন। যেন মাতা বসুমতীব কাছে সহনশক্তি প্রার্থনা করলেন। বৃষ্টি মর্মব প্রতিমা। নয়নে অশ্রু নেই। চেড়ীবা পর্যন্ত সেই

দৃশ্যে ভীত স্তব্ধ নিঃশব্দ হয়ে গেল।

এইভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেলো কে জানে? এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-এক যুগের মতো দীর্ঘ।

বহু, বহুক্ষণ পবে জানকী উঠে বসলেন। অন্তর্সূর্যের ন্যায় বক্তবর্ণ তাঁর মুখ। সীতা বললেন—“ত্রিজটা, অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করো। আমি প্রবেশ করি। জ্যোতিঃশাস্ত্র মিথ্যা। প্রেম মিথ্যা। সত্যি সাধনা মিথ্যা। এই পুরুষশাসিত সমাজে নাবী ক্রীড়নক মাত্র। তাব হৃদয়ের কোনো মূল্য নেই। এই পৃথিবীর জীবন আব আমার কাম্য নয়।” বলে সীতা নিজেই পর্যাপ্ত কাঠকুটো সংগ্রহ করে অগ্নিসংযোগ কবলেন। ত্রিজটা এবং সবম্মা নির্বাক দৃষ্টা, তাঁরা যেন স্থগুবৎ। বাধা দেবাবও শক্তি নেই। সীতা সৃষ্টিকর্তাকে প্রণাম জানিয়ে যেই না অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যাবেন, অমনি স্বর্গ থেকে হুশ করে একটি টেকি নেমে এলো, তাতে নাবদম্মনি।

নাবদ সবলে সীতাকে বাধা দিয়ে, মধুব বাক্যে বললেন—“হে দেবি। নিবস্ত্র হোন। এখনই মববেন কেন? শ্রীরামচন্দ্রের কোনো দোষ নেই। দোষ সবই কবি বাল্মীকিব। কাব্যের খাতিরে তিনিই বামচন্দ্রকে দিয়ে ওই সকল কুবাক্য উচ্চারণ কবিয়েছেন। ওগুলি আপনাব শ্রবণের উদ্দেশ্যে উচ্চাবিত হয়নি। পুরুষমানুষ মাত্রেই পত্নীর আড়ালে-আবড়ালে অমন কত কথাই বলে থাকে। সে সবই যদি আজ জগতের পত্নীদের ঋতিগোচর হতো তবে সংসারে একটিও দম্পতি একত্রে বসবাস করতো না। আপনি ওসবে কর্ণপাতও কববেন না। তাছাড়া, শোকেব বশে তো মানুষ কতই ভুল বকে। প্রলাপবাক্যে কান দিতে নেই। শোকেব মুখে যাই বলুন, বামচন্দ্র অবিলম্বেই আপনাকে উদ্ধাব করতে আসছেন। রাবণবধের বিলম্ব নেই। দেবি। যমজপুত্রের জননী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। অযোধ্যাব বাজ্রমহিষী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। ভাবতভূমিব পবিত্র আদিকাব্যের মহানায়িকা হয়ে চিবজীবী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। শুধু মনে বাখবেন, যে সয সে বয।”—এই বলে নাবদ মৃদু-মধুব হাস্য কবলেন। নাবদম্মনিব চতুব স্তোকবাক্যে প্রলুদ্ধা হয়ে পুনবায় মোহমুগ্ধা সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কবাব ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং নিজেব অঙ্গাতসারেই দীর্ঘতব এক দহনজ্বালাব মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

আগুন নিবিয়ে সীতা আবাব সবম্মার সঙ্গে কড়ি খেলতে বসলেন।

বর্ণক্ষেত্রে তখন গরুড়ের কৃপায় বাম-লক্ষ্মণ পরিপূর্ণ তেজে দীপ্যমান। “সীতাব উদ্ধাব কিংবা আত্মাব সংহার” বলে জ্বালাময়ী শ্লোগান দিতে-দিতে রামচন্দ্র দ্বিগুণ উদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

সেদিকে চেয়ে সস্তিব নিশ্বাস ফেলে বাল্মীকি নারদকে বললেন—“ধন্যবাদ মূনিবব, আরেকটু হলই রামায়ণ লেখা শ্বুচে যাচ্ছিল আর কী! উঃ, কী কঠিন মেয়েদেব চবিত্র! অতি জটিল!” মুচকি হেসে নাবদ বললেন—“জটিল আর কোথায়? নারীব

জীবন কত নিবানন্দ, কত ফাঁপা, তা জেনেও তো সে অমবত্বের ফাঁদে পা দেয়—। নাবীও পুরুষের মতোই নিজেকে ছলনা কবে—কিংবা পুরুষের চেয়েও বেশি। বাম তাঁকে ভালোবাসেন না, তা জেনেও তো সীতা মহাকাব্যের নায়িকা হবাব লোভ সংবরণ করতে পাবলেন না? জীবনে কঠিন দুঃখের মূল্যেও তিনি শিল্পের অমবত্ব ক্রয় কবতে বাজি।”

নাবদেব উত্তবে ধবধবে সাদা দাড়ি জটা চুলকে বাল্মীকি মহাকবি বললেন—“মুনিবব, মবজগতে যশোলাভই যে প্রবলতম বিপু—এ আমিও হাড়ে-হাড়ে টেব পাই। সীতার আব দোষ কি। সে তবুগীমাত্র।”

## সীতার পাতাল প্রবেশ

কলাপাতাতে আবেকটু পায়েস ঢেলে দিতে দিতে খবর শুনে চোখ কপালে উঠলো, খোঁপা থেকে বন্ধলেব আঁচল খসে পড়লো। সীতা বললেন—“বাছাবা, তোমবা সর্বনাশ কবেছো। কাদেব যজ্ঞেব ঘোড়া ধবেছো? এঙ্কুনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে তেড়ে আসবে। বাল্মীকি আশ্রমে নেই, কী হবে?”

লবকুশ অবজ্রায় ঠোট উলটে বললেন—“হবে আবাব কী? অশ্রমেধেব ঘোড়া ধবলেই যুদ্ধ হবে। এ আব না জানবাব কী আছে? তা বলে সে ঘোড়া আশ্রমেব গাছপালা খেয়ে ফেলবে?” দু’জনেবই ঠোটের ওপব স্নিগ্ধ শ্যামল গোফেব বেখা, নিয়মিত শ্রমে পুষ্ট পেশি, কাকপক্ষ কেশ আশ্রমবালকেব চূড়ায় বাঁধা। দুটি চোখ তো চোখ নয়, যেন নীল পদ্মফুল। দীর্ঘ, সতেজ, বর্ষার কচি দেবদাক গাছেব মতো চেহাবা। সীতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন ঠিক এইবকমই দুর্বাদলশ্যাম একটি কিশোব অনায়াসে হবধনু ভেঙে ফেলেছিলেন জনকরাজাব সভাগৃহে। এদেব চবিত্রে যুদ্ধবিগ্রহকে ভয়ডব নেই।

তবু সীতা তাদেব বোঝাতে বসলেন—“যুদ্ধ ভালো নয় বাছাবা। তোমবা আশ্রমিক। তোমাদেব যুদ্ধে কী কাজ? ও ঘোড়া তোমবা ছেড়ে দাও। ওকে অশান্তি আসবে।”

বড় বড় চোখ আবো বড় কবে লব বললো—“ব্যাটা ঘোড়াব এত সাহস। বাল্মীকিমুনিব অত প্রিয় পাবিজাত গাছটা আবেকটু হলই খেয়ে ফেলেছিল। পনস তো খেয়েইছে। নাঃ, মুনিবর আমাদেব ওপর আশ্রমরক্ষার ভার দিয়ে গেছেন. ওকে আমরা ছাড়বো না। থাকুক ও শাল্মলী গাছে বাঁধা। দেখি, পৃথিবীর কোন রাজা এসে ওকে ছাড়াতে পারে।”

কুশ বললো—“তুমি ভেবো না মা, ও ঘোড়ার জন্য ভাববার কিছু নেই, আমরা ওকে ঠিক খাবার-দাবার দেবো। কিন্তু ছাড়বো না।”

সীতা জানেন এরা ইক্ষুকুবংশের ছেলে। কারুর কোনো সদূপদেশ শোনা এদের স্বভাব নয়। বদ উপদেশ বরং শুনতে পাবে। সীতার অনেক কথা মনে পড়ে যেতে লাগলো। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আশ্রমের কর্মে মন দিলেন। লবকুশ ভোজনাভ্যে নদীঘাটে খেলতে চলে গেল। লবকুশের খেলা মানেই তো অস্ত্র অভ্যাস। সীতার ভালো লাগে না। কেন এত যুদ্ধ! কেন এত অস্ত্র! তিনি মাতা ধরিত্রীর সন্তান, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর চিবদিনের বিরাগ। ঘোর বিতৃষ্ণা। শস্যবোপণ, বীজবপন, হলকর্ষণ এসব হলো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দিক। জীবনের শিল্প। আব অস্ত্রসজ্জা, অস্ত্রশিক্ষা, অস্ত্র তৈরি কবা, এবং যুদ্ধ—এ হলো ঠিক তাব বিপবীত। মৃত্যুর শিল্প। যুদ্ধে সীতাব ঘেন্না ধবে গেছে। লবকুশের এই নিত্যনৈমিত্তিক যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাও তাঁব একদম ভালো লাগে না। কী আশ্চর্য এই বন্ধকনিকাস্ত্র অদৃশ্য শক্তির চবিত্র গঠনের ইন্দ্রজাল। যতই তাদের আশ্রমে বেখে আজন্ম মুনিঋষির সংসঙ্গে মানুষ কবা হোক না কেন, যতই শাস্ত্রপাঠ করুক না কেন, বীণা বাজিয়ে কাব্যগীতি গাইতে শিখুক না কেন—সেই তারা নিজে নিজেই অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে, অস্ত্রচালনা শিখেও ফেলেছে নিজেবা নিজেরা খেলতে খেলতে। অলস অবসর সময়ের বিনোদন হিসেবে মারাত্মক সব অস্ত্র আবিষ্কার কবে বসে আছে দুই বালক। সীতাব দৃঢ় বিশ্বাস যুদ্ধবিলাসী নম্বর মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে আমোদপ্রমোদ কবতে অভ্যস্ত অমব দেবতারা ওদের গোপনেও কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছেন। কুশ না হয় বেড়া-বাগটা আবিষ্কার কবেছে, কিন্তু লবের মহাবিশ্ব বাণ? ও তো অমনি অমনি আসেনি? লবকুশ অস্ত্রগুলি বাড়িতে আনে না। নদীঘাটে গাছের কোটবে লুকিয়ে বেখে আসে। বেড়ালের মাছ খেয়ে গোর্গ মুছে আসাব মতো। কিন্তু সীতা সবই জানেন। দিনে বাতে দু’ভাইয়ের অনেক মুক্ত গল্প তাঁর কানে যায়। সব গল্পই অস্ত্রবিষয়ক, শাস্ত্রবিষয়ক তো নয়। সীতা বোঝেন, ক্ষত্রিয়-রক্ত তাঁর আপন কাজ করে চলেছে। সীতাব খুব খাবাপ লাগে। রত্নাকর বান্দীকি যদি ডাকাতি ছেড়ে মহামুনি হতে পাবেন স্বেচ্ছায়, এ-ছেলেবা আশ্রমে জন্ম নিয়ে আজন্ম সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেও স্বভাবচরিত্রে সাত্ত্বিক হলো না, হলো সেই মহাক্ষত্রিয়, রাজসিক? সীতা মনেপ্রাণে যুদ্ধবিবোধী। যুদ্ধে তাঁব পবম ঘৃণা। সীমাহীন মৃত্যু, তলহীন নীচতা দেখেছেন তিনি শ্রীলঙ্কায়। ছেলেরা একদিন স্নানটান করে এসে খেতে বসেছে, লব বললো—“আজ যা মজা হয়েছে না মা, এক ব্যাটা রাজা এসেছিল ঘোড়া ছাড়িয়ে নিতে। তাকে আচ্ছা শাস্তি দিয়েছে কুশ। দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য সমেত সে ভো-কাউ!” সীতাব হাত কেঁপে খানিক অন্ন মাটিতে পড়ে গেল। সীতা লবকুশকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। কয়েকদিন বাদে খেতে বসে ছেলেরা হেসে গড়াচ্ছে দেখে সীতা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? লবকুশ জানালো আরো দু’জন রাজা এসেছিল সেই অশ্বমেধেব ঘোড়াটা ফেরত নিতে, সব্বাই



খতম। চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে। “যেমন আশ্রমের শাস্তি বিঘ্নিত কৰা। এবাব চাব অক্ষৌহিণী সৈন্যসমেত সবাইকে জবাই কৰেছি।”

সীতাব চোখেব একফোঁটা নোনা জল মিষ্টান্নেব পাত্রে মিশে গেল। সীতা বললেন —“তোমবা তাহলে কেবল এইই কবছ? কেবল মাৰামাবি। দাস্তাহাস্তমা? শাস্ত্রপড়া, বামাযণ গান এসব কোথায গেল? পূজো-আচ্চা?”

—“সে-সব তো ভোববেলায কবি, ব্রাহ্মমুহুৰ্তে। বোদ ওঠাব পৰ অনা খেলা।”

সীতা ভেবেছিলেন বাঘেব বাচ্চা বঁবি নিৰামিষাশী হবে। তা কি হয়?

—“মা। মা। দেখবে এসো, তোমাব জন্য কী ধবে এনেছি।” পুত্ৰদেব সমবেত চিৎকাৰে সীতা হাতেব কাজ ফেলে বেখে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন। অদূৰেই বীভৎস যুদ্ধ হচ্ছে, তিনি তা জানেন। আকাশ ছেয়ে গেছে বাণে বাণে। হংকাব টংকাব আব মবণোন্মত্ৰ জন্তু আব মানুষেব শেষ চিৎকাৰে আশ্রমেব শান্ত বাতাস নাবকীয়। সীতা জানেন বলে লাভ নেই। ছেলেবা দুদিন বাড়ি ফেবেনি। খেতে আসেনি, শুতে আসেনি। সীতা দ্বিশবেব কাছে প্রার্থনা কৰেছেন ওদেব মঙ্গলেব জন্য। তিনি জানেন তাঁব পুত্ৰেবা দীৰ্ঘায়ু হবে। তাৰেব প্রাণভয়ে তিনি ভীত নন। তাঁব ভীতি পুত্ৰদেব এই যুদ্ধপ্ৰীতিতে। যুদ্ধশেষে স্নান কৰে বন্ধ ধুয়ে ছেলেবা বাড়ি এসেছে, এবাবে খেতে বসবে। মা ছুটে এলেন জল নিয়ে, গামছা নিয়ে, কণ্ঠস্বৰে বোবাই যাচ্ছে এবাবও তাবাই বিজয়ী। ঘোড়া ছাডেনি। কী জেদ। কী জেদ। এতটুকু-টুকু ছেলেব। কিন্তু কাব ছেলে দেখতে হবে তো?

বাইবে আসামাত্ৰ তাঁব চক্ষু স্থিৰ হয়ে গেল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, চৰণ অচল, এবং হৃৎপিণ্ডও নিস্তব্ধ হয়েছে বলে তাঁব নিজেব মনে হলো। সীতাব মনে হলো তিনি পড়ে যাবেন।

“এই দ্যাখো মা, একটা ভাল্লুক আব একটা হনুমান ধবে এনেছি তোমাব জন্যে। কী প্রাণ ব্যাটাৰেব মা। সব্বাই মৰে গেল, এবা কিন্তু মৰেনি। মূৰ্ছা গেছে মাত্ৰ। মূৰ্ছাভঙ্গ হোক, তাবপৰ এদেব আমবা পুষবো। ভাবি মজাব ভাল্লুক আব হনুমান এবা মা—প্রায় মানুষেব মতোই।” সীতা একদৃষ্টে চেয়ে বইলেন পুত্ৰদেব পদতলে পতিত মহাবীৰ হনুমান আব মহাবল জাম্ববানেব দিকে। তাবপৰ কেঁদে ফেলে বললেন, “ওবে, এ তোবা কাদেব বেঁধে এনেছিস? ইনি হনুমান, আমাব প্রথম পুত্ৰ। ভোদেব বড় দাদা। আব ইনি জাম্ববান। অমোধ্যাধিপতি বামচন্দ্রব এবা চিব অনুগত ঘনিষ্ঠ সহচৰ। এ কী অবস্থা কৰেছিস এঁদেব? তাডাতাড়ি জল আন, পাখা আন”— সীতা হনুমানেব মাথাটি কোলে নিয়ে সম্মানস্নেহে জল ঢালতে শুরু কবলেন।

খানিক পরে হনুমান চোখ মেলেই ভো তাঁব চক্ষুস্থিৰ। লক্ষ্য দিয়ে উঠে পড়ে সোজা মাটিতে সঙ্কীৰ্ণ প্রণাম। “সীতা।মা। কতদিন পবে; এ তোমাব কেমন চেহাৰা

হয়েছে মা?” আনন্দাশ্রু বান ডাকলো। জাম্বুবানও উঠে বসেছেন। প্রণামান্তে দুজনই বললেন—“চলুন, দেখি, ছেলেদুটি রামচন্দ্রের কী অবস্থা কবেছে।” সীতা যেন নিজেই এবার মূর্ছা যাবেন। রামচন্দ্র?

কোথায় তিনি? “কই পুত্রগণ, তোমরা তো আমাকে বলোনি রামচন্দ্র রাজাব কথা—তিনি যে স্বয়ং এসেছেন—”, সীতার অনুযোগ শুনে তাম্বিলাভবে ছেলেরা বললে—“নিজে এসেই বা কোন লাভটা হলো? ঘোড়া কি নিতে পেরেছে? উল্টে নিজেই মূর্ছা গেছে। এই দ্যাখো না মা, সেই বাজাব কেয়ুর-কুণ্ডল, তাব ধনুর্বাণ তাব বতুমুকুট—সব খুলে নিয়েছি।” একটি একটি অতি পরিচিত বস্তু দেখেন আব সীতা আতর্জনাদ কবে ওঠেন। “ওবে ও বাছাবা, তোবা কি সর্বনাশ কবেছিস—শিগগিব ফিবিযে দে—”।

বলতে বলতেই ছুটলেন যুদ্ধবিধবস্ত আশ্রম প্রান্তণে। হনুমানও ছুটছিলেন। জাম্বুবান তাঁব লেজ ধরে টেনে আটকে বাখলেন।

“যাচ্চলে। এ তো বেড়ে মজা। মা এদেব সববাইকে যে চেনেন? দেখিণে ব্যাপাবখানা”, বলতে বলতে লবকুশও মাব সঙ্গে চলল।

অচৈতন্য রামেব তো দেহে প্রাণ ছিলই। সীতা তাডাতাডি বাল্মীকিকে টেলিপ্যাথিতে ডেকে পাঠালেন চিত্রকূট থেকে। এই ব্যবস্থা কবাই ছিল। তখনকাব দিনে টেলিফোন টেলিগ্রাফ টেলিগ্রাফ না থাকলেও টেলিপ্যাথিব চল ছিল খুবই। কিন্তু চিত্রকূট বহুদূর—মনোবথে উড়ে আসাব বাস্তা নয়। দিনদুযেক লেগে যাবেই আসতে। রামনাম জপতে জপতে সীতা চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। না জানি কী দৃশ্য তাঁব দৃষ্টিগোচর হবে।

অনেকদিন যাবৎ সীতা আশ্রমবাসিনী। এখানে বসবাস কবতে কবতে তাঁব কতগুলো অন্তর্দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। চিবকালই লাজুক, স্নগ্ধভাষিণী, সীতা সব আলাপ-আলোচনা নিজেবই সঙ্গে। মনে মনে। শ্রীলঙ্কায় অশোকবনে যেমন সখী সবমা ছিলেন, এখানে ঠিক তেমন কেউ নেই, বন্ধু শুধু বাল্মীকি। বন্ধু হলেও সীতা সব সঙ্গে কিছুটা নিয়মিত সময় বায় কবেন তিনি। তাঁব সঙ্গে বাক্যালাপ কবতে কবতে সীতা বন্ধু ধাবণা হয়েছে, প্রথম থেকেই বক্ষণশীল অগোধ্যাবাসীরা কোনকালেই তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ কবেনি—কেননা সীতা জন্মেব ঠিক নেই। লক্ষ্মণপত্নী উর্মিলাব জন্ম বাজা জনকেব অন্তঃপূরে। রেশমের শয্যায়। কিন্তু ‘সীতা’ প্রকৃতির সন্তান। জন্মমূহর্তে মাথাব ওপবে আকাশ ছিল তাঁর, পিঠেব নিচে মৃত্তিকা। লোকে বলে হলকর্ষণের ফলে জন্ম সীতা। এ তো সহজ কথা। নাবীমাত্রেই ক্ষেত্র। আব যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাব নামই কর্ষণ। পুরুষ নাবীকে কর্ষণ করে বীজ বপণ করে তার গর্ভে। উৎপন্ন ফসলেব নাম সন্তান। সীতা ক্ষেত্রজা—ক্ষেত্রে তাঁর জন্ম। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, সত্যি কথাটা কেউ জানে না, একমাত্র জনকরাজা ছাড়া। সত্যি সত্যি তো ক্ষেত্রে মানুষ ফলে না। সত্যি সীতা বহুদিন বনে বনেই খেলেছেন, ফলমূল

আহাবেই তাঁর রুচি বেশি। জীবনে কটা দিনই বা তাঁর বাজকুমারের সঙ্গে বাজভোগ খেয়ে প্রাসাদে কেটেছে? সীতা ভাবেন দেবী বসুমতী সহসা কেনই বা জনকবাজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গডতে যাবেন? তিনি অল্পবয়সী নন, কিন্তু বয়সের মতো চপলসভাবা নন। সীতা আজকাল তাঁর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মাঝে মাঝেই গভীরভাবে চিন্তা করেন। ক্ষেত্রে কুড়িয়ে পাওয়া মোষটিকে জনকবাজার হঠাৎ এত মূল্য দিলেন কেন? সীতা জনকদুহিতা জ্ঞানকী এতে কোনো সন্দেহ নেই তাঁর—জনকবাজার চলে যে অকালে একটি দীর্ঘ তেবছা বেখাব মতো একইপিচ চওড়া অংশে পাক ধবেছিল, এখন সীতার চুলের ঠিক সেই অংশটিই অবিকল জনকবাজার মতো কবেই পেকে উঠেছে। বান্নাকি বলেছেন এটা নাকি বংশানুক্রমিক ব্যাপার। কিন্তু সীতার মা বসুমতী দেবী কে? নিশ্চয় এমন কেউ, যার সৌন্দর্য জনককে পাগল করেছিল? কিন্তু যার নিম্নবর্ণ তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে দেয়নি। শূদ্রাণী, চণ্ডালনী, যে-কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব। উর্মিলার মতো নিশ্চিত নয় সীতার জন্ম। পিতা বিবাহের সময়ে উর্মিলাকে—“আমাব দ্বিতীয় কন্যা” আর সীতাকে—“একে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে পবিচয় দিয়ে থাকি”—বলে সভাতে উপস্থিত করেছিলেন, সীতা তখন বালিকা হলেও তফাৎটা তাঁর কানে লেগেছিল। এজন্যই কি বামচন্দ্র সীতা সর্বসমক্ষে অগ্নিপর্বীক্ষায় সফল হবার পবেও নিন্দুরকের কথায় কান দিয়ে পাঁচমাস গর্ভবতী পত্নীকে বিনাদোষে বনবাসে দিলেন, এবং জীবনে কখনও খোঁজ নিলেন না গর্ভস্থ শিশুর জন্ম হলো কিনা? ইক্ষ্বাকু বংশের আসন্ন সন্তান ধবাধামে অবতীর্ণ হলো কিনা? তবে কি শ্রীবাম চাননি যে সীতার গর্ভে ইক্ষ্বাকুবংশের ধাবা বঞ্চিত হোক? সীতা নিজে যে কোন গর্ভে জাতা, তাইই যখন ঠিক নেই। একাকিনী বনে বসে বসে সীতার আজকাল এইসব কথা মনে হয়। অযোধ্যা থেকে চলে এসে ভালোই হয়েছে। বসুমতীর কন্যা, মানে পৃথিবীর সন্তান, প্রকৃতির কন্যা। প্রকৃতির সন্তান তিনি, প্রকৃতিতেই ফিবেছেন। দশবথ কিংবা জনকের মর্মবিশিষ্ট স্বর্ণখচিত রাজপ্রাসাদ তাঁর নয়। এই তরুচ্ছায়া, এই পুষ্পবন, এই নদীতট, এখানেই সীতার প্রকৃত ঠাই।

—“এই যে, মা, এ দ্যাখো রাজার অবস্থা। ধুকছে।”

সীতা চেয়ে দেখলেন।

সীতা চেয়ে বইলেন।

বল্লভে মুগ্ধিত শ্রীচ বামচন্দ্র লতাগুল্মের মাঝখানে পড়ে আছেন। বর্মহীন, মুকুটহীন, অস্ত্রহীন, মদিতচক্ষু, অসহায়। ব্যাকুল হয়ে সীতা বললেন, “যাও যাও লবকুশ, কলসী ভরে জল আনো, এফুনি এঁব শুশ্রূষা কবা দবকাব। ইনিই অযোধ্যাপতি শ্রীবামচন্দ্র।” বলতে বলতে সীতা অশ্রু সংবরণ করতে পাবলেন না। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই বর্মণীয় উদ্যান। চন্দন অণ্ডক মধুক পাবিজাত লোদ্র কদম্ব কী না ছিল সেখানে। যেন জগতের সব ফুল, সব ফল, সকল ভ্রমর গুঞ্জন আর বিহঙ্গকাকলিতে উজ্জ্বল বিমুক্ত সেই উদ্যানের দীঘিটির জল ছিল কাজলকৃষ্ণ। তাইই

মণিময় সোপানে তরুণী সীতা একদা যুবক রামের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। অদূবে কুমুমস্তীর্ণ তৃণভূমিতে হবিণ-হবিণী ক্রীড়াবত ছিল। এই ভূমিতলে মূহিত অর্ধবৃদ্ধ বাজপুরুষটি তখন তকণ প্রেমিক। ইন্দ্র যেমন শচীব ওষ্ঠে সোমরস তুলে দেন, বামচন্দ্রও সীতাব হাত ধবে তেমনি যত্নে মৈবেষ মদ্য পান কবিয়েছিলেন। পানোন্মত্তা কিন্নরীবা অঙ্গরীবা নৃত্যগীতাদিব দ্বাবা তাঁদের নন্দিত করেছিল। তার পবেই সীতাব গর্ভলক্ষণ ধবা পড়ে। সেই আনন্দ চূড়ান্ত। সেই আনন্দ শেষ। সীতা বন্ধলে চক্ষু মার্জনা করলেন। বামেব দেওয়া চন্দ্রকান্তমণিব হার দিয়ে তিনি স্নেহভবে হনুমানকে আশীর্বাদ কবেছিলেন স্মরীব অনুমতি নিয়ে। সীতা দেখেছেন, অচৈতন্য হনুমানের কণ্ঠে আজও সেই মণিমালাটি শোভা পাচ্ছে। স্মরী শ্রীবাম সীতাকে বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু সন্তান হনুমান তাঁকে মনে বেখেছে। সেও যে প্রকৃতিব সন্তান, পবন আব অঞ্জনাব প্রণয়ের ফসল। সে তো সামাজিক মনুষ্য নয় বামেব মতন। আব হনুমানও মহাবল, মহাবীৰ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধবিগ্রহে আনন্দ পান না। তিনি নিজেই অনায়াসে সীতাকে উদ্ধার কবে এনে বামবাবণেব যুদ্ধটা প্রায় বন্ধই কবে ফেলেছিলেন। কাব্যেব ইতিহাস উলটে যাচ্ছিল আবেকটু হলেই। ফলমূলভোজী হনুমানকে সীতা সতি সন্তানস্নেহ কবেন। তিনি জানেন বীৰ হনুমান মৃত্যুহীন, জাম্ববানও তাই। তাই তাঁদের অচৈতন্য দেখেও সীতা ততটা বিচলিত হননি। তিনি এও শুনেছেন বান্দীকিব মুখে যে স্নায় পত্রের কাছে বামেব পবাজয় বিধিব লিখন। সেই লিখনই ফলেছে আজ। স্মরী নির্ঘাত চিনে নিয়েছেন লবকুশ তাঁবই ঔবসজাত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আব কেউ নেই যে বামচন্দ্রের চৈতন্যহরণ কবতে পাবে। এসব জানেন বলে সীতা এদিকে নিশ্চিত, তবু হিন্দুপত্নীব কর্তব্যবিধি অনুযায়ী তিনি উদ্বিগ্ন ইত্যাদি হচ্ছেন। আজ বহুবৎসব পবে তাঁব অভ্যস্তবে যেন গুড়গুড় শব্দ কবে একটি যুগযুগান্তের সৃণ্ড আগ্নেয়গিবি ক্রমশ জেগে উঠছে। মনে মনে সীতা অনুভব কবতে পাবছেন আসন্ন ভূমিকম্প।

না, লবকুশ নয়। জাম্ববান আব হনুমান বিশাল জলভাণ্ডে বয়ে আনলেন। লবকুশ তাঁদের পিছনে পিছনে হাসাহাসি কবতে কবতে আসছেন। তপস্বিনী সীতাকে বামচন্দ্রের শিয়বে দেখে জাম্ববান, হনুমান পুনরায় আভূমি প্রণিপাত কবলেন। অশ্রুচক্ক কণ্ঠে তাঁবা বললেন—“মা, তোমাকে এবাব ঘবে ফিবতেই হবে।” অনেক অশ্রুপাতেব মধ্যে, অনেক অনুনয়েব মধ্যে বামেব অঙ্গে জলসিঞ্চনের কয়টি সময়ে চলেতে লাগলো। যথাকালে বামচন্দ্র উঠে বসে লবকুশকে দেখে বললেন—“আমি কোথায়?” উত্তবে শুনলেন—“আপনি মহামুনি বান্দীকিব আশ্রমে বন্দী।” বাম এবাব স্পষ্ট নেত্রে চেয়ে দেখলেন বীরবান নবদুর্বাদলশ্যাম কিশোরদুটিব দিকে। যমজ ভাই দুটি, বালক রামেব হুবহু প্রতিমূর্তি। রাম সবই বুঝলেন। আবামের দীর্ঘশ্বাস পড়লো তাঁব। আঃ। যাক। যজ্ঞাশ্রম তাহলে ঠিক মানুষেব কাছেই এসে পৌছেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে বাধাব প্রশ্ন নেই, ইক্ষুকুবংশের বাজকুমাবেব হাতেই অশ্ব ধরা পড়েছে। বাম বললেন—“বাছারা, তোমাদের বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তোমাবা আশ্রমবাসী বালক কিশোবমাত্র, দুজনে মিলে

ক'দিনের মধ্যে শেষ করেছে। ছিযান্নর অক্ষৌহিণী সৈন্য—কোটি কোটি হস্তী অশ্ববথ—এবং ইক্ষ্বাকুবংশের চাবজন রাজা আজ তোমাদেব সঙ্গে যুদ্ধে পবাস্ত। তিনজন নিহত। তোমাদেব ভাগ্যবান পিতাব নামটি আমি শুনতে চাই।” সীতা ইতিমধ্যে কখন সবে গিয়েছেন বৃক্ষবাজিৰ অস্ত্রবালে।

হেসে লবকুশ বললেন—“আমাদের পিতাব নামে আপনাব কাজ নেই, ববং নিজের ইষ্টদেবের নাম কবন, আপনাকে আজ কেউ বক্ষা কবতে পাবতো না। কেবলমাত্র মাতৃবাকা অনতিক্রমা, তাই মাযেব আদেশে আমবা আপনাব প্রাণ ফিবিয়ে এনেছি। এবং আপনাব সাগবেদদেবও ছেড়ে দিয়েছি। যত বাজোব জাম্বুবান-হনুমান্দেব নিয়ে আপনাব সেনাদল, এমন তো বাবা জগ্নে দেখিনি, কেবল বামাযণ গানেই যা শুনছি। হায় হায়, এই নাকি ইক্ষ্বাকুবংশের বাবদু? ঘোড়া ছাড়াতে যেই আসছে, সেই হেবে যাচ্ছে? আমবা বাব নই। আপনাবাই অক্ষম।”—বামচন্দ্র অবাক হয়ে পুত্রদেব কথা শুনছিলেন। ঠিক যেন কিশোব বয়সেব ভবত শত্রুগ্নদেব কণ্ঠ। নির্বাসিতা অপাপবিদ্ধা সীতাৰ জনা তাঁব প্রচণ্ড মন কেমন কবে উঠল। বাজ্যশাসন কী প্রচণ্ড কঠোব কর্ম। জেনেশুনে পাঁচমাসেব অস্তঃসত্ৰা স্ত্রীকে তিনি পবিত্যাগ কবেছেন, মুখ ফুটে বিদায়টুকু পর্যন্ত নেননি। দেননি কোন কৈফিয়ৎ। অবিকল স্বর্ণসীতা গড়ে দিয়েছেন বন্ধুবব বিশ্বকর্মা (একটা কথা বামকে ভাবায়—বিশ্বকর্মা কেমন কবে যে জানলেন সীতাৰ বামবক্ষেব তিলটিব কথাও, তা বাম আজও বোবোন না।) তাবই দিকে চেয়ে-চেয়ে এতবছর তো কেটে গেল। দ্বিতীয়া বমণী তাঁব জীবনে আসতে দেননি। তবু, বাম এত বৎসবেব অদর্শনে সীতাৰ জনা আকুল হয়ে পড়লেন। হনুমান জাম্বুবান ইতিমধ্যে পুনবায় জল আনতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে শ্রীবামচন্দ্রকে উজ্জীবিত দেখে উল্লাসে আত্মহাবা হয়ে বৃক্ষশাখায় উঠে তা থেকে পুনঃ পুনঃ লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তে লাগলেন হনুমান। আব জাম্বুবান আনন্দেব বেগে আশ্রমেব একটি মৌচাক ভেঙে মধুপান কবে ফেললেন। মৌমাছিবা ক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্দিকে ছুটলো। তাবা সম্মুখবর্তী বামকেই আক্রমণ কবতে দলবদ্ধ হয়ে উড়ে আসছে দেখে সীতা আব লুকিয়ে থাকতে পাবলেন না। ছুটে এসে তিনি মিষ্ট-কঠোব ভাষায় মৌমাছিদেব শাসন কবলেন। মৌমাছিবা আশ্রমবাসিনী সীতাৰ পোষা। তাবা ফিবে গেল। শ্রীরামচন্দ্র চমকে উঠলেন। দেখলেন মধ্য সূর্যেব মতো পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে সীতাৰ যৌবন। বাম সীতাৰ জনা অস্ত্রবে অস্ত্রবে কামনা অনুভব কবলেন। তাঁব চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হলো। তিনি দৃষ্টি আনত কবলেন। সীতাই এগিয়ে এসে প্রণাম কবে বললেন—

—“প্রভু, একটা ভালো বোধ কবছেন তো?” মৰীয়া হয়ে জাম্বুবান-হনুমান সমস্তবে বলতে লাগলেন—“প্রভু! আব নয়, ঢেব হয়েছে। পবেব কথায় কান দেবেন না, এবার সীতা মা জননীকে ঘবে নিয়ে চলুন। আপনাব এই দুই অমিতবিক্রম পুত্র, ইক্ষ্বাকুবংশের সর্বোত্তম দুটি সন্তানকে নিয়ে তিনি আব কতকাল আশ্রমবাসিনী হয়ে থাকবেন বন্ধল পরিধান কবে, ফলমূল ভোজন কবে? প্রভু, বথ, অশ্ব সবই

তো গেছে। ববং আমরা গিয়ে অযোধ্যানগরী থেকে নতুন সুসজ্জিত রথ, অশ্ব আনছি, আপনাবা সপরিবারে ফিবে চলুন। আপনি আমাদের কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই তো এমন মহান বিভ্রান্তি মধ্যে চলে গিয়েছিলেন, এবাবে বন্ধুদেব সংবাকো কর্ণপাত করুন প্রভু। নিন্দুকেব মন্দবাকো নয়। সীতামায়েব জনাই আমবা সবাই আজ এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়েছি। সীতামায়েব কর্ণগার কথা কে না জানে। বনেব মৌমাছি পর্যন্ত তাঁব বশ। কেবল আপনিই কেন যে—”

চকিতেই সচেতন হয়ে বাম বললেন—“তোমরা কি পাগল হয়েছো? ভবত, শত্রুয়, লক্ষ্মণ আজ মৃত। আমি একা ফিববো অযোধ্যাপুরীতে? তাও সীতা এবং আপন পুত্রদেব নিয়ে? দেখে মনে হবে কী? না না। আমি ওসব পাববো না। আমি এখনই অদবে সবযনদীতে প্রাণ বিসর্জন দেবো। তোমবা ববং সীতাব পুত্রদেব নিয়ে যাবে তো নিয়ে যাও। আমার আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ, অযোধ্যাব মূল সিংহাসনে বসিও না যেন। ভবত, শত্রুয়, লক্ষ্মণ সকলেবই তো দুটি কবে পুত্র আছে, ভবতই যুবরাজ। ভবতেব পুত্রবা অযোধ্যা বসুক। এদেব অন্য কোথাও, কোশল-টোশলে—”

সীতা এই সময়ে পাগল নীতল কণ্ঠে বললেন—“থাক, মহারাজ। আমার পুত্রবা এখনও আশ্রমেব পাঠই শেষ কবেনি। তাবা এখনই রাজ্যপাটে বসবে না। আপনি, হনুমান ও জাম্ববান গান কবে আসুন, অন্য মিষ্টাদি ভোজন কবে বিশ্রাম করুন। তাবপর যদি সত্যী হই, তাহলে আমার এই স্পর্শেই দেবব লক্ষ্মণ, শত্রুয়, ভবত সৈন্যে পুনর্জীবিত হবেন। আপনাব শোকের কারণ নেই। তবে ততক্ষণে বাল্মীকিকে এসে পড়তে দিন, একসঙ্গে এত অক্ষৌহিনী সেনা জীবিত হলে কী হবে, সেটা আশ্রমাধিপতি স্যং না এলে ঠিক কবা যাবে না।” বলে দ্বাবপদে সীতা চলে গেলেন। বামচন্দ্র নিঃশব্দে সেই হংসগামিনীব গমনপথের দিকে চেয়ে বইলেন। স্বর্গসীতা যে কত মিথ্যা সাধুনা, তাঁব কাছে সে সত্য প্রকট হয়ে উঠলো। তিনি আবো টেব পেলেন, এ সীতা সোনাব নয়, লোহাব। সীতা আব মাটির মানষী নেই।

বাল্মীকি বললেন “বামচন্দ্র, আপনাব সেনাপতিবা এবং ভ্রাতা শত্রুয় তো সৈন্য সামন্ত বথ অশ্ব সমেত অযোধ্যা বওনা হলেন কিন্তু লক্ষ্মণদেব যে সীতাকে না নিয়ে আশ্রম ছেড়ে গেতে রাজী নন? তিনি সীতাব পদতলে মূর্ছিত হয়ে ‘মা, মা’ বলে অশ্রুবিসর্জন কবছেন।”

বামচন্দ্র বললেন “বেশ, তবে আপনিই বলুন, সীতাকে কি নিয়ে যাবো? লক্ষ্মণ তো চিরকালই একগুয়ে। এতদিন বনবাস করাব পব। সীতাকে ফেব রাজপুরীতে নিয়ে গেলে সেই তো আবাব প্রজাবা গণ্ডগোল করবে। আপনি মশাই সবই তো বোঝান স্যাব। নইলে আমার কি ভালো লাগে নিঃসঙ্গ বাজপ্রাসাদে একাকী স্বর্গসীতাটি নিবীক্ষণ কবে দিবাবজনী নির্বাহ করতে। সীতাকে কি আমি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিযেছিলাম? সেই সমস্যা তো আজও আছে।”

বাল্মীকি বললেন—“হনুমান, জাম্ববানও সীতার পদতলের ভূমিতে সলাঙ্গুল প্রলস্টি হয়ে ওই একই আবজি পেশ কবছেন।” রাম বললেন—“কি আশ্চর্য। আমাবই পার্শ্বদৃশ্য আমাকে একবার অনুমতিপ্রার্থনা কবলে না?” বাল্মীকি বললেন—“কিন্তু ভবত? তিনিও যে অনড় হয়ে বৃক্ষতলে বসে আছেন. লবকৃশকে কেলে নিয়ে। সীতাকে না নিয়ে তিনিও অযোধ্যায় যাবেন না। এখন আমি কী কবি? সামান্য কবি মাত্র. আমি রাজা-রাজডাব কী ব্যবস্থা কবতে পারি? আপনিই ববং চলুন, আপনি বামবাজ্যেব প্রতিষ্ঠাতা, আপনাব রাজ্যে কেউ বিধবা হয় না, কেউ সন্তানহারা হয় না, আপনাব ক্ষমতাই আলাদা। দেখুন কী কববেন। সতীত্বভেজে সীতাই আপনাব হস্তীঅশ্বসৈন্যসামগ্র প্রত্যেকের এবং তিন ভ্রাতাব প্রাণ ফিবিযে দিয়েছেন। অযোধ্যাপূর্বাব মানুষ সেটা মানবে বৈকি। কৃতজ্ঞতা নেই?” শ্রীবামচন্দ্র দীর্ঘকাল চিন্তা কবলেন। তাবপব উঠে ধীব পায়ে সীতার সমীপে উপস্থিত হয়ে গঞ্জিব গলায় বললেন—“সীতা, তবে চলো। লবকৃশকে নিয়ে তোমাব স্বস্থানে ফিবে চলো। তুমি রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজবানী। এই আশ্রম তোমাব স্থান নয়। ইক্ষ্বাকুবংশধবদের যোগা স্থানেই তারা এবাব মানুষ হোক। চলো সীতা, স্বগৃহে চলো।”—

তড়াক কবে লক্ষিযে উঠলেন হনুমান, জাম্ববান। ভবত বৃক্ষতলে নড়ে বসলেন। লক্ষ্মণ সীতার পদতল ছাড়লেন না। সীতা স্তব্ধ হয়ে বইলেন। নতমুখে পাযের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন। তাবপব বললেন—“পিতা বাল্মীকি। মহাবাজ বামচন্দ্রেব উদাব আত্মানেব জন্য আমি কৃতার্থ। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন আপনাব কিঞ্চিং সেবাশ্রুশ্রাব প্রয়োজন। এতদিন আমাকে কন্যাবং প্রতিপালন কবলেন, আমাব সন্তান জন্ম, সন্তান পালন সবই আপনাব কৃপায় সম্ভব হয়েছে। এখন আপনাকে পরিচাণ কবে রাজভোগেব আশায় আমি চলে যাবো না। মহারাজ বামচন্দ্রকে বলুন—তিনি বরং লবকৃশকে নিয়ে যান। এই আশ্রম সতিই তাদেব মতো ক্ষত্রিয়শিশুর স্থান নয়। তারা বড় অস্ত্র ভালোবাসে।”

বাল্মীকি বলে উঠলেন—“সেকি কথা, সীতা মা? স্বামীগৃহে যাবে, সেটাই তো স্ত্রীব ধর্ম? বৃদ্ধ পিতাকে সকল কন্যাই তাগ করে যেতে বাধ্য হয়। ও নিয়ে ভেবো না, আমাব বাবোশো শিষ্যই আমাকে দেখবে। তুমি বামেব সঙ্গে যাও। আমাব তাই ইচ্ছা।”

কিছুক্ষণ চূপ কবে থেকে সীতা বললেন—“পিতা। স্বামী আমাকে ভালোবেসে তো ফিবিযে নিতে আসেননি। তিনি যাদেব সতি ভালোবাসেন, তাঁদের চাপে পড়ে এই কথা বলছেন। আপনি আমাকে ওঁব সঙ্গে যেতে বলবেন না। ভবত, লক্ষ্মণ, হনুমানদের ইচ্ছাব কাছে হাব মেনে ওঁর এই আমন্ত্রণ. তাও কি আপনি টেব পাচ্ছেন না? এতে ওঁর নিজস্ব সায় নেই।”

বাল্মীকি বললেন—“কারণ যাই হোক, মুখে যখন বলেছেন তখন সেইটাই সব। তুমি মা, স্বামীর সঙ্গে যাও। এখনও তোমার উজ্জ্বল মধ্যযৌবন, জীবন অনেক

বাকি। কেন মা বৃথা এখানে কুচ্ছসাধনে কাটাবে, তুমি রাজাব দুলালী!”

সীতাব চক্ষে একঝলক অগ্নিশূলিঙ্গ জ্বললো। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তাফলের মতো চকচকে গালে একবিন্দু অশ্রুও গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন—“রাজাব দুলালীরা কি তপস্কেব ঘব কবে? পিতা, আমাব স্মামী প্রবঞ্চনা কবে আমাকে গৃহহাব করেছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে মালঞ্চব মধুর মলয়ে (পিতা, এই বাকাটি ক্ষমা করবেন) সপ্রণয়ে কোলে বসিয়ে তিনি প্রশ্ন কবেছিলেন, ‘সীতে, তোমাব কী খেতে ইচ্ছে কবে?’ আমি বলেছিলাম—‘আমাব এখানকাব কোন কিছু খাদ্যেরই অভিলায় নেই। সেইসব বনবাসেব দিনেব জন্য আমাব মন কেমন কবে। ছায়াঘন শান্ত কুটিব, সেই মনিপত্নীদেব স্নেহ. সেই সুমিষ্ট ফলমূল. শীতল নিববিণীব অমৃতজল—আশ্রমেব দিনগুলিকে আবেকবাব স্পর্শ কবতে ইচ্ছে কবে’.—স্মামী সন্মোহে বলেছিলেন. ‘তাই হবে।’ সেই সাধেব সুযোগ নিয়ে পবদিন সুমন্ত্র আব দেবব লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আমাব স্মামী আমাকে একবস্ত্রে বনবাসে পাঠালেন। নিজে সঙ্গে তো এলেনই না বাজকার্কেব দোহাই দিয়ে, বাজসভাব ব্যাঘাত হবে এই দোহাই দিয়ে আমাকে বিদায় পর্যন্ত নিতে দিলেন না। বাজ্যেব নিন্দুকদেব সভায় ডেকে এনে দিনেব পব দিন আপন ধর্মপত্নীব নামে মিথ্যানিন্দা যিনি সোৎসাহে শ্রবণ কবেন, এবং সেই মতে জনপ্রিয়তাব লোভে নির্দোষেব শাস্তি বিধান কবেন. সেই স্মামীব ঘব কবতে আপনি আমাকে বলবেন না।

“জনপ্রিয়তাব লালসায় শ্রীবামচন্দ্রের ধর্মাধর্মজ্ঞান ছিল না। তিনি বিনা অপবাধে আমাকে প্রবঞ্চনাপূর্বক অযোধ্যাপূবী থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। আমাব গর্ভে তাঁব সন্তান ছিল. সেকথা জেনেশুনেই। এমন স্মামীব ঘব কবতে আপনি আমাকে বলবেন না। অগ্নিপবীক্ষায় উত্তীর্ণ পত্নীকে যিনি স্মহিমায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত কবতে পারেন না, ববং ভীকব ন্যায় নির্বাসন দিয়ে মন্দজনেব নিন্দাবাক্যকেই জয়ী কবেন. সেই দুর্বল. প্রবঞ্চক. অসাধু প্রেমিকেব অনবস্ত্র আশ্রয় আমাব আব আকাঙ্ক্ষিত নয়। পিতা. আমাকে আপনি মার্জনা ককন। লবকুশ যাক. নিজেবা পুত্রেব অধিকাব বুঝে নিক। আমি আশীর্বাদ কবছি ইক্ষুকুবংশ চিবজীবী হোক। ভ্রাতা ভবত. লক্ষ্মণ. পুত্র হনুমান. জানুবান. আমাকে তোমাবা ক্ষমা কবো। বাজপ্রাসাদ নয়. আশ্রমেব এই সাত্ত্বিক জীবনই আমাব পছন্দ। আমি বসুমতীব সন্তান. এই আকাশ-বাতাস. তৃণভূমি-তরুমলেই আমাব জন্ম. এই সীতাব স্বস্থান।”

সীতা বামচন্দ্রেব সঙ্গে একটিও বাকাবিনিময় কবলেন না।

অযোধ্যাপূবীতে পৌছেও বামচন্দ্রেব কান অপমানে বন্ধবর্ণ হয়ে বইল। মাকে ছেড়ে লবকুশও আসেনি। তবে বান্দীকি কথা দিয়েছেন. অশ্বমেধেব যজ্ঞ যখন হবে. তখন সপুত্রক সীতাকে নিশ্চয় আনবেন। বামচন্দ্র বুঝলেন ঘরে তাঁব স্বগীতা. আব আশ্রমে আছেন এক মর্মব সীতা. যাকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ানো যাবে না।



প্রবঞ্চক, তঞ্চক, জনপ্রিয়তা-লোলুপ, অধার্মিক, দুর্বল চবিত্র, নির্দয়, কী না বলেছেন সীতা সেদিন বামচন্দ্রকে। এক বাবণ ভিন্ন বামচন্দ্র জীবনে কাবো কাছে সমাদব ভিন্ন গালি পাননি। সেই বাবণকে তিনি হত্যা করেছিলেন। সবংশে নিধন করেছিলেন। সীতার জন্য নয়, সূর্যবংশের নামবক্ষাব জন্য। প্রেম যখন প্রতিহিংসায় পরিণত হয় তখন তাব চেহারা অতি বীভৎস। অপমানিত হয়ে বামচন্দ্র কৃদ্ধদ্বাব কক্ষে দু'তিনজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাব সঙ্গে গোপনতম আলোচনায় বসলেন। লক্ষ্মণ ভবত শত্রু পৰ্যন্ত ঘৃণাক্ষরে টেব পেলেন না।

যজ্ঞকাল উপস্থিত। দেশসুদ্ধ মনিষায়িব সঙ্গে বাল্মীকিও এলেন, সঙ্গে সীতাদেবী নেই। দুপাশে বীণায়ন্ত্র হাতে লবকুশ। বামচন্দ্র বললেন—“কই, সীতাকে তো আনলেন না।” বাল্মীকি বললেন—“সীতা এসেছেন, তিনি সভায়ূলে আসেননি। প্রয়োজনমতো যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হবেন। স্বর্ণসীতা নয়, এবাব সত্য সীতাকে নিয়েই আপনাব যজ্ঞকর্ম সম্ভব হবে। কিন্তু যজ্ঞান্তে তিনি আমাব সঙ্গে ফিবে যাবেন, লবকুশকে আপনাব কাছে বেখে। এই শর্তেই তাঁকে আসতে বাজি কবিয়েছি।”

বামচন্দ্র বললেন—“সীতাকে একবাটি সভায় আনবেন না? এই যে আমাব পাশে স্বর্ণসিংহাসন চিবকালই শূন্য বইল, সীতা একবা ব তাতে উপবেশন কবে অযোধ্যাব রাজসভা উজ্জ্বল কবেন না? লবকুশ যখন বামাষণ গাইবে, অন্তত তখন সীতা ববং সভায় এসে বসুন।” বাল্মীকি সম্মত হলেন।

সীতা সভায় প্রবেশ করলেন, যেন বাজগৃহে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো। সভাব আলো শতগুণ দীপ্ত হয়ে উঠলো। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ দাঁড়িয়ে উঠে আপনিই সীতাব বন্দনগান গাইতে শুরু কবলেন। অস্ত্রপুৰীকাবা ছুটে বেবিযে এলেন সীতাসন্দর্শনে। কৈকেয়ীবা চোখে দরবিগলিত অশ্রুধাবা। বামচন্দ্র স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র যেমন শচীব হাত ধবে স্বর্গেব সিংহাসনে বসান, তেমনি সীতাকে তাব পাশে সোনাব সিংহাসনে বসালেন। সীতাব পবনে বাজবেশ নয়—আশ্রমবাসিনীব পট্টবস্ত্র। মুখে সৌম্য স্মিত হাসি, চোখে অসীম করুণা। যেন জগত্ত্রিবিধী। লবকুশ সাতদিন ধবে বামাষণ গান কবলেন, প্রতিদিন সীতা এসে বামচন্দ্রেব পাশে নিঃশব্দে বসলেন। শেষদিনে বেশ সহজ সুবে বামচন্দ্র বললেন—“সীতে, আমাব প্রজ্ঞাবা বলছে যজ্ঞেব পুণ্যকর্মে তোমাকে গ্রহণ কবাব আগে দয়া কবে যদি আব একবা অগ্নিপবীক্ষাটা দিয়ে নাও—এতবছর তুমি একা একা বনেব মধ্যে ছিলে”—এই ভীষণ বাকা শ্রবণে অস্ত্রপুৰ থেকে ছুটে এলেন কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী—“পুত্র। তুমি কি উন্মাদ হয়েছ?”

ছুটে এলেন ইক্ষ্বাকুকুলেব বধবা, কন্যাবা, সখীবা, দাসীরা—

বাজমাতা কৌশল্যা গজ্জীব স্ববে বললেন—“এ অপমান অসম্ভব। এ পবীক্ষাব প্রশ্ন ওঠে না। এতে বাল্মীকি মনিবও অপমান। তিনি কন্যা-স্নেহে সীতাকে বক্ষা

কবেছেন। প্রমাণস্বরূপ বামের হৃদয় প্রতিমূর্তি দুই পুত্রও যদি যথেষ্ট না হয়—অতঃপর অশ্বহস্তী সৈন্যসামান্য এবং সর্বোপরি ভবত শত্রুয় লক্ষ্মণ যে পুনর্জীবন লাভ কবে আজ অযোধ্যাপ্রবাসে ফিবেছে, তাও কি প্রমাণ নয়? পুত্র বামচন্দ্র, তুমি কি আজ সহজ যুক্তিও বিস্মৃত হয়েছ? ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম এসকল জ্ঞানে তোমার তুল্য কেউ নেই—তুমি স্থির হয়ে চিন্তা করো, কী ভয়ানক কথা এইমাত্র উচ্চারণ কবলে।”

বামচন্দ্র অধীর কণ্ঠে বলেন—“মাতা, আপনি অন্তঃপুরে যান। যা বোঝেন না তা নিয়ে বৃথা বাক্যব্যয় করবেন না। এ হলো রাজকার্য্য, এ রাজনীতির কূটচাল। জননী, আপনার বোধগম্য হবে না। আমার অনুবোধ, আপনি কিছু বলবেন না রাজকার্য্য পবিচালনা বিষয়ে। আমাকে মার্জনা করুন।”

জটিল করুণ হাস্যসহকারে কৌশল্যা বললেন—“পুত্র, আমি দেখতে পাচ্ছি অযোধ্যার অন্তকাল সমাগত। যে দেশে স্ত্রী আদব নেই, সে দেশকে দেবতাবা অনাদব করেন। এ শাস্ত্রবাক্য তোমারও জানা।” সীতা ক্রোধে অপমানে কাঁপছিলেন—আকুলকণ্ঠে তিনি বললেন—“পিতা বান্ধাকি, আমাকে আশ্রমে ফিবিযে নিয়ে চলুন—এক মুহূর্তও আমি এই সভাগৃহে থাকবো না—যে অযোধ্যার মানুষ আমাকে এত অবমাননা করেছে, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি সেই অযোধ্যা শ্মশান হয়ে যাবে—যে জনপ্রিয়তার জন্য আজ বাম তাঁব ধর্মপত্নীকে অবমাননা কবলেন, সেই জনতা ইদুরের মতো সবয়ব জলে ঝাপিয়ে মরবে। বামরাজ্য শেষ হয়ে যাবে অযোধ্যাপ্রবী জনশূন্য কবে—আমি যদি প্রকৃতিমাষের সন্তান হই, যদি সন্তী হই—হে মা বসুন্ধরা”—সীতার বাক্য শেষ হলো না।

বামচন্দ্রের বাঁদিকে একটি ক্ষুদ্র বোতাম ছিল। বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বোতামটি টিপে দিলেন, স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতা বসাতলে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপরের মর্মববেদী আবার যেমন-কে-তেমন জুড়ে গেল। সভাস্থ সকলে একবাক্যে চাৎকার কবে উঠলো—“জয় সতীলক্ষ্মী সীতামায়েব জয়। জয় ইক্ষাকুবংশেব জয়।”

বাম মৃদু হাসলেন দু’জন পার্শ্বদেব দিকে তাকিয়ে। তারপবেই বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন—“দে, দে, বসুধা, আমার সীতাকে ফিবিযে দে, নইলে ভোর চাবভাগই আমি জল কবে ফেলবো—একভাগ স্থল আব বাখতে দেব না—”, সভায় বিষম হট্টগোল। কান্নাব বোল শুক হয়ে গেল। ওদিকে স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতাদেবী কিছু টেব পাবার আগেই প্রাসাদনিম্নস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে সরযুব তীর ঘূর্ণ্যমান শ্রোতে মিশে গেলেন।

## অম্বোপাখ্যান

“না, অম্মা, আমাকে মার্জনা করো। আর আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারি না। তুমি ভীষ্মেব কাছেই ফিবে যাও। ভীষ্ম যখন সবলে তোমাদেব হরণ করে নিয়ে গেলেন, কই, তখন তো তোমাব কণ্ঠস্বর শুনি। দিবি তিনবোনে হাত ধবধবি করে জনাকীর্ণ স্নয়ংবসভা পবিত্রাগ করে ভীষ্মেব বথে আবোহণ কবেছিলে। অম্মা, তখন কি আমাব অস্থি হৃদয় তোমার মনে পড়েনি? আমাব চোখেব সামনেই তুমি ভীষ্মের সঙ্গে চলে গিয়েছিলে, অম্মা। কই, সেই সভাস্থলে তো প্রতিবাদ জানাওনি।” শাল্ববাজ অস্থি আঙুলে হাতেব অর্গাভ সহস্রদল পদ্মাটি ছিন্ন করতে করতে কন্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন : —“তখন তো বলোনি, ‘ভীষ্ম—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি শাল্ববাজাব বাগদত্তা বধু?’ বলোনি, কেননা তখন বুঝতে পাবোনি যে বিঘেটা ভীষ্ম নিজে কবছেন না, বিঘে দিচ্ছেন তাঁব অপ্রাপ্তযৌবন ছোটভাই, বিচিত্রবীর্যেব সঙ্গে। বীর্যশূল্লা হতে খুব শখ হয়েছিলো বোধহয়? গায়েব জোবে, সাহস ফলিয়ে, একশো বাজার মাঝখান থেকে একসঙ্গে তিন কন্যাকে যিনি হরণ করে আনতে পারেন সেই মহান দেবব্রতব অঙ্গ স্পর্শ করতে পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিলে। অম্মা, তোমাব কি স্মরণে নেই, যে আমিই একমাত্র বাজা, স্নয়ংবসভা থেকে ভীষ্মের রথেব পশ্চাদ্ধাবন কবেছিলাম, সগর্জনে ‘থামো, ভীষ্ম থামো’, বলে হুক্কার করতে করতে যুদ্ধ দিয়েছিলাম, কিন্তু ভীষ্মেব বাণে আমাব হতভাগ্য সাবধি, আমাব তেজী অশ্বগুলি সবই বিনষ্ট হলো। ভীষ্ম সেদিন কোনো রাজাকেই প্রাণে মাবেননি। আমাকেও না। কিন্তু রথহারা নিকপায় আমি মধ্যপথে থেমে যেতে বাধ্য হই—অম্মা, সেই সংকট মুহূর্তে তুমি কি ভীষ্মকে স্পষ্ট জানাতে পাবতে না, ‘দেবব্রত, আমাকে মুক্তি দিন। ঐ শাল্ববাজ আমাব প্রণয়ী।’ তুমি তা বলোনি অম্মা। তোমাব দৃষ্টি তখন ভীষ্মেব ক্ষাত্রতেজে অন্ধ হবে গিয়েছিল। হতভাগ্য শাল্বব কথা তোমাব মনেও পড়েনি। আমি নিশ্চিত জানি, অম্মা, সেই মুহূর্তে তোমাব হৃদয় মন প্রাণ, এই যৌবনমদমত্ত শরীব, সর্বস্ব ভীষ্মেব প্রতি ধাবিত হয়েছিল। নতুবা স্নয়ংবসভাতেই তো! তুমি বাধা দিতে পাবতে, আপত্তি জানাতে পাবতে। তা তো নয়, বাধা দিয়েছো কখন? না বিবাহসভায়। যখন পাত্রকে দেখলে দুর্বল বিচিত্রবীর্য, তখন শাল্বকে মনে পড়লো। তখন পুরাতন প্রেম পুনর্জাগ্রত হলো। কিশোব বিচিত্রবীর্যের পত্নীত্ব না চেয়ে তুমি বললে, ‘হে ভীষ্ম, আমাকে মুক্তি দাও, আমি শাল্বব কাছে যাই’—উহু, অত সোজা নয়, অম্মা, শাল্ববাজ বালকেব হাতেব মোদক নন যে যখন যেমনভাবে তাঁকে চাইবে, তখনি পাবে।”

এখন অম্মা কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু শাল্ব বললেন, “তাছাড়া লোকেই বা বলবে কি? অন্যপূর্বা কন্যা তুমি, অপবে চুবি কবে নিয়ে গেছে যাকে, তাকে কোনো

ভদ্রলোক কুলবধু করে নিয়ে আসে? আমাদের বাজবংশেব একটা মানসন্মান নেই?”

“কিন্তু, শাল্ল এসব তুমি কী বলছো? আমবা তো ঈশ্ববেব চোখে বিবাহিত. আমি তো গোপনে তোমার সঙ্গে মালাবদল কবেছি। বাবণ ধবে নিয়ে যাবার পবেও বামচন্দ্র কি সীতাকে নিয়ে ঘব কবেননি? শুধু আমবা এখনও সংসাবই পাতিনি, এই যা। এখনও আমাব পিতা কিছুই জানেন না।—তাছাড়া মহান ভীষ্ম যে মিথ্যাভাষী নন, একথা সকলেই মানেন। তুমি তাঁকেই ববং জিজ্ঞেস কবো। আমাদেব তিন ভগ্নীকেই তিনি কন্যাব মতো আচরণে শ্লিষ্ট কবেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাব সঙ্গে বিবাহ দেবেন বলে প্রথম থেকেই তাঁব আচরণ পিতৃসুলভ. কামশূন্য ও স্নেহপূর্ণ ছিল। শাল্ল, তুমি খুব ভুল করছো, আমি তোমাব ছিলাম, তোমাবই।”

অম্মাকে থামিয়ে দিয়ে শাল্ল বললেন,—“সুন্দরী, এ আমি বিশ্বাস কবি না। বৃদ্ধ হলেও যুবাণুরুষেব চেয়েও যৌবনতেজে দৃশু ভীষ্ম যখন তোমাদেব তিন ভগ্নীকে বলপূর্বক হরণ কবেছিলেন, তাঁব স্পর্শে পুরুষেব স্ভাবনিক কামনা ছিল না? এ কখনও সম্ভব? চিব কৌমার্যেব ব্রত এক জিনিস, আব কামনা বাসনা থেকে চিবমুক্ত হওয়া আব এক। তিনি তো বায়ুভুক, বনবাসী, কৃশতনু তপস্বী নন, ক্ষত্রিয়পুরুষই।”

“কিন্তু বিশ্বাস কবো শাল্ল,” অম্মা অস্থির হয়ে বলেন—“আমি তোমারই আছি, তোমাবই আছি। আমি নাবী, সভামধ্যে বাজাদেব সেই তুমুল কলহে আমাব ভয় কবেছিলো। ভীষ্ম যখন বলপ্রয়োগে আমাদেব হরণ কবেন তখন ভয়ে আমাদেব মতিস্থি ছিলো না। পবে শান্ত অবস্থায় প্রথম সুযোগেই আমি ভীষ্মেব কাছে সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি। তাঁব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেছি। উদাব হৃদয় ভীষ্ম তো আমাব ইচ্ছাব উপব বলপ্রয়োগ করেননি? শ্রবণমাত্রই আমাকে সযত্নে তোমাব কাছে পৌছে দিশেছেন।”

শাল্ল কুটিল হাস্য কবলেন।

“সেই যত্নটাব কথাই তো বলছি।”

“ছিঃ, শাল্ল,” অম্মাব ক্রুদ্ধ স্বব ফেটে পডলো—

“নীচবাস্তব ন্যায় বাক্য বোলো না। ভীষ্ম আমাদেব প্রতি নির্লোভ ছিলেন। বলপূর্বক হরণ কবতে হলে যেটুকু বাধ্যকারী অঙ্গস্পর্শ কবা একান্ত আবশ্যক তাঁব অধিক কিছুই তিনি করেননি। আমাকে বিশ্বাস কবো, শাল্ল।”

শাল্ল বললেন, “তোমাকে বিশ্বাস কবা আমাব সাধ্য নয়। তুমি যাও, অম্মা।”

এবাবে অস্থির হয়ে অম্মা বলেন, “শাল্ল, প্রেমিক আমার, সামী আমার, এখন আমাকে পবিত্যাগ কবলে ত্রিভুবনে কোথায় আমার স্থান হবে? পিতা কাশীরাজও আমাকে নেবেন না। আমি তবে আজই, এখনই, ওই নদীজলেই আত্মহত্যা কববো. তোমার সম্মুখে”—

হাহা কবে হেসে শাল্ল বথে উঠলেন। বথেব মুখ ঘূবিয়ে নিয়ে ধীবে ধীবে

বললেন : “তাই যাও, মবো! মবাব অধিক অবমাননা তো তোমাব হয়েইছে। বীৰ্যশূন্য হবাব শখ হয়েছিলো, কেবল হিশেবে মেলেনি। তাই এসেছো। বিচিত্রবীৰ্যকে শালব চেয়ে বীৰ্যবান, উন্নততর পুরুষ বলে মনে ধবেনি। মাত্র এই তো? যদি দেবব্রত নিজেই আজ তোমাকে গ্রহণ কবতেন, তবে তুমি আমাব কাছে ফিবতে না.—অস্ম। তোমাব চোখে আমি স্পষ্ট দেবব্রতব প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছি। তোমাব সর্বান্দে কামাব দেবব্রতব প্রতি মোহাক্ষতা পাতলা ওডনাব মতো জড়িয়ে আছে। সেই মোহ আমাব কাছ থেকে তোমাকে জন্মেব মতো বিচ্ছিন্ন কবে ফেলেছে। তোমাব দেহে মনে চিবদিনেব মতোই দেবব্রতব বাহুবল, তাব ওদার্য, তার স্নেহমমতা, তাব পৌকষ, এক অমোঘ কৃষাশাব মতো, জলজ উদ্ভিদেব মতো লেপ্টে থাকবে। আব কোনেদিনই এই শাল তোমাব চোখে জগতেব শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে প্রতিভাত হবে না। জগতেব একমাত্র কাম্য পুরুষ তো হবেই না। এমন অবস্থায় আমি তোমাকে আব গ্রহণ কবতে পাবি না, অস্ম। তোমাকে বলপূর্বক স্পর্শ কবে, তোমাকে হবণ করে, তোমাব শবীবেব কৌমার্য যদিও ভীষ্ম নষ্ট কবেননি কিন্তু তোমাব মনেব সেই একনিষ্ঠতা বিনষ্ট কবে দিয়েছেন—এতে আমাব সংশয় নেই। অস্ম, তুমি আমাব নয়নেব সামনে থেকে দব হও। তোমাকে দেখলেই আমাব প্রতিটি বোমকূপে অপমান আব অভিমান দাবাগ্নিব মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমাকে দগ্ধ কবছে। আমাব পৌকষ, আমাব প্রেম, সবকিছুকে মিথ্যা কবে দিয়েছে দেবব্রতব স্পর্শ—তুমি তা কোনেদিনই ভুলতে পাববে না। তুমি চিবকাল আমাদেব দুজনকে তুলনা কববে, আব মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ভীষ্ম কেন তোমাকে গ্রহণ কবলেন না, এই ভেবে।—সেই জীবন আমাব পক্ষে দুঃসহ—তুমি যাও, তুমি এক্ষুনি চলে যাও, আমি তোমাকে সহ্য কবতে পাবছি না। তুমি বামচন্দ্রেব কথা তুলেছিলে, তিনিই তো সীতাকে বলেছিলেন না— ‘নেত্রবোগীব সম্মুখে দীপশিখাব মতো তুমি আমাব ভীষ্ম নেত্রপীডাব কাণ ২চ্ছে’—আমিও তোমাকে তাই বলছি, অস্ম। বিদায় হও, আব কদাচ আমাব ধাবেকাছে এসো না, বাঁচো কিন্তু মবো। আমাব কাছে তুমি মৃতই—যেদিন ভীষ্ম তোমাকে অপহবণ কবেছেন সেইদিন থেকেই আমি জানি অস্মাব মবণ হয়েছে। হীন প্রেতায়া হয়ে তুমি আমাব ওপবে আব উপদ্রব কোবো না”—বলতে বলতে শাল তাঁব বথ ছুটিয়ে দিলেন।

অস্ম আব অশ্রু সংববণ কবতে পাবলেন না—দ্রুত ছুটে গেলেন নদীতীরে। ঝাপ দেবাব জন্য দুহাত আকাশে তুলে, সচ্ছ জলে নিজেব ছায়া দেখতে পেলেন। অনিন্দ্যাসুন্দরী অস্ম নিজেব অভিমানিনী কপদর্শনে নিজেই বিমোহিতা হলেন। আত্মহননে তাঁব মায়া হলো। এত কপ, এত যৌবন, এই প্রাণ—শালব মতো নিষ্ঠুর, ভীক, প্রেমহীন, ঈর্ষক, অবিশ্বাসী, আত্মবিশ্বাসশূন্য পুরুষেব জন্য কেন তিনি বিসর্জন দিতে যাবেন? অস্ম নদীতীরেব বৃক্ষছায়াব বসলেন। একটু শান্ত হয়ে ভাবা দবকাব।

সদ্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। সজীব শ্যামল বনানীব বর্ষণসিক্ত গন্ধটি অস্মাব নাকে এলো।

চারিদিকে কচি সবুজের মেলা, ভিজে মাটির স্পর্শেও জননী পৃথিবীর মমতাব ছোঁয়া। ভবা নদী টলটল কবছে কুলেকুলে, যেন যৌবনগর্বিতা নাবী। অঙ্গাব আবাব নিজেব কথা মনে পড়লো। না, কক্ষনো না। শাল্লব জন্য আত্মহননের প্রশ্ন নেই। কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া? কী কবা? বর্ষাব বনের একটা নেশা আছে, চাবদিক থেকে প্রকৃতি যেন জীবনের ফাঁদ পেতেছে আজ অঙ্গাকেই ধববাব জনো। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়েছে, আকাশে মেঘ-ছেঁড়া চাঁদ উকি দিয়েছে। অঙ্গা বসেই থাকেন।

ভাবতে ভাবতে বাত্ৰি গহন হলো। এই সময়ে সেখানে কয়েকজন যক্ষ যক্ষিণী জলকেলি কবতে এলেন। তাঁদের উচ্ছল জলকেলি, তাঁদের লজ্জাহীন প্রণয়লীলা দেখে অঙ্গাব মনের দুঃখ দ্বিগুণিত হলো। তিনি ফুঁপিয়ে কেন্দে ফেললেন।

কান্নাব শব্দ শুনে বিচলিত হয়ে যক্ষ ও যক্ষিণীবা লীলা বন্ধ কবে তীব্রে উঠে এসে খুঁজে দেখলেন। দেখেন এক পবমাসুন্দরী কন্যা একাকিনী বৃক্ষতলে বসে বসে অঝোবে বোদন কবছেন। যক্ষিণীবা তাঁকে স্নেহভাবে সাত্বনা দিতে এলে, অঙ্গা অকপটে তাঁদের সব কথা খুলে বললেন। যক্ষিণীবা মন দিয়ে শুনে বললেন, “অঙ্গা, এখন নিবিষ্ট মনে, শান্ত হয়ে ভেবে দ্যাখো তো সত্যি সত্যিই তুমি কাকে চাও? শাল্লব প্রতি তুমি এখনও কি অনুরক্ত, নাকি ভীষ্মকেই চাও? যদি শাল্লবকে চাও, তাহলে কিন্তু আমরা মায়া প্রয়োগে তাব মন বদল কবে দিতে পাৰি। দেবো কি? ভেবে বলো।”

অঙ্গা তখন কঠোরভাবে চিন্তা কবতে শুরু কবলেন। শাল্লব কঠিন বাক্যগুলি, যা তাঁকে বিষাক্ত তীব্র মতো বিদ্ধ কবেছিলো, অঙ্গাব মনে মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। অঙ্গা মনকে শুদ্ধ কবে, শান্ত কবে, নিবপেক্ষ কবে চিন্তা কবলেন, কাকে তিনি চান।

যে-শাল্লবকে তিনি একদা একান্তে কায়মনোবাক্যে ভালোবেসেছিলেন এবং আত্মসম্প্রদান করেছিলেন যাঁব কাছে পিতা কালীবাজেব অজ্ঞাতসাবে, সেই অখণ্ড আত্মনিবেদনের মনোভাব কি তাঁর এখনও আছে? এত তীব্র অবমাননাব পবেও? এই নির্দয় অমানুষিক প্রত্যাখ্যানের পবেও? যে-হবণে অঙ্গাব কোনো অংশই ছিল না, যে-হবণকে বাধা দিতে পারেননি স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত মহাবল বাজন্যবৃন্দও, সেই হবণেব জন্য শাল্লব অঙ্গাকেই দোষী কবছেন। ভীষ্মব কাছে সত্য কথা বলে, তাঁর কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়ে অঙ্গা যে ছুটে ফিরে এসেছেন শাল্লব কাছে, সেই গভীর প্রণয়েব সত্যকে শাল্লব বিশ্বাসই করলেন না। ভীষ্মেব প্রতি তাঁব তীব্র অসূয়া—ভীষ্মের তুল্য শৌর্য শাল্লব নেই, নাইবা থাকলো। শৌর্যবীর্য দেখেই কি শাল্লবকে ভালোবেসেছিলেন অঙ্গা? কিন্তু শাল্লব তাঁর প্রেমের সম্মান দিলেন না। এই দুর্বলচিত্ত, যে প্রেয়সী নারীকে অপমান করে, অর্থাৎ আত্মাবমাননাকারী, আত্মবিশ্বাসহীন, পৌরুষহীন, প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন রিক্ত মানুষটিকে অঙ্গা আগে কোনোদিনই দেখেননি।

এই শাল্লকে তিনি চেনেন না। একে ভালোবাসাও সম্ভব নয়, সম্মান করাও না, এব সঙ্গে ঘর-সংসার পাতা অসম্ভব। না, অগ্নি আব শাল্লকে ফিবে চান না।

অগ্নি জানুব ওপাবে চিবুক বেখে ভাবতে ভাবতে বাত্ৰি প্রভাত কবে ফেলেন। উষাকালে যক্ষ-যক্ষিণীবা বলে গেলেন,—“আর্য্য দেখা হবে, সখি, আজ পূর্ণিমাবাত্ৰি। পুনবায় নৈশ জলকেলি হবে। অগ্নি, আজই তুমি কিস্তি মনস্থি কবে ফেলো।” যক্ষবা বললেন, “কৈদো না, সুন্দরী, তোমাব মনোবাসনা পূর্ণ হবে।” বলে যক্ষ-যক্ষিণীবা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই বাত্রে নিঃসঙ্গ, নিবন, নিবসু, বিনিদ্র, অগ্নি বৃক্ষতলে বসে বসেই শাল্লব কথা ভাবা বন্ধ কবলেন। না, শাল্ল নয়। আব শাল্লকে চাই না অগ্নাব, এই যুবকের তাঁব হৃদযেশ্বর হবাব যোগাতা নেই। কখনও যে ছিল—সেটা ভেবেই অগ্নাব আশ্চর্য লাগে। এই পুরুষই তাঁব প্রাণাধিক ছিল? একেই তিনি স্মিত্তে বরণ কবেছিলেন? এবই জন্য তিনি প্রাণত্যাগেও প্রস্তুত ছিলেন? কলত্যাগ তো সামান্য কথা। অগ্নি অবা ক হয়ে যান। মানুষ মানুষকে এত অল্ল চেনে? অগ্নিকেও যেমন শাল্ল বিন্দুমাত্র চিনতে পাবেননি এতকাল বিভ্রান্ত হয়ে অবিচার কবেছেন—অগ্নিও তো তেমনি শাল্লকে বিন্দুমাত্র চিনতে পাবেননি, এতকাল? বিভ্রান্ত হয়ে আত্মনিবেদন কবেছেন। মনস্থি কবে ফেলে অগ্নি আঁচল সামলে উঠে বসলেন। নদীকূলের শীতল বাতাসে বুকভাবে নিশ্বাস নিলেন, জলে নেমে অঞ্জলি ভবে জলপান কবলেন, স্নান সারলেন, বনে ইতস্তত বিচরণ কবে মিষ্ট ফল আহরণ কবে ক্ষুধা নিবারণ কবলেন। ঈশ্বর চতুর্দিকে তাঁব সৃষ্ট জীবদেব জন্য কত সুবাস্থ্য কবে বেখেছেন, আব অগ্নাব একটা যবস্থ্য হবে না? ঈশ্বর কবণাময়। অগ্নি যদি শাল্লব প্রতি অবিশ্বস্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে জীবনও তাঁকে নিশ্চয় সুবিচার দেবে। মনেব চবম দুর্যোগ মিলিয়ে এল, শান্তি পেলেন অগ্নি।

এবাব ভাবতে বসলেন, কর্তব্য কী? বাত্রে যক্ষ যক্ষিণীগণ এলে তাঁদেব বলবেন, “না। শাল্লকে চাই না।” কিস্তি ভীষ্ম? ভীষ্মকে কি তাঁব চাই? যক্ষ যক্ষিণীবা সেই বিষয়ে কিছুই বলেননি কিস্তি। অগ্নি ভীষ্মব শাস্ত মুখচ্ছবি, তাঁব উদাব বিশাল বক্ষপট, দীর্ঘবাহু দুটিব বলিষ্ঠতা স্রবণ কবছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁব অঙ্গে গাট বোমাধ হলে। অগ্নি গোপনে লজ্জা পেলেন। এবং বুঝলেন, প্রণয়ী শাল্ল হয়তো ভুল বলেননি, সত্যিই মনেব গহনে ভীষ্মেব প্রতি তাঁব কোনো দুর্বলতা জন্ম নিয়েছে। ভীষ্মেব তুলা বীব তিনি সত্যিই দেখেননি। কিস্তি ভীষ্মেব তুলা নির্লোভ, নিদ্রাম, প্রায়-সন্ন্যাসী পুরুষও তাঁব এই অদীর্ঘ জীবনকালে চোখে পড়েনি। তিন বোনকে বলপূর্বক হরণ কবলেও তাঁব কবস্পর্শে কামগন্ধ ছিল না। চোখে লোভ ছিল না, বাক্যে নিষ্ঠুরতা ছিল না। তাঁব আচরণে শিষ্ট মমতাব সঙ্গে বাজন্যসুলভ মর্যাদা আব পবিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁব নাবীত্বকে তিনি সম্মান কবেছেন, কিস্তি কামনা কবেননি। কনিষ্ঠ ভ্রাতাব বধূদেব প্রতি জ্যেষ্ঠেব যেমন আচরণ করা কর্তব্য সেইমতো আচরণই তিনি করেছেন,

আব যেই মুহূর্তে অঙ্গা তাঁকে শাল্লর কথা প্রকাশ কবে বলেছেন, সেই মুহূর্তেই ভীষ্ম সম্মেহ হাস্য বলেছেন—“বাজকন্যা, তুমি মুক্ত, তোমাব কাঙ্ক্ষিত পতির সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখী জীবন যাপন করো।” ভীষ্মই স্বয়ং তাকে বথ দিয়ে শাল্লের বাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়েছেন. যাতে পথে কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে তাঁর।

ভীষ্মের আচরণে প্রণয় ছিল না, নারীপুরুষের মধ্যে যে বিশেষ এক ধবনের অদৃশ্য টানাপোড়েন তৈরি হয় চোখে-চোখে, কথায়-কথায়, লঘু স্পর্শে. স্নায়ুতে. শিবাতে, ত্বকে, প্রকৃতি আপনাআপনি যে একটা অদৃশ্য সূত্র বুনতে থাকে—ভীষ্মের সঙ্গে তাও ঘটেনি। ভীষ্ম ছিলেন একেবারেই জিতেন্দ্রিয়। বাসনাশূন্য। অঙ্গাব জন্য তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়নি। অঙ্গাব দেবীতুলা কপও তাঁকে স্পর্শ করেনি। ভাবতে ভাবতে অঙ্গাব মনে মনে অভিমান জমতে শুরু কবে। অঙ্গাব অভিমান ক্রমশ গোপন কামনায় পবিণত হয়। তাব শরীবের শিবা ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ে দপ-দপ কবে জ্বলতে থাকে। অঙ্গা বুঝতে পাবেন যুবতী নারী হিসেবেই তিনি পুরুষ ভীষ্মের বিশেষ মনোযোগ কামনা করেন, তাঁব স্পর্শদ্বারা চিহ্নিত হতে চান। এই ব্রহ্মচারীর দার্শনিক ব্রহ্মচর্য না মোচন কবলে যেন অঙ্গাবই নারীত্বের চরম অপমান। ভীষ্মের উদাসীনতা অঙ্গাব উত্তাল যৌবনের উদ্ধত অসম্মান। অঙ্গাব মনে হলো ভীষ্মের কামমোহিত দৃষ্টি না পেলে তাঁব এই দুর্লভ সৌন্দর্য ব্যর্থ। যে কোনো উপায়ে ভীষ্মকে জয় কবতে তিনি মবীয়া হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী অঙ্গা স্পষ্ট বুঝতে পাবলেন তাঁব দেহমন আব শাল্লরাজের প্রতি নিবেদিত নয়। ভীষ্মকেই তিনি চান। দেহে. মনে. আত্মায় তিনি এখন ভীষ্মের সঙ্গে মিলনে ব্যাকুল। এ জীবন, এ যৌবন তাঁব অর্থহীন. মিথ্যা হয়ে যাবে, যদি তিনি ভীষ্মকে প্রেমিক হিসেবে না পান।

ভীষ্মের কপবান, বীর্যবান. শান্তিদীপ্ত মহৎ বাজমূর্তি তাব চোখে ভাসতে লাগলো। সভামধ্যে তিন ভগ্নীকে হবণ কবাব মুহূর্তের সেই তীব্র দৃশ্য চেহারা, আব অঙ্গাকে প্রতাপর্ণ করাব সময়ের স্নিগ্ধ. মায়াময় কপ. দুইই তাঁকে সমানভাবে প্রলুব্ধ কবতে লাগলো।

অঙ্গা ভীষ্মের প্রণয়কামনায় অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা হলো। পূর্ণচন্দ্র উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ যক্ষিণীবা জলে নামলেন। অঙ্গা করজোড়ে সকাতবে তাঁদের কাছে জানালেন : “—শাল্ল নয়, আমি ভীষ্মেই প্রণয়কাঙ্ক্ষিণী। হে অমব বন্ধুবৃন্দ, আপনাবা দয়া কবে ভীষ্মকে বাজী কবান।”

এক মুহূর্তের জন্য কি চন্দ্র তাঁব জ্যোৎস্না সংবরণ কবলেন? ভরা নদীও কি তাঁব স্রোত শুষ্ক কবলেন? যক্ষ যক্ষিণীব প্রণয়কলরোল স্থগিত হলো। একমুহূর্ত মাত্র। তারপবেই যক্ষ স্ফূণাকর্ণ বলে উঠলেন, “—ভাবিনী, আমাদের ক্ষমা করো। তোমার এই অনুবোধ বক্ষা কবা আমাদেব ক্ষমতার বাইরে। গঙ্গাপুত্র দেবব্রত এক ভীষণ ব্রহ্মচার্যের ব্রতধারী—তাকে কোনো অঙ্গবা, কোনো দেবীও টলাতে পাববেন না, তুমি তো মানবীমাত্র। মহাত্মা ভীষ্মের প্রণয় শুধু সত্যের সঙ্গে. তাঁব পিতাব



জন্য তিনি এক বিষম ব্রহ্মচর্যের শপথে স্বেচ্ছাবন্দী। তাঁর জীবনে কোনো নারীর স্থান হবে না। তুমি অন্য যে-কোনো পুরুষকে প্রার্থনা করো। বলো অঙ্গা, তুমি কাকে চাও। যাকে চাইবে, তাকেই আমবা এনে দেবো, কেননা জগতে কেউই মানুষী দুর্বলতার বাইবে নন। শুধু ভীষ্মই মল্ল। ভীষ্মকে প্রার্থনা করো না।”

অঙ্গা দুই হাতে দুই কান চেপে ধরে চোঁচিয়ে উঠলেন, “আপনারা দয়া করে তরু হোন, আমি আব কাউকেই চাই না—শুধু ভীষ্ম, আমি চাই ভীষ্মেবই প্রণয়—আপনারা যদি না পাবেন, আমি নিজেই যাবো তাঁর কাছে। তাঁর পায়ে ধরে প্রণয়ভিক্ষা করবো—তিনি ভিখারিনীকে তো বিমুখ করতে পাবেন না।”

স্বণাকর্ণ শাস্ত্রসবে আবাব বললেন—“মানিনী, মান করো না। আমবা তোমাব সুহৃদ, তোমাব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই এই কথা বলছি—যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন প্রয়োজন বোধ করো, এই বৃক্ষের নিচে এসে ‘স্বণাকর্ণ’ বলে আমাকে ডেকো,—আহ্বান করলেই আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসবো। কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ আমাদের সাধ্য নয়, তোমাবও সাধ্য হবে না। বৃথা চেষ্টা না করে তুমি ববং আমাদের কথা শোনো। ভাবতে এত বখী মহাবখী আছেন, যে-কোনো একজনকে প্রার্থনা করো, আমবা এনে দিচ্ছি।”

অঙ্গা কষ্ট হয়ে বললেন, “—থাক। আমি নিজে যাবো বলেছি, নিজেই যাচ্ছি।” বলে তিনি দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। অবগেব বৃক্ষবাজিৰ পাতাস পাতায় দীর্ঘশ্বাস বেজে উঠলো। অঙ্গাব কানে তা পৌছোল না। অরণ্য তাঁব পায়ে লতাগুল্মা জড়িয়ে দিয়ে অঙ্গাব পথ আটকাতে চেষ্টা করলো, অঙ্গা সে-সঙ্কেত বুঝতে পাবলেন না। অবগ্য তখন নিষ্ঠুরভাবে অঙ্গাব পায়ে কাঁটা বিধিয়ে দিয়ে তাঁকে থামাতে চাইলো, যাতে মনোকষ্ট থেকে তাঁকে বাঁচানো যায়, যাতে জন্মজন্মান্তরেব যন্ত্রণা থেকে তাঁকে বক্ষা করা যায়। কিন্তু অঙ্গা বন্ধানে পাবেই ছুটে চললেন। যে স্বেচ্ছায় দুঃখের পথ বেছে নেয় তাকে কি যক্ষবক্ষ অবগাপ্রকৃতি কেউ বক্ষা করতে পাবে? অঙ্গা নিজেব দুর্ভাগ্য নিজেব হাতে গড়ে নিলেন।

বাত্রি গহন। সব কাজ সেবে, প্রাসাদের মল্ল অঙ্গনে বৃদ্ধ অশ্বথের বেদীমূলে ভীষ্ম আছিকেব জন্য সবে বসেছেন, এইবাব শয্যাগ্রহণেব প্রস্তুতি। এমন সময়ে অঙ্গা ছুটে এলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁব চন্দ্রাননে উদ্ভাসিত, বেদীমল্ল দীর্ঘ কেশবাশি এবং আকুল উতল স্বর্ণাঞ্চল বাত্রিব বাতাসে উডছে, বাসি স্থলপদ্মেব মতো গোলাপী তাঁব গাল, অশোকপুষ্পেব মতো বল্লিম ওষ্ঠাধব অল্প বিস্ফাবিত, তাঁব দুই চক্ষু ভীষ্মেব দিকে, যেন দুটি মধুপানবত স্থিব ভ্রমব। সেই জ্যোৎস্নাবিশুব অঙ্গনে, দক্ষিণী বাতাসে, একটি ভাসমান ভোরের স্পর্শেব মতো, অলৌকিক দৈবদৃশ্যেব মতো, প্রণয়বাঁকুল অঙ্গা এসে ভীষ্মেব পদস্পর্শ করে চবণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁব চোখ নিবদ্ধ বইলো ভীষ্মেব চোখেব দিকে।

মহাবল ভীষ্মের বৃকের মধ্যে উষ্ণ শোণিত ছলাৎ করে আছড়ে পড়লো, বিশাল সিন্ধুতীরে যেমন লবণাক্ত ফেনিল কল্লোল। এক পলকের জন্য বুঝি তাঁব নাড়ীর গতি বন্ধ হলো, তাঁব কানে সহস্র ভ্রমরের গুঞ্জন ঝিমঝিম কবে উঠলো, কানে, চোখে, গালে, এক গুড় অভূতপূর্ব উষ্ণতা অনুভূত হলো, যেন জ্বলন্ত বোধ করে। ভীষ্ম আহ্নিকের চেষ্টা বন্ধ করলেন।

আকাশ থেকে গ্রহনক্ষত্রেরাই কেবল দেখলেন, কেমনভাবে ভীষ্ম অঙ্গাব মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

দৃজনের হ্রিৎ চোখে বুঝি কয়েকটি জন্ম কেটে গেল। কেউ কোনো কথা বললেন না! অঙ্গাই শেষে বন্ধকণ্ঠে ডাকলেন—“প্রভু!”

ভীষ্ম নীরব।

“প্রভু, আমাকে গ্রহণ কবে ধন্য করুন।”

ভীষ্ম নির্বাক।

“প্রভু, জন্মজন্মান্তরেও আমি আব অন্য কারুবই হবো না, আপনি কৃপা করে আমাকে গ্রহণ কবে দীনাকে কৃতকৃতার্থ করুন, প্রভু।”

ভীষ্ম নিঃশব্দ।

“প্রভু? অন্তত মাত্র একটিবাবের জন্যও আমাকে গ্রহণ কবে আমার নবীজন্ম সার্থক করুন প্রভু। মাত্র একবাব?”

এবার ভীষ্মের অধবোষ্ঠ কেঁপে উঠলো। সবলে নিজেই সংবৃত্ত কবে তিনি বললেন—“ওঠো নাবী, যা অসম্ভব তা প্রার্থনা কোবো না। শাল্লকে পবিত্যাগ কবে আমার কাছে কেন এলে?”

“কেননা আমি আব শাল্লব প্রতি শ্রদ্ধা বাখতে পাবিনি। তিনি অসূয়াপববশ হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা সন্দেহ প্রকাশ কবে আগায় প্রত্যাখ্যান কবেছেন, তাঁব বিশ্বাস আপনিই আমার কাম্য পূরুষ।”

“তাব সে বিশ্বাস তো ভুল নয়। তুমি যা বলছে। তাতেই তো শাল্লব সন্দেহ প্রমাণিত। হে মুগ্ধা নাবী, তুমি শাল্লকে মিথ্যা অভিযুক্ত কবছো, তিনি সত্য বাক্যই বলেছেন। তুমি তাঁব প্রতি যথার্থ অনুবৃত্ত হলে আমার কাছে এভাবে আসতে না।”

“আমি প্রথমে শাল্লব দ্বাবা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। অপমানিত হবাব পবেই ছুটে এসেছি প্রভু। তাব আগে, কাল সাবাবাত, আজকে সাবাদিন বসে বসে শুধু ভেবেছি, আমি কাকে চাই। শাল্ল যে ব্যবহাব কবলেন তাব পরেও তাঁকে আব তো প্রার্থনা কবা যায় না। তাঁব প্রতি শ্রদ্ধা বাখতে পাবিনি। প্রভু, অন্তরাত্মায় এখন আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমাকে বিমুখ কববেন না। আপনি ফেবালে আমি কোথায় যাবো?”

“কেন? তোমাব তো গৃহ বয়েছে অঙ্গ—চলো, তোমার দুই প্রিয় ভগ্নীব সঙ্গে তুমিও বিচিত্রবীর্যব বানী হবো। যদিও শাল্লব মনোনীত পত্নীব সঙ্গে বিচিত্রবীর্যব

বিবাহ দেওয়া আমার অনুচিত—তবু এখন তোমার অবক্ষণীয় দশা ঘোচাতে সেটাই কবতে আমার আপত্তি নেই।”

—“ওঃ, করুণা? থাক”—ক্রোধে, অভিমানে অঙ্গার মুখভাব পবিবর্তিত হলো। কঠোরস্ববে অঙ্গা বললেন,—“প্রভু! আপনার চোখে কি তবে আমি ভুল দেখেছি? ওই আয়ত দুই চোখ কি ক্ষণেকপূর্বেই আমাকে প্রার্থনা কবেনি? আপনি ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমাকে বলুন—‘না, অঙ্গা, তোমাকে আমি একমুহূর্তের জন্যও কামনা করিনি।’ বলুন?”

ভীষ্ম মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে বইলেন। তাবপবে ধীরে ধীরে বললেন,—“আমার পিতার সূত্রেব জন্য আমি চিব কৌমার্যের ব্রতে অঙ্গীকৃত আছি। অঙ্গা, আমাকে তুমি মার্জনা করো। কোনো নারীকেই গ্রহণ কবাব অধিকার আমার নেই। তুমি সুন্দরী, তুমি মোহময়ী, ক্রোধ ও ক্ষোভ তোমাকে আরো কপকপী কবেছে, হে যুবতী, তোমাকে অবমাননা কবা মোটেই আমার ঈঙ্গিত নয়, কিন্তু যা দেওয়া আমার অসাধ্য তা আমি কেমন কবে দিতে পারি?”

এবাবে অঙ্গা মৃদু বঙ্কিম হাস্য কবে কিঞ্চিৎ বিকৃত, অশ্রু-বদ্ধ কণ্ঠস্ববে বললেন : “জীবন যখন ভিক্ষা দিতে পাবলেন না প্রভু, মরণটা তবে আমিই ছিনিয়ে নোবো। কেউ আমাকে বাধা দিতে পাববে না। জন্ম জন্ম ধবেও আমি কঠোর, কঠোবতম তপস্যা কববো। আমাদের মিলন হবেই, প্রেমে না হোক ঘৃণাতে, জীবনে না হোক, মরণে”—

ভীষ্ম এবাবে এক মধুর, গভীর, বিয়গ্ন হাসি হাসলেন। দক্ষিণহস্ত অঙ্গার দিকে সন্নেহে প্রসাবিত কবে দিয়ে প্রশান্ত স্ববে বললেন,—“তথাস্তু। তাই হোক, অঙ্গা। তোমার কথাই সত্য হোক। শুভাননা, শোনো, তোমাকে সন্তান দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কিন্তু মিলনের ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে। প্রণয়ে যা সম্ভব হলো না, শত্রুভায সেটাই সম্ভব। প্রেমিক হিসেবে তোমার কাছে আজ আত্মনিবেদনে আমি অসমর্থ, অঙ্গা, কিন্তু শত্রু হিসেবে একদিন আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ কববো। জীবনে না পেলোও মরণে তুমি আমাকে তোমার স্ববশে আনতে পাববে। একমাত্র তুমিই, অঙ্গা।”

অঙ্গা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে বইলেন। পবিচ্ছন্ন, বজ্রতগুপ্ত দৈববাণীর মতো ভীষণেব মধুর গভীর স্বব ধ্বনিত হলো সেই শীতল নৈশ বাতাসে : —“অঙ্গা, আমার জীবনে আব কোনো নারী নেই, শুধু তুমি। শুধু তুমিই আমৃত্যু আমার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকবে। এমন কী মৃত্যব সহস্র বৎসব পবেও অঙ্গাব নাম ভীষণেব নামেব সঙ্গে একত্রে উচ্চাবিত হবে। তুমি আমার উত্তরপুরুষদেব মুখে মুখে ঘববে। অঙ্গা, তুমি ভীষ্মকে জয় কবতে চেয়েছিলে, তুমি ভীষ্মকে জয় কববে। আমি তোমার হবো।”

সেই শান্ত স্নিগ্ধ নিশাকাশ বিদীর্ণ কবে অঙ্গা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন—“এ কী হলো প্রভু? এ আমি কী বললাম? এ আমি কী চাইলাম? আমি চেয়েছিলাম আপনার

প্রণয়, চেয়েছিলাম আপনাব সন্তান, আব চেয়ে নিলাম ধ্বংস! বিনষ্টি! মৃত্যু। আমাব কি মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে প্রভু? পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যানের অপমানে আমি কি দানবী হয়ে গেছি?” অন্না এক ছুটে অবণ্যে ফিবে এসে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঝাঁপ দিলেই কি আব মৃত্যু আসে?—এ সময়েই যক্ষ স্ব্ণাকর্ণ তাঁব যক্ষিণীকে নিয়ে চন্দ্রালোকে নদীকূলে বিচরণ কবছিলেন। অঙ্গাকে জল থেকে তুলে আনলেন দুজনে। জল থেকে উঠে এসে বোকদ্যমানা অঙ্গা বললেন—“আমি আব এ জীবন বাখতে চাই না বন্ধু, আমি একটা ভয়ঙ্কর কথা আজ উচ্চারণ কবে ফেলেছি। আব মহামতি ভীষ্ম স্নেহভাবে আমাব সেই কুখ্যাত্তেই সম্মত হয়ে বব দিয়ে ফেলেছেন। এখন আমিই তাঁব মৃত্যুব কাবণ হবো। তাঁব আগেই আমি তাই মৃত্যুবরণ কবতে চাই।”

স্ব্ণাকর্ণ হেসে বললেন—“মৃত্যু তো চাইলেই আসে না, অন্না। কেবল ভীষ্মেব বেলাতেই মৃত্যুও ইচ্ছাব দাস। ভীষ্মেব ইচ্ছামৃত্যু বব আছে। তাঁকে হনন করা তোমাব সাধ্য নয়, যদি না তিনি নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ কবেন। তুমি এ নিয়ে বৃথা দুশ্চিন্তা কোবো না। ভীষ্ম দীর্ঘায়ু হবেন, তিনি স্নেছামৃত্যু বরণ কববেন। তাঁকে হত্যা কবা নশ্বব-অনশ্বব কারুবই সাধ্য নয়।”—

“কিন্তু ভীষ্মেব কথা কি ব্যর্থ হবে?”

যক্ষ স্ব্ণাকর্ণ তখন মুহূর্তেব অন্তর্ধানে ভবিষ্যৎ দেখে নিলেন। তারপব বললেন, —“অন্না, ভীষ্মেব কথা মিথ্যা হবে না। তাঁব স্নেছামৃত্যুতে তুমি হবে নিমিত্তমাত্র। দায় তোমাব নয়। পবজন্মে তুমি হবে দ্রুপদবাজাব কন্যা, কিন্তু কিছুকাল পবেই তুমি পুত্রে পরিণত হবে, এবং কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে ভীষ্মেব নিজস্ব মৃত্যুকামনায় সহায়তা কববে। ঘটনা সবই নিয়ন্ত্রণ কববেন ভীষ্ম স্বয়ং। শত্রু নয়, অন্না, তুমিই হবে ভীষ্মেব শেষ বন্ধু, তিনি যখন মৃত্যুকে পেতে চাইবেন, একমাত্র তোমাব সাহায্যেই তাঁব পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব হবে। তুমিই হবে তাঁব মুক্তি। তাঁব শাস্তি।”

“আব মৃত্যুব পবে? আমবা মিলিত হবো তো? স্বর্গে হোক অথবা নবকে?”

স্ব্ণাকর্ণ হাসলেন—“নবক? ভীষ্মেব প্রাপ্য আছে অক্ষয় স্বর্গবাস। আব ধর্মযুদ্ধে অজ্ঞাঘাতে মৃত্যু তোমাকেও স্বর্গে নিয়ে যাবে। তোমাদেব মিলন নির্ধাবিত আছে অমবাবতীতে, মর্ত্যধামে নয়।”

এইবাবে স্ব্ণাকর্ণেব মুখেব স্মিত হাসিটি অঙ্গার মুখেও প্রতিফলিত হলো। যক্ষ-যক্ষিণী দুজনে আকাশে মিলিয়ে যাবার পবেই তিনি ভবাবর্ষার প্রফুল্ল নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে পাডে এই জন্মটিব অন্ত ঘটালেন পবজন্মকে দ্রুততর করার আকাঙ্ক্ষায়।

স্থান. কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধেব দশম দিন। অর্জুনেব বথ তীব্রগতিতে ধাবিত হচ্ছে ভীষ্মেব বথেব দিকে, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী ধনুর্বাণ হস্তে অর্জুনেব ঠিক সামনে। পিতামহ ভীষ্ম এবং অর্জুন দ্বৈবথে পবস্পরেব সম্মুখীন। বৃদ্ধ ভীষ্মেব সঙ্গে তরুণ শিখণ্ডীর দৃষ্টিব

মিলন হলো। ভীষ্ম মৃদু হাস্য কবলেন। শিখণ্ডী চোখে কি অশ্রু? অর্জুন দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধনুকে শবসংযোজন কবলেন। শিখণ্ডী পবপব নয়টি বাণ ছুঁড়লেন ভীষ্মের বক্ষ লক্ষ কবে। নয়টিই বিদ্ধ হলো।

অর্জুনের শবাঘাতে বথ থেকে পতিত হতে হতে ভীষ্ম তাঁব অস্থিহীন দক্ষিণহস্ত ববাভয়মুদায় শূন্যে অল্প তুললেন। মুখে প্রশান্ত স্মিতহাসি।

আঃ সস্তি। আঃ মুক্তি। স্বজনহননের চবম যন্ত্রণাব শান্তি। সুদীর্ঘ দায়বহনের পবিসমাপ্তি।

বাত্রি গভীর হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম শবশয্যায় একাকী শয়ান। তাঁব তত্ত্ব ললাটে শীতল কবম্পর্শ কবে মৃদঙ্গবে কেউ ডাকলেন,—“প্রভু?”

ভীষ্ম বললেন, “এসেছো? এসো।”

“আব কত দেবি, প্রভু?”

‘শুধু সূর্যের উত্তবায়ণের অপেক্ষা।’

আগন্তুক নিঃশব্দে ভীষ্মের হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। চমকে উঠলেন ভীষ্ম।

“এ কী? তুমি আব পুরুষ নও?”

“না প্রভু। বন্ধু যুগাকর্ণ তাঁব স্বর্ণ দেওয়া পৌরুষ ফেবৎ নিয়েছেন। কিন্তু আমি সেকথা গোপন বেখেছি প্রভু, শিবিরেও কেউ তা জানে না। এই যুদ্ধে যে আমাকে অন্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে, তবেই না অমবাবতীতে স্থান পাবো আপনাব কাছাকাছি।”

ভীষ্ম অঙ্গাব কোমল হাতে মৃদু চাপ দিলেন। নক্ষত্রের আলোয় তাঁব অধবের তত্ত্ব হাসিটি অঙ্গাব মুগ্ধ চোখ এডালো না। সেই দৃশ্য দেখে স্বর্গের দেবতাবা স্মিত-মধুর হাস্য কবলেন। মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রবন্দ আলোকবষ্টি কবে আনন্দ প্রকাশ কবলেন।

আব অন্ধকারের অন্তবালে সূর্যদেব উত্তবায়ণে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হলেন।

## অভিজ্ঞানদুশ্মন্তম্

দুশ্মন্ত বাবান্দায় এসে দাঁডালেন। চাঁদেব আলোয় যেন ধূষে যাচ্ছে দিকবিদিক। আকাশ মাটি মিশে একাকার। চমৎকার। ‘উদাসী-বিদেশী-স্বর্গহে আবাসী’ জাতীয় মুখ কবে মহাবাজ বাবান্দাব বেলিং-এ ভব দিলেন। চোখ ছড়িয়ে দিলেন দিগন্তে। এই ক্ষুদ্র

ঝাবোকাটি সবচেয়ে উপবেব মহলে। এই মহলে কোনো স্ত্রীলোক থাকে না। দুগ্ধস্বেব বয়স্য বিদুষকের মহল এটা। ঝাবোকা থেকে অন্তত হংসপদিকাব গানটা শোনা যাবে না। উঃ। প্রাণ খালি কবে ছেড়ে দিলে? কী এনার্জি, কী গলার রেনজ।—যেখানেই দাঁড়ান না কেন, হংসপদিকার প্যানপ্যাননি থেকে বেহাই নেই। ঠিক শুনতে পাবেন।

একা কি হংসপদিকাটি? দুগ্ধস্বেব একটিই মাত্র দোষ। একটু বেশি বেশি প্রেমে পড়েন। বড্ড বোম্যান্টিক স্ভাব। আব কপেব প্রতি শিল্পীসুলভ মোহ। দুগ্ধস্বেব প্রাসাদে আব কোনো মহল বাকি নেই। কোনো মহলে আব কোনো কামবা বাকি নেই, যা তাঁব একজন না একজন পবিত্যন্ত পত্নীতে ভবা নয়। এই কাবণেই সেবাবে বিদুষক পবামর্শ দিয়েছেন, “এবাব থেকে মহাবাজেব যা করবাব বাড়িব বাইবেই কববেন, বাইবেই বেখে আসবেন। বাড়িতে স্থানসঙ্কুলান হচ্ছে না। আবেকটি প্রাসাদ প্রস্তুত কবা দবকাব। ততদিন অলমিতি বিস্তবেণ।” তাই, যখন কণ্ঠমুনিব আশ্রমে সেই নির্বোধ মাতৃপিতৃপবিচয়হীন কপসী কন্যাটিব সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি কবে ফেললেন, বিদুষক শব্দ হাতে তাঁকে পথপ্রদর্শন কবে বাড়ি ফিবিয়ে এনেছিলেন। সেই কন্যা ছাড়াই তিনি প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এসেই প্রচার কবেছেন তাঁব পাঞ্জছাপেব অঙ্গুরীয়টি মুগযায় গিয়ে হবিয়েছে। কেউ খুঁজে পেলে শতমুদ্রা পুবস্কাব। ঘোষণা শুনে কেবল মহাবানী চন্দ্রাবতী চোঁট টিপে একটু হেসেছিলেন। চন্দ্রাবতী তাঁব বডবানী, পাটবানী, প্রথমা পত্নী।

দশবৎসরকাল চন্দ্রাবতী একলা থাকেন। কেননা, বাজা অপুত্রক বলে, প্রায়ই বিবাহ কবেন। নিত্য নবীন শয্যাসঙ্গিনীব খোঁজে তাঁব প্রাণে শান্তি নেই, হৃদযজ্বালাও আব মেটে না। চন্দ্রাবতীব এতেই আপত্তি। সেবাব কণ্ঠমুনিব আশ্রমে কী ঝামেলাটাই না বেধেছিল। কে ভেবেছিল কণ্ঠমুনিব স্ভাব এত আধুনিক? বালিকাব গর্ভসপ্ধাব যদি হয়েও থাকে, তাব ফলে তাকে আত্মহত্যায উদ্ধত না কবে, অথবা বনেই আশু বানপ্রস্থ গ্রহণেব সুপরামর্শ না দিয়ে, তিনি যে দুই ছোকবাকে সঙ্গে দিয়ে তাকে বাজসভায় পাঠিয়ে দেবেন, তা কে কল্পনা করতে পেবেছিল? বাজসভায় এসে আসন্নপ্রসবা গাভীর মতো নির্ভরশীল দুই চোখ মেলে সেই মেয়ে তাঁব দিকে তাকাছিল। স্ফীতোদবা, শীর্ণ, নীবল্ল হাত-পা, বনবালাদেব অনভাস্ত হাতেব গ্রাম্য প্রসাধনেব ফলে বাজসভায় তাকে দেখাছিল হাস্যকর। অতি কষ্টে হাস্য সন্দবণ কবে ধমক দিয়ে তাদেব বাজসভা থেকে বহিস্কাব করে দিয়েছিলেন সেদিন দুগ্ধস্তু, চিনতে-না-পারাব ভান কবে। মেয়েটা জংলী, সবলভাবে ভাবল অঙ্গুরীয় হবিয়ে ফেলেছে বলেই তাকে বাজা চিনতে পাবেছেন না। কোনো অভিযোগ না কবেই ফিবে গেল।

সবাই অবিশ্যি অমন হয় না। সেই যে মৎসজীবীদেব মেয়েটি তেড়ে এসেছিল তাব পাডাব সবকটা ষণ্ডাণ্ডা ছেলেকে নিয়ে—তাকে তো ঘবে রেখে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বাজা দুগ্ধস্তু। সে মেয়েও এখন হংসপদিকাব মতো গান করে, আব

মাছ ধবাব জাল বোনে। পব পব দুটি মৃত শিশুর জন্ম দিয়ে তার কিঞ্চিৎ মাথাব গোলমাল হয়েছে। বাঁচা গেছে।

দুগ্ধস্তেব এখন মন খাবাপ। মন খাবাপ বাজনটী কপবতী লোলাপাঙ্গীৰ জন্য। লোলাপাঙ্গীৰ মা অতি চতুৰা! সে কিছুতেই মেয়েকে বাজাব খপ্পবে পড়তে দিচ্ছে না। মেয়ে আবার খুব মাতৃভক্ত। দুগ্ধস্তেব মনে লোলাপাঙ্গীৰ প্রতি আনলিমিটেড প্রেমের সঞ্চাব হয়েছে। যুবতীটি যেমন কাপে, তেমনি গুণেও তুলনাইনা। ভালো নাচে, ভালো গায়, ভালো বীণা বাজায়, শাস্ত্র নিয়ে তর্ক কবতে পাবে, কাব্য নিয়ে আলোচনা কবতে পাবে, আব এইসব নাবীবাই তো শোনা যায় বাৎসায়নের শাস্ত্রেও সুদক্ষ। হবে থাকে। কিন্তু হায়, সেই বিসয়টাই আব দুগ্ধস্তেব জানা হচ্ছে না, লোলাপাঙ্গীৰ মায়েব চতুৰ বিলসঞ্চাবেব ফলে। এই চবাচববিস্তৃত বজতচন্দ্রালোকে দুগ্ধস্তেব প্রাণে লোলাপাঙ্গী-বিবহ প্রবল হয়ে উঠল, তিনি প্রাসাদশিখব থেকে নেমে চললেন সাবথি অশ্রমেধেব খোঁজে। পথেই দেখা বিদুষকেব সঙ্গে। এ মহলটা তাঁবই। বিদুষক বললেন —“লোলাপাঙ্গীৰ ভাবনা ত্যাগ ককুন মহাবাজ। ওব মা ওকে বিবাহেব জন্য প্রস্তুত কবছে, অতি চতুৰ মহিলা, আপনি ওদেব জানেন না। নটীদেব জাতটাই আলাদা।” দুগ্ধস্তেব অহঙ্কাবে আবেকটু ঘা লাগলো। কী? আমি ওদেব জানি না? কেন, ওবা আমাব প্রজা নয়? তাঁব জেদ চড়ে গেল।

একদিন লোলাপাঙ্গী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁব বাতায়নে, দেখলেন একটি পবমাসুন্দরী আশ্রমবালিকা ক্লাস্তচবণে দুটি তরুণ সূর্যেব মতো সুদর্শন আশ্রমিক যুবাব সঙ্গে অশ্রমোচন কবতে কবতে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। লোলাপাঙ্গী তাদেব তাডাতাডি ডেকে এনে ঘবে বসালেন। ফল-মিষ্টান্ন দিয়ে শীতল জলপান কবতে দিলেন। পাখাব হাওয়া দিয়ে তাদেব পথশ্রম মোচন কবতে বললেন দাসীদেব। তাবপব শুনলেন মেয়েটিব নাম শকুন্তলা, সে কণ্ঠমুনিব মানুষ কবা মেয়ে। প্রকৃতপক্ষে অক্ষরী মেনকাদেবীব কন্যা। লোলাপাঙ্গীৰ মা শলভা নিজেও এই মেনকাবই কন্যা —শকুন্তলা যেমন ঋষি ও অক্ষরীব মিলনেব ফলে জাত, লোলাপাঙ্গীৰ মা তেমনি উজ্জিনিব মহাবাজ এবং মেনকাব সঙ্গমজাত কন্যা। শলভা শকুন্তলাব সহোদবা ভগিনী —অর্থাৎ শকুন্তলা লোলাপাঙ্গীৰ ছোটমাসি। এই পবিচয় আবিষ্কাব কবে, এবং সবলা আশ্রমবালা শকুন্তলাব দুববস্থা দেখে নাগবিকা শলভাব মনে যেমন মায়া-মমতা হলো, তেমনি বাগও হলো বাজাব ওপরে। শলভা বললেন—“বোন, তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কবো। আয়সা দিন নেহী বহেগা। তোমাব স্মরীগহে তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না কবতে পাবলে আমাব নাম শলভা নয়। কুছ ফিকব মত কবো।” এই বলে শকুন্তলাকে নিজেব কাছে বেখে লোলাপাঙ্গীৰ মা শাবদ্রত শার্ঙ্গববকে আশ্রমে ফেবৎ পাঠিয়ে দিলেন। শকুন্তলা যথাসময়ে পবম সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তানেব জন্ম দিলেন শলভাব গৃহে। তাবপব তিনি পুত্রসমেত শকুন্তলাকে গহন বনেব মধ্যে ঋষিদেব কাছে এক

উদ্ধাব-আশ্রমে জমা করে দিয়ে এলেন। শিশু পিতাব নাম বেজিস্তি খাতায় লিখিয়ে এলেন মহাবাজা দুম্ভু। মাঝে মাঝে খবর নিতে যান। শকুন্তলা কেবলই বলেন—“কই দিদি, মহাবাজ তো এখনও এলেন না?” প্রত্যেকবার বাজনটীর মা মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাপ্টা-ঝুমকো-সিঁথি-সাতনবীতে ঝমঝমঝম শব্দ তুলে গেয়ে ওঠেন—“আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা আনেওলা। ইতনা জলদি কিঁউ? বহিন, তুম ঘাবড়াও মৎ—হম তেবা সঙ্গ হায়া। বে-ফিকব হো যাও।”

বসন্তকাল। পিক-ক্জনে দুম্ভু মদনজ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। এমনই এক ঘোব-লাগা বসন্ত প্রভাতে মর্নিং ওয়াকে বেবিয়ে মহাবাজ নটী লোলাপাঙ্গীকে পুষ্পশোভিত উপবনে তৃণশয্যায লীলায়িত ভঙ্গিতে চিঠি লিখতে দেখলেন। বাজা উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তাব কাছে হৃদয় নিবেদন করলেন। কী ভাগ্যি, মা শলভা কাছাকাছি ছিলেন না বলেই বোধহয়, লোলাপাঙ্গীও বাজাব প্রণয়বাক্য গ্রহণ করলেন। মহাবাজাব আহ্বাদ দেখে কে? তিনি সাবধানে আবে খানিকক্ষণ নিবীহ প্রণয়লীলা চালিয়ে তাডাতাড়ি আসল কথাটা পাড়লেন—“সুন্দবি। নিশাকালে আমি তোমাব দর্শন প্রার্থনা করি।” মোহিনী লোলাপাঙ্গীব আজ হয়েছে কী? বসন্তের মধুব বাতাসে তিনিও কি ভুললেন? তিনি যে এ প্রস্তাবেও বাজি। সময় ঠিক হলো, মধ্যাহ্ন। বাজা একা, ছদ্মবেশ ধারণ করে যাবেন, লোলাপাঙ্গীব বাতায়নে টোকা দেবেন, তিনবাব। লোলাপাঙ্গী নিজের শিরোমণিটি বাজার হাতে সমর্পণ করলেন। দাসীব হাতে ওটি দিলেই দাসী দবোজা খুলে দেবে। এবাবে শূন্যে মধুব বিদায়-চুসন ছুঁড়ে দিলেন দুম্ভুকে লোলাপাঙ্গী—এক যবন শ্রেষ্ঠীব কাছে এই বায়বীয় প্রকাশটি শিক্ষা কবেছেন। দুম্ভু মুগ্ধ নয়নে বাজনটীব দিকে চেয়ে কয়েক পা পিছু হটে, অগত্যা প্রাসাদে ফিবে গেলেন আনন্দের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে।

আগ্রহ তাঁব অধীব অতি।

বজনী মধ্যাহ্নমিনী। মহাবাজকে ছদ্মবেশ ধারণ করভেই হবে। কেননা পাডাটা ভালো নয়। বাজনটী হলেও থাকেন তো তিনি নটীদের পল্লীতেই—সেখানে বাতভোব হৈচৈ, আলো। মত্ত নাগবিকের ভিড়, বিদেশী সৈনিক আব শ্রেষ্ঠীদের আনাগোনা, এমন কী ক্ষমতাসীন অমাত্য, বাজপুরুষদেবও অনববতই সে পাডায় যাতায়াত। দুম্ভুকে সবাই চিনে ফেলুক এটা কাম্য নয়। বিদূষকের সাহায্য নিয়ে দুম্ভু অতি যত্নে নিজেকে এক যবন শ্রেষ্ঠীব মতো করে সাজালেন—দর্পণে দাঁড়িয়ে “চমৎকাংব” বলে পিঁঠ চাপড়ালেন নিজেরই। বিদূষক বললেন—“সত্যিই মহাবাজ, চেনা যাচ্ছে না। এখন লোলাপাঙ্গী নিজে চিনতে পাববে তো?” মহারাজ বললেন—“বিদূষক, বয়স হয়ে তোমাব সাধবণ জ্ঞান কি লুপ্ত হয়েছে? লোলাপাঙ্গীব দাসী আমাকে দবজা খুলে দেবে, এবং তাব চেনা নির্ভব করবে আমাব চেহাবাব ওপব নয়—অভিজ্ঞানের ওপব।



এই সেই অভিজ্ঞান।" বলে, মহাবাজ তাঁব বয়সাকে একটি শিবোমগি দেখালেন, বৈদ্যের তৈবি, জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

মাঝরাতে লোলাপাঙ্গীৰ বাতায়নে টোকা মাঝতে গিয়ে মহাবাজ দৃশ্য দেখলেন আগেই বাতায়ন খুলে উকি মাঝে দেহাতী একটি কিশোরী দাসী। অঈর্ষ্য প্রেমিক বললেন—“দোব খোলো গো, দোব খোলো। আমি এসেছি।” দাসী বাজাকে বললে—“তু কোন বে?” উত্তরে মহাবাজ মুঠো খুলে লোলাপাঙ্গীৰ অভিজ্ঞান শিবোমগিটি দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে কী যেন ঘটে গেল। “—ডাকু। ডাকু।। পাকডো। পাকডো।।” বলে চীৎকার কবেই দাসী ঠাশ কবে পাল্লা বন্ধ কবে দিয়েছে—আব অমনি অন্ধকার থেকে দুটো যগাঙা, গুঁফো, নেংটিপবা পাহেলবান বেবিয়ে এসে মহাবাজকে “হেইও” বলে মাটিতে ঠেঁশে ধবেছে—। শুধু কি তাই?—“মাঝ শালাকো। মাঝ শালাকো।” বলে চোঁচিয়ে পাড়া ফাটিয়ে ফেলেছে। একজন তাঁব হাত মুচড়ে বৈদ্যমগিটি কেঁড়ে নিয়েছে, এবং চোঁচাচ্ছে “মিল গিয়া মিল গিয়া একঠো চোবাই মাল মিল গিয়া।” অন্যজন ততক্ষণে বাজামশাইয়ের বুক উঠে বসেছে এবং তাঁব দাড়ি টানতে টানতে পবিষ্কার যবন ভাষায় বলছে—“কী হে বাছান। বেব কবো এবাবে বাকি মালকডি সব? নিকালো যা কুছ লিয়া, আভি নিকালো।” বলতে বলতে জামাব ভেতবে হাত গলিয়ে বাইবে টেনে এনেছে মহাবাজেব বাজচক্রবর্তী বড় উপবীত, যাব কোণে তাঁব অভিজ্ঞান-বাজ-অঙ্গবীয়াটি সমস্তে গ্রস্থিবদ্ধ কবা বয়েছে। হাজাব হোক বাবান্দনাপল্লী তো, ওটি আঙুলে পবিধান কবে প্রকাশ্যে সেখানে যাওয়াটা মহাবাজ শোভন মনে কবেননি। ততক্ষণে বাজকীয় পিঠে বেশ কয়েকটি কিল ঘুমি পড়েছে আব কর্ণকুহবে যা মধুবর্ষণ হচ্ছে তা বলাব নয়, চতুর্দিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়, বাজা দৃশ্য চোখ বুজে মনে মনে সীতাব মতো বলছেন,—“হে ধবণী, দ্বিধা হও।” এমন সময়ে লোলাপাঙ্গীৰ মা পালোয়ানদেব ধমকে উঠলেন—“ওবে বড়বক। কবিস কি, কবিস কি, খোডাবহুং গডবড তো হো গিয়া কুছ—জব্ব। যবনের বুক কেউ কখনো যজ্ঞোপবীত দেখেছিস? আব এ তো বাজ-উপবীত? ইনি নিশ্চয় কোনো ছদ্মবেশী বাজা-বাজডা হবেন—ছি ছি। কা শবম-কি বাত—ছোড দো, ছোড দো, আভি ছোড দো উনকো।”—বলতে বলতে যেই শলভা দৃশ্যস্তেব যবনসাজটি টেনে খুলে ফেলেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই বাজাব পদতলে পড়ে ক্ষমাও চাইতে শুরু কবেছেন—“হে রাম। তৌবা তৌবা। গুড গড। একসকিউজ মি। অপবাধ নেনেন না মহাবাজ। দাসীটি বালিকামাত্র—এবং দেহাতী, মহামহিমাস্থিত মহাবাজকে সে চিনতে পাবেনি। আমাদের অসীম সৌভাগ্য আজ আপনি এসেছেন। দুর্ভাগ্যবশত আজই আমাব ঘবে এক চোবও এসেছিল, এবং সে আমাব বড় পেটিকাটি নিয়ে গেছে। যেহেতু লোলাপাঙ্গীৰ আব আমাব বৈদ্যমগি দুটি জোডামানিক, তাই দাসী ভুল কবেছে—ভেবেছে এটাই বুকি আমাব—” এই সময়ে হস্তদস্ত হয়ে লোলাপাঙ্গী এসে পড়লেন—“চলুন মহাবাজ, গৃহমধ্যে বিশ্রাম নেনেন। ছি ছি, আমি যাবপবনাই লজ্জিত এবং

মর্মান্বিত। আপনি পবিত্রাশ্রম, বিপর্যস্ত, আপনাব গুণশ্রাব প্রয়োজন আছে। এই দাসদাসীদেব বুদ্ধিহীনতাকে আপনি আমাব মুখ চেয়ে মার্জনা করুন। ওদেব কঠোব শাস্তি দেবেন না যেন প্রভু। ওদেব ভুল হয়েছিল।”

আব শাস্তি কে কাকে দেয়। চোবেব দায়ে ধবা পড়ে দুগ্নস্ত তখন চোখে সবর্ষে-ক্ষত দেখছেন। ষণ্ডাণ্ডা লোকদুটি মুহূর্তেই অশপাশেব ভিড হটিয়ে বাস্তা ফাঁকা কবে দিয়েছে যদিও, তবু মহাবাজ লজ্জা বাখবাব জায়গা পাচ্ছেন না। হাঁটতে গিয়ে দেখলেন সোজা কবে পা-ও ফেলতে পাবছেন না। দেহেব চাইতেও মনেই চোটটা লেগেছে বেশি। বাজা লোকজনেব মাঝখানে এত অপমানিত জীবনে কখনো হননি। শলভাব এবং লোলাপাঙ্গীব সেবায় তিনি সকালেব আগেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবং শলভা নিজেব বথে সাবথিকে দিয়ে মহাবাজকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন সূর্যোদয়েব আগেই।

দুগ্নস্ত য়ান কবতে গিয়ে সভয়ে আবিষ্কাব কবলেন, অভিজ্ঞান অঙ্গুবীযটি উপবীতে বাঁধা নেই। সর্বনাশ কবেছে। এখন উপায় কী? তাডাতাডি বিদূষককে পাঠালেন শলভাব গৃহে। দুই থলি স্বর্ণমুদ্রা সমেত। শলভা খুব যত্ন কবেই অতিথি সৎকার কবলেন, তাবপব আলবোলাব ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—“কেয়া আফসোসকি বাত। লেকিন, ইসমে, বিদূষকবাব, ম্যায় তো লাচাব হঁ। হাঁ, আংটি একটা আমি কুডিয়ে পেয়েছি বটে, ঠিকই, কিন্তু ও দিয়ে আমি কীই বা কববো, তাই আমাব ছোট্টো নানহেমুনহে বোনপোটিকে উপহাব দিয়ে দিয়েছি। সে খেলা কববে বলে। আপনি ওব কাছ থেকে চেয়ে নিন। আংটিটা যে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও তো ম্যাঁ সচমুচ নহী সমঝা।”

শুনে বিদূষকেব তো মাথায় হাত। শলভাব কাছ থেকে উদ্ধার-আশ্রমেব ঠিকানা নিয়ে বিদূষক প্রাসাদে ফিবলেন। বাজাব সাবথিকে প্রথমে বললেন বথ প্রস্তুত কবতে। তাবপব দুগ্নস্তকে গিয়ে বললেন,—“এ আমাব একাব কর্ম নয়। আংটি উদ্ধাব কবতে হলে,—মহাবাজ, আপনি নিজেও চলুন। এসব মুনিঋষিবা লোক সুবিধের হয় না। যদি না দিতে চায়?”

বাজা কয়েক থলি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিদূষকেব সঙ্গে আশ্রমেব খোঁজে বের হলেন। বথ বনের গভীবে প্রবিষ্ট হলো। অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয অচিবেই ফেবৎ না পেলে বাজোব যাবতীয় বাজকার্য স্থগিত থাকবে।

আশ্রমেব ঠিকানায় পৌঁছে বিদূষক দেখেন পবমাসুন্দবী এক আশ্রমকন্যা বৃক্ষমূলে বসে আছেন, কোলে একটি বাজচক্রবর্তী শিশু। তারই ক্ষুদ্র মুঠির মধ্যে দুগ্নস্তেব অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয শোভা পাচ্ছে। পদশব্দ পেয়ে কন্যা মুখ তুললেন। বিদূষক দেখলেন, শকুন্তলা।

বাজাকে দেখে শকুন্তলা অবাক হলেন না, তিনি বাজাব আশাতেই বসেছিলেন।

কিন্তু আকস্মিক শকুন্তলাকে দেখে বাজা যাবপবনাই বিস্মিত। তাঁকে চিনতে একটুও দেবি হলো না। এত সুন্দরও মানুষে হয়? আব এই মেয়েকেই কিনা তিনি পবিত্রাগ কবেছিলেন? তাঁকে কি ভূতে ধবেছিল? শকুন্তলা উঠে মহাবাজকে প্রণাম কবলেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে দুম্বন্ত শটে আশীর্বাদ সেবে বললেন—“থাক-থাক। তা, ইয়ে, কি বলে, হ্যাঁ, শকুন্তলা, তুমি আমার অঙ্গুরীয়াটি পেয়েছিলে তো?”

শকুন্তলাব বিশাল দুটি সবল চোখ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো—“আপনি কোন অঙ্গুরীয়েব কথা বলছেন, মহাবাজ?”

“কেন, যেটি আমি শলভাব হাতে বাজপুত্রের জন্য পাঠালাম?”

“এটাও তবে আপনাবই দেওয়া? আমি ভাবলাম দিদিই বুঝি—”

“বোকা মেয়ে।” দুম্বন্ত শকুন্তলাব মাথাটি নেড়ে দিয়ে পবিত্র হেসে বলেন—“তোমার দিদি এটি পাবেন কেমন কবে? আমি নিজে না-দিলে? বাজবংশেব শিলমোহব বলে কথা। ও কি যে-সে আংটি? নাও, ছেলেকে নাও, আংটিটা নাও, বথে ওঠো—বাস। আর কিছু নিতে হবে না”—শকুন্তলা সলজ্জভাবে বললেন—“ঋষিমশাইকে প্রণাম কবে, অনুমতিটা নিয়ে আসি?” বিদূষক বলে ওঠেন—

“সাবধান কিন্তু মা-জননী, অঙ্গুরীয়াটি যেন আবার রাজকুমার না গিলে ফ্যালেন। পেট কেটে তো আর বের কবা যাবে না। ওদিকে আমাদের মহারাজ আবাব একটু ভুলো আছেন,—জানেনই তো।”

দুম্বন্তেব শাশুড়ি মেনকা তখন আকাশপথে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রের আদেশে আবেক মূনিব তপোভঙ্গ কবতে। শলভা আব শকুন্তলার কাণ্ড দেখে মৃদু হাসলেন।

## মাতৃয়ার্কি

[ অর্থাৎ বন্দে মাতরম! ]

মেয়েবা দু'জাতেব। একদল মাতৃতান্ত্রিক বাই নেচাব, এঁবা সংখ্যালঘু কিন্তু শক্তিতে লঘু নন মেটেই। বাকিবা পিতৃতান্ত্রিক, অবলা। এঁদেব কল্যাণেই জগতে পুংশাসিত সমাজে নারীব আজ এই দূরবস্থা। প্রথম জাতেব মেয়েতে জগৎ পরিপূর্ণ থাকলে 'উইমেন্স লিব্ মুভমেন্ট'-এব প্রয়োজন হত না। কেননা তাঁবা বাল্যে পিতাকে, যৌবনে পতিকে এবং বার্ধক্যে পুত্রকে অনায়াস-অঙ্গুলি সঞ্চালনে পদানত বাখেন। শুধু পুরুষজাতি কেন তাবৎ মনুষ্যসমাজ তথা সমাগবা বসুন্ধবা তাঁদেব অবিসংবাদিত প্রভুত্ব মেনে নেয়। এঁবা এঁদেব জীবনের সব কিছুকেই অনায়াস স্নায়ু-শাসনে বাখেন। দ্বিতীয় কোনো শক্তিব তোয়াক্কা কবেন না। বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী বাসবঘবে প্রবেশ কবলেও মুকুট মাথায় বাজদণ্ড হাতে সিংহাসনাকট হয়ে সেখান থেকে আবির্ভূত হন সম্রাজ্ঞীব বেশে। সুলতানা রিজিয়া, কি খাঁসীর লক্ষ্মীবাদি, বানী রাসমণি, কি বানী ভবানী, বা আমাব গর্ভধাবিনী, এঁবা সব এই জাতেব। আমাদেব চেয়ে একেবাবে অন্য মেটিবিয়ালে তৈরি। মা প্রায় কোনো কিছুবই তোয়াক্কা করেন না। সমাজ, অথবা সরকার তাঁব কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। এমন কি চন্দ্রসূর্যও না। সৌব নিয়ন্ত্রিত চক্ৰিকাটি ঘণ্টাব বাঁধা ছককে মা এখন আব গ্রাহ্য কবেন না। যখন খুশি ঘুমোন যখন খুশি জাগ্রত থাকেন, কোন বই পডছেন, সেটা কতটা ইন্টারেস্টিং তাবই উপব নির্ভর কবছে অন্যান্য যাবতীয় জাগতিক প্রয়োজন। ঘড়িব কাঁটাকে মা খোড়াই কেযাব কবেন।

“আমি কি ঘড়িটা কিনেছি, না ঘড়িটা আমাকে কিনে নিয়েছে? কে কাব মালিক?”

সুতবাং ঘড়ি ওঁব ক্রীতদাস।

মহাকাল ওঁব ক্রীতদাস। সজ্ঞানে তাব ইচ্ছানুসাবে উনি চলতে বাজি নন।

ভাবতবর্ষে নাকি গণতন্ত্র চাল। এ বাড়িতে ঘোব বানীতন্ত্র। আগে একজন বাজামশাই ছিলেন, তিনিই ছিলেন মহাপানীব মুখ্য প্রজা। আব গৌণ প্রজা ছিলাম আমি। এখন বাজামশাই নেই, মহাবানী আছেন, আব আছেন তাঁব দুই সখী, দুটি খুদে বাজকন্যে। ট্রেনিং পিবিয়ড চলছে তাঁদেব, আপাতত আত্মপ্রতিস আছেন। এঁবা বাজদণ্ড হাতে নিয়েই জমেছেন, তাই এঁদেব নচাখাল ওয়ানডাব বলা যায়। তিনজনেব কিন্তু মোট প্রজা মাত্র একটিই। আমি। গৌণ বলতেও আমি। মুখ্য বলতেও আমি।

আমি আবাব প্রজা বাই নেচাব। প্রজা বাই বার্থ। বশংবদ, প্রভুভক্ত।

স্কেচ : এক

নামেও রানী, কাজেও বানী। শুধু কি চন্দ্র-সূর্য? মৃত্যুকেও কি কেয়াব কবেন তিনি? ওঃ নো। কাল ব্যাপারটাকেই তুড়ি মেবে উড়িয়ে দিয়েছেন। জীবনমৃত্যু পায়েব ভূতা চিত্ত ভাবনাহীন। এটা বোঝা গেল এবাবকাব বড়ো অসুখে। যখন নাকে অস্বিজেনেব নল আব হাতেব শিবায গ্লুকোজেব ছুঁচ গোঁজা, পাশে দাঁড়িয়ে খটখটে সাদা টুপি মাথায় নার্স, আব জোব করে হাসি-হাসি মুখে হৃৎকম্পমান আমি—ডাক্তাববাবু সেইবাত্রেব চতুর্থ ইঞ্জেকশনটি সদ্য দিয়ে উঠছেন,—একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। চোখ যদিও বন্ধ, মা গুনগুন কবে ক্ষীণ স্ববে কী যেন বলছেন। বাগবিস্তাবেব ক্ষমতা মাব মোটেই ছিল না তিনদিন। তাই সব্বাই আগ্রহেব সঙ্গে মুখেব কাছে কান নিয়ে ঝুঁকে পড়লম,—কী বলছেন? মা বলছিলেন, বেশ ভাব দিয়েই, “আমি পবাণেব সাথে খেলিব আজিকে মবণ খেলা, নিশীথবেলা। সঘনবরষা গগন আঁধাব, হেব বাবিধাবে কাঁদে চাবিধাব—ভীষণবঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা,” আমাদেব ডাক্তাববাবুটিও আজকেব মানুষ নন, মাবই বয়সী—সেকালেব গোল্ডমেডালিস্ট বলে কথা। তিনিও কান পেতে শুনলেন, এবং একগাল হেসে বললেন—“উহঁ। ওসব বললে শুনবো কেন? আমবা তবে আছি কি কৰ্তে? এমাবজেসী ডিক্লেয়াব কবেছি, বাস্তায আমি নামিয়ে দিয়েছি। ওসব মবণখেলাধুলো একেবাবে বন্ধ। এখন জীবনখেলা। এখনো ভাঙেনি, ভাঙেনি মেলা, নদীব তীবের মেলা। এ শুধু আষাঢ় মেঘেব আঁধাব, এখনো বয়েছে বেলা। বুঝলেন?”—মৃদু হাসিব রেখা ফুটলো ঠোঁটে, চোখ একটু খুললো।

“‘ক্ষণিকা’ তো? কিন্তু এই কবিতাটা ‘ক্ষণিকা’র তুলনায় তেমন ভালো নয়।” মিনমিন কবে, হাঁপাতে হাঁপাতে মন্তব্য কবেন যাই-কি-না-যাই কগী।

—আপনি এই অবস্থায় এত বকবক কবেন না তো”—নার্সটি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে বাধা দেন।

ঠোঁটেব হাসি মুছে যায়। কগী ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান : —“কাব্য-আলোচনাকে যে-অৰ্ঘ্যচীন বলে বকবক কবা, সে শুশ্রূষাব কী জানে? ডাক্তাববাবু, একে সবিয়ে নিয়ে যান।”

—“হঁা। হঁা। ওকে তো নিয়ে যাবোই, আপনি আগে সেবে উঠুন—তাবপবা।”

—“আব সেবে ওঠা। এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি—”

—“থামুন তো আপনি? ও কবিতা এখন নয়।”

—“কেন নয়? কি জানেন ডাক্তাববাবু, মর্মে মর্মে টেব পেয়েছি, অর্থ নয়, কীর্তি নস, সচ্ছলতা নয়, আবো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদেব অন্তর্গত—”

—“থাক থাক এখন জীবনানন্দ নয়। ববীন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ। বুঝলেন?” ডাক্তাববাবু বাধা দেন।

—“গা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ, আব গীতা। আব জীবনানন্দ। এই কি জীবনে যথেষ্ট নয়? বলুন ডাক্তারবাবু?”

—“বাস। বাস। চমৎকার। কেবল এব সঙ্গে একটু অক্সিজেন, একটু গ্লুকোজ, আব একটু অ্যান্টি-বায়োটিকস। জীবনানন্দটা ববং এখন থাক। সেবে উঠে হবে। কেমন? কাল সকালে আবার আসবো।”

মা নার্সের দিকে মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করে বলেন—“এঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।”

কপালগুণে নার্সটি বুদ্ধিমতী। মানুষও ভালো। বেগতিক বুঝে বলে উঠলেন—“স্যরি মাসিমা। আমাব খুব ভুল হয়েছে। বকবক নয়, কাব্য-আলোচনা। আব এমনটি হবে না। আমরা কাঠখোঁড়া মানুষ, অত কি জানি?”

কগী সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেন নার্সকে—ক্ষীণ গলায়, থেমে থেমে বলেন—“এই তোমাদের মতন আজকালকাব ছেলেমেয়েবা—কেবল লেখাপড়াই শিখছে—নামকাওয়াস্তে। শিক্ষিত তো হচ্ছে না। এই যে আমাদের ডাক্তারবাবু, উনি হলেন—প্রকৃত শিক্ষিত—কত কবিতাই যে ওঁর মুখস্থ। বলো দিকিনি, বন্দে-মাতবম—মানে কী?”

—“মানে? মানেটা ঠিক—স্যান্সক্রিট বোধহয়—ঐ স্লোগান আব কি... জয় হিন্দ যেমন—মানে দেশের জয় হোক।”

—“তোমার মাথা। লিটারাল মীনিং মায়েব বন্দনা করি। বল দিকি গানটা কার লেখা।”

—“রবিঠাকুর?”

—“হল না”—মা অক্সিজেনের নলসূদ্ধ মাথা নাড়াতে যাচ্ছেন দেখে নার্স তাড়াতাড়ি মাথাটা চেপে ধবে বলে—“আমি ঠিক জানি না মাসিমা, আপনিই বলে দিন, কিন্তু আব কথা বলবেন না—এতে খুব স্ট্রেন হচ্ছে আপনাব—এই শেষ—”

—“আনন্দমঠ পড়েছ?”

—“হ্যাঁ-আঁ।”

—“কার লেখা?”

—“বঙ্কিম।”

—“পড়নি। ওতেই আছে। জগদীশ ভট্টাচার্যের বইটা দেখো, গানটাব সব খবব পাবে।”

তিনমাস বাদে, মাকে-সুস্থ করে, চলে যাবাব সময়ে নার্সটি বলে গেলেন। পচিশবছরের নার্স-জীবনে এমন আজব কগী আব তিনি পাননি। যে চামচে দিয়ে তবল দ্রব্য ছাড়া কিছু খেতে পাবছে না, ফাউলার্স বেড়ে হাতল ঘুবিযে খাটগুদু উঠিয়ে বসিয়ে না দিলে উঠে বসাব পর্যন্ত ক্ষমতা নেই, অক্সিজেন, গ্লুকোজ আর ইঞ্জেকশনের ফাঁকে ফাঁকে সে আপনমনে খালি কবিতা আওডায়, আব নার্সের পড়া ধরে। তাজ্জব কাণ্ড!

স্কেচ : দুই

ফোন বাজলো।

—হ্যালো, হ্যাঁ নবনীতা বলছি। কে? মল্লিকমশাই?

—শুটিং হুগাখানেক বাদে শুরু? হ্যাঁ তা পাবব বোধহয়। পবন্ড ভোববেলা আমাদেব একটা একসকাবশনে কলকাতাব বাইবে বেরুতে হচ্ছে, তিনদিন বাদেই ফিবব, তাবপবে তো?

ওঃ না, মাকে এখনো কিছু বলা হয়নি, খুব অসুস্থ ছিলেন তো, তাব মধ্যে আজই বলব।—নাচতে নাচতে মাব কাছে যাই।

—দাকুণ একটা চান্স পেয়েছি মা—

—কিসেব?

—ওয়ার্ল্ড ফেমাস হবাব। বিখ্যাত চিত্র পবিচালক মল্লিকমশাই তাঁর নেক্রাট ফিল্ম আমাকে নিয়েছেন। তোমাব তখন খুব বাডাবাডি অসুখ, তাই বলা হয়নি।

—নাযিকা?

—না না, এমনি একটা ছোট সাইডরোলে, কিন্তু খুব সুন্দব বোলটা।

—পার্স্চবিত্রে? আমাব মত নেই।

—ও আবাব কী কথা?

(চিন্তিত স্ববে) ফিল্ম লাইনটা—এখনও টালমাটাল। আট্টেব স্বর্গে পৌছুবে—না

—পণ্যেব সাম্রাজ্য মেলবে বোঝা যাচ্ছে না। ওটা লাইন—তায় পার্স্চবিত্রে এখনও বাণিজ্যেবই বাহন মনে হয়। না, না ও হবে না।

—এত আধুনিক হয়েও তুমি এবকম বলছ মা? এটা আশি আশা কবিনি—

মা একটু থেমে থেকে, আবাব প্রশ্ন শুরু কবেন—কিসেব বোল? চবিত্রটা কেমন?

—মৃত্যুপথযাত্রিণী শয্যাশায়ী একটি বউয়েব। আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে না—শুয়ে ওয়ে সে খুব বইপত্র পড়ে। আব মানুষজন ভালোবাসে। মল্লিকমশাই চমৎকাব ডেসক্রাইব করেছেন মা—বেশ ম্যাচিওর কিন্তু সেনসিটিভ ফেস—চেহাবা হবে বেশ কল্প কল্প, অথচ তারই মধ্যে প্রচুর ওয়ার্মথ আব ভাইভ্যান্সিটি লেগে থাকা চাই, আব থাকবে একটা অদ্ভুত সেলফ কনফিডেন্স, মৃত্যুকে পরোখা না করার।

—এই সমস্ত কি তোমার মধ্যে আছে?

—হ্যাঁ, স-ব। মল্লিকমশাই বলেছেন, আমাব মধ্যে সব আছে। মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে অথচ চোখে হাসিটি লেগেই আছে।

—মুখে মৃত্যুব ছায়া? আমাব মেয়ের?

—সত্যিতে না। অভিনয় তো।

—তুমি অভিনয় পারো?

—আমি তো ওঁকে বল্লম : কী করে হবে বলুন, একে কখনো অভিনয় কবিনি, তাব ওপরে আমার বাঁদিকেব ভোকাল কর্ড খাবাপ হয়ে গেছে আট বছর হলো, ভয়েসটা ঠিক নেই, তায প্রচণ্ড হাঁপানি, যখন তখন টান উঠে যায়—

—শুনে তিনি কী বললেন?

—ওনে? মল্লিকমশাই শুনে টুনে খুব খুশি হয়ে বললেন আমার নাকি এগুলো সবই প্লাস পয়েন্ট। ধরো যদি শুটিংয়ের সময়ে হঠাৎ গলাটা বসে যায়, কিন্না কাশিব দমক ওঠে, কি হাঁপ ধবে, তবে তো খুবই ভাল, বেশ ন্যাচাবাল হবে—আমাকে একদম অভিনয় কবতেই হবে না—

—ন্যাচাবাল হবে? তাবপব ন্যাচাবাল ডেথটা দ্যাখাতে পাবলে তো আরো ভালো? সেটা বলেনি? আহা হা মুখে মৃত্যব ছায়া!—আমাব এই বোগাকল্প মেয়েটাকে, উঃ! আচ্ছা, ওদের কি মনে মাযা মমতা নেই বে? যত অলক্ষুণে কাণ্ড!

—তাতে কী হয়েছে মা? এতো শুধু অভিনয়—

—বেশ, অভিনয়ই যদি হবে তবে কণীকে ধবে এনে কণীব ভূমিকায় নামানো কেন? তাহলে তো বর-কনে ধরে এনে বর-কনের ভূমিকায়, খুনী ধরে এনে খুনীব ভূমিকায় নামাতে হয়। অভিনয় শিল্পটা তবে আছে কী করতে? ভাল ভাল অভিনেত্রীব ছুড়াছড়ি টালিগঞ্জে—

—সে কথা আমিও বলেছিলাম, মা। উনি বললেন, কিন্তু অভিনেত্রীবদেব চেহাবায় যে আবার লাবণ্য-টাবন্য আছে। ওঁব দবকার মোটামুটি কাঠকাঠ চেহাবা—লাবণ্যহীন—

—কী? আমার মেয়ের চেহাবা লাবণ্যহীন? কাঠকাঠ? রোগে ভুগে ভুগে নাহয় একটু শুকিয়েই গেছে মুখানা। তাবলে তাকে কিনা লাবণ্যহীন বলা? বাবা খুক, —শোনো যা বলি। লোভ করতে নেই মা। ওপথে পা বাড়িও না। শুধু শুধু কেন সেধে সেধে নিন্দে কুডোবে মা? অভিনয় তো তুমি পারো না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পবধর্ম ভযাবহ—

এইবাবে খেয়াল হলো। মল্লিকমশাইয়ের চমৎকার অফারটি পেয়ে অবধি চোখ বুজলেই মানসনেত্রে দেখছিলুম কাগজে ছবি—শ্রেষ্ঠ পার্শ্বভূমিকাভিনেত্রীব পূবস্কাব নিচ্ছেন নবনীতা দেবসেন—সিনেমার পত্রিকাগুলোতে মৃত্যুপথযাত্রিণী আমার বস্ত্রীন স্টিল ফোটো, বাসেট্রামে লোকমুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—

—খাটি সিন্ধে জেনিফাব কাপূবেব পবে এই নবনীতা সেন দেখালো বটে অভিনয় কাকে বলে। এসব কিছু না হয়ে, ঠিক উল্টোটাও তো হতে পারে।—এদিকটা মোটে স্ট্রাইকই কবেনি। বাসে ট্রামে শোনা যাবে—আচ্ছা নবনীতা সেনের কাণ্ডটা একবাব দেখলি? কী লোকটাই না হাসালে বল তো? কেন যে মানুষেব হঠাৎ



হঠাৎ এমন ভীমবলি হয়, পুরো বইখানা ঝুলে গেছে ওব জনো—

মা বললেন—পাঁচজনের পাঁচকথায় কান দিতে নেই বাবা। ওতে ক্ষতি হয়। একমনে নিজের কাজটি কবে যাও। ওই ভদ্রলোককে টেলিফোন কবে আজই বলে দাও—মা তোমাকে পাবমিশন দেন নি—

—গেল। শেষ হয়ে গেল আমার নক্ষত্রভাবনা। গুটিগুটি কোণের দিকে এগুচ্ছি, মা বললেন : —খুক, তোমার নড়ীছেঁড়া ধনেবা গেলেন কোথায়? এ বিষয়ে মতামত দিতে এলেন না যে বড়ো? সব ব্যাপাবেই তো তাঁরা আগে বক্তব্য রাখেন—

—তাবা ইশকুলে চলে গেছে।

—টিফিন কী দিলে?

—স্যানডুইচ বোধহয়—লক্ষ্মী দিয়েছে।

—বোধহয়? কেন, বোধ হবে কেন? নিশ্চিত জ্ঞান না কেন? এমন কিছু দুর্বোধ্য ব্যাপার? ফিল্মে নামাব নামেই এই? তবেই বুঝে দ্যাখো নামলে কী অবস্থা হবে তোমার।

হল না। ওয়ার্ল্ড ফেমাস হওয়া হল না। আমার কান, বার্লিন, ম্যানিলা সবগুলো ফেস্টিভাল হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেল। বানীমার এক হুকুমে। আমি ঠিক জানি মল্লিকমশায়েব ঐ ছবি ওয়ার্ল্ড হিট হবেই। অমন গল্প। অমন চবিত্র। বেশ। হোক হিট। তখন মার মনে আফশোস হবে। ঠিক হবে। বেশ হবে।

### স্কচ : তিন

ফর্সা মুখের চাবিধার ঘিবে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো ধবধবে চুল একমাথা ফুলে ফেঁপে আছে, গোলাপী ঠোঁট, বলিবেখাটেখা পডেনি কুত্রাপি, দূবে দেখবাব বেশি পাওয়াবেব চশমার ফাঁকে বুদ্ধি ঝকঝকে চোখ—এখনো চালশে টালশে লাগে না, বিনা চশমায বই পড়তে পাবেন, (ওসব আমাদের পক্ষেই যা অপবিহার্য পবনির্ভবতা) পবনে ফর্সা সিল্কেব নাইট গাউন, পায়েব ওপব গবদেব চাদর-চাপা দেওয়া, হয় ইজিচেযাবে বসে বই পডছেন নয় খাটে ওয়ে ঘুমোচ্ছেন। পায়েব কাছে শাদা কটকী চটি। যদিও নডাচডার শব্দে অতি সামান্য। গতবাবের অসুখেব ধাক্কায পায়েব টালমাটাল অবস্থা। বানীমা ইজিচেযাবে বসে মনোযোগ সহকারে বিশাল এক পেতলেব ফুলদানীতে লেবু ঘষছেন। নাইট গাউনে সেই নোংরা বস পডছে, দাগ হচ্ছে খেয়াল নেই। এমন সময়ে কাপেব মধ্যে ঘটঘট চামচ নাডতে নাডতে ছোটকনো, অর্থাৎ ফ্লোবেসদ নাইটিঙ্গেলেব প্রবেশ।

—দিম-দিম, এই নাও তোমার মহান শক্তিদাতা, শিগগির খেয়ে ফ্যালো, অলবেডি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। পেছু পেছু ওষুধের ছোট্ট রেকাব নিয়ে জলসমেত মাদার টেবেসা অথবা মেয়ে-পুলিশ বড়কনো এই দুটোব একটা হবেন, ডাকাত ধববেন চন্দলে

গিয়ে, অথবা—) এসে পড়েন। এসেই পুলিশী ধমক—

—দিম্মা। তোমাকে নিয়ে আব পাবা গেল না। এদিকে তো স্টেবয়েড আব ভ্যাসোডায়েলটব-এব ওপব ভবসা, তাইতে এত গায়ে জোব হয়েছে, যে ওই ধুয়ো ফুলদানী—ঈশ, যদি পাযের ওপবে পড়ে যায়?

—জামাটা তো গেছেই। ছোটকন্যাব আ্যাডিশান।

—তোমরা যদি সাফ না কবো ফুলদানীটা তাহলে কাউকে তো সাফ কবতে হবেই? গান্ধীজী তো স্নহস্তে প্রিভি পবিস্কাব কবতেন আশ্রমেব—

—ইন-কবি-জিবল। সতি দিম্মা, তুমি না, ইন-কবি-জিবল। ফুলদানীতে হাত থেমে যায়। চোখে একটা অনেক দূবেব আলো ঝলসে ওঠে—

—কী বললি? কী শব্দটা বললি ওটা? ইন-কবি-জিবল? তোদেব দাদুও আমাকে বলতেন, ইন-কবি-জিবল। অথচ শব্দটাব মানেটা কোনোদিন জেনে নেয়া হয়নি। কী মানে বে?

—দাদুও বলতেন তো? তবেই বোঝো কতদূব আ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দটা তোমার ক্ষেত্রে। ওব মানে হচ্ছে যাকে কবেস্ত কবা দুঃসাধ্য, যেমন তুমি। বুঝলে?

—পাণ্ডববা কোন বনে বনবাসে গেলেন?

—মানে?

—মানে, কেবল স্টেবয়েড আব ভ্যাসো অমুক তমুক আব ইনকবিজিবল বলতে পাবলেই তো হল না? ইংবিজি শব্দভাণ্ডাব বৃদ্ধি মানেই তো শিক্ষিত হওয়া নয়। জ্ঞানভাণ্ডাবটা কী অবস্থা, তাই দেখছি। এটা একটা এলিমেন্টারি প্রশ্ন। পাণ্ডববা কোন বনে বনবাসে গেলেন?

—দণ্ডকাবণ্য?—ছোটকন্যাব ভীত ভীত উত্তব।

—দূব বোকা, সেটা তো বামায়ণেব বন বে! বডকন্যে শুধবে দেন।

—তবে কি পঞ্চবটি? ছোটকন্যে আবাব বলেন।

—সেও বামায়ণে, স্কুপিড। তুমি চূপ কব। দিদিব ধমকে বোন চূপ কবেন। কিন্তু দিম্মাব মায়া হয়। উৎসাহ দেবাব চেষ্টায় বলেন—

—বেশ তো, তবে বামায়ণই হোক না? বাবণের বাবার নাম কী?

—বাবণেব বাবা? পবস্পব মুখ চাওয়া-চাওয়া।

—বাবণেব বাবা তো একজন মনিষ্যি ছিলেন...

—বেশ, বুঝলুম। কোন-মুনি? তাব নাম কী?

—বিশ্ব.... বিশ্বা... বিশ্বামিত্র? না না বৈশ্বানব? না, সরি সবি, ওটা তো অগ্নি.... বৈশ্য, বৈশ্বা দাঁড়াও বলছি—বলছি...

দিম্মার ফর্সা মুখ নাতনীদেব পাণ্ডিত্যহীনতাব বেদনায আবো পাণ্ডুব হয়ে যায়।

—হ্যাঁবে, ইশকুলে কি তোদেব কিছুই শেখায়নি বাছা? শুধু শুধুই গালে চড মেবে টাকা নেয়?

—বিশ্বেশ্রবা।—হঠাৎ বোমার মতন বড়কনো বিস্ফোৰণ ঘটায়। মুখচোখ আত্মদে জ্বলজ্বল কবছে। ছোটকনোও হাততালি দেয়—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বেশ্রবা। এবাব ঠিক মনে পড়ে গেছে।

যেন এক্ষুনি কেউ তাঁব গালে একটা থাপ্পড মেবেছে, এমনি একটা যন্ত্রণাময় মুখভঙ্গিতে দিম্মা। দু'হাত তুলে বলে ওঠেন—ওবে চপ কব ভাই চপ কব। ওটা তোবা উচ্ছেশ্রবাব সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিস। বিশ্রবা, বিশ্রবামুনি। পুলস্ত্যমুনিব পুত্র। তাই বাবণকে পৌলস্ত্যে, বৈশ্রবস ইত্যাদি নামে ডাকা হয় দেখিসনি? মাকগে যাক, এবাব বল বাবণেব মায়েব নাম কী?

—মন্দোদরী।

—এঃ ছি ছি তুই যে কী ভুলভাল বলিস। মন্দোদরী কি বাবণেব মা? না ইন্দ্রজিতেব মা? বাবণেব বানী।

—ওঃ সব সব, ইন্দ্রজিতেব মা। আসলে, আই মেস্ট ইন্দ্রজিতেব মা।

—আচ্ছা, দিদি, বাবণেব মায়েব নাম কি বামায়ণে আছে? —ক—কখনো তো শুনিনি? শুনেছি কি আমবা, দিদি?

—শুনেছি নিশ্চয়ই, বামায়ণ মহাভাবত এটসেটবা আব ফুল অফ এনডলেন বংশকুলজাঁস। তবে স্টোবিতে তো ওব কোনো ইম্প্যাটান্ট বোল নেই। সাম বাক্সসী হবে, আব কি। নিকষা, ত্রিজটা, কি বৃকোদরী জাতীয়—

—না। কেকসী বিশুদ্ধা বক্ষকন্যা ছিলেন না, তাঁব মা ছিলেন পবম কপবতী এক গান্ধবী, বুঝলে? যাকগে। ওসব কথা থাক। আজ সতি মনটা বড্ড খাবাপ হয়ে গেল ভাই। তোমবা এত এত কুইজ কবছ। এত এত জেনারেল নলেজ বই পডছ আব নিজের দেশেব পৌৰাণিক গল্পেব বেলায়—প্রহ্লাদ কে ছিলেন জানো? হিবণ্যকশিপু? অথচ মেভুসা কে ছিল জানো, জেসন জানো, দ্যাবিবিনথ, থিসিয়াস—সব জানো—

দু মিনিট স্তব্ধতা। পূৰ্ণকালের তিবোধানে শোকপালন। ঘবসুদ্ধ সবাই লজ্জিত এবং অন্ততপ্ত।

মা নিজেই স্তব্ধতা ভাঙেন—আচ্ছা ভাই, তোমাদেব খুব ছেলেবেলাতে যে কুন্তিবাসী বামায়ণ গাইতে শিখিয়েছিলুম কিছু মনে আছে? সমদ্রের উত্তর হয় এবারে :—আছে, দিম্মা। বলব? ‘গোলোক বৈকুণ্ঠপূরী সবাব উপব। লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর’—আবো বলব? আবো মনে আছে অনেকখানি—

—থাক। আব বলে কী হবে? ওটা তো ব্যর্থ। ও তো লোকদেখানো শেখা। ভেতরে তো যায়নি। মূলে হা-ভাত। যাব মূল নেই, তাব মূলোও নেই।

—অর্থাৎ অমূল্য বস্তু। না, দিম্মা? কনো মুখ টিপে হাসছেন।

—রসিকতা কবে লাভ নেই। কাম্যাকবন বলতে পাবোনি মনে রেখো। বিশ্রবা বলতে পাবোনি। কৈকসী না, প্রহ্লাদ না, হিরণ্যকশিপু না.—তোমাদেব এই ইশকুলেব

শিঃকা—সব ঝুট হায়া, সব ঝুট হায়া। সব ঝুট। এটা ঝুট কথা? কোথেকে বললুম?  
জানি বলতে পাববে না।

—মেহেব আলিৰ কথা তো।

—বাঃ? জনিস? মেহেব আলি কিসে আছে?

—ক্ষুধিত পাষণে।

—ক্ষুধিত পাষণ কিসে আছে?

—গল্পগুচ্ছে। কোন খণ্ড তা বলতে পাবব না কিন্তু।

—তোবা গল্পগুচ্ছ পড়েছিস? কত খণ্ড পড়েছিস?

—আমি তিনটে। দিদি হয়তো আৰো...

—আমাদেব বাড়িতে তো তিনটেই আছে—

—তিন খণ্ডই পড়িচিস ভাই? বেশ, বেশ, এবাবকাৰ মতন কাম্যকবন না পাৰাটা  
মাপ কৰে দিলুম। বিংশশবাও মাপ—হবে, হবে, তোদেব আস্তে আস্তে হবে। ভাগিস,  
“বচনাবলীতে আছে” বলিসনি—

—দিয়া, ওষুধগুলো খেয়ে নাও, আব হবলিকস তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল  
—এই নাও ধব ওষুধ—

মা ওষুধ মুখে দিচ্ছেন, এমন সময়ে সিঁড়িতে দীপূৰ হেঁড়ে গলায় সদা হাবড়া  
জিলায় শুনে আসা “বিষকন্যা” যাত্রাৰ পাৰ্ট শোনা গেল—“হুঁসনে পাগোল।” তাবপব  
সুব কৰে গান ধবলো—“হুঁ—স সনে পা-গো-ওল। ও যে বিস এব বডি-ঈ  
ঈ—”

বাস! মাৰ চোখমুখে দুদান্ত দুট্টমি ঝলমল কৰে ওঠে। মা ওষুধসূদ্ধ হাত নামিয়ে  
দেন।—ওই যে, শোনো, ডেলফিব অব্যাকল। দৈববাণী হচ্ছে। এসব আজ আব খাবো  
না, ইয়া ভাই? এগুলো থাক? বিষেব বডিগুলো? কেবল ঠাণ্ডা হবলিকসটুকু খেয়ে  
নি, কেমন?

—ওমা, সেকি কথা দিয়া? ওই অব্যাকল ঝুট হায়া। না, ওসব গুনবো না,  
শিগগিব খাও

এব পৰে ঘটে গণতান্ত্ৰিক দেশে মেয়ে-দাবোগাব হাতে মহাবানীৰ অসহায়  
আত্মসমর্পণ।

### স্কেচ : চাব

শোবাব ঘৰ তো নয়, যেন নহবংখানা। বাড়িতে জমজমাট বমবমাট কাণ্ড। যুগলবন্দী  
সানাই বাজছে। এঘৰে আমি, ওঘৰে মা। যন্ত্ৰ লাগে না আমাদেব, ফুসফুসেই বিল্ট  
ইন তাবসানাই। ধুলো, ধোয়া, ফুলেব বেণু যাহোক কিছু সঙ্ঘ তন্ত্ৰীতে ঘা দিলেই  
হলো, এওলিয়ান হাৰ্প বেজে উঠবে শাঁই শাঁই কৰে। বাড়িব যাবতীয় বালিশ, তাকিয়া,

কুশান আমাদের দুজনকে পিঠে গাঁজা। বাড়ির আব সকলের বিনা বালিশে শোওয়া এবং বিনা কুশানে বসা অভ্যাস হয়ে গেছে। খানিক আগেই কম্পাউন্ডাবাব এসে সটাসট দু ঘবে দু খানা করে ডেবিফাইলিন ডেকাড্রন সুই মেবে দিয়ে গেছেন, ডবলফোর্ড। ফলমঃ আমাব শরীর অনেকটা ভালো বোধ হচ্ছে। উঠে গুটি গুটি মাঝ কাছে এসেছি। পিঠে হাত বুলোছি।

—একটু ভালো বুলোছে মা?

—তুমি আবার কেন উঠে এলে? শোওগে যাও।

—একটা জিনিস খুঁজছি। তোমাব কাছে কি—

—আবাব কী হাবালি খুঁ? শুয়ে শুয়ে? বডড বে-খেয়ালী হয়েচিস বাপু—

—তোমাব কাছে একটা সরস গল্প হবে. মা? (বলেই ফেলি।)

—কী? কী? হবে?

—একখানা সরস গল্পা? একটু মনে কবে দ্যাখো না প্লীজ? বাবাব সঙ্গে, কোনো কৌতুককর ঘটনা-টটনা কিছুই ঘটেনি কি? একটু ভাবো না. মা?

—ইয়ার্কি? ইয়ার্কি হচ্ছে? আমাব সঙ্গে? আমি না তোমাব মা?

—সত্যি গো মা, ইয়ার্কি নয়, এক্ষুনি একটা প্লট না পেলো—এই সময়ে ঘবে মেয়ে-পুলিশের আবির্ভাব হয়।—

—মা। ফেব তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ? এই তোমাব কমপ্লিট বেড বেস্ট? চলো, এক্ষুনি শোবে চলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—

—শুইয়ে ফাল। শুইয়ে ফাল। ধবে নিয়ে যা। ধবে নিয়ে যা। মা উৎসাহ দেন। যেন খেলাব মাঠেব দর্শক।

শুয়ে পড়েছি। ওঘবে আলো জ্বলে মেয়েবা পডতে বসেছে। কি সৌভাগ্য। তাবপবে কী মনে কবে. ডাকি : —ছোটো মানুষ?

—উঁ?

—কী পডছে?

নৈঃশব্দা অপাব।

—গল্পেব বই?

—হঁ।

—ওতে হাসিব গল্পটল আছে কিছু?

—না তো। ডিটেকটিভ। ন্যানসি ড্রু।

—ওঃ।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-পুলিশের তীক্ষ্ণ মন্তব্য আসে বুলেটের মতো—এবং অন্তর্ভেদী তদন্ত শুরু হয়।

—কেন? যদি থাকতো, তাহলে তুমি কী কবতে? টুকতে?

—নাঃ, মানে, মাথাটা একেবারে ফাঁকা তো? ওষুধে ওষুধে—

—যতই ফাঁকা হোক, অন্যেব কাছে আইডিয়া ধার কবতে হবে না তোমাকে—জাস্ট লুক ইনটু দ্য মিরর, ইউল ফাইনড ইনফ মেটিরিয়াল দেয়াব—তুমিই নিজেই যথেষ্ট আবসার্ড, মা।

—দাখো সবাই যে যাব বাবা মাকে আবসার্ড মনে করে, বুঝলে? এটাই ওয়ার্ল্ড অবডাব। আমি যেমন আমাব মাকে ইনক্রেডিবলি আবসার্ড মনে কবি—মা নিজে ভাবেন তিনি প্রচণ্ড প্র্যাকটিকাল—কিন্তু...

ওঘর থেকে সাড়া উঠলো।

প্রথমে গলা খাঁকারি। তাতেই হাত পা হিম। তাবপরে—“খুকু!” এখনো ওই আওয়াজে নাতীর ভেতব পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। হাত থেকে আচাবেব শিশি পড়ে যাবাব ঝনঝনাৎ বুকেব মধ্যে বাজতে থাকে।

—আজ্ঞে।

—কথা কইছ কেন এত? কাকে লেকচাব দিচ্ছ?

—বড মেয়েকে।

—পিকলু পাখি!

—উ?

—এখন কেন মাকে অত কথা বলাচ্ছো ভাই?

—কী কবব? মা যে সবস গল্প লিখতে চাইছেন।

—এই মাঝবাত্তিরে? এই বোগ বালাইয়ের মাঝখানে?

—এই মাঝবাত্তিরেই। এই অসুখবিসুখেব মধ্যেই।

—ছি ছি ছি। তোমাব মায়েব মাথাটা এবাবে বিগড়ে গেছে ভাই। মাথা খাবাপ না হলে কেউ... এক কাজ কব। এই গীতাটা ওঁকে দিযে এসো ভো ভাই। আমাব টেবিল থেকে নিয়ে যাও।

—গীতা? কেন দিম্মা, গীতা দিযে কী হবে?

—গীতা পডলে মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। দুঃখেষ্ অনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষ্ বিগতস্পৃহ। বীতবাগ ভযক্ৰোধ : তবেই না স্থিতধী হওয়া যায়? তোমাব মাকে যে স্থিতধী হতেই হবে ভাই। এই চপলবিশ্বে নইলে সে টিকতে পারবে না। বোগে বোগে মেয়েটাব মাথাটা—

—মমাঃ! হঠাৎ পাজর ফুঁড়ে চাঁৎকার বেরোয় আমাব।

—কি বাবা?

—আমাব মাথায় কিস্যু হয়নি—গীতাফিতা খবদাব পাঠাবে না আমাকে—ওসব পারব না এখন পডতে—

—ছি বাবা, গীতাফিতা বলতে নেই। মেয়েবা শিখবে। কেন পড়বে না বাবা? টেবিস্টরাও পডতেন।

—পড়ুন গে। আমি চাইছি মুড়টাকে লাইট করতে।

—এই কি মুড় লাইট কবাব বয়েস, মা?

—তাবলে কি এটা গীতাপাঠেব বয়েস, মা?

—গীতাপাঠেব কোনো বয়েস নেই খুকু। গীতা যখন অর্জুনকে শোনানো হয় তখন তিনি গঙ্গাযাত্রী ছিলেন না। যৌবনেই মনেব জন্ম সবচেয়ে উর্বর থাকে খুকু—

—এত কথা বোলো না মা, কষ্ট হবে তোমাব।

—তুমিই ববং কথা না বলে চূপ করে থাকো—গান্ধীজীব মতো হুগ্ৰায় একদিন মৌন পালন কবলে ভালো হয়।

—তুমি এত কথা বোলো না মা।

—আমাব কথা আলাদা, আমাব এক পা শ্মশানে।

—আমাবও তো তাই। একই তো ওষুধ খাচ্ছি দুজনে।

—ছিঃ, মায়েব সামনে ওকথা বলতে নেই। যতই সত্যি হোক কথাটা। যা তোমাব শরীবেব অবস্থা তুমিই যাও কি আমিই যাই—আমাব যা ভাগ্য, হয়তো তুমিই বেসে জিতে যাবে। সেও আমাকে দেখতে হবে—

মা বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন এত কথা বলে। এবাবে মেয়ে-দাবোণা ওঘবে যায়। বড় আলো নিবিযে নীল আলো জ্বলে দেয়।—

—এবার কে কাকে কথা কওয়াচ্ছে দিম্মা?

—সবি ভাই সবি। তোমাব মাকে মৌন প্র্যাকটিস কবতে বলছিলুম—

—আগে তুমি মৌন হও তো দেখি। এই নাও ঘুমের ওষুধটা খেয়ে ফ্যালো চটপট। একটাও কথা বলবে না আর। কত সবস আলোচনাই হচ্ছে। কে আগে শ্মশানে যাবে—তাব বেস—মায়েতে মেয়েতে।

—দুগগা দুগগা। শয়নে পদ্মনাভঃ। তোর মা গীতাটা পড়লে নিজেবই উপকাব কবতো। নির্বোধ মেয়ে। সবস গল্প ভাবছে। দূর দূব। ওসব গল্প লিখে কী হবে? গভীবে যাও। প্রবন্ধ লেখো। কবিতা লেখো। শান্তি পাবে।

—দিম্মা, এই যে তোমাব ফ্লাস্কে চা বইলো।

—চা? দীপু ফিবেছে? বাত এখন কটা?

—এখন দীপুমামা কোথায়? আজ তো ফিবেতে এগাবোটা।

—তাহলে ঠিক আছে। আব কোনো ব্যাপাবে আমি দীপুকে সন্দেহ কবি না, কেবল এই দুটো ব্যাপাবে দীপুব প্রতি আমাব সন্দেহ গভীব। আমি জানি সে দুর্বলতাকে জয় কবাব শক্তি ওব নেই।

এবাবে আমাদের কান খাড়া হয়। গভীব সন্দেহ? বলি, ব্যাপাবটা কী? দীপুটাকে তো আলা-ভোলা নিরীহপ্রাণী বলেই জানি এতদিন? এ আবাব কীবে বাবা? উঠে বসি।

—কেন মা, দীপু আবার কী করলো?

—দুটো ব্যাপাবে ও আমাব আস্ত হাবিয়েছে খুক। দুটো ব্যাপারে ও আমাদেব সংসাবেব পক্ষে সংশয়ভাজন। বিশ্বাস করা উচিত নয়।

শুকনো গলায় কোনোবকমে বলি—

—কীসে কীসে মা?

—এক : ওই ফ্লাস্কেব চা। দুই : বান্নাঘবেব দেশলাই। দুটি জিনিসে ওব অপৰিসীম দুৰ্বলতা। সে দুৰ্বলতা জয় করবাব মত মনোবল ঈশ্বৰ বেচাৰীকে দেননি। দীপু ফেৰেনি, তাব মানে চা ফ্লাস্কেই আছে, গবমও আছে। ফিৰে থাকলে কমে যেত। কমে গেলেই জুড়িয়ে যেত। এই আৰকি। আৰ দেশলাই।

—আব দেশলাই?

—দেশলাইগুলো ও কেবলই বান্নাঘব থেকে নিয়ে চলে যায়। যখনই বাঁধনী টেঁচায় তক্ষুনি আমি বলি, যাও দীপুৰ ঘব থেকে নিয়ে এসো। গেলেই একটা না একটা ঠিকই পেয়ে যায়। এব নাম চোবেব ওপব বাটপাডি।

—ঠিক। ছোটো কন্যে বলে ওঠেন। আমাদেব বলপেনগুলো দীপুমামা বোজ আপিসে নিয়ে গিয়ে হাবিয়ে আসে, এবাব থেকে তাহলে আমিও ওব বলপেনগুলো নিয়ে নেব। হ্যাঁ দিম্মা? ঠিক হবে? চোবেব ওপব বাটপাডি।

বিব্রত গলায় দিদিমা বলেন—না বাবা, দেশলাই আর কলম কি এক হলো? একটা খবচ হয়ে যাবাব জিনিস, আব একটা বেখে দেবাব। দেশলাই নিলে দোষ নেই।

—বান্নাঘবেব দেশলাই নিলেও না?

—একটু একটু, বেশি না। কলম নিলে দোষ নয়।

—তোমরা চুপ কববে? ঘূমেব ওষুধ কাজ কববে না এত কথা বললে। দাবোগা এবাব টেবেসাব ভূমিকায়।—গুডনাইট দিম্মা। গুডনাইট।

—গুডনাইট। গীতাটা তোব মা পড়লে না তাহলে? পড়বে, আপনিই পড়বে। দিন পড়ে বয়েছে।

স্কেচ : পাঁচ

মাকে ঘূমেব ওষুধ খাওয়ালে কি হবে? কপালে ঘুম থাকলে তো? তাওয়াং ঘূমোতে দিলে না। তাওয়াং হচ্ছে আমাব আদৰ্শী তিব্বতী সাৰমেয়ী যাকে টাকে, প্লেনে, পদব্রজে নানা উপায়ে কোলে কাঁখে কবে তিব্বত-ভারত সীমান্তের নির্জন প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে এই কলকাতায় নিয়ে এসেছি। এনে, নিজেব কবব নিজেই খুঁড়েছি। টেক্সটাইল টেন্টিং আও ফার্নিচার সাম্পলিং হয়ে উঠেছে ওৰ প্রধান হবি। ওব কাছে ভাত-মাংসেৰ চেয়ে প্ৰিয় পদা আৰ বেডকভাব। হাডেব চেয়ে দন্তকচিকৰ



হলো চেয়ারবেব হাতল, টেবিলের পায়া। চাব-পাঁচ বছর বয়েস হয়েছে, এখনো বদভ্যাস ঘোচেনি। ওই কাঠ আর কাপাসের ভেজিটেবিয়ান টনিকেই ওব গায়ে অসীম শক্তি, ধবে বাখা যায় না। বছবেব পব বছব এত ক্ষতি সহ্য কবা কঠিন বলে নেহাৎই ছাপোষা অর্থনৈতিক কারণে ও বেচাবীকে বেঁধে বাখতে হয় অধিকাংশ সময়ে। এদিকে ও কার্নিশে কাক বসতে দেখলে, বা বাস্তিবে বাস্তায় পুলিশ পাগচারী কবতে দেখলে প্রবল চোঁচামেচি শুরু কবে দেয়। কিন্তু ওব বাহবিচার আছে। সব কাককে দেখলে ও চোঁচায় না, সব পুলিশকেই ধমকায় না। দু'-একজন কাক, দু'-একজন পুলিশের গায়েব গন্ধ ওব আপ্রাভাল পায় না—তাদের ধাবে কাছে আসতে দেখলেই শুরু কবে দেয় চোঁচানি। বাত্রে অমন কবলে ওকে গাঁই বদল কবে দিতে হয়, যাতে অমনোনীত পুলিশদের হেঁটে বেড়ানো ওকে আব দু চক্ষে দেখতে না হয়।

সেদিন বাত্রে মাকে ঘূমেব ওষুধ খাওয়ানো মাত্রই তাওয়াং হঠাৎ মডাকান্না শুরু কবলো। ব্যাপারটা কী? এতো ধমকধামক নয়? পথেঘাটে পুলিশও দেখা যাচ্ছে না। কাক তো নয়ই। তবে? তেস্তা পেয়েছে? জ্বল দিতেই এক পায়ের ঠেলা দিয়ে পাত্র উলটে দিলে। বাবান্দায় জল গড়িনে নদী বইলো। তবে? পেট ভবেনি? খিদে? এই নে, বিস্কুট খাবি? খেয়েদেয়ে একটু চুপ কব বাবা। তাওয়াং বিস্কুট স্পর্শও কবলো না। মডাকান্না চলছে—চলবে মনে হলো। ব্যাপার কি? গায়ে হাত বুলোলে চুপ কবে থাকছে অবশ্য। হাত তুলে নিলেই কুই কুই, আব যেই চলে এলুম, ফেব টাংকাব। বাড়িসুদ্ধ যাবপবনাই বিচলিত—মা বেচাবী ঘূমেব ওষুধ খেয়েও যদি ঘুম না হয়, তাহলে খুব শরীর খাবাপ বাড়বে। মেজাজ তো খাবাপ হবেই। এমন সময়ে মাব গলা ফুটলো : —বৃদ্ধ বয়সে গুনেছি মেয়েবা নাকি পুত্রের অধীনে বেঁচে থাকে? আমার পুত্র নেই। আমি সেই অপবাধে কুকু-বেড়ালের অধীন হয়েছি। চোখের ঘুম, পাতের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে কুকু-বেড়ালে। এই তো দেখছি পুত্রাম নবক। এব চেয়ে যে ওলড পীপলস হোম ঢেব ভালো।

এত বড়ো অপমান? দুই মেয়ে এবাব ছুটে গেল তাওয়াংয়ের দিকে।

—জল খাবি না, বিস্কুট খাবি না, বাবান্দায় যাবি না, তুই চাস কী? হলো কী তোব? দুটু কোথাকাব—আমবা সবে এলেই ভৌ-ভৌ কবে আকুল হয়ে কেদে উঠছিঁস?

ওদিকে মা তখন বলে চলেছেন : —ওব কী দোষ? ও তো ওয়াইলড নেচার ছেড়ে প্রথম মানুষের কাছে এসেছে। এই বন্ধনের মধ্যে ও কোনো সুখ পায় কী? স্বার্থপরের মতো ওকে ওব মা-বাপ-ভাই-বোন, ওব খোলা মাঠঘাটের খেলা, ওব ঠাণ্ডা ববফের দেশের আবাম থেকে বঞ্চিত কবে, কেড়ে এনে, এখানে ঘূপচিত্তে শেকল বেঁধে একলা ফেলে বাখা। কী, না আমাদের শখ। না আছে ওব খেলবাব সঙ্গীসাথী, না স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কাঁদবেই তো। কাঁদবে না? আমি হলে তো বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতুম—তোদের নিষ্ঠুরতার সীমা নেই—তোবা নাকি আনিমাল-

লাভাব? ছোঃ, তোরা সব সেলফিশ জায়ান্ট—একটু বেড়াতে নিয়ে যাবি না কুকুরটাকে, একটু খেলা করবি না ওব সঙ্গে—

—বেড়াতে কে নিয়ে যাবে ওকে? জায়ান্ট তো ও নিজেই। ঐটুকু গায়ে কী জোব! এক হাঁচকা টানে উন্টে ফেললেই দেবে তো বাস্তার ওপবে। বোজ বোজ মোটা চেন ছিড়ে ফেলছে দাঁতে কেটে, দেখছ না? চেন ছাড়া ওকে নিয়ে পথে বেকনোব প্রশ্ন নেই। আব চেন বেঁধে ওকে নিয়ে বেকলেও কেলেক্সারি। শুধু কি কুকুর দেখলেই ছুটে যাবে? গাড়ি দেখলেও ছুটে যাবে, রিকশা দেখলেও ছুটে যাবে, ছোট ছেলপিলে দেখলেও ছুটে যাবে—বেড়াল দেখলেই তাড়া করবে—চেন বাগিয়ে ওব দৌড়ব সামিল হতে পারি হেন শক্তি আমাব নেই। আমাব মেয়েদেবও নেই। আব দীপটা তো বহুদিন বলেই দিয়েছে—ওসব তার দ্বাবা হবে না, সে কনফার্মড আনিমাল হেটাব। অর্থাৎ জীবজন্তু ভয় পায়।

কথায় কথায় বাত বাড়ছে। মা শোবেন কখন? হঠাৎ খেয়াল হলো, কুকুরকান্না থেমে গেছে। আলো নিবিযে দি। —মা, ঘুমোতে চেষ্টা করো একটু। আমি ওঘবে গিয়ে পড়তে বসি। —অনেক বাতে শুতে গিয়ে দেখি বিছানায় একজন নেই। সেকি, ছোট কনো কোথায় গেলেন? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। ও লক্ষ্মী, ও যশোদা, টুম্পা কোথায় গেল? পড়ার ঘবে নেই, বাথরুমে নেই, নীচে নেই, ছাতে নেই, বারান্দায় নেই, এ-ঘব ও-ঘব সে-ঘর কুত্রাপি নেই। ঘুম ভেঙে উঠে বসে তার দিদি বললে —সেই যে তাওয়াংকে আদর করছিলুম, তাবপব আব ওকে দেখিনি তো। আমি উঠে এলুম, ও বসে রইলো মোড়া পেতে।

এখনও কি সে সেখানেই বসে থাকতে পারে? অসম্ভব কথা। যা চঞ্চল মেয়ে। হেনকালে যশোদা দিদি বলে উঠলো—“অ দিদি, দ্যাখবে এইসো তোমার মেইঞে—এথেনে—

ছুটে গিয়ে দেখি অপকপ দৃশ্য। মোড়া পেতে বসে লোহাব রেলিঙে হেলান দিয়ে, মেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বৃকে কুকুর জড়ানো। বোগা মেয়েব কোলের মধ্যে আবামসে মাথাটি গুঁজে, মোটকা কুকুর তাওয়াং চমৎকার ভাত-ঘুম মারছেন, সুকৎ সুকৎ কবে বাঁশিব মতো শব্দে নাক ডাকছে তাঁব। ভাবলুম বলি—মা, দেখে যাও, কী অবহেলায়, অযত্নেই না আছে বনের প্রাণীটি।

ছোটো কনোকে তুলে আনা হলো। যা থাকে কপালে। এবাব তাওয়াংয়েব আরাম নষ্ট হয় হোক। ঘুম ভেঙে যেতে আধখানা চোখে টেবিযে টেবিযে সে আমাদেব দিকে তাকালো বটে, কিন্তু না, আব কান্না জুড়ে দিলে না। গুটিগুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়লো আবাব।

টুম্পা ঝাকড়া মাথাটি নেড়ে নেড়ে বললো—আমি ঠিক জানি, কী হয়েছিল ওব। নিশ্চয়ই নাইটমেয়ার দেখেছিল মা। আমি রাত্রে নাইটমেয়ার দেখে ভয় পেলে তুমি বৃকে জড়িয়ে ধবে শুয়ে থাকো তো, আমি সেইটে মনে করে ওকে বৃকে

জড়িয়ে ধৰে বসে বইলুম, দেখলে তো ঠিক থেমে গেল কান্না।

পিকো এবাব মন্তব্য শুরু কৰে—ও বোধহয় তখন তিব্বতের স্পন্ন দেখছিল, ইয়েতিবা ওকে ধৰে নিয়ে গিয়ে বোস্ট কৰে খাচ্ছে—

—ইশ যতো বাড়াবাড়ি। মেমসায়েব হয়েছেন সব। কুকুবেব আবার দুঃস্পন্ন।  
হুঁ—কুকুবেবও নাইটমেয়াব।

গজগজ কবন্তে কবন্তে দীপুও নেমে এসেছে। টোটে না জ্বালা সিগারেটের ফাকে—‘যও শৌখিন মধ্যবিত্ত বিলাসিতা’—সোফা বান্নাঘৰেব দিকে চলে গেল—‘এই কুকুৰ-বেড়ালেব দৌবাত্ৰিতে’—সেণ্টেসেব মাঝখানে বান্নাঘৰেব দবজাটি খোলামাত্রই হাঁকডাক কৰে এক লাফে পিছিয়ে এলো ক’পা—টোটে থেকে সিগারেট খসে পড়ে গেছে—কে? কে ওখানে? কে যেন এক ধাক্কা মাৰলে ঠিক বুকুৰ ওপৰে—

—আবার কে? এই তো, লেটস পালাচ্ছে—লক্ষী বলে।

—চুপি কৰে পাত কুড়োনো খেতে গিয়ে শান্তি হয়েছিল, বন্ধ হয়েছিল বান্নাঘৰে। আপনি দৌব খোলবামাত্র লাফ মেবেছে পালাবার জন্য—তা ওজন আছে বেশ—অত মোটা হলো তো? আপনি ভেবেছেন কেউ বুকু ঠেলা মেবেছে—

—তয় উদিকে যাচ্ছিলেনই বা কেন, এত আতিবি? দ্যাশালাই ট্যাশালাই—? যশোদাদিদি যোগ কৰে। মুখ টিপে হেসে।

—অনেক বাত হয়েছে, ইযাৰ্কি না মেবে শুয়ে পড়ো তো সব! বলে ধমক লাগিয়ে, সিগারেট ধৰিয়ে নিয়ে যশোদাদিদিদিকে অগত্যা দেশলাইটি ফেবৎ দিয়ে দীপু ওপৰে পালিয়ে যায়।

—দেখছো তো মা, দিম্মা যা বলেন, সব ঠিক। দেশলাইয়েব ব্যাপাবে দীপুমায়া একদমই আনবিলায়েবল—বলতে বলতে টম্পা বুকুৰ মধ্যে ঘেঁষটে আসে।

গুডমর্নিং দিম্মা। এই নাও, তোমাব হবলিক্স। এই যে তোমাব ওষুধ, আব—এই নাও, ‘দেশ’।

কাগজ? কাগজগুলো কই? এতবলা হলো এখনো কাগজ দিলে না? মা ওষুধ এবং হবলিক্সে ঢুকপাত মাত্রও না কৰে সবলে দেশটা ছিনিয়ে নিলেন—গুপ্ত দেশ? মেয়েবা উত্তৰ দেয় না। মা আবার শুরু কৰেন—তোমবা যে আজ সাক্ষ্য হয়েছো, এ আমার মহাদুর্ভাগ্য। একটা কলম হাতে পাইনে, একটা বই যেখানে বাখি সেখানে থাকে না—এনাব কাগজগুলো পর্যন্ত পড়া বন্ধ কৰে দি। আজ বাজেট স্পীচ বেকুবে —কাল থেকে আমি কাগজেব জন্যে আছি—আব এত বেলা পর্যন্ত চাবটে কাগজেব একটাও এ-ঘৰে ঢুকল না?

দিদিব পেছনে পেছনে বোনও এসেছে পায়ে পায়ে। চোবেব মত মুখ হয়েছে দুই বোনেব।

আমিও অৰাক। সত্যিই তো—কাগজগুলো গেল কোথায়?—লোকটা এখনো

আসেনি নাকি? নাঃ, এই তো ‘দেশ’ এসেছে। তবে? আজ কি কাগজ বেরোয় নি? নাকি হক্কাবরা বেশি দামে বেচে দিয়েছে? দুই বোন মুখ চাওয়াচাওয়ি কবে। উত্তর নেই।

—কাগজগুলো কী হল? আসেনি? না, এক একজন এক একটা করে পড়বার নাম করে এক একঘরে ছুড়িয়ে ফেলেছে?

—দুই বোনে মাথা নাড়ে। না। নেয়নি।

—বাক্য যে হবে গেছে দেখছি। তোমরা কি মুকব্বির?

—কাগজ আসছে দিগ্বা। এক্ষুনি এসে যাবে মনে হয়।

ছোটকন্যে অবশেষে বলেন। সিঁড়িতে ধূপধাপ জোব শব্দ হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে দীপু ঢোকে। বগলে খবরের কাগজ।

—এই যে। চাবটে কাগজ কিন্তু পাওয়া গেল না। এত বেলায় আর পাওয়া যায় নাকি? আজ বাজেট বেবিয়েছে—আগে বলবি তো?

মা অতোশতো শোনেন না, কেবল কাগজ ও দীপুকে একত্র দেখেন। এবং গুরু করেন : —অ। তুমি। তুমিই পড়ছিলে তাহলে চাবটে কাগজ একসঙ্গে? এই হচ্ছে জার্নালিজম কবাব বিষয়ফল। কম্পার্টেটব স্টাডি হুজিল বোধহয়?

—আমি না। আমি না। যাঃ বাবা। লোকের উপকার করতে নই দেখছি—আমিই তো ববং কিনে আনলাম এই কাগজগুলো বাজার থেকে। কাগজ কি আমিই পড়তে পেয়েছি আজ? তাদের উপব বেড়ালের দল প্রাতঃকৃত্য কবে বেখেছিল যে। একসঙ্গে চাবটে কাগজই নষ্ট করেছে।

—সেকি? চাবটেই? আজ না বাজেট বেকবে—কী কী কমল—

—ওদেব কী দোষ?

শব্দ হয় বেড়ালদের দুই উকীলের ওকালতি.—গেট খুলতে দেবি করেছিল যে। ওরা বেকতে না পাবে—তাই—বাধ্য হয়েই

—তা বলে বাজেটেব ওপবে প্রাতঃকৃত্য। ছি ছি ছি... অবশ্য বাজেট জেনেই বা কী লাভ হবে? ও তো গবীর লোকের বাজেট নয়—ও দেখাও যা, না দেখাও তাই। দেখলে মনে হবে না-দেখা ছিল বে ভালো—

—এই দুখানাই পড়ো না মা, যা পেয়েছে, চাবটে নাইবা হল—

—দে তাই দে। অবিশ্যি দুটো চাবটেই এসে যায় না। প্রকৃতপক্ষে সবই সমান। সবই ওঁছা। ওঁছা খবর। ওঁছা ভাষা। অথচ আগে এরকম ছিল না। এখন কটিব গতি নিম্নমুখী, কাগজের আর দোষ দেব কি? যেমন পাঠক তেমনি কাগজ—

হরলিক্তেব গ্লাস নামিয়ে বেখে, মা কাগজ মেলে ধবতে ধবতে বলেন—বুঝলি খুকু, আমবা সবাই গত জন্মে মহাপাপ কবেছিলুম, তাই কুকুর-বেড়ালের দাসত্বে জীবনযাপন করছি—কি ঘবে, কি বাইরে। সব সমান, স-ব সমান। ওঁছা!

স্কেন : ছয়

আমরা সন্ধেব শোয়ে সিনেমা দেখে, চীনে খেয়ে ফিরেছি। সাবা পাডা অন্ধকাৰ। ডোরবেল বাজলো না। ধাক্কাধাক্কি যত কৰি, ওপৰে কুকুৰ ততই চৈঁচায়। কেউ দোব খেলে না। গাড়ি গ্যাবাজে তুলে দিয়েছি। কী কৰা?

বড কন্যা বললেন—এগাবোটাৰ পৰে ফিবলে ঠিক হত। চল আবেক্কাৰ চক্ৰ মেবে আসি। লোডশেডিংয়ের মধ্যে দিয়া কিছুতেই দৰজা খুলতে দেবেন না। আমবা তো কেউ বাডি নেই।

আবাব গাড়ি বেব কৰা হল। ছোটকন্যা নেচে উঠলেন—এবাবে বেশ আইসক্ৰীম খেতে যাওয়া হচ্ছে?

দীপু বললে, না, না পাঞ্জাবী চা।

আমি বললুম, পান ছাডা আব কিছু খাবার মতন পয়সা বাকী নেই। —আলো জ্বলতে, এগাবটাৰ পৰে ফিবে আমাদেব কোড-সিন্টেমের বেল বাজালুম। বাবান্দা থেকে যশোদা উকি মাৰলে—কে? দিদি? অ—

ওপৰে এসে হস্তিত্তি জুডবো, তার আগেই যশোদা বললে—দিদি, ছাদে মানুষ পড়েচে।

—তার মানে?

“ছাদেব উববে ঝপাৎ কৰে কী সব পড়ে গেল, ঘৰে নোক ঢুকেছেল। আঁধাবির মদি। নেচে কিন্তুক নাবেনি। মনে হয় এয়াতখনে চইলো গেচে। ঝা নেবাব নে’।

ওনেই দীপু আব বজ্জন দুই দুঃসাহসী ডাকু-ধৰিয়ে টেবিল থেকে কাঁচা-চামচ খাবলে তুলে নিয়ে বাবদৰ্পে সশস্ত্র সেজে ওপৰে চলল।

মা ঘৰ থেকে চৈঁচাতে লাগলেন, ওভাবে যাসনি, ওভাবে যাসনি ওদেব কাছে ভোজালি থাকে—

শান্ত গলায় যশোদা বলে, উববে কেউ নি, মা। আমি আব নুৰ্কা দেকো এইচি এইমাতব। আলো জ্বইলো।

বাববন্দ নেবে এসে একই সংবাদ পৰিবেশন কবলেন। দুই মেয়ে ওসবে কান না দিয়ে বেডাল-কুকুৰেব ডিনাব দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দেখা গেল একজন কম। লেটস নেই। কিন্তু বেকুল কোথা দিয়ে? আমবা তো সব দিক সীল কৰে দিয়ে বেৰিয়েছি। দৌদৌভাগেব বাডি ডাকাতি হবাব পৰ থেকে পাডায় সবাই খুব সাবধান। যদিও এ বাড়িতে ডাকাতিব সম্ভাবনা মিনিমাম, কেননা খাতা-বই কিনা আসবাবপত্ৰ কেড়ে নিতে ডাকাত পড়েছে কোনো বাড়িতে, এখনো এদেশে এমন ঘটনা শোনা যায়নি।

—তবু, সাবধানেব মাৰ নেই।—মা বললেন, সে কথা তো ডাকাতবা জানে

না যে এ বাড়িতে বই ছাড়া নেবাব মতো কিছু নেই? আজ ভীষণ ব্যাপার হয়েছে। অন্ধকারেব মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলে ওবা গল্পসল্প—আমি চেষ্টা করছি একটু ঘুমোতে, ছাদেব ওপরে ঝপঝপাস কবে কী যেন পড়ে গেল প্রচণ্ড শব্দে। বাস। বুঝছি, রেইনওয়াটার পাইপ বেয়ে লোক উঠেছে সম্ভবত. তাবপবে অন্ধকারে হেঁচট খেয়ে কিছু ফেলে দিয়েচে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদেব দিয়ে তিনটে ঘবেব দোবগুলোতে সবগুলো ছিটকিনি বন্ধ করিয়ে দিয়ে, বসে বইলুম। বাইবে থেকে যা নেবাব নিকগে। ঘরগুলো তো আটকানো থাক। আর কুকুবেব কী চিৎকার! কিন্তু সেও তো বন্ধ। তাব কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে বাইবে ছেড়ে দেবে, এমন তো কেউ নেই বাড়িতে। অবিশি কুকুরকেও ওবা মেবে ফালে। দোবগুলো বন্ধ কবে দিয়ে আমি ভাবলুম পুলিশে টেলিফোঁ কবি। তাবপব ভাবলুম তাব চেয়ে তাডাতাড়ি হবে যদি বাবান্দা থেকে জোতিবাবুব গেটেব পুলিশদেব চেঁচিয়ে ডাকা যায়। ওবা কি আব হেলপ কববে না? কিন্তু ওপবে আব শব্দটন্দ হয়নি। পায়েব শব্দও শোনা যায়নি আব —তাবপবেই আলো জ্বলে উঠল। হয় ওবা নেমে গেছে, নয় ওপবে লুকিয়ে আছে। ডেঞ্জারটা কেটেছে কিনা জানি না। যশোদা যাই বলুক।

উদ্বিগ্ন হয়ে মেযেবা এসে বললে—লেটুস কই? লেটুসকে তো দেখছি না? বেরুবাব সময়ে সবাইকে গুণে গুণে বাড়িতে পুবে বেখে সব দোবটোব বন্ধ কবে গেছি। বাবান্দায় বেবিযে যেইনা ডাকা. লেটুস। লেটুস। নিচে গ্যাবাজেব টিনেব চালে উত্তব এল—“ম্যাও!” দেখি লেজ ফুলিয়ে তাব সুন্দরী হলুদ বঙেব সেই গার্লফ্রেন্ডেব গা ঘেঁষে বসে আছে লেটুস। মুখ তুলে আমাদেব ডাকে সাড়া দিল —“ম্যাও!”

—বেরুল কী কবে?

—এখনো তো সব দিকই বন্ধ।

—আমবা যখন ঢুকলুম তখন তো ওকে বেরুতে দেখিনি?

—বুঝছি? বুঝছি। মেযেবা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।

—“দিম্মা, তোমাদেব ডাকাত ধবা পড়েচে এইবাব। লেটুসটা তো হলোবেডাল নয়, সতি। সতিই ডাকাত একটা। গার্লফ্রেন্ডেব ডাক শুনলে ও আব থাকতে পাবে না. নিশ্চয় ছাদে ওঠে, সেখান থেকে নিচে টিনেব চালে ঝাঁপ দিয়েছে। এই কাণ্ড ওকে আগেও আমবা কবতে দেখেছি। না মা? সেই যে একদিন মাঝবান্তিবে?

—উফ। এই লেটুসেব প্রেমেব জ্বালায় তো আব টেকা যাবে না পৃথিবীতে। একবাব বার্থ প্রেমে দেবদাস হয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেবল উর্ধ্বমুখে মডাকান্না কান্দত, মনে আছে? এখন আবাব সফল প্রণয়ী হয়ে যা ভয়ানক সব অ্যাক্রোব্যটিকস জুড়েছে, ওফ। মাসিমায যে হাট আটাক হয়নি—

দীপুব কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মা বলেন—সফল প্রণয়ী হতে গেলে অ্যাক্রোব্যটিক্স সবাইকেই জুড়ে দিতে হয়, বাবা। ষোলো বছরেব ছেলে বাম যদি হবধন ভঙ্গ কবতে পারে, লেটুস তো কেবল ঝাঁপ খেয়েছে! তোমরা যে কে কী

কববে, সেও তো আমবা দেখবো, সময় আসুক।

ইতিমধ্যে মেয়েবা গিয়ে দবজা খুলেছে এবং কপসী প্রণয়িনীকে অনায়াসে টিনের চালে একলা ফেলে বেখে লেটুস এক লাফে ঘবে এসে তাব ডিনাবেব প্লেটে মন দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মা বললেন—এটাও ফাস্ট অফ লাইফ, বাবা। দেখে শেখো। এটা নেক্সট স্টেপ।

### স্কেচ : সাত

মা। মাগো। সর্বনাশ হয়েছে।

—আবাব কী হলো, তোমাদের সর্ব এতই ক্ষুদ্র, বাবা, যে ক্ষণে ক্ষণেই দেখি বিনাশ পাচ্ছে। কি, মেয়েদের বেডালছানা হাবিয়ে গেছে বুঝি?—বই থেকে চোখ তুলে মা প্রশ্ন কবেন।

—গবম কাপডের ট্রাংকে কেবল খবরের কাগজ ভবা। একটাও শাল নেই। সোয়েটার নেই কিছু নেই আমাব।

—অন্য কোনো ট্রাংকে বেখেছিলে বোধহয়। খুঁজে দ্যাখো। গেল বছরের কথা তো? আদিনি মনে থাকা সম্ভব নয়। তোমাব যা স্মৃতিব অবস্থা।

—অন্য ট্রাংক নয়। এতেই ছিল। এতেই বেখেছিলুম। এব মধ্যে এত খবরের কাগজই বা কে পুবেল? কখন পুবেল?

—কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে তোমাব শালটালগুলো নিয়ে গেছে। জানে বাক্সটা নাডলে-চাডলে হাল্কা লাগলে আগেই খোঁজ পড়বে। ভাব থাকলে শীত পড়াব আগে কেউ খোঁজ কববে না।

—কি সর্বনাশ। নিশ্চয় বমলা মা। ওই কবেছে এটাও, বাসন আব কাপডগুলো তো ওই নিয়েছে স্নিফাবই কবে গেল। এটা তো বললে না।

—ও সেধে তোমাকে সবটা বলবে কেন, মা? ও কি চার্চের কনফেশন কিউবিকলে ঢুকেছিল? যাকগে থাকগে, ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও। আব কোথাও কিছু নেই?

—মানে?

—মানে, তোমাব তাড়া থাকলে আমাব আলমাবী থেকে একটা শাল নিয়ে যাও না—যা গেছে তা নিয়ে সময় নষ্ট কবে অবোধে। গতস্য শোচনা নাস্তি। ও তো আব বিকভাব কবতে পাববে না। সেটা সম্ভব হলে ববং ভাবা চলতো। এত দেরিতে বিকভাবি অসম্ভব। বছর ঘুবে গেছে।

—মাগো, তোমাব মনে কষ্ট হচ্ছে না? আমাব অতগুলো শাল অতগুলো সোয়েটার—

—ওগুলো গেছে যাক গে। মনে কবে নাও গবীবকে দিয়েছ। শীতবস্ত্র দানে

মহাপুণ্য হয়। তোমাবও পুণ্য হচ্ছে। গরীবের গায়ে উঠেছে সেসব অ্যাঙ্গিনে। এমনিতে তো দিতে না। তোমার আবার হবে।

—হবে না, মা হবে না। ওসব শাল কেনবার ক্ষমতাই আর আমার হবে না, মা। গরীবে ওব মূল্য কিছুই বুঝবে না সে। কোয়ালিটিব শালকরও আব নেই, ও জিনিস তৈরিই হয় না আর—

—কেন উলটোদিক থেকে ভেবে দুঃখ কচ্চিস খুক? ববং এইভাবে দ্যাখ—মনে কব ওগুলো কোনোদিনই তোর জিনিস ছিল না। পবের জিনিস ধাব কবে গায় দিচ্ছিলি, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিস, বাস—তাহলেই আব দুঃখ নেই। আমাব যখন সব গয়না নিয়ে অর্জনঠাকুব পালিয়ে গেল, আমি এই বকমই ভেবেছিলুম। যে ক’দিন ভোগ করেছিস, সেইটেই যথেষ্ট। তোর পাওনাব অতিবিক্ত সেটা। এইভাবে ভেবে নে।

—আমি অমন কবে ভাবতে পাবব না।

—তাহলে দুঃখ পাও। মর্তেব কষ্টে মুখ বগড়ে মর। ভালোবুদ্ধি দিচ্ছিলুম, নিলে না তো? আমি তো তোমাব বাবার বেলাতেও এমনি কবে ভাবি—ভগবানের জিনিস, ভগবান ফেরৎ নিয়েছেন। আমি যে অতগুলো বছব ওঁকে কাছে পেলুম, সেটাই আমার মহাভাগ্য। অলওয়েজ পজিটিভ থিংকিং কববি। সব সময়ে সব জিনিসের পজিটিভ দিকটাই শুধু দেখবি। তোর বাবারই কথা এটা। তাহলেই সদানন্দ থাকতে পারবি। এই দ্যাখনা—শাল চুরিব পজিটিভ দিক কী কী? এক নম্বব—গরীবগুলোব গায়ে গবম কাপড উঠলো। তোর পুণ্য হলো। দু নম্বব—ওগুলো অনেকদিন পবেচিস, এবাবে নতুন শাল কেনবার সুযোগ হলো। তিন নম্বব—ওভাবে চাবি না দিয়ে ট্রাংক খুলে ফেলে বাখতে নেই, এই শিক্ষাটা হলো। জীবনে সব শিক্ষার জন্যেই একটা মূল্য দিতে হয় তো? চার নম্বব—একগাদা খববেব কাগজ পেলি—ওজন কবিয়ে বেচে দে, অস্তুত একখানা আলোয়ান তো হয়ে যাবে?

### স্কেচ : আট

সন্কেবেলায় চিত্রমালা হচ্ছে, ঘবের মধ্যে হেমামালিনী নাচছেন। লতা গাইছেন, মা ইজিচেয়ারটা টেলিভিশানের উন্টোদিকে (এ বাড়িতে টিভি বলা বাবণ, ওটা নাকি অমার্জিত) ঘুরিয়ে বসে বই পড়ছেন। কানে তুলোর প্লাগ গোজা। মুঞ্চ দর্শক বাড়িব কাজের লোকেবা এবং কন্যাঙ্ঘয়। মা খবরের সন্য়ে এদিকে ধুবে বসবেন, কানের তুলো খুলবেন। মা ঘববন্দী বলে মাকেই উপহাব দেওয়া হয়েছে যন্তুটা। কিন্তু মা ওটাতে খবব ছাড়া প্রায় কিছুই দেখেন না। আব চেনাজানা লোকের প্রোগ্রাম। অথচ ঘব ভর্তি হয়ে যায় ঠিকে-ঝিয়ের ফ্যামিলি অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডস-এ, রোজ সন্কেবেলায়। কলকাতার মধ্যবিত্ত পাডার প্রত্যেকটা টিভি সেটই কমিউনিটি সেট। সরকার থেকেই



খরচটা দেওয়া উচিত মনে হয়। মা তাঁর ঘরে এত লোকজনের ভীড় একদম পছন্দ করেন না। অথচ জমায়েত দর্শকের জীবনের কথা চিন্তা করে মুখে কিছু আপত্তিও জানাতে পারেন না। অতএব পিছন ফিবে কানে তুলে, গুঁজে বই হাতে যথাসাধ্য সেন অনাঘবে আছেন এমন একটা ভাব করেন। খবর শুকু হলেই ওবা পালায়, আব মা চেয়াবটি ঘুরিয়ে বসেন। খবরপড়া শেষ হতেই সেদিন মা বললেন,—বঙ্গন, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার। বনো দেখি, খবর পড়া শেষ কবেই পাঠক বা পাঠিকাটি কেন আমাদের দিকে চেয়ে অমন মুচকে হাসিটি হাসে?

—কী জানি মাসিমা... ইঞ্জিনিয়ার বঙ্গন তাব পড়া বলতে না পাবে ইতস্তত কবে।—দীপকে জিজ্ঞেস কোবো। তাব জানা উচিত। ও তো জার্নালিস্ট।

মা বলেন : —‘খবর পড়াব শেষে ওই মুচকি হাসি মানে হচ্ছে, ‘কী? কেমন টুপি পবালুম?’ কেননা সবই তো মিথ্যা খবর। বানানো খবর। ওবা তা জানে। ঘোব মিথ্যা, অর্ধসত্য, আব অদবকাবি তথ্য। এই তিনেব মিশ্রণে সংবাদ তৈরি হয়। বুঝলে? দীপকে জিজ্ঞেস কোবো, ওব সীকাব কবা উচিত।

সেদিন কে যেন দৃংখ করছিলো, এতবকমের সব সাহিত্য পুস্তক। মা কেন, কোনোটাই পাননি। পাবেনই বা কেন? সবাইকেই তো চটিয়ে বাথেন উলটো গান গেয়ে। যখন যে সিংহাসনে, তখন মা তাব বিপরীতে। সেবার বিদ্যাসাগরের মুণ্ডচ্ছেদনের বিকল্পে বঙ্কতা দিতে নিয়ে যাওয়া হলো কিছু বয়স্ক, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে। মা-ব বিধবাবিবাহের জন্য ওই ভদ্রলোকই ধন্যবাদার্ক। মাকেও তাই নিয়ে গিয়েছিলেন সভাকর্মা। আশা ছিল, মা বিদ্যাসাগরের পক্ষে কথা বলবেন। মা গিয়ে বললেন—ছেলেবা তো বিদ্যাসাগরের শিবশ্ছেদ কবতে চায়নি, চেয়েছে একটা যুগের অন্ত। প্রাচীন একটা সমাজের, একটা বিশ্বাসের, একটা বদ্ধমূল ধারণার ওবা শিবশ্ছেদ কবতে চেয়েছে। বিদ্যাসাগর যে ব্রিটিশ লিবারেল মানবতাবাদের প্রতিভূ, তাবই উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক নতুন জাতিব মানবতাবাদের পতন চায় ওবা—আজ বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে তিনিও মত বদলাতেন—মাকে আব টেনে নামানো যায় না মঞ্চ থেকে।

স্কটিশ যদিও আমাদের কলেজ নয়, কোনো মধব স্মৃতিও জড়িয়ে নেই, তবু স্কটিশের ল্যাব পুড়িয়ে ধ্বংস কবা হয়েছে খবর পড়ে ক্ষতিব শোকে আমি তো কেঁদেই ফেললুম। কে জানে কতদিনে আবার ওইবকম ল্যাবটা তৈরি কবা যাবে। মা বললেন—এ তো ওদের করতে হবেই। পুরো বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাপদ্ধতিটাকেই আজ ওবা পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে। ল্যাববোটরিটা তো তুচ্ছ, সিঙ্গলমাত্র। ওই শিক্ষাব্যবস্থায় সাবা দেশেব ভবিষ্যৎ উড়েপুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তার বেলা? অমানুষ তৈরি হচ্ছে, তাব বেলা? তাব বেলায় তো কাদতে দেখিনি তোমায?

আবাব ওদিকে ইন্দিরা গান্ধী যখন এমাবজেন্সি ঘোষণা করলেন, আমবা তো সব ক্ষেপে লাল, মা বললেন—ইন্দিবা ঠিকই কবেছে। দেশটা শ্রেফ উচ্ছিন্নে যাচ্ছিল। একটা শব্দ হাতে হাল ধরা দরকাব হয়ে পড়েছিল।—এবং এখনও তাই-ই বলে যাচ্ছেন—আমাদেব দবকাব এমাবজেন্সি ডিক্লেয়ার কবা, নইলে এসব ব্যাঙ্ক ডাকাতি বন্ধ হবে না, সব যোগসাজস, সব যোগসাজস।

একদিকে এই, অন্যদিকে আবাব চলে মাঝে মাঝে বঙ্কিমী ভাষায় গালমন্দ। তাব ঝাঙ্কাটও কম নয়। বাইবে ফচকা খেয়ে এসে একদিন কিছুতেই বাত্রে কিছু খেতে পারছি না। মা এদিকে আমাদেব মুখে কচবে বলে স্পেশাল ফ্রায়েড বাইস কবিয়ে বেখেছেন। শেষে যখন বাধ্য হয়ে সীকাব কবতেই হলো ফচকাব ব্যাপাবটা, মা বললেন—ছিঃ। মা হয়ে পদে পদে এবকম অবিন্যাসিকাব শিকাব হলে সম্ভাবনবাই বা কী শিখবে? চবিত্রবলই জীবনে সবচেয়ে জবকাবী, খুব। যে-কোন ক্ষুদ্র প্রলোভনে এভাবে বিচলিত হয়ে পড়লে, জীবনের বৃহত্তর প্রলোভনের ক্ষেত্রে নিজেকে বক্ষা করবে কী ভাবে?—এই বক্তাব ফলশ্রুতিতে, অথবা শ্রুতিফলে বলাই ঠিক—বাঁধুনী, ও ঘবেব কাজেব মেয়েটি হাতেব কাজ ফেলে নোৎসাহে খাবাব টেবিলের কাছে চলে এলো এবং এই উচ্ছঙ্খল, চবিত্রবলহীন, অবিন্যাসিকাবিগীৰ দিকে তৃণাদপি তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত কবতে লাগলো। আমি মবমে মবে গেলুম। তাবা তো ফচকা খাওয়াব ব্যাপাবটা মোটে জানেই না।

### স্কেন : নয়

ভোব বাতে ট্রেন ধবতে হবে। একটু বাইবে যাচ্ছি, তিনদিনেব আউটিং। দলসুন্দ সবাই হাওড়ায় মীট কববে। ব্যাগবাক্স নিয়ে মাব সামনে এসে দাঁড়াই। বাইবে অন্ধকাব। দু'একটা কাক জাগছে।—মা, প্রণাম কবি, পা দেখি। আমি বেকছি।

মা আলো জ্বেলে শালমুড়ি দিয়ে ফ্লাফ্ থেকে গবম চা ঢেলে খেতে খেতে মৌজ কবে বাতভোব ইজিচেয়াবে বসে বসে বাট্টান্ড বাসেলেব জীবনী পড়ছেন। শুনতে পেলেন না।

—দেখি, মা, পা-টা বাড়াও, বেকছি। সময় হয়ে এল।

অন্যমনস্কভাবে চটিসুন্দ একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে মা বলে উঠলেন—

—খুব, এখানটা শোন, কী চমৎকাব, এই লেনিনেব সঙ্গে সাক্ষাৎকারটার বিববণ। জানিস, উনি গোৰ্কি আর টুটস্কির সঙ্গেও দেখা কবেছিলেন। কথায় বলে—আহা ফিলজফাব, জাগতিক জ্ঞানশূন্য—কিন্তু বাসেলেব জীবনী পড়লে বুঝবি তা মোটেই নয়। লোকচবিত্রে অসামান্য জ্ঞান। আশ্চর্য অ্যানালিসিস কবেছেন লেনিন-টুটস্কির চবিত্রেব। এই পড়ছি, শোন— প্রায় দশমিনিট ধরে লেনিনেব বুদ্ধি, আদর্শবাদ, টুটস্কিব

কপ, গোর্কির মূল্যবোধ বিষয়ে বাসেলের মতামত মা পড়ে শোনান। শুনে, আমি বলি—মাগো, এবারে কিন্তু যেতে হবে।

—যাবি, যাবি। একটা জরুরী কথা শুনে যা। কাল বাত্রে আমি এইটাই ভেবে ঠিক কবেছি। আমাব ডিসিশানটা শুনে যাবি না?

—কিসেব ডিসিশান?

—বার্ডান্ড বাসেল। মাও সে তুঙ। পাবলো পিকাসো। আব চার্লি চ্যাপলিন। কেবল এই চাবজন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শুধু এদেবই আমি আলাউ করি।

—কিসে মা? তাডাতাডি কব, ট্রেন—

—ওঁদেব মনেব বিবাটত্বেব সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মাত্র একজনেব পক্ষে সম্ভব না হতেও পাবে। কিন্তু তাব বদলে পৃথিবীকে ওঁবা অনেক দিয়েছেন। এইসব মহান ব্যক্তিত্বেব ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যবিভিন্ন মূল্যবোধগুলি প্রয়োগ করতে যাওয়া ভুল। ওঁবা চাবজন—

—এতো গেল অন্যান্য কথা। কী যেন ডিসিশান নেয়াব কথা বলছিলে না? চটপট নেটা বল, ট্রেন—মা আমাব ইন্স্টেপাশন গ্রাহ্য কবেন না—তাই বলে আমাদের ঘবেব আটপৌবে ছেলেমেয়েদেব তো ওঁদেব উদাহরণ দেখিয়ে যা খুশি তাই কবতে দেয়া চলে না? ব্যক্তিগত পার্থক্য চিবকালই থাকবে—

—তোমাব আলোচ্য বিষয়বস্তুটা কী মা?

—বিষয়? একাধিক নাবীকে পত্নীত্বে বরণ কবাব নৈতিকতা—

—ওঃ! এইটা বলতে দাঁড কবালে? ট্রেনটা যে—

—ঠিক তাও নয়। ভাবছি এলিজাবেথ টেলবেব কথা। তাব এতবাব বিয়ে কবাব মদ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল তৃষ্ণার্ততা আছে। আমি এব কোনো বৃহত্তর নৈতিক যুক্তি দেখি না।

—মাগো, এটা ফিবে এসে ববং—

—মাও, বাসেল, চ্যাপলিন, পিকাসো—এদেব শক্তিব কাছে সাবা পৃথিবী ঋণী। চিবদিনেব জন্য ঋণী। এঁবা যা দিয়েছেন তা শাস্ত্র, তা চিবন্তন—এঁদেব কথাই আলাদা। এঁরা প্রত্যেকে এক-একটা জীবনদর্শনেব প্রতীক। দৃঃখেব বিষয়, এলিজাবেথ এই প্রাথমিক সারিতে পড়ে না।

—এটা তুমি ঠিকই বলেছ। আই এগ্রি।

—তাই ওব বেলায় পাঁচবার আমি মোটেই আপ্রভ কবতে পাবি না। এটা অসংযম, লাম্পটা ভিন্ন কিছু নয়। যদিও তিনবাব একই আমি।

—এবাব যাই মা? ফ্লাজ? এব পবে ট্রেন পাবো না।

—একটা না পোলে আব একটা পেয়ে যাবে। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক আগে, না ট্রেন আগে? এটা খুব জরুরী বিষয়। যেতে যেতে এ নিয়ে ভেবো।

হাওড়া যখন পৌঁছুলুম ট্রেন চলে গিয়েছিল। আমাদের দলবলের চিহ্নমাত্র ছিল না। হাওড়া থেকে ফিবে এলুম। মা তখনও রাসেলের জীবনী পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন—ওবা চলে গেছে? যাকগে। মন খাবাপ কবিসনি, ওই স্টেশন খুঁজলে দেখতিস তোব মতন আবো অন্তত দশজন লোক তাদের ট্রেন ধবতে পারেনি। কাকর হয়তো ছেলের বাডাবাডি অসুখ, কাকর হয়তো বিয়েব লগ্ন ফসকে গেল,—তোর তো কেবল পিকনিক!—যশোদা, দিদির জন্যে চালটা নিয়ে নিও—আগ খুক, বোস। শোন, এইখানটা পড়ে শোনাই :

—এই লেডি অটোলাইন মোবেলের কাছে লেখা বাসেলের চিঠিটা; কী সুন্দর, তোব মন ভালো হয়ে যাবে—আমি গ্যান্টি দিচ্ছি। ওঁব সঙ্গে ভগবদবিশ্বাস নিয়ে যখন বাসেলের বাধলো, সেইখানটা যে কী অপরূপ, এই পড়ছি শোন—যশোদা, আমাদের দু'কাপ কফি কবে দিয়ে যাও তো—আশ্চর্য মোয়ে ছিলেন এই লেডি অটোলাইন মোবেল...

### স্ক্লেট : দশ

—হ্যাঁ খুক, খোকাব বাড়ির খবর শুনেচিস? ভোব ছুটাঁব সময়ে ডাকাত পড়েছিল, ভোজালি দিয়ে পৈতেটা কেটে, চাবি নিয়ে নিয়েছে। সিন্দুক খুলে চাব হাজার সাতশো কুড়ি টাকা, তিনটে পার্কার্স পেন, একটা টর্চ—কি খুক? শুনেচিস তো? নাকি এখনও সবস গল্প ভাবচিস? ওসব বাজে ভাবনা ছেড়ে দাও মা, সিবিয়স হও। গভীবে যাও। কবিতা লেখো, কবিতা।

—শুনছি, শুনছি। ডাকাত পড়েছিল তো? নে তো জানি।

—তাব উপদেশটা কী, বুঝেছ?

—কিসেব উপদেশ? ডাকাত পড়াব?

—ববিকে ধবে নিয়ে গেছে। আব ছাডেনি। বলছে যোগসাজস ছিল ডাকাতদের সঙ্গে। গৃহভ্রাতাবাই আজকাল সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। সেদিন লেকর্টাউনে, কাগাজে পড়লি তো,—

—সভেবো বহুবৈব পুবোনো ঢাকন তো? হ্যাঁ, পড়েছি, তাকেও তো ধবেছে পুলিশে—

—হ্যাঁ, ধবেছে, কেননা তাঁব গ্রাম, থানা, নাম, ঠিকানা সব ছিল। না থাকলে ধবতো না, মনিবের মাথা ফাটিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠপাট কবে, হাওয়া হয়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে মনের ফুর্তিতে দিন কাটাতো। এব উপদেশটা কী?

—কী?

—এ বাড়িতে যারা কাজ কবছে তাদের ফোটোগ্রাফ, বায়োডেটা, আব

ফিংগাবপ্রিন্ট এখনই থানায় জমা দিয়ে আসতে হবে।

—তাহলে লোকজন আর থাকবে না।

—না থাক। পুলিশ বাবাব নোটিস দিচ্ছে। এটা বেসিক সিকিওবিটিব প্রশ্ন। নাগবিক সচেতনতাব প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, তা, ঠিকানা-ঠিকানাগুলো দিয়ে এলেই হবে।

—সঙ্গে ফোটো চাই। হবিকে বলো ফোটো তুলে দিক।

—ছবিটিব তুলতে বললেই সব পালাবে—ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে, মা।

—বেশ, তাহলে চুপি চুপি ফোটো তোলা হোক। মুখের নয় ফিংগাবপ্রিন্টেব। বডদিদিমণি, ছোড়দিদিমণি, শোনো, শোনো, একটা দবকাবি কথা আছে। বান্নাঘবে ময়দা ছড়িয়ে রাখতে হবে, আব ড্রেসিংটেবিলে পাউডাব। যেই তাতে ওদেব ফিংগাবপ্রিন্ট পড়বে, দীপু, দীপু কৈ? দীপুৰ তো অনেক ফোটোগ্রাফাব বন্ধু আছে, নইলে আমাদের সূমনই আছে, ডেকে আনবি, ফিংগাবপ্রিন্ট তুলে ফেলবে—চুপিচুপি—মা ফিসফিস কবে ষডযন্ত্র আটেন।

—আচ্ছা, দিগ্মা,—বডকন্যে হেসে ফেলে—ওভাবে কখনও ফিংগাবপ্রিন্ট তোলা যায়? নিয়ম আছে না?

—তাহলে... আচ্ছা, অন্য উপায়ও আছে। এবাব মাইনে দিয়েই সব টিপসই নিয়ে নেব, তাহলেই দিবি ফিংগাবপ্রিন্ট ঘবে এসে যাবে? হুঁ হুঁ বাবা—

—বা বে—ওবা কি বোকা নাকি?—ছোটকন্যে বলেন—এতবছৰ তুমি কিছু সই-টই নিলে না, এখন হঠাৎ নিলে ওবা বুঝি কিছু সন্দেহ করবে না?

এতক্ষণে সাহস সংগ্রহ কবে আমিও যোগ কবি—ওসব ছেড়ে দাও মা, এই সময়ে লোকজন পালালে বড্ড মশকিলে পড়বো। তুমি-আমি দুজনেই এখন বিছানায়—ওদেবই ভবসায় সংসাব চলছে—

—তোমাব সংসাব ওদের ভবসায় চলতে পাবে, কিন্তু আমাব নয়। আমাব ভবসা ঈশ্বর। ওবা নিমিত্ত মাত্র। একটা কিছু আমাদের জমা দিতেই হবে পুলিশে। ঠিক কবে ফ্যালো, ফিংগাবপ্রিন্ট না ফোটো—

—আচ্ছা, দিম দিম—মহাবানীর গলা জড়িয়ে বড সখী বলেন—কী ছেলেমানুষী হচ্ছে বলো তো? তোমাব চেয়ে পুরো ষাট বছরের ছোটো হয়েও আমি যেটা বুঝতে পারছি, চৌষট্টি বছরের ছোটো হয়ে বোনও যা বুঝতে পাবে—এটুকুনি বুঝছ না, এখন হঠাৎ ফিংগাবপ্রিন্ট নিতে গেলে—

—দুব দুব—কী আজবাজে বকচিস।—মা হেসে ফেলেন এইবার। ষাট-চৌষট্টি—যাতা একটা বলে দিলেই হলো? কী যে অঙ্কের মাথা হয়েছে না তোদের, অথচ তোদের বাবা এত অঙ্কে পটু। ...হুঁ, ষাট-পঁয়ষট্টি—কী যে বলে। যত সব আজগুবি কথা—

—আজগুবি? তোমাব থেকে আমাব বয়েসেব তফাৎ ষাট বছরের নয়? আব

বোনের সঙ্গে চৌষড়ি বছরের? গুনে দ্যাখো—উনিশশো তিন থেকে উনিশশো তেষড়ি—নব্ব্বের থেকে অক্টোবর...

—তিন থেকে... তেষড়ি? মা যেন একটা ঘোবের মধ্যে কথা বলেন এবাবে। যেন স্বপ্নের মধ্যে—

—সত্যিই তো। তিন... থেকে তেষড়ি—ষাট বছরই তো। এতো বয়েস হয়ে গেছে আমার? সংসারের ভেতবে কেউ যে কারুর চাইতে ষাট বছরের বড়ো হয়, হতে পারে, এটাই যে কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না আমার... ষা-ট মানে তো... উঃ—অনে—ক বছর বে। বানীমাব বিশ্বাসিত দুটি নয়নে ছ' বছরের শিশুর বিশ্বাস। আর ষাট বছরের উপচে ওঠা বিষাদ—হঠাৎ লুকোচুরি খেলতে থাকে।

### স্মৃতি : এগারো

মা খাটে বসেই পান সাজছেন। পুখী থেকে হরিবাবু পাণ্ডা এলেন। কার্তিকপাণ্ডাব ছেলে বলে মা যাক্কে উল্লেখ করেন।

—নমস্কার মা। প্রসাদী গজাব প্যাকেটে ফুলে আছে কাপড়ের থলেটা হরিবাবুব হাতে। মা-র কাছে এসে বসলেন মোড়াতে। প্রতিবছর এই সময়টায় আসেন। মা হাত তুলে নমস্কার করলেন। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। কেউই কাউকে স্পর্শ করতে সাহস করেন না দেখা গেল। কী পদ, কি মন্তক। মা মুখ তুলে হাসলেন। হরিবাবুও। দুজনের মুখেই পান।

—তাবপব ঠাকুর, বেলো। কী খবর জগন্নাথের?

—জগদনাথঅ কভু খাবাপ থাকে? ভল্ল অছি।

—আব তুমি?

—মু ভল, মা। সানু বহিনটাই কিছি গডবড করিলা।

—কী আবাব হল?

—কিচ্ছিতে সসুবঘবকু বহিব নাই। পলাই আসিব পরা? বাপা নাই। এবের মু একেলা। তিনোট পিলা-বিয়া সব্ব নৈই কিবি বাপাঘরকু অসি ঠিসে যিব্ব। বাস। দুই মাসঅ, চাবি মাসঅ, বৎসব ভোবঅ ঠিয়ে যিব্ব, সসুবঘবকু মনঅ নাই মা। যেভেবার মু তাক্কু রখি দেই আসিবি, ছ'টি মাসঅ পুরিবে নাই ঠি-ক পলাই কিবি চালি আসিবি।

—সত্যি তো? ঘুরে ঘুরে পালিয়ে আসে কেন মেয়েটা? মারধোর কবে বোধহয়।

—মু কিমিত্তি জানিবি পবা? খালি কহিবে—ভাই, মু সেইটি রহি পারিবিনি, মু মবি যিবি। সাতঅ বৎসব পুবি গলা মু পাঞ্চ হাজার টঙ্কা পণঅ দেই কিরি বাহা দউচি, মা, জোঁই বি পুজাবী-বাঙণ। মোর বহিনটাই পাঞ্জি। মন দেই কিরি সসুরঘর করে না। মতে কহচি,—সসুরটা জুড়াতন করুচি।—তাক্কর তিনোট পিলাকু মু পালিবি

কিমিতি পবা? হোব সসুৰটা পাঞ্জি ত মু কঁড কবিবি? পাঞ্চ হজাবঅ দেই নাই? সোনা দেই নাই দসঅ ভবি? সাইকেল বি দউচি পবা? সতীনঅ ঘরঅ নুয়ে, বুটা ববঅ নুয়ে। সৰ্ব্ব অছি। ঘবঅ, বরঅ, পিলা।—আপুনি কহন্ত মা, আউ মু তাক্ কাহিকি বখিবি মো পাখে? বাপাঘরকু?

—সতি তো—কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেলে পব সে কন্যাকে ঘবে ফিবিযে আনবে কেন? ঠিক কথা। গোত্রান্তব হয়ে সে এখন অন্য ঘবেব বউ। তাদের বংশধব হবে, তাবা বুকু ঠেলা। আমবা ঠিক এতটা লজিক্যাল হওয়া পেবে উঠি না। ইচ্ছে কবলেও পাৰি না। এই দ্যাখো না আমাব মেয়েকেও তো বিয়ে দিয়ে গোত্রান্তব কৰেছিলুম। তবু সে ফিবে এসে ঘবে বসে আছে। দু'দুটো মেয়েসুদ্ধ। কী কবব বলো? তা মেয়েবা কি কখনওই আসে না বাপেব বাড়ি?

—আসিব না কাঁহিকি? কামঅ পড়ি গলে আসে। বহব অসুখঅ হেলে, দাদীব কিচ্ছি হেলে, ভাইবহব পিলা হেলে, তেবেব আসিব। কামঅ সাবিকিবি ঘবকু চালি যিবব। এমিতি বুলিবাকু আসে নাই।

—তা তো ঠিকই। তা তো ঠিকই। এমনি বেড়াতে আসবে কেন? কাজ কবতেই তো মেয়েব জন্ম। শওববাড়িতেও খাটবে। বাপেব বাড়িতেও এসে খেটে দিয়ে যাবে। বিশ্রামটা কববে চিতায় উঠে। অল্প বঙ্গ কলিঙ্গ এক। কোন ভেদ নেই। সর্বত্র একই কাহিনী। কি ঠাকুব? এ-সব কথা বলতে বলতে মাথা গবম হয়ে যাবে—তুমি ববং মন্দিবেব কথা বলো। পূজো-আচ্চা কেমন চলছে?

—ভলই চলিছে। সৰ্ব্ব ভগবানব ইচ্ছা, মা। বাধামাধব যাহা কবিবে। মু নিমিত্তমাত্র। আউ কী কহিবি?

—ঠিক তাই। তুমিও যেমন নিমিত্ত, ঠাকুব, স্বয়ং বাধামাধবও তাই। সেও তো নিমিত্ত মাত্রই। আসল হলেন গিয়ে বিজনেস। বিজনেস যাহা কবিবেন। কী বলো ঠাকুব? বিজনেস সৰাব ওপবে কিনা?

—বাঃ। মা কঁড কহিছন্তি পরা। বামঅ। বামঅ।

—মা ঠিক কথাই বলছে ঠাকুব! বিজনেসই সৰাব বড ভগবান। সে তুমিও কী, আব আমিও কী। নইলে পূবীর ফুবফুবে বাতাস ছেড়ে তুমি আব তোলা তুলতে আসো কলকাতায়? এই পচা গবমে, বর্ষায়, ঘামে, ভিড়ে, হ্যাঙ্গামে? এখানেও আজকাল তোমাদেব মতন তোলা তোলবার বেওয়াজ হয়েচে, ঠাকুব। পাণ্ডা আছে। এক এক পাটিব এক এক ঘব যজমান। ঘব মানে এই দোকনঘব আব-কি। বাজাব, হকাব, এদেব পাণ্ডাব খাতা হয়েচে।

—মা কঁড কহিছন্তি? মু বুঝি পারলানি—পূবী পাণ্ডা এইটি হব কিমিতি?

—সে থাক। ও-কথা যাকগে। মেয়েদেব কথা বলো। জামাইগুলি কেমন হয়েচে সব? যুগি পান্ডব তো?

—ভল্ল, মা, ভল। জামাই সৰ্ব্ব ভল হউচি।

—লেখাপড়া জানে ?

—সব্বু গ্রাজুয়েটঅ। তিন নম্বর এম.এ. পাস করি গলা। ইতিহাসঅরে।

—বাঃ বাঃ! কদ্দুর পড়িয়েছিলে মেয়েদের ? গ্রাজুয়েট ?

—বি.কম পাস কবি গলা। আপন্দের নাতিনী বি.কম. পাস করিলে, মা ?

—নাঃ। তা আব কবলে কই ? তাব বি.কম. পাশেব এখনও দু'তিন বছর দেরি আছে। তোমার চাবটি মেয়ের প্রত্যেকেই বি.কম পাশ ?

—হঁ মা। আউ পুঅ বি একেব বি. কম. পড়ুচি। ফাস্ট ইয়াব।

—বেশ বেশ। বেশ বেশ। জামাইবা কী করে ?

হবিঠাকুব বললেন, বড় জামাই কটকে। পি. ডব্লু. ডি.-তে অফিসাব। মেজ জামাই ভুবনেশ্ববে, স্টেট ব্যাঙ্কেব ক্লার্ক। তিন নম্বর জামাই প্রফেসর, পূবী কলেজে। কাছেই থাকে। আসে-যায় (থাকে না অবশ্যই)।

—বাঃ বাঃ। খুব ভালো কথা। চার নম্বর জামাইটি কী করে ?

—সানু ঝিঅর বাহা হেই নাই, মা। ঢেনকানালে হাই ইঙ্কুলেবে পঢ়ায়।

—সে কী কথা ? কেন দাওনি বিয়ে ?

—পণ পন্দের হাজার ডিমাম্ভ করিলা। বড় দ্বিটার বেলাবে পাঞ্চ-পাঞ্চ হজাব লাগিলা। তিন নম্বরের বেলাবে দসঅ। চাবি নম্বর পন্দের চাহচি। বেট বটি যাউছি।

—ও বাবা। এত টাকা পণ তুমি দিয়েছ ? তা, তুলতে পাববে তো ? বেট অবশ্য বাড়তিই।

—কি, মা ? কঁড় কহিলা ?

—বলছি এত টাকা সবটা তুলতে পাববে তো ? ছেলে তো চারটে নেই, একটা মোটে।

ঠাকুর এক গাল হেসে বললেন—তা ঠিক। সব্বু পাৰিবিনি—এই পন্দের হাজাব, কি পচ্চিস। পণ্ডাঘবকু আসিবে পর সে কন্যা ? কুড়ি হাজার দবনি ? মু এভে দউচি। মতে দেবাকু হব কুড়ি-পচ্চিস। হঁ ! মু কহি দউচি।

—কী বললে ঠাকুর ? ভালো শুনি না কানে আজকাল—তুমি ছেলেব বেলা কত পণ নেবে বললে— ?

—কুড়ি হাজার। সানু ঝিঅব পণ পন্দের হাজার দেইকিবি। পিলাব বেলাবে বিস হজাব নেই নব। নবনি কাঁহিকি ? মু পঁইতিশ হাজার দেই নাই ? পাঞ্চ, পাঞ্চ, আউ দসঅ, আউ পন্দের। মোট পঁইতিশ।

—তা তে বটেই, তা তো বটেই। তুমি পঁইত্রিশ হাজার মেয়েদেব বেলায় পণ দিয়ে তার থেকে বিশ হাজাব ছেলেব বেলায় পণে তুলে নেবে। এ তো খুবই স্বাভাবিক হিনেব। কিন্তু ঠাকুর, তখন যে আমি তোমাকে পুলিশে দেবো।

—কঁড় কহিলা ? মা ?



—মা বলছে যে তোমাকে মা তখন পুলিশে দেবে। যেই তুমি ছেলের বিয়েতে পণ নেবে না হরিঠাকুর, অমনি আমি এখানে পুলিশে খবর দেব।

—কাঁহিকি ? কাঁহিকি ?

—কেননা ওই কমটি ঘোরতর অপকর্ম। ঘোব বে-আইনি। পণপ্রথা দেশ থেকে উঠে গেছে ঠাকুর। পণ নেওয়া পণ দেওয়াও বে-আইনি। তোমাকে অবিশি আমি এখন জেলে দিতে পারি।

—জেলেরে ? মতে ? কাঁহিকি দব ? আ-হা। মা যে কী কহিছিস্তি। ঠাট্টা কবিলে পরা ?

—মোটাই ঠাট্টা কবিনি ঠাকুর। ঠিকই শুনেছ। জেলে। তুমি পণ দিয়েছো কেন ? শুধু তোমাকে নয়, তোমাব প্রত্যেকটা জামাইকে এফুনি জেলে দিতে পাবি। ব্যাঙ্কাব, প্রফেসাব পি.ডব্লিউ.ডি-র অফিসাব সব কটা নিশ্চয়ই জেনেশুনেই পণ নিয়েছে, আব শিক্ষিত যখন। চোড়াকে ওড়িয়াতে কী বলে ঠাকুর ?

—চোবঅ কহিছিস্তি পবা, চোবাবি কহিছিস্তি।

—তোমাব সবকুটি জামাই চোবা হল। বুঝলে ?

—ছি ছি, না মা। চোবা নাই। পণপ্রথা তো যুগযুগান্তবের নিয়মঅ। হিন্দু বিবাহের রীতি। ব্রাহ্মণের কন্যাদান বিনাপণেরে আউ কিমিতি হব, মা ? মতে কহি দিয়ন্তু ?

—বেশ তো ঠাকুর। কোটে গিয়ে সেই কথা বোলো। আমি তো এখনই খবর দিচ্ছি একটা ভুবনেশ্বরের থানাতে, একটা কটকের থানাতে, একটা পুর্বাতে। কেস ঠুকে দিচ্ছি।

—আপনি ? আপনি কাঁহিকি কেস কবিরে ? পণমু দউটি পবা।

—এ হচ্ছে জনস্বার্থেব কেস বুঝলে ? যে কেউ সূট ফাইল কবতে পাবে। আমিও পাবি। এই কলকাতা থেকেই তোমাব জামাইদের পুলিশে দিতে পাবি। বুঝলে ঠাকুর ? দেশের আইনকানুনের অনেক উন্নতি হয়েছে। গণতন্ত্র এখন প্রবল আকাব, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধাব।

—মা, ম্ বুঝি পারিলি নাই।

—না বুঝবার কী আছে ? পণপ্রথা দেশের খুব ক্ষতি কবছে ঠাকুর। যে পণ দেয়, সেও পাপী। মন্দ নিয়মটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে। আব যে লোক পণ নেয় সে তো মহাপাপী। তাই তোমাব জামাইদের যত কড়া শাস্তি হবে—ধবো, তাদের হবে দশ বছর করে জেল, তোমাব কিন্তু অট্টা শাস্তি হবে না। ধবো, এই দু'বছর কবে। প্রত্যেক মেয়েব বেলায়। জেলখাটায় শাস্তি ওপবে অবিশি জরিমানাও হবে। সেও মন্দ নয়। পণের কাছাকাছিই যাবে।

—বাঃ। মা, ঠাট্টা...

—কে বললে ? এটা কি ঠাট্টার কথা ? না তোমাব সঙ্গে আমার ঠাট্টাব সম্পর্ক ? ভালো কথা বলছি শোনো, ছেলের বিয়েতে পণটা নিয়ো না ঠাকুর। আব ছোট

মেয়েৰ বিয়েতেও পণ দিয়ো না। ওতে মেয়েৰ অপমান হয়। গ্ৰাজুয়েট মেয়ে। চাকৰি কৰছে। মাসে কত কৰে পাচ্ছে?

—সাড়ে পাঞ্চসং টংকা মিডুছি। কম নুয়ে।

—সাড়ে পাঁচশো টাকা? তবু তুমি পণ দেবে? কেন দেবে ঠাকুৰ? মেয়ে তো মাসে মাসেই কিস্তিতে কিস্তিতে পণ দিচ্ছে। সুদসুদ্ধ আঠাশ মাসেই পনেবো হাজাৰ শুধে দেবে সে। খবদাৰ পণ দিয়ে বিয়ে দিয়ো না। এবং নিজে পণ নিয়ো না। এতে অধৰ্ম হয়। ভগবানেৰ লাইনে আছ। ধৰ্ম-অধৰ্ম নিয়ে পাপ-পুণ্য নিয়ে একটু ভাবতে হয়। পুৰী জগন্নাথৰ পাণ্ডা তোমৰা। তোমৰা যা আচৰণ কৰবে সাৰা দেশ তাই কৰবে। কখনও কি ভেবে দেখেছ—

—কিন্তু মা, আপুনি বুদ্ধি পাবিবেন না বেপাৰ—

—বুঝতে তোমাকেই হবে, ঠাকুৰ। ব্যাপাৰ খুব গুৰুতৰ। এখন কিন্তু নিয়ম-কানুন খুব কড়াকড়ি হয়েছ। যে লোকটা পনেবো হাজাৰ চেয়েছে তাকে খবদাৰ মেয়ে দিও না। পৰে আৰাৰ বেশি টাকা চাইবে। নানান গোলমাল কৰবে। কেবোসিনেব কেসও হয়ে যেতে পাবে। অবিশি তোমাদেব আৰাৰ ভয় কী ঠাকুৰ? তোমাদেব হাতে তো পোষা গুণ্ডাৰ দলই আছে। দাও না বেশ কৰে পাত্ৰেব বাপকে বাম-ঠেঙানি। পণ নেওয়াৰ কথা ভুলে যাবে।

—আইঃ। মা... কঁড কহিছন্ত? গুণ্ডা কৌঠি পাইবি?

—কেন? মন্দিৰেই পাবে? তা, ছেলোটা কৰে কী? কোথাকার ছেলে?

—সেবি ঢেনকানালে ইস্কলৰে পঢ়ায়।

—ওই একই ইস্কুলে? মেয়েৰ সঙ্গেই নাকি?

—ইঁ মা। হাইস্কুলকে সায়াস টিচাব, সেটা এম. এসসি. পাস।

—তবে তো প্ৰেমই মনে হচ্ছে।

—সে হেই পাবে। অসম্ভব নুয়ে। আজিকাদি ইমিতি বহুত ইউচি মা। উড়িয়াবে বি হয়। কলিকাতাবে, আউ বম্বইবে যেমিতি—

—তা তো হবেই। তা তো হবেই। সব ওই সিনেমাৰ দোষ। কিন্তু, ঠাকুৰ—ছেলেৰ জাতি কী? ব্ৰাহ্মণ তো?

—জাতি গোত্র ঠিকঅ অছি। সিটি বা পণ্ডা ঘবৰ সন্তান। সদবাজনঅ।

—তাহলে? তাহলে আব বামেলা কিসেব? লাগিয়ে দাও। ওবা নিজেবাই বেজিস্তি কৰে নিক। তুমি তাবপৰ ধুমধাম কৰে হিন্দু বিয়ে দিয়ে দাও। পণেৰ প্রশ্নই উঠবে না।

—উঠিবে। উঠিবে। মা। মো পাখৰে ঠিক উঠিবে।

—কেন উঠবে, শুনি? এ তো লাভ ম্যাবেজ? পণ নিলে পুলিশ গিয়ে বাপেব হাডগোড ভেঙে দেবে না? ছেলেবও। ইঁ।

—ছি, ছি, মা। লব মেবিজ বেজিস্টিবি বাহা, ভাল নুয়ে। এক পাণ্ডাপুত্ৰ এক

মেথবানীবে বেজেন্টিবি লবমেবিজ কবিলা, সব্ব পণ্ডা মিলিকিবি তাক্ক একঘবিকিয়া কবি, দেলে। দেলে কঁড হব ? তাক্ক কিচ্ছি হেলা নাই, দুইজনা নুআ দ্বিতল ঘবঅ বনাই কিবি দিব্বি ফুঁতিবে বহিলে। আউ কী ?

—সে কি, একঘবে হয়ে গিয়ে দোতলা বাড়ি তৈরি কবে ফেলেছে ?

—হেবে না কাঁহিকি ? মেথবানীটা ভল নুয়ে। গুটে মেথবানী হেই কিবি তু এডে বটিয়া কপসী কাঁহিকি ? সবকাবি নুগা দুকানে ভল সার্বিস করুচি। দিনকে দিন হিন্দু ধবম ভাসি যাউছি মা। তাক্কব এববে বচ্চা হেলে, সে বচ্চাব জাতি কঁড হব ? পণ্ডাপুঅব মেথব পিলাপন হব ?

—তা কেন ? পাণ্ডাব ছেলে পাণ্ডা হবে। বামুনেব ছেলে শাস্ত্রবেব মতে বামুনই হয়।

—আই মা। মেথবানীব গর্ভবে পণ্ডা হব ? ছি ছি।

—কেন হবে না ? গর্ভে কী এসে যায় ? স্ত্রীবত্ন দুহুলাদপি। শোনোনি ? কুব্জেন্দিব বাজদেব জন্ম তো জেনেলীব গর্ভে। সত্যবতীর জাত কী ছিল ? ঘটাকচবেই বা জাত কী ছিল ? ওসব নিয়ে ভেবো না, ঠাকুব। এখনকাব আইনে মেথবানীব সন্তানেব ব্রাহ্মণ হওয়া কেউ ঠেকাতে পাববে না, ববং দেখবে বামুন হলেই অসুবিধে হচ্ছে। জাত তুলে একদম কথা কইবে না, ঠাকুব। পুলিশে ধবে নিয়ে যাবে।

—না মা। মু আউ কহিবি। সবকাবি আইন বড জববদস্তি হেলা। পুঁবাব দেবদাসী-প্রথা বি উঠাই দিলা—এবে লাস্ট গুটে বুড়ি দেবদাসী মবিলে, আউ প্রথাবন্ধা হবনি। সব্ব নষ্ট।

—দেবদাসীপ্রথা আব বেখে কাজ নেই ঠাকুব, যেমন পণপ্রথাও আব বেখে দরকাব নেই। পণ দেবাব প্রশ্নই ওঠে না। ছেলেব বাপকে ঠেঙাতেও হবে না। ছেলেব বাবা তোমাব কিছই কবতে পাববে না। তুমি বিয়েটা বিনা পণেই দিয়ে দাও, জয় জগন্নাথ বলে।

—সে বি পণ্ডা অছি, মা। পাত্রবঅ বাপা।

—অঃ। তাই বনো। সেটাই তবে ঝামেলা ? তাব মানে তাবও প্রাইভেট গুণ্ডাবাহিনী আছে ? আই সী। তা, তাব মেয়ে নেই ? অববাহিত ?

—অছি। তিনোটি ঝিঅ। পঢ়ালিখা করুচি।

—তাদেবই একটার সঙ্গে বদলাবদলি কবে নাও না ববং তোমাব ছেলেব সঙ্গে ? কেউ কারুব কাছে ববপণ নিয়ে না। কেমন ? হতে পাবে না ?

—সেটি হেই পাবে। সেইটি মন্দ নুয়ে।

—বাস। সেইটিই কববে। এ-কথাব আব নডচড নেই। নো-পণ। বদলাবদলি। নইলে আমি কিন্তু পুলিশে খবর দিয়ে রাখছি। ঢেনকানালেব বাজবাডিব সব্বাই আমাদেব বন্ধুলোক। এতটা অধর্ম আমি কবতে দেবই না। একেই তো তোমাবা

ফক্কিকারি চালিয়ে দিবি। বিজনেস গুছিয়ে নিচ্ছ, আবার পণ দেয়া-নেয়াও করবে, উনিশশো তিরিশিতে? উঁহ—জেনে শুনে সেটি হতে দিচ্ছি নে। মহাপাপ হবে। ঠাকুর, চা খাবে তো? খুকু, ঠাকুরের জন্যে আর আমার জন্যে দু'কাপ ভালো কবে চা—

—আউ মু চা-পানি কিচ্ছি খাইবিনি। মা, মু একে ঘবকু যাউছি। পরসাদ নেই কিরি মতে ছাড়ি দিয়ন্তু।

—প্রসাদ? বেশ, দিচ্ছ দাও। ওসব পেসাদ-ফেসাদে আমার আর বিশ্বাস নেই, ঠাকুর। আবার এসো, সামনের বছর যদি থাকি, দেখা হবে। কিন্তু পণ যদি নিয়েছ, আমি থাকি বা না থাকি, ঠিকই টের পাব কিন্তু বলে দিচ্ছি। স্বর্গেই থাকি আব—

—না না, এতে তাড়াতাড়ি মা স্ববগকু গিব্ব কাঁই?

—বেশ, স্বর্গে যদি নাও থাকি, ধব যদি নরকেই থাকি, বা মর্তেই থাকি—পুলিশে খবরটি ঠিকই পৌছে দেব।—এ হল জনস্বার্থের মামলা। শেষ জিত ধর্মের হবেই। বুঝলে না? (ফিসফিস করে) আবে, আমিও যে ধর্মেরই ধবজাধারী—আমিও তো পাণ্ডাই। ঠাকুর—শোনো বলি। আমাদের ধর্মটা শুধু একটু হাত বদলে ধর্ম-যাজকদের হাত থেকে ধর্মাবতাবদের কাছে চলে এসেছে—মন্দির থেকে কোটে। এখন ধর্ম মানে জাস্টিস। বুঝতে পারছ? আমার স্বপ্নরবাড়ির সবাই সেই ধর্মের পাণ্ডা। সবাই যে উকিল ব্যারিস্টার জজ মাজিস্ট্রেট। ভগবান ইদানীং এখানেই বসবাস কবছেন কিনা—। মন্দিরে মন্দিরে যা নোংরাশ্মি গুণ্ডামি দলাদলি খুনোখুনি—ও কি। ও কি। উঠে যাচ্ছ যে বড়—তোমার প্রণামীটা নিয়ে যাও? ওটা না নিয়ে পালালে তো চলবে না—বংশের যেটা বেওয়াজ—অকল্যাণ হবে যে। অ ঠাকুর—

### স্কেন্স বারো

—আচ্ছা খুকু, বলতো দিকি, জগতে সবচেয়ে সুখী কে? আই বেট, তুই বলতে পারবি না।

—জানোই গখন, তখন জিজ্ঞেস করছো কেন মা? তোমার নাকে অস্ত্রিজেনেব নল। হাতে গ্লকোজের ছুঁচ। এখন না হয় বককপী ধর্মের বোলটা তুমি নাই নিলে? বেস্ট নেওয়া উচিত নয় এখন?

—তার মানে তুই উত্তরটা জানিস না। এই তো? জানতুম, পারবি না।

—আমি তোমার মতন ধীমতী নই মা। ইনফ্যান্ট তোমার চেয়ে বেশি কেন, তোমার সমান বুদ্ধিমান লোকও আমি জীবনে খুবই কম দেখেছি। ভু-ভাবতে কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার জুড়িটি নেই।

—মেলা তেলাসনি বাছা। তবে এই প্রসঙ্গে যে 'বুদ্ধিমান' শব্দটি ব্যবহার করলে তাতে আমি খুব আনন্দিত। 'বুদ্ধিমতী' যে বললে না, এটাই তোমার বুদ্ধির প্রমাণ।

—থ্যাংকিউ!... কিন্তু ঠিক কোন কারণে বলছ এটা?

—সেটাও যদি তোমাকে বানান কবে বলে দিতে হয় মা তবে আমারই হিসেবে ভুল ছিল। আব তোমার ভুল ছিল স্বেফ ব্যাকবণেব লিঙ্গভেদে। ‘উইমেস লিব’ বিষয়ে তুমি অজ্ঞ মনে হচ্ছে। সে যাক গে, আমার প্রশ্নেব জবাব কই?

—কোন প্রশ্ন?

—আবে। এব মধ্যেই ভুলে গেলে? এটা একটা বেকর্ড টাইমের মধ্যে ভুলে যাওয়া কিন্তু। নাঃ। জগতে বুদ্ধিই সবচেয়ে জরুবি বস্তু নয় দেখেছি।

—নয়ই তো। স্মৃতিও খুব জরুবি। প্রশ্নটা ছিল কী? খেই ধবিয়ে দাও।

—ঐ যে, জগতে সবচেয়ে সুখী কে?

—তাব উত্তব তো কবেই—

—আহাঃ। সেটা তো মহাভারতের উত্তব। যুধিষ্ঠিরের দিনকাল পালটে গেছে তো, এখন এসব পাচা পূবনো উত্তব চলবে না। তোমাব নতুন যুগের মানুস—নতুন জবাব খুঁজে দাও। শাক্সনে এখন বড়জোব ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পাবে, সুখ কিন্তু হয় না। নতুন যুগেব নতুন উত্তব চাই।

—পূবনো প্রশ্নেব নতুন উত্তব?

—প্রশ্নটা চিবস্তন। সংকটজনক পরিস্থিতি যেমন চিবস্তন হলেও সংকট মোচনেব পন্থাটা তো চিবকালই এক হয় না—যুগে যুগে বদলায়, এটাই জগতেব নিয়ম। ইতিহাসের ধাব। ধর্ম বলো, দর্শন বলো, রাজনীতি বলো, এবা তো যুগ যুগ ধবে এটাই কবে আসছে। পূবনো প্রশ্নের নতুন উত্তব যোগানো। প্রশ্নটা একই থাকে, শুধু যুগে যুগে, দেশে দেশে, সভ্যতা বিশেষে, সময় বিশেষে এবং চিন্তাবিদ বিশেষে জবাবটা পালটে পালটে যায়। যেমন ধবো মূল্যবোধেব প্রশ্ন। প্রশ্ন তো পালটায় না, উত্তবই পালটায়। তাই নয় কি?

—তাই বটে। কিন্তু মা, তোমাব—

—আচ্ছা, আবো সহজ কবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি তো, বাবা, একটু মাটে আছো। এই ধবো না কেন আমার অসুখের কথাটা। আসলে এই যে অসুখটি আমার হয়েছো এটি তো ঠাণ্ডা লেগে বৃকে সদি বসে জ্বব, কাশি, ইত্যাদি? এ নির্ধাৎ মনুষ্যপ্রাণীব চিবকালই হয়ে আসছে। আজ বীজাণু পবীক্ষা কবে একে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া বলছে। আগে অন্য কিছু বলতো। চবক-শুশ্রূত নির্ধাৎ কোনো সংস্কৃত নামে এই বোগেব ওষু লিখে গেছেন.. গ্রীস বোমেব চিকিৎসকবা আবো কোনো অন্য ট্রিটমেন্টেব বন্দোবস্ত কবেছেন, আবব মিশবেব হাকিমবাও মন্ত মন্ত পণ্ডিত ছিলেন, তাবা আবাব আবেক বকম প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। সবেতেই এই বোগটা সেবে যেত। বৃকালে কথাটা?

—বৃকলুম। নতুন বোতলে পূবনো মদ নয়, পূবনো বোতলে নতুন মদ।

—ওসব মদেব বোতলেব উপমা ছেড়ে দাও। ওটা এখানে অপ্রযোজ্য। অভান্ত

উপমা দিয়ে সব কিছু বুঝে নেবার টেন্ডেন্সিটাও ছেড়ে দাও। ওটা অল্পবুদ্ধির লক্ষণ। অশিক্ষিত এবং শিশুরা এটা কবে থাকে।

—মা, তোমার কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হত না?

—চিববিশ্রাম তো নিতেই হবে মা। আশি বছরে ব্রহ্মোনিমোনিয়া মানেই চিববিশ্রামের সৃষ্টি আয়োজন। তা তোমারাই তো সে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালে। মাকে নল শিষ্য ছুঁচ, একেবারে আসুরিক যুদ্ধের বন্দোবস্ত কবেছ। এ যাত্রায় মনে হচ্ছে চিববিশ্রাম আর হল না। এ শীতটাকেও হাবিয়ে দিলুম। বৃদ্ধবৃদ্ধা শুকনোপাতার মতন। শীতকালেই বেশি ঝাবে যায়। তা, আমি বোধ হয় ডালেই ঝুলে বইলুম।

—চপ করো, চপ করো, ডোন্ট টেম্পট থ্রিভিডেন্স। মা।

—অঃ। ইংবিজিতে কুসংস্কার প্রকাশ কবছো? মার গায়ে যাতে 'নজব' না লেগে যায়? বেশ বেশ। ইংবিজিতে বললে কানে তেমন ঠেকে না, নাহে? এই জন্যেই তবে 'ইংবাজি শিক্ষা'? কুসংস্কার ট্রান্সলেশন করবার জন্যে। উত্তরটা কিন্তু দিলে না। স্মৃতিলি এ্যাভয়েড কবে যাচ্ছ।

—আমি জানি না উত্তর। জগতে সবচেয়ে সুখী কে? কে জানে? অন্তত আমি যে নই এটুকু বলতে পারি।

—ইয়ার্কি মেবো না। চিন্তা করো।

—জগদগুরু শঙ্কবাচার্য চতুষ্টয়? অথবা মার্গারেট থ্যাচার? কিংবা ন্যাসি রেগন? যাদবপুরে মমতা ব্যানার্জি, দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী, বঙ্কতে অমিতাভ বচ্চন, হিন্দুস্থান পার্কে তুমি। অঙ্কে এন-টি-আব, চাঁদে শশক? কী জানি মা, মনস্থির করতে পাবা শব্দ। আচ্ছা, বলছি। জগতে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি, সত্যজিৎ বায়। সবচেয়ে গ্ল্যামাভাস অন্তত। আফটার মেবিলিন মনবো। হয়েছ উত্তর?

—যতসব ছোট কথা। কত বড় প্রশ্নের কত ছোট উত্তর। শোনো, আমি বলে দিচ্ছি, জগতে আজকের দিনে যে কোনো লোকের পক্ষেই সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হওয়া খুবই সহজ। সেটার জন্য অত মহৎ ব্যক্তি হতে হবে না এবং সেই সহজ সুখটি আহরণ না কবে মানুষ সেধে সেধেই নিজের জীবনকে দুঃখে জর্জরিত কবে তোলে। অযথা টেনশন সৃষ্টি কবে জীবন বিপন্ন কবে ফেলে। স্প্রে-টা দাও সিগারেট।

—আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন মাসিমা। দিদি, আপনি নিচে যান। মাসিমা বড় বেশি কথা বলছেন। শব্দ খাবাপ হবে—

—দিদি নিচে যাবে না। তুমিই নিচে যাও। আমার এখন নার্সিং দবকাব নেই। আমার কম্প্যানি দবকাব। ওটাও খুব জরুরি।

—ঠিক আছে মা—আমিও থাকি, আর সিগারেট থাকুক। তুমি ববং একটুক্ষণ কথা না বলে মৌনীবাবা হয়ে কথা শোনো। তাহলেই উনি কিছু বলবেন না।

—ছিলুম তো মৌনী এই কটা দিন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বাধ্যকরী শোনবার মত

কথা কে বলবে যে শুনব? সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি কে তুমিই শুনে রাখো। সেই সুখীতম, যাব সমস্ত ইনকামট্যাক্স পূরোপূরি নিঃশেষে শোধ করা অভ্যাস। যাব ব্যক্তিগত কোনো ঋণ নেই। সবকাবের কাছেও কোনো ঋণ নেই। সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সুখী। আমি মবলে ডেথডিউটি পূরো দেবে। যদি লাগে। ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোরো না।

—ও। আচ্ছা। তুমিই সব দিয়ে থায়ে যাও না উকিল ডেকে, হিসেব করবে।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ব্যাপারটা ধবতে পাবলে না, অথবা ইনকামট্যাক্স দাও না বা দিতে চাও না। অবিশি তোমার যা ইনকাম, সম্ভবতই ট্যাক্সবল নয়।

—তা কেন, আমাদের তো মাইনে থেকেই কেটে নেয়।

—আমরা তো বাত্ম তৈরি, টিউবওয়েল বসানো বা হাসপাতালের উন্নতি এসব ব্যক্তিগতভাবে করি না, করার শক্তিও বাধি না। কিন্তু যথায়টা ট্যাক্স দিলে, জানি, আমার সামান্য বোজগাবও দেশের উন্নয়নের কিছু কাজে লাগছে। কত সুখ এই চিন্তায়। ভাবো, কত শান্তি।

ভাবলুম। কিন্তু এও তো পূর্বনো উত্তরই। অস্বাভাবিক।

—মা, ট্যাক্সের টাকার কিন্তু সদ্ব্যয় হয় না—অপব্যয়ই বেশি হয়, সবকাবি লোকেবা নিজেদের পিছনেই খবচ করে। চুবি অনন্ত।

—হোক অপব্যয়। তুমি-আমি যা খরচ করব সবটাই তো নিজের পেছনে, সবটাই তো অপব্যয়, সেনসব সত্ত্বেও যেটুকু উদ্ধৃত হবে চক্ষুলাজ্ঞা বাঁচাতেও সবকাবি মহল যেটুকুনি দেশের কাজে লাগাবেন, সেটুকুই পুণ্য। এখন আমার পাপপুণ্যের ধারণাটা বদলে গেছে। ছেনেবেলার মত নেই। ধর্ম থেকে সমাজের দিকে চোখটা ঘুরে গেছে। আর নষ্টও থেকে সদর্থের দিকে।

—কীবকম? কীবকম?

—এসব প্রশ্ন করবেন না দিদি। আরো কথা বলবেন মাসিমা তাহলে। কাল সাবাবাত ধরে আমাকে বলেছেন পাপ কী আর পুণ্য কাকে বলে। এদিকে এখনও দিনের সিস্টার এল না—কখন যে আসবে?

—না আসুক। দিনমণি তো এসেছেন। তোমার ডিউটি শেষ। তুমি যাও। তুমি আর আমাতে মনোনিবেশ কোরো না তো, বাবান্দায় যাও। ওই দাখো বাস্তব কিসেব শব্দ—শোনো।

খুকু, পাপ আর পুণ্য দুটোই আসলে নিতান্তই সমাজ-সম্পর্কিত, সমাজ-উদ্ভূত ধারণা। আধ্যাত্মিক বা ভগবত-বিষয়ক কোনো ব্যাপারই নয়। অম্বুবাচী-একাদশী-গরু ব মাংসটাংসের সঙ্গেও যুক্ত নয়। সমাজের প্রতি ব্যক্তির আচাৰ আচরণ কেমন, তাই দিয়েই নির্ধারিত হবে কোনটা পুণ্য, আর কোনটা পাপ। যাতে সমাজের আর সকলের

মঙ্গল, উন্নতি—সেইটেই পুণ্য, আর উন্টোটা হচ্ছে পাপ। অর্থাৎ যাতে সমাজের সকলের অমঙ্গল, অবনতি ঘটে—সেই কর্মই অপকর্ম, পাপকর্ম। বুঝলে? ব্যক্তিকে সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে। পাপ ব্যক্তি করে, ক্ষতি সমাজের হয়।

—হঁ। পোপও বলেছিলেন এমনি কথা—

—পোপ যাই বলুক, শুনতে চাই না। কোন পোপ? পোপ বলে কেউ নেই, নন্দব কি?

—আলেকজান্ডার পোপ, মা। কবি।

—ও। নাম শুনেছি। পোয়েটস কর্নাবে সমাধিস্থ কি? নাইটিং ফিফটিতে—আচ্ছা খুকু, দ্বাদশ জনকে তোমার মনে আছে? ভেটিকানে?

এখন তো বোধহয় পোপ পলের বাজদু চলছে, না? ৬ নং না ৫ নং? পোপ জন দি টুয়েলফথকে তুমি যে ভাটিকানে গিয়ে স্রচ্ক্ষে দেখেছিলে, হোলি ইয়াবো, তোমার মনে আছে কি? অবশ্য খুব ছোটো ছিলে।

—আছে মনে একটু একটু। বড্ড ভিড ছিল। উনি তো বারান্দায় বেবিয়ে হাত নাড়লেন। লাল-সাদা জামা ছিল গায়ে।

—ভিডেব কাবণ যুদ্ধের পর ঐ প্রথম হোলি ইয়াব। ক্যাথলিকরা সারা পৃথিবী ভেঙে এসে জড়ো হয়েছিল রোম শহরে। তুমি খুকু খুবই সৌভাগ্যবর্তী। ওটা খুব জকবি ‘দর্শন’ ছিল। অনেক মৃত্যুর পর্ব।

—তা আর বলতে? নেস্টট রোমে যাই অলিম্পিক্সের বছর, সোজা ইণ্ডিয়াকে হকি খেলে জিততে দেখে এলাম। এখন তো কেবলই হারে। একমাত্র ওয়ান ডে ক্রিকেটে ছাড়া। সবচেয়ে হার।

—কেবল হালকা কথা। কত বড় বড় মহৎ মানুষকে তুমি চোখে দেখেছো—সেসব লিখে বেখেছো কোথাও? ডাইবি রাখতে এত কবে অভ্যাস কবালুম ছোটবেলায়। বড় হয়েই ছেড়ে দিলে। দুর্ভাগ্য।

—তুমি ভো মা আমার চেয়েও বেশি বেশি কবে বিখ্যাত সব মানুষদের দেখেছো। তুমিও তো লিখে বাখিনি। কতকাল আগে ছেড়ে দিয়েছো ডায়েরি লেখার অভ্যাস। কেন ছাড়লে?

—কিছুই থাকে না। আমিও খুব ভাগ্যবর্তী। সে কথাও ঠিক। দেশ-বিদেশের অনেক গুণীমানী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি জীবনে। কিন্তু এহ বাহ্য। কিছুই থাকে না। লিখেই বা কী হবে?

—মা, আমাকে তুমি একটাও শিশির ভাদ্রী নটক দেখাওনি। এ দুঃখ কিন্তু আমার কখনো যাবে না।

—কে বলল দেখাইনি। তুমি সীতা দেখেছ। অথবা অভিযোগ করার স্তব্ধ ভাল না।

—যাঃ সত্যি? সত্যি বলছো মা? আমি সীতা দেখেছি?



—সত্যি। আমাদেরই ববং তুমি দেখতে দাওনি। এত ডিস্টার্ব কবেছিলে যে উঠে আসতে বাধ্য হই আমি। তাবপব থেকে কোনো থিয়েটারে তোমাকে নিয়ে যাইনি, একেবারে শঙ্কু-তৃপ্তির সময়ের আগে। ততদিনে একটু মানুষের মতন হয়েছো। চূপ কবে বসে দেখতে। তোমাব স্বভাব যে বডোই অমার্জিত ছিল বাবা। প্রাকৃতজনোচিত। এখনো আছে।

—মা, তুমি গিবেশ ঘোষকে দেখেছো?

—“সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল”—নাঃ, আমাব আব গিবেশ ঘোষকে দেখা হয়নি। তবে তাঁব ছেলেকে দেখেছি। দানিবাবুকে। দানিবাবুই কি কিংবদন্তি হিসেবে কম যান? আতুতুতু কবে আধো আধো বুলিতে কথা কইতেন। ঠিক তেমনি কবেই মধ্যে অভিনয়ও কবতেন—দানিবাবু কেন, আমবা আবাব স্বয়ং অমৃতলাল বসুকেও দেখেছি—

—ঈস-স—বসবাজ?

—হায়বে তখন কিছু জ্ঞানই ছিল না। জ্ঞানতুম না মোটে কী জিনিস দেখছি। কাকে দেখছি। ঠিকমতো মূল্য দিতে পারিনি সেসব অভিজ্ঞতাব।

—থাক থাক, অত কথা বলে কাজ নেই। আবেকদিন শুনবো।

—আবেকজনকে দেখেছিলুম।

—বিবেকানন্দকে?

—তাঁকে তে দেখিনি, তবে সিন্দাব নিবেদিতাকে আমবা দেখেছি। তাছাড়া আমি ইয়ে, সাবদা দেবীকেও দেখেছি। শ্রীমা, আব কি। তাঁকে দেখাব ভাগ্য হয়েছিল।

—সে কি? এতদিন বলোনি কেন? এত বড় একটা কথা চেপে যাচ্ছিলে?

—বলবাব কী আছে? কী হবে বলে?

—কোথায় দেখলে? দক্ষিণেশ্বরে?

—না, অন্য জায়গায়। বাগবাজাবে। উদ্বোধনে।

—উদ্বোধনে? ওখানে তুমি কেন গিয়েছিলে মা? সাবদা দেবীকে দেখতে?

—নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলুম। চপলা দেবী নামে একজন বালাবিধবা মহিলা নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষিকা হয়ে। বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেনডেন্ট ও শিক্ষগিত্রী হয়েছিলেন। উনি খুব স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। চপলা দেবীক কাছে গিয়েছিলুম। সেখানে গণেন মহাবাজেব সঙ্গে দেখা হল। তিনি যাচ্ছিলেন উদ্বোধনে শ্রীমাব কাছে। আমি তখন ১৫-১৬ বছরের মেয়ে। গণেন মহাবাজ যাচ্ছেন শুনেই আমিও যাব বলে নেচে উঠলুম। খব ওৎসুকা উদ্দীপনা ছিল। ওই গণেন মহাবাজই শ্রীমাব কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁব সর্বত্র অব্যর্থ গতি ছিল। খুব পারোপকারী মহৎ মানুষ ছিলেন। নন্দলাল বসুব ছবি নিজে সেধে নিয়ে গিয়ে ধনীদেব বাড়িতে বিক্রি কবে দিতেন। আজকাল তেমন গণেন মহাবাজেব নাম শুনি না কোথাও। অথচ এককালে—

—মা, সাবদামণিকে তোমাব কেমন লাগলো?

—অমি তখন ছোটো তো—কীই বা বুঝি, আমাব মনে হয়েছিল সাবদামণি গ্রাম্য সবল সাধারণ গিন্নি। ঘবকন্না, নিজেব ভাই, ভাইপো-ভাইঝিতে তাঁব মন ছিল। তাঁব মধ্যে লোক ঠকানোব, বং চড়ানোব, মিথোব বা কৃত্রিমতাব কোনো ব্যাপারই ছিল না। তাঁব সবলতা ও সততা ছিল অসামান্য। যজ্ঞমানই হলো ভাত-ভিত্তি বামুনদেব। তিনি সেটাই বুঝতেন, তাই তাঁর মন্ত্রশিষ্যদেব প্রতি অগাধ স্নেহ ছিল। অন্যদের দিকে ততটা মন দিতেন না বোধ হয়। অন্তত আমি তো তাই দেখেছিলুম। একেবারেই অকৃত্রিম, সোজা মানুষ। লোক-দেখানো কিছুই কবতেন না। সেজন্যে তাঁব প্রতি খুবই শ্রদ্ধা হয়েছিল, পরে। প্রথমে কেমন একটা ধাক্কা লেগেছিল।

—ধাক্কা? কেন মা?

—তখন তো আমাবা সদাকিশোরী, ব্রাহ্মসমাজ প্রভাবিত, নাগবিক স্মার্টনেসেব মোহে বিমোহিত। তখন ওঁকে মনে হয়েছিলো গ্রাম্য। ওঁব অকৃত্রিমতাকে গ্রাম্যতা মনে হয়েছিলো। সেটা ঠিক নয়। এখন বুঝতে পাৰি।

—সে তো বামকৃষ্ণদেবকেও গ্রাম্য মনে হয় শ্রীমাব লেখা থেকে। ওঁবা গ্রামেব লোক, গ্রাম্যই তো ছিলেন। তাতে হয়েছোটা কি? এটাই তো স্বাভাবিক। তাই না?

—তোমাদেব এখন যেমন গাঁ নিয়ে মাতামাতি—কেননা শহর এখন পুরনো হয়ে গেছে। ফোক সং, ফোক টেল, ফোক ডাস, ফোক কালচাব। আমাদেব সময় তো তেমন ছিল না। তখন কলকাতা শহর নিয়েই আসল মাতামাতির যুগ। নাগবিকতা তখনও নতুন। বুদ্ধদেব বসুদেব লেখা পড়ে বোঝো না? এখন মহাশ্বেতাব কল্যাণে গ্রাম, উপজাতি এবা সবাই মান্যগণ্য হয়েছো। তখন ঠিক তা ছিল না—জানিস।

—কেন? তাবাসন্দেব, বিভূতিভূষণ এবা সবাই তো গ্রাম-জীবন নিয়েই লিখেছেন। শবৎচন্দ্রও তো তাই।

—তবুও, গ্রাম্যতাটা আলাদা কবে গুণেব কিছু ছিল না। জীবনেব অঙ্গ ছিল। এখন তোমাদেব কীসব ব্যাক টু নেচাব না ব্যাক টু ভিলেজ, ব্যাক টু দি কন্ট্রি না কীসব শব্দেব কাষদা হয়েছো না—তখন তো তা ছিল না। এখন যে জিনিস যতটা গ্রাম্য, ততই তাব কদর শহরেব কাছে।

—আচ্ছা মা, সাবদামণিকে কেমন দেখতে ছিল? ছবিতে যেমন দেখি, তেমন সুন্দর?

—ঠিক তেমন সুন্দর। খুব সুন্দর শ্রীময়ী, লাবণ্যময়ী, গেবহু বউ যেমন হলে চোখে ভাল লাগে তেমন। বেশ স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ছিলেন। হয়তো আনন্দময়ী মাব মতন ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন না। আনন্দময়ী মাকে অল্প বয়সে তো দেখিসনি।

—তুমি দেখেছিলে ববি?

—তা দেখেছি। কিন্তু সাবদামণিব মতই তিনিও মাতৃমূর্তি ছিলেন, এমন-কি অল্প বয়সেও।

—মাসিমা, আপনি এখন ওষুধটা খেয়ে নিয়ে এবার একটু বিশ্রাম করুন। এত কথা বলবেন না—

—থাক মা, সত্যি এখন আর কথা বলে কাজ নেই—ওষুধটা খেয়ে চুপচাপ থাকো কিছুক্ষণ।

—কেন? তোদের আবাধ্যা দেবী আগাথা ক্রিস্টিব সঙ্গেও তো আমি বেশ দশবাবো দিন ছিলাম। হেলসিংকিতে। দাও ওষুধ? কই, দাও। আগাথা চেন মোকাব।

—হ্যাঁ? সত্যি? আগাথা ক্রিস্টি? তিনি তোমার সঙ্গে কি কথা বললেন?

—বেশি না। উনি কেবলই ফ্রেঞ্চ বলছিলেন কিনা সকলের সঙ্গে। আমি যদি-বা কষ্টে-সুখে দু'হাতের ইংরিজি বুঝতে পারি, ফরাসি তো গোমাংস। তাই বেশি কথাবার্তা হয়নি। তাছাড়া...

—তাছাড়া?

—তাছাড়া উনি বেজায় অহঙ্কারী মহিলা ছিলেন, অন্য মেয়েদের খুব একটা পাত্র দিতেন না। ঐ যে একেব পব এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন, আমারও দেখতে ভাল লাগতো না। অবশ্য তাঁরও ঠিক এশীয়-টেশিয়দের সঙ্গে কথা বলতে, কাল। আদমিদের সঙ্গে মেলামেশাতে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। এক ওই, হোচিমিন-এব সঙ্গে, ফ্রেঞ্চে একটু-আধটু কুশল বিনিময় ছাড়া।

—কে? হোচিমিন বললে কি? মা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ইন্দোচায়নাব, এখন তোরা তো বলিস ভিয়েৎনামের, কবি এবং বিপ্লবী নেতা হোচিমিন বে।

—একটু একটু ঘনাদাব মত শোনাচ্ছে কিন্তু মা। কিছু মনে কোরো না। একটু নয়, ভীষণ।

—তাহলে শুনিসনি, কে সেথেকে?

—সত্যি সত্যি হোচিমিন? মা? অ মা?

—এব পবে তাকেই তোব নতিনাতনী বলবে—আঁ? সত্যি সত্যি মহাআ গান্ধীকে দেখেছিলে? কইন এলিজাবেথকেও দেখেছিলে? আঁ—ববি ঠাকুরকেও? সত্যি সত্যি সত্যজিৎ বাবকে চিনতে? তখন তুইও ঘনাদা হয়ে যাবি। সত্য তো মিথ্যাব চাইতেও বেশি অবিশ্বাস্য বে।

—অ। বেশ। তাহলে বলো, আগাথা ক্রিস্টি হোচিমিনের সঙ্গে ফ্রেঞ্চে গল্পগুজব করতেন সিগারেট টানতে টানতে, আর তুমি কি করতেন সেখানে?

—কিছুই বুঝতুম না, আর খুব বোদ্ধার মতন মুখ কবে বসে থাকতুম। তোব নাবাব সঙ্গে গল্প করতুম। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড বাগ হতো। নাঃ, আগাথাকে কিন্তু একদমই ভালো লাগেনি আমার—ভয়ানক উন্নাসিক—

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে, মা। ভীষণ।

—বড্ড দান্তিক। অবশ্যই দান্তিক হবার সোগ্যতা সে বাখে। তবুও। হোচিমিন

কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। তিনিও তো কিছু কম জরুরি মানুষ নন! নানান দিক থেকে। আজকের যুগে দেখতে গেলে, ঢেব বেশি জরুরি, ইতিহাসে।

—মাগো? হোচিমিন তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?

—কতো! আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। উনি লাজুক স্তম্ভাবের। কিন্তু অমিশুক নন। আর কি চোখ। কি দৃষ্টি। সত্যি, খুব, এত সুন্দর চোখ—যেন ককণা ঝরে ঝরে পড়ছে। ঠিক মনিষ্যদেব মত দেখতে রে—মানুষের প্রতি মমতা, ককণা যেন উপচে পড়ছে—এমনি চোখের দৃষ্টি ছিল তাব—কখনো কখনো কবিগুরু চোখেও অমন মায়াময় দৃষ্টি দেখেছি আমরা, আর কখনো কখনো গান্ধীজীব চোখেও। কিন্তু হোচিমিনের চোখ সর্বদাই ওইবকম। আব হাসিটা কি বলব—

—কেমন? হাসিটা কেমন? হাসতেন খুব?

—ঠিক একটা শিশুর হাসি যেমন হয়। হঠাৎ হঠাৎ হেসে ফেলতেন। গান্ধীজীব ফোকলা মুখের হাসির মতো। উনি অবশ্য ফোকলা ছিলেন না। বোজাই আমবা বিকেলে একসঙ্গে চা খেতুম। উনি চাইতেন এশীয়বা সবাই একসঙ্গে ঘোবেফেবে, একসঙ্গে থাকে-টাকে। এখন যে তোবা থার্ড ওয়ার্ল্ড-টোয়ার্ল্ড বলিস, তখন তো অতশত শব্দের খেলা তৈরি হয়নি। তখন সবে ভিয়েতনামের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই বছবেই দেখা—তখন পৃথিবীটা অন্য বকম চবিত্রের লোকে ভরা ছিল। ইলিয়া এবেনবুর্গ বলেছিলেন—

—তাকে আবার কোথায় পেলো?

—তাকে তো তুমিও দেখেছো পাবে। দিল্লিতে? এশিয়াব লেখক-সমাবেশে? মনে নেই?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

—তুমিই তাকে বলেছিলে তাঁর তিন বন্ধু না কী যেন বই পড়েছো। আমি তো তাঁর কিছুই পড়িনি। আমাদের প্রথম দেখা হেলসিংকিতে। উনিও ছিলেন। পীস কংগ্রেসে।

—মা, আমাব কিছু মনে নেই।

—অতি দুর্ভাগা মেবে মা তুমি। তোমাব কি শলোকভকেও মনে নেই?

—শলোকভ? মানে কোয়াফেট ফ্লোজ দ্য ডন?

—হ্যাঁ, ধীরে বহে ডন যিনি লিখেছেন।

—আমাব তাঁকে কী করে মনে থাকবে মা, আমি কি তোমাদের সঙ্গে বাশিয়া গেছি? আমাকে তোমাব নিয়ে যাওনি—

—অভিযোগ কোনো না। অভিযোগ কবতে নেই। কলকাতায় এসেছিলেন শলোকভ। তোমাব কি সেই সভায় নিয়ে যাইনি তা হলে?

—নিশ্চয়ই না। তাহলে আমাব ঠিক মনে থাকতোই।

—এবেনবুর্গের কথাটা মনে আছে। তুমি অটোগ্রাফ খাতায় সইও করে নিয়েছিলে এবেনবুর্গের। খুঁজে দেখো, শলোকভই আমাকে চামডাব ওই বাদামী রঙের বইয়ের

মলাটটা দিয়েছিলেন সোনালি এনগ্রেভিং করা—তুমি যেটা কেবলই নিয়ে নেবাব চেষ্টা করতে।

—যেটা শলোকভের দেওয়া উপহাস!

—তোমাকে তখনই একধিকবার বলা হয়েছে সে কথা। আজই যেন প্রথম গুনলে এরকমভাবে কথা বোলো না।

—ভুলে গেছি মা।

—কোন দিন মাকেও ভুলে যাবে।

—ওঃ হো, সত্যি তো? শ্রীমাব কথাটা ঢাপাই পড়ে গেল—মা, সত্যি! কাবটা শুনবো, কার কথাটা তুলে রাখবো?

—ভাগ্যিস অসুখ কবেছিল, তাই তো কাছে এসে বসলি দু' মিনিট। না বসলে শুনবি কেমন কবে?

—কী কববো মা—সময় হয় না যে মোটেই। বলো, মা, শ্রীমাব কথাটা বলো।

—ওই তো। আমি তখন খুবই ছোটো। যদিও বাল্যবিধবা, পড়াশুনোয় ভীষণ আগ্রহ বলে শশুরবাড়ি বাপের বাড়ি উভয় পক্ষই আমাকে ইন্ধুলে পড়াতে বাজি হলেন। নিবেদিতা ফুল তখন মেয়েদেব খুব ভাল ইন্ধুল। কিন্তু সেখানে নাকি বিবাহিত মেয়ে নেয় না—থাকগে ওসব কথা।

—মা, বড় ভ্রাতাতন কবছো কিন্তু। যেই জমে উঠছে, অমনি—বলো দিকিনি শিগগিরি কী হলো—

—হবে আব কী? হলো না।

—তোমাকে ওঁরা নিতে বাজি হলেন না?

—তা নয়, বাজি হবেন না কেন?

—তবে?

—মিথো বলবো না, কেউই নিতে অমত কবেননি।

—তবে যে বললে হলো না?

—আমিই বাজি হলুম না।

—কেন মা? কেন? এত বড় সুযোগ—

—এখন মনে পড়লে ভীষণ কষ্ট হয় বে। তাই তো মনে কবি না। ছেলেমানুষী ভ্রাতৃ সিদ্ধান্তের মাশুল গুনছি সাবা জীবন। বিদ্যো হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পড়লো না। কতো কিছু জানাব ছিলো যথাযথ শিক্ষার অভাবে জানা হলো না।

—মাগো, তুমি কেন বাজি হলে না?

—সে কথা থাক না।

—না না, থাকবে না।

—আপনি ওকে আর উত্তেজিত কবেন না দিদি। বাকিটা পাবে শুনবেন।

—না না, উত্তেজিত কবাব কি আছে? এখনই বলছি আমি। এখনই শুনে রাখুক ও। ওব মায়েব নির্বন্ধিতাব কাহিনী। ব্রাহ্মসমাজ তো খ্রীশিক্ষা প্রসাবেই সাহায্য

করেছে চিবকাল। কেবল এই একটিই ব্যতিক্রম আমি। আমার ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা আটকে গেল ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে।

—সে কি? কেমন করে? ওরা বাধা দিলেন?

—তা, একটু দিলেন বইকি।

—যাঃ।

—বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বাইবেল বাধাই কি জীবনে সব? অধিকাংশ বাধাই তো ভিতবেব বে। দেখা যায় না। অথচ অনতিক্রম্য।

—তা বটে। কুসংস্কার যেমন। অদৃশ্য হাত-কড়া।

—ঠিক। মার্জিত কচিব বিষয়ে বাড়াবাড়িও এমনই এক সংস্কার। এক আভ্যন্তরীণ বাধা। যা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমার ভিতরে আপনি গড়ে দিয়েছিলো। সেটা সবিয়ে আমি তোমার শ্রীমাব কাছাকাছি পৌছতে পারিনি। ছোট মেয়ে ছিলুম, বুদ্ধিও দ্বন্দ্বি পাকেনি। এক কুসংস্কার ছাডিয়ে উঠতে গিয়ে অন্য এক কুসংস্কারেব আওতায় পড়ে গিয়েছিলুম। সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি। কচিব ওই সংস্কার, আমি ওটাকে কুসংস্কারই বলব, তখন আমাকে শ্রীমাকে বৃত্তে বাধা দিয়েছিল। আমারই ওখানে ভর্তি হতে ইচ্ছে কবল না তখন।

—কেন? কি হয়েছিল?

—কিছুই নয়। আমরা এ-পাশেব ঘবে ওয়েটিং রুমে ওয়েট কবছি। মা আছেন ও-পাশেব ঘবে। কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রণাম কবলুম। শ্রীমা আশীর্বাদ কবলেন। “ওমা একদম কচি মেয়ে তো—আহা বে। এ বয়সে বেওয়া?”

তাবপবেই বললেন, “ওবা কি আমার যজমান?”

আমাব সঙ্গীবা বললেন—“না। নয়।”

—“তাহলে ওবা এখন পাশেব ঘবে অপেক্ষা করুক। আমি আগে আমার যজমানদেব সঙ্গে কথা কয়ে নি। তাবপবে ওদেব সঙ্গে কথা হবে।” বাস ওতেই হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে একে তো ওই ‘বেওয়া’ শব্দ। তাবপবেই ওই ‘যজমান’ শব্দ। গ্রাম্য শব্দ কানে লাগলো। পূজোব পুরুতদেবই তো যজমান থাকে—বাঁধা ঘব। দিব্যাত্মা মহামানবী কেন ওই কথা বলবেন? হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা মনে হতেই আর নিবেদিতা ইঙ্গুলে পডবার উৎসাহটা বইল না। মার্জিত কচিব ফলস অহঙ্কারে বাধলো। ঐ যে উনি আমাকে যজমান নই বলে একটু অবহেলা করলেন, তাতেও অহঙ্কারে ঘা পডলো। এখন বৃত্তে পারি উনি ঠিকই কবেছিলেন। দীক্ষিত শিষ্যদেবই উনি ‘যজমান’ বলেছেন। আব সত্যিই তো তাদেব দাবি আগে। কিন্তু ঐ ‘যজমান’ হাব ‘বেওয়া’ আমাব অন্ধকার ভবিষ্যৎ শীলমোহর কবে দিলে। তাই বলছি ব্রাহ্মসমাজী মার্জিত ভাষার প্রতি অযথা শ্রদ্ধা ও দিশি গ্রাম্য ভাষাব প্রতি অযথা অশ্রদ্ধাই আমার

পড়াশুনো হতে দেখনি। ইস্কুলে ভর্তি হবাব সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। সেটাই আমার আসল পাপকর্ম হয়েছে। আমার উচিত ছিল না অমন অন্যায জেদ করা। অহঙ্কারের শাস্তি হয়েছে।

—তোমার গার্জেনবাই বা কী বকম? তাদেরই উচিত ছিল উল্টো জেদ ধবে তোমাকে ভর্তি কবে দেওয়া।

—অত মাথা ঘামাতেনই না ছেলেমেয়েব পড়াশুনা নিয়ে তখনকার বাপ-মা। তাঁরা পড়ায় মত দিয়েছিলেন, এই যথেষ্ট। আমিই ভর্তি না হওয়ায় সবাই যেন বেচে গেলেন। খুশিই হলেন আমার ওপর। বোর্ডিংয়ে অবশ্য থাকতে দিতেও বাজি ছিলেন না কেউ।

—আশ্চর্য।

—কিছুই আশ্চর্য নয়। যে প্রথাটা যেমনভাবে চলে।

—‘যজমান’ আর ‘বেওয়া’ মাত্র এই দুটো শব্দ আলার্জি হয়ে তুমি জীবনের মতো ইস্কুলে ভর্তি হলেই না? এটা ভীষণ খাপস কথা।

—জানি। তোব মেয়েদেব এ গল্পটা কোনোদিন যেন বলিসনি। যা জেদী একেকজন। বড়টি তো একটি মেয়ে-পুলিশ—জাদবেল মেয়ে বটে। ওদেব এই গল্প কখনো করবে না।

—অতি অবশ্যই করবো। ঐবকম জেদ ধবে বড়দেব কথা না শুনলে কী হয় তাবা জেনে রাখুক। তাদেরও ধারণা ঠিক তোমাবই মতো, যে তাদের মা-টি নির্বোধ। কিছু বোঝে না। তাবা কিন্তু মহা চালাক, সর্বজ্ঞানী। ওই কবে জেদ ধবেই ফের্ত সাবজেস্ট পবীক্ষা দিলে না। কতো ক্ষতি হলো, দেখেও এখন আবাব জেদ ধবেছে—দ্যাখো।

—ফেব কমপ্লেন? কমপ্লেন কোবো না খুকু। বড্ড বদ অভ্যাস। কিছু লোকেব কেবল ঘানঘ্যান করা স্রভাব হয়ে যায়। স্রমী আদর কবছে না, শ্রাংডি অত্যাচাব কবছে, ছেলেমেয়েবা কর্তব্য কবছে না বা এই এই কুকর্ম কবছে—ওফ, খুব বোবিং। তুমি বাছা ওবকম হয়ো না। বি ভেবি কেয়াবফুল, স্রভাবটাকে সচেতন প্রাসাে নির্মাণ কবতে হয়। অমন য্যাযসা-কে-ত্যাযসা চালালে হয় না। বলো দিকিনি, য্যাযসা-কে-ত্যাযসা কাব বই? কি বই? নভেল, নাটক, প্রবন্ধ না গল্পেব?

—এই শুরু হলো তো পবীক্ষা কবা? তবে তুমিও শোনো মা, কিছু কিছু লোকেব বড্ড বদ অভ্যাস থাকে। কেবল প্রশ্ন কবা আব উত্তর ধবা। মাস্টাবিব স্রভাব একদম ভাল নয়। ওফ—খুব বোবিং এবং ভয়াবহ। অমন কবলে কিন্তু তোমাব কাছে কেউই আসবে না মা। আমিও না। আমি এখন চললুম। ঐ তোমাব দিনেব সেবিকা এসেছে—ওই থাকুক—গুড বাই—

—পাবলি না তো? হেবে গেলি তো? ল্যাজ তুলে পলায়ন?

—হারজিং আবাব কি? একবাব বললে জগতে সবচেয়ে সুখী কে বল দিকিনি। একবাব বলছো, “য্যাযসা-কে-ত্যাযসা” কাব লেখা বই, কী বই। এটা না হয় আমি

জানি, এর পবেরটা তো নাও জানতে পারি? আগেই পালাই।

—জানিস? কী বই? কাব বই?

—আমাদের টেক্সট। সুবীর পড়ায়। তাই জানি।

—তুই পড়েছিস?

—এবাব কি টেক্সচুয়াল কোয়েশেনস কববে?

—আচ্ছা থাক। যা. কোথায় যাচ্ছিলি, যা। তোদের যুগটাই ফাঁকির আব ফোকরের যুগ। ফোকরের আর ফোকটের।

—যাচ্ছি চাকরি কবতে। জ্ঞান দিতে।

—শ্রম বিনা জ্ঞান হয় না। আমাদের যুগটা পবিশ্রমেব যুগ ছিল। সলিড জ্ঞান ছিল লোকেদের। তোদের সব ফাঁপা। ফাঁকা। যাঃ পাল। ভাগ। অজ্ঞানতিমিবাক্সা—

—মা, তুমি সেরে উঠেই একটা আত্মকথা লিখে ফেলবে? প্লিজ? পুলিনকাকু কত কবে বলে গেছেন—

—বিনোদিনী দাসীর মতো?

—তা কেন? বাসসুন্দরী দেবীর মতো।

—দেখলি তো? তোবা উইমেস লিবাবেশন করিস অথচ ভাবনার বেলায় সেই পুরুষের মতো মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরই তুলনা কবিস। কই বলতে পারলি না তো ‘জীবনস্মৃতি’র মতো? কি গান্ধীজীব অটোবায়োগ্রাফি'র মতো? আর বিনোদিনীর মতো বলতেই অমনি বললি ‘তা কেন’? কেন নয়? বিনোদিনীর জীবনই তো বেশি মূল্যবান, শিল্পী-জীবন।

—যা স্বাভাবিক। তাব চেয়ে রথী ঠাকুরের মতো আমিই ববং একটা ‘মাতৃস্মৃতি’ লিখতে শুরু কবি।

—কেন? আমি কি রবীন্দ্রনাথ? খবদাব ওসব কীর্তি কববি না। লোক হাসাবি না। তোব বাবা অল্প বয়সে খুব সুন্দব ছবি আঁকতেন। কিন্তু আমি ওঁব কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যে উনি বৃদ্ধবয়সে ছবি আঁকায় ফিবে যাননি। অনেক লেখককেই তো দেখলুম কিনা? বৃড়ো বয়সে একটা রবীন্দ্রনাথ-কমপ্লেক্স দাঁড়িয়ে যায়।

—বাবা আমাকে ছোটবেলাতে ছবি আঁকে দিতেন—তোমাব কাছেই তোলা ছিল তো মা? সেগুলো কোথায়? কী সুন্দব চাইনিজ ইংকে আঁকা।

—আছে কোথাও। স্মৃতিতে থাকাই আসল। মোটিবিয়াল বস্তুগুলো দিয়ে কী হবে। মোটিবিয়াল বস্তুবা অনেক জায়গা নিয়ে নেয়, জায়গা ফুটিয়েও যায়। বস্তু ধবংস হয়ে যায়। স্মৃতি অনশ্বব। কিন্তু স্মৃতিব ভাণ্ডাব অনন্ত। ওটাই ভবে বাখ, সেই ধন কেহ নাই নিতে পাবে কেড়ে।

—আমাদের বাড়ির সব ফার্স্ট এডিশনের বইগুলো তো ক্রমশ স্মৃতিব ভাণ্ডাবেরই ধনই পবিগত হয়ে যাচ্ছে মা।

—যাকগে, কী হবে ফার্স্ট এডিশন জমিয়ে। তখন পাগলের মত এসব জিনিসেব মূল্য দিয়েছি। এখন, চলে যাবাব সময়ে আর দিই না।

—তবে কাকে মূল্য দেবে?



—কেন? যা দেখলি, যা পড়ালি তাই দিয়ে জীবনটাকে প্রতিদিনেব বাঁচাকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পারলি। সেটাই সবচেয়ে দামী। সেটাই আসল। তোব জানা দিয়ে তোব দেখা দিয়ে জগতেব আব সব মানুষেব কতটা উন্নতি, কতটা উপকাব কবতে পারলি, সেটাই প্রধান। বুঝলি? সব জন্তু-জানোয়ারই নিজেব জন্যে আব নিজেব অপরিণত শাবকদেব জন্যে খাদ্য আহরণ কবে বেঁচে থাকে। এতে বাহাদুরীৰ কিছু নেই। জন্তুরা তার জন্যে কাবোব বাহবা চায় না। ছেলেমেয়েব কাছে কৃতজ্ঞতা আশা কবে না। কিন্তু মানুষ চায়। সেই তো মজা। আচ্ছা, বল তো—

—আমি চললুম।

—না না, দাঁড়া। আজকাল এই তোদেব ফ্লাটে বাস কবা স্মী-স্ত্রী-সন্তানেব মনুষ্য পবিবাবেব সঙ্গে গুহায় বাস কবা সিংহ-সিংহিনী-শাবকেব পবিবাবেব কিংবা গাছেব ডালে বাস কবা কাক-কাকিনী-শাবকদেব তফাৎটা কি? কী তফাৎ? বলো আমাকে।

—পাবব না। চললুম। ভীষণ দেবী হয়ে যাচ্ছে আমাব, যাচ্ছি এবাব মা।

—কোথায়? শাবকদেব জন্যে খাদ্য আহরণ কবতে?

—যদি বলো, তাই।

—যাও বাছা, কীটপতঙ্গ ধবে আনো। জৈব ধর্মেব সেবা কবো। তোমাদেব এই অর্থ উপার্জন তো আহাব-নিদ্রা-মৈথুনেব সঙ্গেই একাত্মক। প্রাণধাবণেব জন্যে অবশ্যকরণীয়। এতে মনুষ্যত্বের ছায়া নেই। পশুবাও কমটি করে থাকে।

—তাহলে মানুষেব কবণীয় কি? খাদ্য উপার্জন না কবা?

—ফেব বোকাব মতো কথা। জীবনধাবণেব জন্যে কবণীয় যা তাব ওধাবেও কিছু করা চাই তো? মানুষ-জন্তু যখন পেয়েছে? কেবল জৈবকর্মে কালহরণ না করে সৃজনমূলক কিছুতে মন দাও।

—তাতে পেট চলবে না মা।

—কেবল পেটেব চিন্তা না কবে একটু অন্তরলোকের দিকে মন দাও এবাবে।

—মাসিমা, আপনাব অস্ত্রিজেনেব নলটা খসে পড়ছে—একটু কাত হন এদিকটাতো।

—আঃ, কেবল শবীবেব কথা। শোনো খুকু মা, একটু অধ্যাত্চিন্তাব চেষ্টা কবো।

—বিকেলবেলা ফিরে এসে কববো মা। এখন একদম সময় নেই, স্নান কবা হবে না।

—ওঃ, বহিরঙ্গের স্নানে আব কতটুকু পবিস্কাব হবে মা? অন্তরলোক প্রক্ষালন করতে হবে। তোমাব যে যুগে জন্মেছে, কল্যাণপদ বাজাব মতন কেবল পাদুটাই নয়, সর্বাঙ্গই তোমাদের পোড়া কালো—ও তো স্নানে সাফ হবাব নয়—কই স্প্রেটা কোথায়? ও বাবা, মেয়ে-পুলিশ সে?

—দিন্মা, এই যে কমপ্লান—দিন্মা। আব একটাও কথা নয়, চটপট খেয়ে ফ্যালো। তাবপর একদম চুপ। এবাবে আমি এসে গেছি কিন্তু—বাস! এ তোমাব মেয়ে পাওনি। হ্যাঁ!

## এলিজাবেথান সিস্টেম

সিগাবেটটা ধরাতে ধরাতে ছোডদা বললেন—এলিজাবেথকে মনে আছে? ওর একটা বাচ্চা হয়েছে সম্প্রতি। বাস্কেটে শুইয়ে সঙ্গে কবে নিয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছে। মহা খুশি।

—তা-ই? বাঃ। কবে বিয়ে হলো? শুনিনি তো?

—বিয়েই হলো না তো শুনিবি কি?

—বয়ফ্রেণ্ড আছে তো? আজ না হোক কাল বিয়ে হবে।

—বয়ফ্রেণ্ড ছিলই না তাব কখনও।

—তবে? আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন।

—ধুৎ, সে তো গরব হয়।

—এখন মানুষেবও হয়—টেকনিক্যাল টামটা হয়তো আলাদা। ব্যাপারটা এই—স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবস্থা কবে নেয় মেয়েবা। এলিজাবেথও কবেছে। বিয়ে-থা'ব ঝামেলায় যায়নি।

—বাঃ, কি দারুণ খবর। বাচ্চা-কাচ্চাব শখ মেটাতে আব জীবনভোর একটা স্মার্মি পোষাবাব ঝাক্কি পোয়াতে হবে না। এদেশে যে কবে এমনটি চালু হবে? আমি আত্মদে ফেটে পড়ি।

—চালু কবে দিলেই হলো। স্পার্ম ব্যাঙ্ক ছাড়া কি বাচ্চা হয় না? ছোডদা তাঁব পত্নীর দিকে একপলক তাকিয়ে নেন।

—সে অনেক ঝামেলা। কে শুরু কববে ওসব?

—কিন্তু ঝামেলা নয়—ছোডদাব উৎসাহ দেখি প্রচুব।—আমাদের ছেলেমেয়েরা চালু কবে দিলেই চলে যাবে। তোমাবও পাত্র খোঁজাব ঝামেলা নেই, 'পণ দেব কি দেব না'-ব নৈতিক চাপ নেই, ওদিকে আমাবও পাত্রী দেখে বেড়ানো নেই, 'পণ নেব না যৌতুক নেব'-ব সমস্যা নেই, সবচেয়ে বড় কথা বধুহত্যার বন্দোবস্ত কবাব মন্ত ঝামেলাটাও থাকবে না—বধুই নেই, তো বধুহত্যা। হৈ-হৈ কবে হেসে ওঠেন ছোডদা। যেন বধুহত্যাটা খুব একটা মজার ব্যাপার। বউদি কিন্তু হাসেন না।

আমি বলি—আমাব অবশ্য ওসব প্রবলেম নেই। আমি পাত্রও খুঁজতে বেকবো না, পণও দেব না। পাগল হয়েছো? একটা শাড়ি কিনে দিলে যাদের পছন্দ হয়নি বলে পাবে না তাদের বব এনে দেব?

—তা বটে, সুখের মুহূর্তে তোমাব এই বৌদিদি কখনও বলে না, হ্যাঁ। বাবা দিয়েছিলেন বটে, একটা বিয়ে। কিন্তু কিছু গডবড় হলেই শুনতে পাই শ্বেতবমশাইকে গালি দিচ্ছে, হ্যাঁ। বাবা দেখেছিলেন বটে একটা পাত্র।

ছোড়দাব কথায় বউদি ভূঙ্গি কবেন। কিছু বলেন না। হাতেব বোনা ভেমনি চলতে থাকে। ছোড়দা যত বাকপটু, বউদি তত মিতভাষিণী।

—এই এলিজাবেথান সিস্টেমটা সত্যি ভালো কিন্তু। আমি না বলেই পাবি না—ঘবেব মেয়ে দিবি ঘবেই বইলো। ওদিকে নাতি-নাতনিব সুখও হলো। বিয়ে-থা দেবাব পবিশ্রম নেই, সামাজিকতার ধাক্কা নেই। শ্বেতববাডিকে তোযাজ করা নেই, এক্কেবাবে আত্মাব আবাম, প্রাণের শান্তি। দাকুণ ব্যবস্থা?

—মেয়েদেব কেবল যত্ন কবে স্ননির্ভব কবে দেওয়া। বাস। ছোড়দা সোৎসায়ে যোগ দেন—ফাতে খেতে খেতে পারে, নিজেব সন্তান নিজেই পালন কবতে পাবে। তোমাব সেখানেই দাযিত্ব শেষ। এরপব মেয়েবা মন দিয়ে কেরিয়ার গডবে, আর ঠিক সময় বুঝলেই টুকটুকে ফুটফুটে নাতি-নাতনি এনে মা-বাবাকে প্রেজেন্ট কববে। এক্সেলেন্ট আব্বেঞ্জমেন্ট।

—সত্যি। কি আরাম না ছোড়দা? মেয়েরা ঘবেই থাকবে, বুডো হয়ে বাপ-মার দেখভাল মেয়েদেব মত আর কে করবে? ছেলের বউ নেই বলে অভাব বোধ হবে না। আর যাদের ছেলের বউ আছে তাদেরও আর সেই বউয়ের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। মেয়েই দেখবে। বুডো বয়সেব উদ্বিগ্ণটা অনেকখানি কমে বে।

মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে ছোড়দা বলেন—যা বলেছিস। মেয়েদের সময়ও বাঁচবে অনেকটা। স্বামীর খিদমৎ খাটতেও হবে না, দেশের এনার্জি সেভিং হবে। সমাজেব ন্যা জরুরী কাজে লাগবে সেটা।

—সবদিক থেকে সুবিধে ছোড়দা। বেচারা মেয়েগুলোকে আব অচেনা পরিবারের দ্ব কষ্টেসৃষ্টে মানিয়ে নিতে হবে না, দেশে বউ পোড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। আমিও ডবড কবে উঠি।

—পণ-দৌরাত্ম্যও মিটে যাবে, ভাব কত ভালো, ডিভোর্সও হবে না। খোরপোশেব মলা হবে না, শাওডি-বউ ঝামেলা হবে না, চিবকাল ছেলেগুলো মায়েব আঁচল বে বসে থাকবে আর মায়েবা মনের সুখে শান্তিতে সংসার কববে।

—‘নয়া প্রজন্ম’ও আটকে থাকবে না, সময় হলেই মেয়ে নাতি-নাতনি এনে লে তুলে দেবে। আঃ। কি আরাম। কতো বিল্যাক্রম হয়ে যাবে পৃথিবীর চেহারা। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

—ছেলেদেবও খুব মজা—আর বউয়েব মন রেখে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হবে না—মজাসে মূর্তপক্ষ জীবন, স্বাধীন। বলেই ছোড়দা বৌদিব দিকে আডচোখে চেয়ে নেন। বৌদি এতক্ষণ মন দিয়ে বুনেই যাচ্ছিলেন। এবাব বোনা নামিয়ে গলাটি তললেন—বিয়ে-থা উঠিয়ে দিলে বুঝি ছেলেদেবও খুব আরাম? তুমি তো আচ্ছা

লোক? মেয়েদের মা-বাবার কোলে নাতি-নাতনি আসবে, নবনীতার মেয়েবা ঘরে থাকবে, ওকে দেখাশুনো কববে—খুব ভালো কথা। নিজের কথাটা কি ভেবে দেখেছো? তোমার মেয়ে নেই। দুটো ছেলে। আমার-তোমার কি হবে? ছেলের তো খুব ফ্রীডম, খুব আবাম, দয়িত্বহীন ‘মুক্তপঙ্ক জীবন’—কিন্তু তাদের বাবা-মা? তাদেরও কি আরাম হবে এতে? ঘবে বউ না এলে?

—হবে না? ওই তো বললুম, সাবা জীবন তোমাব আঁচলের তলায় ‘মা-মা’ বলে বসেই থাকবে। বউ-টউয়ের ঝঙ্কাট হবে না সংসাবে।—বৌদি বলে ওঠেন—বাঃ! নাতি-নাতনি? কেবল নবনীতাই নাতি-নাতনি নিয়ে মজা কববে? মেগেব মা বলে? কেন, আমারও বৃঝি ইচ্ছে কবে না নাতিকে আদব কবতে? বৌদি একটু আত্মদে কঠে বলে। আবও বেশি আত্মদে গলায় ছোডদা বলে ওঠেন—কবে বৃঝি? স্মামীকে আদব কবে সেটা মেকাপ হয় না? মাঝে মাঝে নাতি ভেবে নিলেই পাবো। দুদিন বাদে Second childhood তো হবেই।

—আসলে তুমিই চিবকাল ছোকবা সেজে থাকতে চাও। শশীকাপুর আব সিপ্লিব মতন। স্বব কঠিন।

—আবে? হঠাৎ বেচাবী শশীকাপুর আব সিপ্লি এব মধ্যে আসে কেমন কবে? বলতে যদি দেবানন্দ. তবেও বুঝতাম। ছোডদা হাঁ-হাঁ কবে ওঠেন, বড্ড ইরেনেভেন্ট কথা—

—কেন? কাগজে পড়োনি? নাতি হয়েছ বলে আনন্দে শশীকাপুর সাবাবান্দির মদেব দোকানে গিয়ে সৌজসে খানাপিনা নাচা-গানা চালিয়েছে, সকালবেলা এক্কেবারে মাতাল। সিপ্লিবও নাতি হয়েছে, তাই সিপ্লিও ঠিক ওই কাওই কবেছে—সাবাবাত হুল্লোড়, সকালবেলায় মাতাল। ছাই। ওসব আমি ঠিক বুঝছি। তালে ঠিকই আছে দুজনে।

—মানে? মাতাল হয়নি আসলে?

—মাতাল হবে না কেন? মাতাল হওয়াটা কী এমন কঠিন কর্ম? কেন মাতাল হলো. সেইটে হচ্ছে কথা। নাতি হবাব আত্মদে, না ছাই। ‘শোকে উন্মত্ত’ বলে না? ঠিক তাই—‘দাদু’ হবাব দুঃখে।

—দুঃখে?

—না তো কি? ওসবে বোয়াই-কলকাতায় তফাৎ নেই। নাতি মানেই তো তিন জেনাবেশন বয়েস বাড়। তাই না? তাতে শোক হবে না? কোন পুরুষমানুষটা বুড়ো হতে চায়? সারাবাত হুল্লোড় কবে জগৎকে দেখিয়ে দিচ্ছে, যৌবন এখনও যায়নি। এখনও হুজ্জতি করতে পাবি, হোঁড়াদের মতই।

—আববে? সবলা অবলা বলেই তোমাকে জানতুম, পেটে পেটে এত? এতকাল ঘর কবছি, টেব পাইনি মোটে? দ্যাখ, তোর বৌদিকে দ্যাখ একবার। চিনতেই পারছি না!

—পাববে কেন? সে চেষ্টা কি করেছে কখনও?

—করিনি মানে? সেই চেষ্টাতেই তো সাবাজীবন নিযুক্ত আছি—রহস্যময়ী রহস্য উদ্ধার করাৰ কাজে প্রাণমন সমর্পণ করেছি বত্রিশ বছর—ভোব থেকে বাত পর্যন্ত—

—নাকি? তাই বোজ ভোবে উঠে লেকে চক্কর লাগাও? যাতে আমাকে চিনতে সুবিধে হয়? না যাতে নিজের ভুঁড়ির সাইজ কমে? চূলে যে কলপটি লাগাও, সেও নিশ্চয় আমাকে চিনতে? হুঁ, বুঝি না ভেবেছ? খালি এক চিন্তা—বয়েস যেন বেড়ে না যায়। তাই তুমি চাও না তোমাব ছেলেরা বিয়ে করুক। তোমাব ইচ্ছে ওবা চিবকাল ‘ছেলে’ হয়েই থাকুক, ‘বাবা’ আব হতে হবে না। তাহলে তোমাকেও ঠাকুন্দা হবার গেবজাবী পোজিশনটা আব নিতেই হবে না।

—ওবে বাবা। এত কুটিলতাও ছিল তোমাব মধ্যে?—ছোডদা শিহবিত হন।

—থাকবে না কেন? তোমাদের মত কুটিলদের সঙ্গে ঘব কবতে হয় না? আমি সতি কথটা বলছি, আমিই কুটিল, না, তুমি শাক দিয়ে মাছ লুকোচ্ছ, তুমি কুটিল? দেশ থেকে বিয়েব পর্বপাটই তুলে দিতে চাইছো। যাতে নিজেকে বেশিদিন ছোকবা বাখা যায়। ওই জগিং, ডায়েটিং, কলপেব সঙ্গে এইটেও এক-গোতব। ছোটো-ছোটো ‘বাবা’ হয়ে থাকব ভাই চিবকাল। ‘ঠাকুন্দা’ হব না। নাতি-নাতনি হলে অসুবিধে।

—কেন, ঠাকুন্দা হলেই বা ক্ষতি কি? আজকালকাব ঠাকুন্দা সব ইয়াং হয়, বুঝেছো, আগেব মতন বুডো হয় না।

—যতই ছেলেমানুষ হোক, বয়েস তো কাকব গায়ে লেখা থাকে না—নাতি নাতনিব গায়েই ওটা লেখা থাকে, বুঝলে? এই তো দ্যাখো না সিদ্ধার্থশঙ্কব বায়কে। নাতি-নাতনিব বালাই নেই, টুকটুকে লাল টি-শার্ট পবে, লাল জুতুয়া পায়ে খোকাটি হয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছেন। আব জ্যোতিবাবুকে দ্যাখো? নাতনিপরিবৃত হয়ে, শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, গুরুগম্ভীর মূর্তি কবে ঘুরছেন। করবেনটা কি? ঠাকুন্দার একটা ডিগনিটি আছে না? শশীকাপুববা তো সেটাবই বিকন্ধে বিদ্রোহ কবল। তোমাব বিদ্রোহ আবো গোলমালে, ইনডিভিজুয়ালেব নয়। সাবা সমাজেব চেহাবায হাত পডবে। ছেলেব বিয়ে বন্ধ।

—বা বে বাঃ। এমন লেকচাব দিতে পাবো তুমি? ‘সমাজেব চেহাবা’? গ্র্যাণ্ড, শোনাও ওসব বয়েস-টয়েস নিয়ে পুরুষমানুষ মাথা ঘামায় না, ওসব মেয়েদের এবিয়া। তাছাড়া মেয়েব বিয়ে বন্ধতে তোমাব আপত্তি হলো না, ছেলেব বিয়ে বন্ধব বেলাতে ক্ষেপে উঠেছ। এটা বোঝা খুবই কঠিন।

—একটুও কঠিন না। বিয়ে না হলেও মেয়েবা ইচ্ছেমতন ‘মা’ হতে পাবে। বিয়ে না করলে কোন ছেলেব কি ‘বাবা’ হবাব উপায় আছে? বিয়ে বন্ধ কবলে ছেলেবা আজন্ম ‘ছেলে’ই থেকে যাবে, ‘বাপ’ আব হবে না। তোমাবাও ‘ঠাকুন্দা’ হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

—তার মানে? বিয়ে না কবে মেয়েবা যদি ‘মা’ হতে পারে, তাহলে বিয়ে

না করে ছেলেরাই বা কেন ‘বাবা’ হতে পারবে না শুনি? যতসব যুক্তিহীন মেয়েলি এঁড়েতক্কো কেবল। একই কয়েনের দু’পিঠ তো? ছোড়দা রেগে উঠেছেন দেখেও বৌদি চটেন না।

—মেয়েলি বলো আর এঁড়েতক্কোই বলো, সবই অনর্থক। এঁড়েগরুরা কি মেয়ে? এঁড়েতক্কো মেয়েরা করে না, তোমার মত এঁড়েগরুতেই করে। বুদ্ধিশুদ্ধি খাটাবে না, কথার পিঠে কথা দিয়ে তাস খেলবে কেবল। বলি, ভেবে দেখেছো কি, কয়েনেব একটা ‘হেড’। একটা ‘টেল’? মেয়েরা হেড, তোমরা টেল।—ছোড়দাকে এবাব বাতিমতো বিভ্রান্ত দেখায়।

—তুমি কি নিও-ফেমিনিস্ট নাকি? মেয়েরা হেড, ছেলেরা টেল বলছো? হেঁয়ালি ছেড়ে সোজাসুজি বলো দেখি কী বলছো?—আমি চুপ কবে গেছি। এখন দাম্পত্যকলহ চলছে—আমার নাক গলানো ঠিক নয়। তবে খুব মন দিয়ে শুনছি। এবং বৌদিকে যদিচ চিনি, তার চেয়ে বিশ বছর বেশি চেনা ছোড়দার সঙ্গে। তবু বৌদিব কথাবার্তাই অনেক বেশি অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে—যদিও এই হেড-টেলটা ঠিক বুঝিনি আমিও। ফেমিনিস্ট, নিও-ফেমিনিস্ট—এসব শব্দ উচ্চাবিত হচ্ছে শুনেও আমি চুপ কবে থাকি। বৌদি একাই লড়তে পারবেন, বুঝে গেছি। ছোড়দা আবার চেষ্টান:

—বিয়ে না করে মেয়েরা মা হতে পারলে বিয়ে না করে ছেলেরাও বাবা হতে পাববে। একশোবার পারবে। জীবজগতে বিয়ে হয়? বাঘ বাবা হয় না? কাগ বাবা হয় না?

—বাঘের কথা আর কাগের কথা এক নয়। তাছাড়া তাবা ঠাকুন্দাও হয় না। তুমি তো এলিজাবেথের কথা, আব আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা বলছিলে। বাঘ আর কাগ এতে কোথেকে এল? এঁড়েতক্কো কে করে? আসল কথায় এসো।

—আসল কথা? বেশ। আসল কথা এই যে, মেয়েরাও যেমন ছেলেরাও তেমনই। বিয়ে না কবে মা, আব বাবা হতে পারে। ইকোয়াল অপারচুনিটি আছে।

—আজ্ঞে না, সেটি হবার নয়, বিয়ে না কবেও মেয়েবা মা হতে পারে, কিন্তু ছেলেরা বাবা হতে পারে না। ঘবে একটা জলজ্যান্ত বাবা বসে না থাকলেও মেয়েবা দিবা নিজে নিজে ‘মা’ হতে পারে। কিন্তু ঘরে একটা জলজ্যান্ত মা হাজির না থাকলে কোন ছেলে কি আপসে ‘বাপ’ বনে যেতে পারে? পারে কি? তুমিই বলো। বলতে নেই, বাপ মবে যাবার ন’মাস বাদেও মা হতে পারে কেউ। মা মরে যাবার ন’দিন পরেও কি কেউ বাবা হতে পারবে?—অকাটা যুক্তি দিয়ে বৌদি চুপ করে যান। আমিও। ছোড়দা ধোঁয়া ছেড়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক নির্বাক থাকেন। বৌদিই কথার খেই ধরেন আবার—

—ওই তো, নবনীতার মেয়েরা। ওরা তো ইচ্ছে করলেই এলিজাবেথের মতোন, ভগবান না করুন, আপনা-আপনি মা হয়ে বসতে পারবে। সমাজে পাঁচটা সাক্ষী প্রমাণ থাকবে, যারা বলবে যে হ্যাঁ, এর পেটেই বেড়েছে, এর পেট থেকেই ভূমিষ্ঠ

হয়েছে এই বাচ্চাটা। আমবা দেখেছি। কিন্তু তোমার ছেলেরা? টুলু কি বুলু যদি আজ বাবা হয়, তার সাক্ষী প্রমাণ কোথায়? বাচ্চাটা প্রকৃতপক্ষে টুলুবই, সেটাও সাক্ষী দেবে কে? তার বউটি ছাড়া?

ছোড়দা নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন বৌদিব দিকে। বৌদি আবার বলেন—

—বুঝেছো এবার, বুদ্ধুরাম? বাচ্চাব বাবার সমাজে একটাই মান্তর সাক্ষী, একটাই, তার বউ। মায়েব একটা মুখেব কথার ওপরে বাবার বাবাত্ব টনমল কবছে। আব তো কেউ জানে না প্রকৃত বাবাটি কে?

অবাক হয়ে পত্নীকে মুগ্ধনয়নে অবলোকন করতে থাকেন ছোড়দা—বুঝতে পাবেন, ভাষণ এখনও সমাপ্ত হয়নি। তাঁব চোখে প্রশ্ন ফুটে থাকে। মুখে কথা ফোটে না। এতক্ষণে আমি বলেই ফেলি কথাটা—

—সত্যিই তো? এই যদি কেউ এখন তোমাকে বলে, যে টুলু-বুলুব বাবা তুমি নও, অন্য কেউ, তাদেব কাছে তুমি কেমনভাবে প্রমাণ কববে ছোড়দা, যে তুমিই ওদেব জন্মদাতা? অনেক ডাঙাব-বদ্যা ল্যাবরেটরি-পরীক্ষা, আইন-আদালত কবতে হবে। কিন্তু আমিই যে পিকো-টুলোব মা, সেটা কেউ অপ্রমাণ কবতে পাববেই না—ছোড়দাব আব সহ্য হয় না, বাধা দিয়ে বলেন: তা খুব জানি—তোমাব বউদিকে জিজ্ঞেস কবলেই সবাই জানতে পাববে—

—এগজ্যাক্টলি সেইটাই আমিও বলছি। বৌদি হৈ-হৈ কবে হেসে ওঠেন, আমি যদি সাক্ষী না দিই, তোমার কিন্তু কোনই প্রমাণ নেই যে ওরা তোমাব সন্তান। জগতে কোন বাপেবই থাকে না। বংশবক্ষা তো ছেলেরা করে না, কবে বউই। বউ না হলে চলে? বউ না এলে বংশবক্ষা হবে কি কবে? কে যে কাব বংশধব, সেটা বউ ছাড়া আব কে-ই বা বলে দেবে?

বৌদি আবার বোনাটা তুলে নেন। আমি আব ছোড়দা চোখ চাওয়া-চাওয়া কবি। কিন্তু আলোচা বিষয়টি আর উত্থাপন কবি না। আমাব মহাভারতের কথা মনে পড়ে যায়। কুরু-পাণ্ডবের বংশবক্ষা তো এই এলিজাবেথান সিস্টেমেই হয়েছিল বলতে গেলে। এখনই ওটা এ-সমাজে চলবে না বোধহয়। হয় অনেকটা এগোতে হবে, নয় অনেকটা পিছোতে।

—ছোড়দা, ওসব এলিজাবেথান সিস্টেম এদেশে এখন চলবে না, ভাই। বৌদি খুব একটা ভুল বলেননি। তুমি ববং ছেলের বিয়েব জন্য বেডি হও, টুলুকে প্রায়ই একটা বোণা মতন মিটি মেয়েব সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখি আজকাল!

## পরভূৎ

—না বাপু, তোমার মাথাব যন্ত্রণা সারাতে আমি এক্ষুনি বাবা হতে পারবো না। আগে বজনী আব বমেন পাশ করে বেরুক। ততদিনে স্কেলটাও বেড়ে যাবে। ছেলেপুলে হয়নি বলে মাথাব যন্ত্রণা হয়, একথা বাপেব জন্মে শুনিনি। চটে-মটে সৌমেন বেরিয়ে এসেছিল ডাক্তারখানা থেকে। অসহ্য মাথাব যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সরমা। নানা রকম চিকিৎসা হয়েছে, ব্রজেন ডাক্তারের ধাবণা ছেলেপুলে না হলে ও-মাথাব্যথা যাবে না।

মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে সরমার। বিয়ে হয়েছে কি আজ? সেই বাইশ বছর বয়েসে এম. এ. পাশ কবেই। সেই থেকেই চলেছে ইঙ্কুলে চাকরি। দুজনের রোজগার না হলে সংসার চলবে না। শাশুড়ি নেই, স্বশুরেব পেনশন পঞ্চাশ টাকা। দুই কচি দেওর, দুই ননদ ইঙ্কুল-কলেজে। দিনরাত পরিশ্রম কবে সংসার টেনেছে সরমা আর সৌমেন। বাচ্চা-কাচ্চা হবাব কথাই ছিল না। ছোট দেওব বমেন তখন মাত্র সাত বছরবেটি।

সারাদিন বাচ্চা ঠেঙিয়ে বাড়ি এসে একদম ভাল লাগাব কথা নয় আবাবও বাচ্চাকাচ্চাব কথা ভাবতে। কিন্তু সবমার কী যে স্বভাব। নিজের একটি বাচ্চাব সখ তাব প্রচণ্ড। সৌমেন ধমক দিত, ঘাড়ে দু'দুটো অবিবাহিত বোন, দু'দুটো ইঙ্কুলে পড়া ভাই, তুমি কি পাগল হলে? ওদেবকেই মানুষ কবো না নিজের ছেলেমেয়েব মতন কবে?

তাই কবেছে সরমা। পনের বছর ধরে। ইতিমধ্যে স্বশুরেব পাট চুকেছে। তাঁর পেনশান খতম, তাঁব র্যাশনকার্ড বাতিল। তাঁর নাতিব মুখ দেখে যাওয়া হয়নি।

ইঙ্কুলে যেতে হবে ভাবলেই মেজাজ খাবাপ হয়ে যায়। আজকাল বাড়ি থেকে বেরুতেই ইচ্ছে কবে না সরমার। নাকে-মুখে দুটি গবম ভাত গুঁজে ছাতি বগলে ছোট। ইচ্ছে কবে পান মুখে দিয়ে দুপূর্ববেলায় পাখা খুলে, মাদুরে শুয়ে শুয়ে সিনেমাব বই পড়তে। আব থাবড়ে থাবড়ে একটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়তে।

স্বামী-স্ত্রী আর বমেন বাদে বাড়ি খালি হয়ে গেছে, বজনী সজনীব বিয়ে হয়ে গেছে, শোভেনেব দুর্গাপুরে চাকরি হয়ে গেছে, সৌমেনের স্কেলও বেড়েছে। হয়নি কেবল সবমার ইঙ্কুল-ছাড়া। মাস গেলেই সাড়ে চাবশো টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। অতটা সাহস হয় না। সাবাদিন একশো গুণ্ডা অন্যের পাচ্চা ঠেঙানো। আর মা-গুলো কী ন্যাকা। উঃ! ছুটিব ঢের আগে থেকে গেটে এসে ভীড় করবে, হাহা হিহি গুলডানি আড্ডা, দেখলে গা জ্বলে যায় সরমাব। কোনো কাজ নেই, কেবল বাচ্চা পৌছনোর নাম কবে পথে পথে ঘোরা। অথচ সরমাব তো ইচ্ছে করে, সারাদিন ধরে কেবল একটাই বাচ্চা নিয়ে ঘরেব মধ্যে বসে থাকতে।



বাড়ির ঠিকে বিটা পর্যন্ত জানত, এতগুলো দেওব ননদদেব একটা গতি হয়ে গেলেই বৌদিদির বাচ্চা হবে। তাঁব ছেলেপুলেদের মানুষ কবতে হচ্ছে বলেই যে বৌমাব ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ এটা শশ্ববমশাইও জানতেন। এবং জানতেন বলে মনে মনে বৌমাব কাছে ‘চোর’ হয়ে থাকতেন। থাকতে থাকতে একদিন তাঁর খালাসেব হকুম এসে গেল।

সজ্ঞীব বিয়ে, শোভেনেব চাকবিব পবেও সৌমেন বাজী হয়নি। কিন্তু বছর তিনেক হল বজ্ঞীবও বিয়ে হয়ে গেছে। অবশেষে সৌমেনেব কোনো যুক্তিই আব খাটল না।

বমেন সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তাব বেকনোব জন্য অপেক্ষা কবতে হলে সরমাব আব ছেলেপুলে হবে না। সাফ কথা বলে দিল সবমা, প্রাণেব ভয় বলেও তো একটা জিনিস আছে? বুড়ি হয়ে মা হওয়া অনেক বেশি বিন্ধি। এখনই তো সে বুড়ি হয়ে গেছে। সৌমেন অনেক তর্ক কবল—তেত্রিশে আবাব বুড়ি হয় কেউ? আঠাশে বিয়ে হল তো সজ্ঞীবই।—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজী হয়ে গেল। একটা শর্তে। চাকবি কিন্তু ছাড়া চলবে না। দুঃখিত হলেও সেটা মেনে নিয়েছে সবমা। দেখা যাবে পবে। বাচ্চাটা হোক তো আগে।

সেও হয়ে গেল দু’ বছর। এখনও তো কই সবমাব বাচ্চা এল না। চেষ্টাব কোনোই ক্রটি কবে না তাবা। ব্রজেনডাল্লাব সববকম পরীক্ষা কবিযে বলেছেন কারুব কোনো দোষত্রুটি নেই শরীবে। দুজনেই সমর্থ, সক্ষম, নির্দোষ। চিকিৎসাব কিছু নেই। তবে? তবে কেন হচ্ছে না?

তাবিজ, মাদুলি, শেকডবাকড, এমন-কি তুুতাকও কবে দেখেছে সবমা। সৌমেনেবও মনে একটা চাপা উদ্বেগ হয়েছে এতদিনে। ‘পুবনো-বাসি-ববকে নিয়ে তোমাব আর মন উঠছে না—’ এসব কথা বলে হালকা কবলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছে সবমাব চেয়েও বেশি টেনশন হচ্ছে সৌমেনেব মধ্যে।

কিবকম যেন দোষী-দোষী ভাব কবে থাকে। মুখে যদিও চোটপাট কবে—‘এত মন দিয়ে ভগবানকে ভজ্ঞনা কবলে তিনিও সশরীবে এসে পডতেন, তোমাব সন্তানেব ভজ্ঞনা কবা অতি কঠোব উপসাব্য ব্যাপার।’ ক্রমশ সৌমেন কিন্তু পালটে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ চটে যায়। মেজাজটা খাবাপেব দিকে যাচ্ছে। আবাব একসঙ্গে দু’উজন বজ্ঞীগন্ধা নিয়ে হঠাৎ আপিস থেকে ফেবে। কেমন একটা ‘ঘুষ’ দেবাব মতন ভাব যেন। আজকাল নিজেবে খুব খাবাপ লোক বলে মনে হয় সবমার। বব ফুল এনে দিচ্ছে ভালোবেসে, সেটাকে ‘ঘুষ’ বলে মনে হবে কেন সবমাব? আগে দেয়নি বলে? আগে দেয়নি কেন না, তখন শশুর ছিলেন, ভাইবোনেবা ছিল, লজ্জাটজ্জা কবত। এখন দিচ্ছে, সে তো ভালো কথা। খুশির কথা। সবমাব এত অস্বস্তি কেন হচ্ছে তাতে? সবমা নিজেই নিজেকে চোখ রাঙায়।

তবু, কেবলই ওর মনে হয়, সৌমেন ইদানীং বদলে যাচ্ছে। অথচ বদলটা কিছু মন্দ নয় সরমাব পক্ষে। যেমন, সেদিন মাসপয়লায় হঠাৎ একটা সবুজ-সাদা ডুর্রে ধনেখালি এনে হাজিবি। সুন্দর শাড়িটা দেখে কোথায় আহ্বাদ করবে, তা না, সবমাব মনটা দপ করে খাবাপ হয়ে গেল। জোব করে মুখে হাসি এনে বললে, 'বাঃ! কী সুন্দর! কিন্তু কেন বলতো? হঠাৎ কী মনে করে?' কথাটা নিজের রূানেই কুঞ্জী শোনাল সবমাব।—'কী আবার? সেলে দিচ্ছিল, ফুটপাথে ঢেলে শাড়ি বেচছে। তাই ভাবলুম, কোনদিন তো কিছু দেওয়া হয় না তোমাকে—' সৌমেনেব কথায় লজ্জায় গবে যেতে ইচ্ছে করছিল তাব। সত্যিই তো, সজনী-রজনীকে বাদ দিয়ে হঠাৎ বৌয়েব জনো কাপড আনলে বড়দ খাবাপ দেখায়। এইজনোই জীবনেও তার জনো আলাদা করে কাপড আনা হয়নি সৌমেনেব। এখন বাড়িতে কেবল ও একা, তাই শখটা মিটিয়েছে। এতে সন্দেহেব কী আছে? নাঃ, সরমাব সত্যি বয়েস হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতেই মন্দ দেখছে সে। স্বামীব মনোযোগ পেয়ে কোথায় আনন্দ হবে, তা না, ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভেতবে ভেতবে সব সময়েই কেমন একটা প্রশ্ন-উত্তরেব ব্যাপার চলছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেব পালা চলছে। বাচ্চা নেই বলেই নিশ্চয় এইসব খুঁতখুঁতুনি। আসলে, সৌমেনকে মাঝে মাঝে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে তাব। মাইনের স্কেল বেড়েছে, ছোট সংসাবে খরচাও কমেছে, তবু, এতটা দরাজ হাতেব লোক সৌমেন নয়।

বিছানাতেও তার ধরনধাবণ অন্যবকম হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বাচ্চা জন্ম দেবাব চেষ্টায় কি এতদূব চারিত্রিক বদল হয়?

যে সৌমেন অনেক বড লেখকের লেখাকেও 'অস্বীল' বলে বাড়িতে ঢুকতে দিত না, সেই সৌমেন আজকাল কোথেকে সব নোংবা ছবিব বই বাড়িতে নিয়ে আসছে। অবশ্য সবমাকে দেখাবে বলেই আনে, কিন্তু সরমা ওদিকে চাইতে পর্যন্ত পারে না। খাবাপ খাবাপ ছাইপাশ ছবি দেখে দেখে সম্ভানধারণের আইডিয়াটাই খুব বাজে লাগে সবমাব। অতি কষ্টে সে-বই বাড়িতে আনা বন্ধ কবেছে সে, 'রমু দেখতে পেলে আমি গলায় দড়ি দোব' বলায় কাজ হয়েছে।

আব বিছানায় এসেও সৌমেন কেমন পাগলামি কবে ইদানীং। বাচ্চার জনো কি পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? বোঁক তো বেশি ছিল সরমারই—সৌমেনের কোনোদিন বাচ্চার সখ নেই, অতিকষ্টে বাজী কবিয়েছে তাকে। কিন্তু এ কী হলো? বেশি বেশি উগ্র, নির্লজ্জ আদরে আদরে যেন বিপর্যস্ত কবে ফেলেছে সরমাকে। নতুন বিয়ের ঠিক পবে-পরেও এতটা উদগ্র লোভ তার দেখিনি সরমা।

অথচ সরমার শরীরটা-তো তখনই ঢেব বেশি লোভনীয় ছিল। এত আগুন ছিল কোথায় এ্যাঙ্গিন? এ কি কেবল বাড়িতে লোকজন কমে যাবার ফল? কী একটা অচেনা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে সৌমেন আর সরমার মধ্যে। সরমা ধরতে পারছে না। সবই ভালো, অথচ! স্বামী বেশি বেশি আদর করছে এতেও যদি স্ত্রী ভুরু

কুঁচকায়, তবে দোষটা কার?

সবমাব মাথাব যন্ত্রণার বোগটা ইতিমধ্যে কখন যেন উধাও হয়েছে। নতুন একটা বোগ হয়েছে এখন। মনে হয় বৃকেব মধ্যে গলাব নলিতে একটা বাথা আছে, খুব আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে, বৃকেব মধ্যে থেমে থেমে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নামছে তো নামছেই। গলাব নিচে বৃকেব কাছে এই নতুন বাথাটা মাঝে মাঝেই হচ্ছে সবমাব।

অবশেষে গেল মাসে অঘটনটি ঘটেছে। ব্রজেন ডান্ডাব কালই সেই বহু প্রত্যাশিত খবরটি দিলেন—‘ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বৌমা, এখন ভালোয় ভালোয় কটা মাস কেটে গেলেই হয়।’ কালীবাড়িতে পূজো দেবে ঠিক করেছিল সবমা। কিন্তু শনিবারে সৌমেনের অফিসের থিয়েটারেব বিহাসল। সে যেতে পারবে না কালীঘাটে। বমেন বলেছে নিয়ে যাবে বৌদিকে। কালীঘাটেব শনিবারের ভীড় কি সোজা ব্যাপার?

সবমাব সমস্ত শরীর-মন একটা অভূত শান্তিতে ভিজে বয়েছে। অবশেষে। পনেরো বছর বাদে তিনি আসছেন।

কালীঘাটেব দিকে যেতে-যেতেই খবরটা দিল বমেন। বেচারা খুবই বিচলিত, বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে।

—‘এইবেলা ঠেকাতেই হবে ব্যাপারটা বৌদি। যত অফিস ক্লাবেব থিয়েটারে পার্ট করে, আর শ্রেফ বদমাইসি কবে বেডায। অতি পাজী মেয়ে বৌদি—কণ্টু, দুলাল ওদেবই পাডাব মেয়ে। হালতুব দিকে থাকে। ওবা ভালোমতই চেনে ওকে। তুমি দাদাকে বাবণ কব বৌদি।’

শুনেও না শোনাব মতো চূপ কবে থাকে সবমা। উদ্বেগেব চেয়ে যেন নিশ্চিতই হয় বেশি। ভীষণ জটপাকান একটা গেবো যেন এইমাত্র খুলে দিল বমেন।

এতদিনকার সব কিছু অসঙ্গতি, যা কিছু খাপছাড়া ব্যাপার, সৌমেনের সব অচেনা, বেথাপ্লা আচরণগুলো এবাবে সুন্দর ভাবে খাপে খাপে বসে যাচ্ছে।

কঠিন একটা ধাঁধাব সবল সমাধান হয়ে গেল এইমাত্র।

তাবপরেই যেন বজ্রপাত হয়। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় সবমার। এই সন্তান তাহলে কার?

ওই যে নতুন সৌমেন, নির্লজ্জ, কামুক, লোভে অধীব, চোবের মতো, অপবোধীব মতো। স্ত্রীকে ঘৃষ এনে দেওয়া যে সৌমেন সেই কি সরমাব স্মারী? শয্যায় ওই উন্মত্ত উদগ্ৰ যে কামনাব প্রকাশ হচ্ছে ইদানীং, তাব লক্ষ্য সবমা নয়। অন্য কেউ। যাব রুচিপ্ৰকৃতির সঙ্গে এই উগ্রতা, নগ্নতা, জাস্তবতা মিলে যায়, অথচ যাকে শয্যায় পায় না সৌমেন। এই শিশুটি যখন জন্ম নিচ্ছিল সরমাব জরায়ুতে, তখন সৌমেনের চোখে ছিল কার স্পন্দ? কার প্রাপ্য বীজ সৌমেন নিকপায় হয়ে গুঁজে দিয়েছে

সরমার রক্তকণিকায়? কাদের স্নপ্নের শিশু এখন বাড়ছে সরমার জরায়ুতে? কাদের সন্তান এখন লালনপালন করবে সরমা তাব রক্তে-মাংসে?

গলাব মধ্যে অদৃশ্য সুপূরিটা আবার বুক চিরে চিরে নামতে থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে। ব্যথা দিয়ে দিয়ে, সময় নিয়ে নিয়ে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো নামতে থাকে সবমার ভিতরটা পুড়িয়ে দিতে দিতে।

পুজো দিয়ে ফেবার পথেই মন ঠিক করে ফেলে সবমা।

আজই কাগজে দেখেছে বিজ্ঞপন। ‘সাকশন পদ্ধতিতে বিনা যন্ত্রণায় মাত্র দু মিনিটে’—সেটাই ঠিক হবে। এসব তো আজকাল আইনসিদ্ধ হয়ে গেছে।

ভগবান জানেন, ভগবানের চোখে সেটাই ঠিক হবে। পনেরো বছর ধবে অন্যের বাচ্চাদের প্রাণ টেলে মানুষ করেছে সরমা; ঘবে বাইবে। তাই বলে সাবা জীবন করবে না। সংসাবে পবেব বাচ্চা মানুষ করা, ইস্কুলে পবেব বাচ্চা মানুষ করা, আর আপন রক্ত-মাংসেব ভেতবে পবেব বাচ্চা মানুষ করা এক নয়।

চিনতে পাবাব পবেও আর নিজের বাসায় কোকিলেব ছানাকে পোষে না, এমন-কি কাকপক্ষীও। সবমা মন ঠিক করে নেয়।

## প্রোপ্রাইটার

ভিডেব মধ্যে টালমাটাল হয়ে দবজাব এককোণে দেয়াল ঘেঁষে দাঁডাবাব ঠাইটুকুনি পেয়ে যেন বর্তে গেল মিতা। বাসে ওঠার অভ্যেসটা তার নষ্ট হয়ে গেছে, আর এই ঝরঝবে প্রাইভেট বাসগুলো দেখলেই তার ভয় কবতে থাকে, মাঝে মাঝে মিনিবাসে চড়াট! তবু খানিকটা শিখে গেছে আজকাল।

পনেবো বছর পবে কলকাতা যেন অন্য একটা শহর। এত ভিড, এত ধুলো, এত আবর্জনা আর এত কক্ষতা চারিদিকে। কাবখানাটা এমনই এক পাড়াতে, ট্যাক্সি, মিনি কিছুই মেলে না। গাড়িটা না থাকলে এই প্রাইভেট বাস ভিন্ন উপায় নেই।

সামনের দবজা দিয়ে উঠেছে, লম্বা লেডিজ সীটটা ভর্তি। মোটা মহিলাটি মানুষ ভালো, নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে মিতার ব্যাগটা টেনে নিয়ে কোলে রাখলেন। এবার দেয়ালে ঠেকো দিয়ে খানিকটা জুত করে দাঁড়াতে পারলে। ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে ভাড়াটা বেব কবে বাখতে হবে এক ফাঁকে। সামনের আয়নাতে হঠাৎ নিজের মুখটা দেখতে পেয়ে বেশ খুশি-খুশি অবাক লাগলো মিতাব। নাঃ, তেমন ক্লাস, বিধবস্ত, মলিন দেখাচ্ছে না তো? যা পরিশ্রম গেছে এতক্ষণ কারিগরদের সঙ্গে।

বিদেশ থেকে তাঁরা ফ্যাশন ডিজাইনস পাঠাবেন, আব দিশি কারিগরদের সেই ডিজাইন বোঝানো কি সোজা কর্ম? এখানে কাবিগবি সজ্জা, চামড়াও সজ্জা, যত্ন নিয়ে কাজটা করাতে পাবলে ব্যাবসা জমে যাবেই। মিতা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করায়, বিদেশের নামী কোম্পানিকে সাপ্লাই দেয় সে। কৃষ্ণনকে দেখাব আগে পর্যন্ত মিতাব ধাবণা ছিলো সাউথ ইন্ডিয়ানবা ব্যাবসা কবে না, চাকবি-বাকবিতে প্রবল উন্নতি কবাই তাদের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণন এই ধাবণা ভেঙেছেন। তাঁর এক্সপোর্টের ব্যাবসা জমজমাট। কাঁধে-কাঁধে মিলিয়ে খাটে মিতাও। আশ্চর্য ধীর স্থির প্রকৃতি কৃষ্ণনের, গত পনেরো বছরে তেমন ঝগড়াঝাঁটি স্বরণেই আসে না মিতাব। অথচ কতবকম অদলবদলের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। মালটিনাশনাল কোম্পানির বিসেপশনিষ্ট থেকে মিতা নিজেই আজ কতগুলো কোম্পানির ডিরেক্টর। ক্যামাক স্ট্রিটের দশতলায় প্রশস্ত পেণ্টহাউস তাব। না, বাসে তাকে চড়তে হয় না। নেহাৎ গাড়িটা কারখানায় তাই। অন্য গাড়িতে মা গেছেন বডমাগীকে দেখতে। না, কৃষ্ণন তাব কোনো কষ্ট বাখেননি। মেয়েটা পড়ছে কার্সিয়ঙের কনভেন্টে, এই গোখাল্যাও নিয়ে তাব বাবাব উদ্বোধনের শেষ নেই। বোজ দু'বেলা ফোন কবছেন কৃষ্ণন, আব বলছেন, “তুমি যাও, গিয়ে বমিকে ফেবৎ আনো”—কেন বে বাবা? ইশকুল ভর্তি আবো তো মেয়ে বয়েছে? এত আদিখ্যেতা কিসেব? তাছাড়া বমি তো বাঙালিও নয়। তাব ভয়টা কী? জামাইয়ের সঙ্গে শানাইয়ের পোঁ ধবেছেন বাবা মাও। কি কবে বোঝাবে তাঁদের যে এই সময়ে পড়াশুনা ডিস্টার্ব কবলে ক্ষতি হয়ে যায়? এখানে এসে নতুন কবে অন্য ইশকুলে ভর্তি করা স্বপ্ন কল্পনাব তুল্য। বমি মেয়েটা মিষ্টি, কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই একা একা একটাই হোস্টেলে থাকাব লাভ এটা। মিতা যে বাবা মাব সঙ্গে সমানেই ঘুরে বেড়াতো নিতি বদলি হয়ে, দশবাবোটা ভিন্ন ভিন্ন ইশকুলে পড়েছে, তাতে ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। এটা কাকে বোঝাবে? বমির সে-ক্ষতি হতে দেবে না সে।

মনে মনে ভাবতে ভাবতে বাসেব ভিতবেব দেওয়ালে, ঠিক তাব চোখেব সামনেই যে সবিবদ্ধ ইংবিজি হবফগুলো কাটকেটে হলদে বং দিয়ে লেখা আছে সেদিকে আলগা ভাবে চোখ ফেলে রেখেছিল মিতা। বমি যেমন “ঠোঙা ভবা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না” তেমনি অক্ষরগুলোকে মিতা দেখছিল, কিন্তু পড়ছিল না।

হঠাৎ সমস্ত শবীবের ভিতর, গভীর, গভীর থেকে একটা কাপনি উঠলো তার। সাবা গায়ে কাঁটা দিল।

ওটা কী?

ওখানে কী লেখা? বাসেব দেয়ালে?

কার নাম ওটা?

লেখাগুলো এক মুহূর্তেই যেন নাচতে নাচতে ভাসতে ভাসতে ঝাপসা হয়ে

মিলিয়ে যেতে শুরু করে দিল।

মন শক্ত করে, চোখ স্পষ্ট করে, আরেকবার তাকালো মিতা। পড়বার চেষ্টা করলো। ওই তো।

ওই তো স্পষ্টই লেখা আছে। একটা নোটিসের মতো।

শ্রী শুভাশিস মজুমদার বি. এসসি.

১৩২/২ সি গোবিন্দ ঘোষাল লেন

ভবানীপুর, কলকাতা ২৬।

প্রথমে নাম

তাবপব ঠিকানা।

হ্যাঁ, সেই ঠিকানাই।

ওই নামে তো কতো লোকই থাকতে পারে।

কিন্তু ওই ঠিকানাতে?

ওই ঠিকানাতে ওই নামেব মাত্র একটি মানুষই পৃথিবীতে থাকা সম্ভব। শুভমিতাব শুভ আব দেবশিসের আশিস মিলিয়ে যার নাম বাখা হয়েছিল শুভাশিস।

পনেরো বছর আগে তাব বয়েস ছিল ন' বছর। শাদা শাট, খাকি হাফপ্যান্ট পাবে লাফাতে লাফাতে ইশকুলে যেতো। একদিন ইশকুল থেকে ফিরে আব তাব মাকে খুঁজে পায়নি।

কেমন আছে সে। কতো বড়ো হয়েছে এই বাসখানার মালিক? এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে? মিতাব গলায় দলা জমে, বুকেব মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে একটা ব্যথা ক্রমশ জেগে উঠতে থাকে—পনেরো বছর ধবে চাপা দিয়ে বাখা একটা ক্ষতস্থান যে এখনও এমন কাঁচা ছিল, কে জানতো? এখনও এত রক্ত বারতে পারে, কে জানতো?

শুভাশিস মজুমদার।

ব্রাউনপেপারে মলাট দিয়ে প্রত্যেকটা নতুন পাঠ্যবইয়ের ওপর কত যত্ন করে লিখে দিতো তার নামটা তাব মা।

“তোমার শুভ, আর আমার আশিস এই দুইয়ের সম্মিলিত মঙ্গলে মিলিয়ে যা প্রচণ্ড কল্যাণ হবে যাবে না ছোকরাব—মাথায় অ্যাটম বম পড়লেও কিছু হবে না”—বলে অটু হেসেছিল দেবু। সদোজাত শিশুর মাথায় অ্যাটমবোমা পড়ার বসিকতাটা মোটেই ভালো লাগেনি শুভমিতাব—“চুপ করো তো? যতো কুখ্যা!” এক ধমক লাগিয়েছিল সে।

সেই শুভাশিস।

—শুভাশীস নয়, শুভাশিস। সবাইকে বানানটা শিখিয়ে দিতো দেবু। শুভা হেসে লুটিয়ে পড়তো। গোবিন্দ ঘোষাল লেনের আধো-অন্ধকার ঘবে যখন সে ক্লাস্ত শরীবে ফিরতো, আশ্রকুঁড়ের পচা মাছেব আঁশ আর মরা বেড়ালছানা এড়িয়ে বকের মত

লক্ষ্মী লক্ষ্মী পা ফেলে, যে-বাচ্চাটা ছুটে এসে “মা” বলে জড়িয়ে ধবতো, অন্ধকাব ঘরটাতে এক মুহূর্তেই রোদ্রর ছড়িয়ে দিতো। যাব হাসি-কথা, সেই শুভাশিস।

ওই ঠিকানা তো ভুল হবাব নয়। দেবুব ঠাকুরদার তৈরি চকমিলানো উঠোনের বাড়ি। এখন কমাতে কমাতে মাত্র ক'খানা ঘব, একটু কবে দালান, এক চিলতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। শরিকের বাড়ি। দেবুব ঠাকুরদার বিয়ে কবাব নেশা ছিল। তিন বউ। সন্তেবোটি জীবিত পুত্রসন্তান। মিতাব বাবা মাৰ ওটাতেই আপত্তি ছিল। নাতিবও যে সন্তাব ঠাকুরদার মত হবে না, তা কে বলতে পারে? তবু মত দিয়েছিলেন। উপায় ছিল না। মেয়েব জেদেব কাছে হাব মানতেই হল। মালটিন্যাশনাল কোম্পানির কনিষ্ঠ কেরানি, কবি দেবাবশিস মজুমদারকেই বিয়ে কবে ফেলল শুভমিতা দাশগুপ্ত, অনেক চেনাশোনা যোগ্যতর পাত্রকে নিরাশ কবে। না, দেবুব বাবা মা তাকে অনাদর কবেননি। দেবুর ছোট দুই বোন আনন্দে অস্থিৰ হয়ে পড়েছিল সুন্দবী বউদিকে পেয়ে। দেবুব দাদা বউদি একটু দুবে দুবেই থাকতেন, বউদিব সঙ্গে তাব ভাব হয়নি বিশেষ, দশ বছব ঘব করেও দুই জা দুই বোনে পবিণত হয়নি। ওদের ভাগে ঘব মোটে চাবটে। দুই ভাই দুই বউ নিয়ে বড় দুই ঘবে থাকে। বাবা রাত্রে বসাব ঘবে শোন। মা দুই মেয়েকে নিয়ে ছোট ঘরটায়। সেখানেই তাব পুজোর সরঞ্জামও। হ্যাঁ, বাবোযাবি ঠাকুরবাডি একটা আছে ছাদেব ওপর মাৰ্বেলের চিলেকোঠায়। কিন্তু সব বউয়েবই ঘবে ঘবে নিরুপস্থ ঠাকুর। যেমন প্রত্যেকেব উনুন আলাদা, বান্নাঘব “ভিন্ন” হয়েছ, তেমন পুজোব ঘবও। ঠাকুরও যাব যাব তাব তাব।

শুভমিতা মফঃস্বলেব মেয়ে। ইঞ্জিনিয়ার বাবার বদলির চাকবি, ঘুবে বেড়িয়েছে সারা ভারতবর্ষ। জ্যেষ্ঠ ফ্যামিলিব অভিজ্ঞতা তার কোনদিনই ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে এসে মুহূর্তে মুহূর্তে মোহভঙ্গ হতো। চাবী বন্ধ ঠাকুরঘবটি তাব অন্যতম। বৃহস্পতিবার কবে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে লক্ষ্মী পুজো হয়। প্রতিদিন ভাড়া কবা পুৰত এসে ফুল বেলপাতা বদলিয়ে ঠাকুরকে জল আর এলাচদানা দিয়ে যান তাল খুলে, সেটুকু বউরা কেউই দেয না। কি আশ্চর্য। এতগুলি বউ এ-বাড়িতে। শুভমিতা না হয় চাকুরে বউ, ইচ্ছে থাকলেও তাব সময় নেই। অন্যোবা? সারা পাডাতেই যেন মিতাব আসা যাওয়া, চলাফেবা, সাজপোশাকেব বেজিষ্টাব আছে—সবাই সব টুকে বাখে তাতে, আব ত্রুটি ধবে। আব এই বড বাড়িটাতে তো ঘবে ঘবে তাব নামে হিসেবেব জাবদা খাতা আছেই। নোংবা বস্ত্রিটা পেবিয়ে যেতে আসতে প্রথম প্রথম বড্ড ঘেন্না করতো। খোলামেলা পবিচ্ছন্ন সব বাস্তব মফঃস্বলী কোযাটাবে মিতা বড হয়েছ। তাব হাঁটাচলায়, নাকে কমাল চাপা দেওয়ায সেই অনভ্যাসেব অস্বস্থি প্রকাশ পেয়ে যেত। পাড়ার লোকেবা সেটা ক্ষমাসুন্দব নজবে দেখতো না।

বোজ বোজ সকালবেলা নতুন বউ সিল্কেব ছাপা শাড়িটা পবে, নখে-ঠোটে বং মেখে, ঘাড়ছাঁটা মেমেব মতো চুলটি ফুলিয়ে বরবে পাশাপাশি হেসে হেসে আপিস যাচ্ছে, এ দৃশ্য সে-বাস্তব মানুযজন চোখে দেখেনি তাব আগে। মধ্যবিভ

বাড়িতে নিয়ম করে পর্দা তুলে বউবা দেখতো, রকে বসে বুড়োরা দেখতো, বস্ত্রি সামনে, কলতলায়, কয়লার দোকানে সর্বত্র মেয়ে-পুরুষ হাঁ করে চেয়ে দেখতো এই বেহায়া বউটাকে। এইভাবে চলল সাত বছর। তার মধ্যে শুভাশিস এলো, ইশকুলে ভর্তি হলো, ননদদেব বিয়ে হয়ে বাচ্চা-কাচ্চা হয়ে গেল, শ্বশুর মাবা গেলেন, এবং কৃষ্ণান এলেন দেবুর নতুন ওপরওয়ালা অফিসাব হয়ে। চাকরিতে দেবুর তেমন কিছু উন্নতি না হলেও জীবনে খুব একটা মস্ত বড় বদল হয়েছে। ইদানিং তাব কবিতা পত্রিকা, লেখালিখি নিয়েই থাকে সে। সমস্ত মনপ্রাণ তার পড়ে আছে সেখানেই। অফিস কোন ছার, ঘবেও তাব মন বসে না। বাড়িতে থাকেই না বলতে গেলে। শুভা আব শুভাশিস দু'জনেই এখন গোণ হয়ে গেছে “শিল্পেব” মহান দাবিব কাছে। একসঙ্গে অফিস থেকে ফেবা কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। কবিসাহিত্যিক বন্ধুবা বেজায় নাকি মদ খায়, তাদের সঙ্গে থাকলে একটু আধটু খেতেই হয়। দেবু যখন ফেবে তখন পা ঠিকঠাক পড়ে না। মিভাব ঘেন্না করে, অথচ মিভা মদ খাওয়া ঢেব দেখেছে। তাদের বাড়িতেই তো বাবাব কতো পার্টি হয়েছে। কই—কেউ তো মাতাল হয় না? বমি কবে না? সবাই দিব্যি পার্টির শেষে হাসিমুখে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে যায়, দেবুই কেবল টলতে টলতে মাঝবাত্রে ফিবে বমি করে উঠোন ভাসায়। সেই উঠোন বালতিব জল ঢেলে ধুয়ে দেয় মিভা। সকালে জ্ঞাতিবা যাতে দেখতে না পায়। জলেরও কষ্ট আছে বাড়িতে, টিউবওয়েল থেকে ধবতে হয়। চৌবাচ্চাব জলটা যথেষ্ট নয়। বাড়িসুন্দুব কুলায় না। দেবু দিনকে দিন যেন অব্বা হচ্ছে। মদের ঝোঁকে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, ফাঁকি দিয়ে অফিসে বকুনি খাচ্ছে, বকুনি খেয়ে বেশি মদ খাচ্ছে, মদ খেয়ে কাজে আবও ফাঁকি দিচ্ছে। এত যে ভালবাসাব লেখালিখি—ক্রমশ তাও মাথায় উঠলো, অত সুন্দব কবিতা ত্রৈমাসিক “কবিকাহিনী” উঠে গেল শেষ পর্যন্ত। এ কোন দেবশিস? শুভা চিনতে পাবে না। মান অভিমান দূবে থাক। ভালো কবে বোঝাতে গেলেও কানে তোলে না—পরদিন থেকে কথা বন্ধ কবে দেয়। মা বোঝাতে গেলে ধমকে উঠবে। দাদা বাঁকা বাঁকা কথা বললে সামনে যা পায় তাই তুলে মাঝতে যাবে। শুভাশিস কেঁদে উঠতো প্রথম প্রথম। বউদি নাকী গলায় ঝংকার দিত। মা ছুটোছুটি কবে ঝগড়া থামাতেন। ক্রমশ এমন হলো, আব শুভাশিস কাঁদে না, বাড়ি থেকে বেবিযে পালিয়ে যায়। মা নিঃশব্দে কাঁদেন। বউদি নিজের ববকে জাপটে ধবে ঘরে নিয়ে যায়। মিভা শুভাশিসকে খুঁজে আনতে বেবোয়। -দেবু চোঁচাতে চোঁচাতে ঘুমিয়ে পড়ে।

এই যখন নিঁতি বাড়িবাব ব্যাপাব, সেই সময়ে একদিন শুভমিতা গিয়ে কৃষ্ণানকে ধবলো। “স্যাব। আপনি ওর বস, আপনি ওকে বারণ ককুন। বাড়িতে টাকা দেয়া তো দূবে থাক, বসবাস কবাও কঠিন করে তুলেছে দেবু—ওকে ডাক্তাব দেখান স্যাব, যাই হোক কিছু ককুন। আমাদের বাঁচান।”

না, বাবাব কাছে যায়নি শুভমিতা। বাবা তখনও বিটায়াব করেননি, দুর্গাপূবে



পোস্টেড। কলকাতার কাছেই ছিলেন। বাবা মাকে বলে লাভ নেই। তাঁরা কষ্ট পাবেন, দেবু তাদের কথা শুনেবে না। মা উলটে কেবল মিতাকেই দশকথা শুনিযে দেবেন—“তখনই তোমাকে বারণ কবেছিলাম মিতা। ওসব বনেদি ঘর মোটেই ভাল না—বনেদি ঘবে আমাব দাকুণ ভয় আব দাকুণ ঘেন্না—” না, মিতা ওসব শুনেতে চায় না। তাব চেয়ে ওই শান্ত, ভদ্র, দক্ষিণী অফিসাবটিকেই ধবা ভালো—যে দেবশিসেব ইমিডিযেট বস। ওপব থেকে চাপ এলে দেবু ঠিকই কডকে যাবে। বসেব কথা প্রাইভেট কোম্পানিতে না শুনে উপায় নেই।

তাবপবেব ইতিহাস অনাবকম। বছব দুযেকেব মধো শুভমিতা ও-বাডি ছেড়ে লেক বোডেব প্রশস্ত দোতলা ফ্ল্যাটে উঠে এল।

কৃষ্ণান শুভমিতার সুবাবস্থা কবতে পেবেছেন, পাবেননি দেবশিসেব অভ্যাস বদল কবতে। ডিভোর্স পাকা হবাব পব মিতাব বেজিস্তি মাবেজ হয়ে গেছে কৃষ্ণানেব সঙ্গে। কিন্তু শুভশিসকে সঙ্গে আনা গেল না। সে বয়ে গেল তাব বাবাব কাছে। গোবিন্দ ঘোষাল লেনেই। আটবছব পূর্ণ হয়ে যাবাব পব হিন্দুবিবাহ আইনে ছেলেব বাবাব কাছেই থাকাব কথা। মা অনধিকারী। কৃষ্ণান খুব চেষ্টা করেও শুভব জনা মিতার মন খাবাপ যখন কাটাতে পাবলেন না, তখন বন্ধেতে ট্রান্সফার হয়ে যাওয়াব ব্যবস্থা কবলেন। বন্ধে, বাঙ্গালোব, বন্দে। পাঁচবছবেব মধো কলকাতায় আব ফেবাই হল না মিতাব। বাইবে থেকে শুভশিসকে বঙিন চিঠি লিখতো, জন্মদিনে নতুন জামা পাঠাতো পার্সেলে, পূজোতে টাকা। সেসব ফেবৎ আসেনি বটে কিন্তু প্রাপ্তিসংবাদে কোনো চিঠিও আসেনি কখনও। বন্ধেতেই জন্মেছে পারমিতা। ঘবে-অফিসে নানান কাজেব চাপে, কমে যেতে যেতে একদিন থেমেই গেছে শুভকে চিঠি লেখা, কখন যেন বন্ধ হয়ে গেছে তাকে টাকা পাঠানো, দেবু কিছুতেই ছেলেকে যোগাযোগ বাখতে দেয়নি মিতাব সঙ্গে। একপক্ষ থেকে আব কতদিন চেষ্টা চালানো যায় সম্পর্ক বন্ধাব?

বন্ধে, বাঙ্গালোর, বন্ধে। তাবপব হঠাৎ ইয়েমেন। আলি বিটামাবমেন্ট নিয়ে চাকবি ছেড়ে গালফ কাণ্ট্রিতে প্রচুব মাইনেব চাকবি নিয়ে চলে গেলেন কৃষ্ণান। মেযেকে কার্সিযেঙে ভর্তি কবে, দাদু দিদিমাব অভিভাবকত্বে বেখে দিয়ে। ফিবেছেন প্রচুব ধনী এবং পাকা ব্যবসায়ী হয়ে। অনেকগুলো ব্যবসায়ে কৃষ্ণানকে অনববত ঘবে বেড়াতে হয়: আজ বন্ধে, কাল লণ্ডন, পবশু ইয়েমেন, তবশু সিঙ্গাপুর। তব শুভমিতা এখন সুখে আছে এবং শান্তিতেও। গোবিন্দ ঘোষাল লেনেব কথা ওব মনেই ছিল না। বাবা বিটায়াব কবে সল্ট লেকে বাড়ি কবেছেন। তব মেযেব এই ক্যামাক স্ট্রিটেব দশতলাব ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে এসে থাকতে ভালোই লাগে। মেগেকে ভে। বেশিব ভাগই একা থাকতে হয়। জামাই ঘোবেন বিশ্বমস। নাতনি থাকে পাহাড়ে। না, শুভশিসেব সঙ্গে যোগ নেই তাদেবও। দেবু একেবাবেই ছেঁটে দিয়েছে শুভমিতাব পবিবারকে শুভশিসেব জীবন থেকে।

বন্যেব অফিস থেকেই মিতা খবর পেয়েছিল ডিভোর্সের পর ‘দেবদাস’ না হয়ে গিয়ে, উলটে, আস্তে আস্তে মদ ছেড়েই দিয়েছে বরং দেবাশিস। এখন নাকি দুটো বইও বেবিয়েছে বাজাবে কবি দেবাশিস মজুমদারের। বুক ফেয়ারে একটা দোকানে চোখে পড়লেও কেনেনি শুভা। কিনবে না। সে জানতে চায় না দেবাশিস কি লিখেছে। কি ভাবছে।

শুভা নয়, মিতা। বাবাব মিতা, দেবুর শুভা হয়ে গিয়েছিল। এখন কৃষ্ণানেব কাছে আবাব মিতা। শুধু মিতা।

—“টিকিট?”

এক ঝাঁকুনিতে শুভমিতাকে বর্তমানে ফিবিয় আনে কনডাকটরের প্রসারিত তালু। ভদ্রমহিলার কোল থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে আবেকবাব তাকিয়ে দ্যাখে —প্রোপ্রাইটাব : শুভাশিস মজুমদার।

পনোবো গ্লাস নিয়ে কত হয়? চব্বিশ বছর? বাঃ! এবাবে আব চিঠিপত্র নয়, নিজে চলে যাবে শুভমিতা। গোবিন্দ ঘোষাল লেনকে আব ভয় কবছে না। দেবাশিস এখন আর সবিয়ে বাখতে পাববে না শুভকে। শুভকে জানানো দবকার যে এই বাসটা ছাড়া আবেকটাও জনজ্যাস্ত সচল সম্পত্তি প্রোপ্রাইটাব সে।

## মুখর নৈঃশব্দ্য

কী ভীষণ শব্দ কবে বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ-এর জিব লকলকিয়ে উঠছে, থেকে থেকেই চেটে নিচ্ছে আকাশেব বস। আকাশ ঝেঁপে ভবসন্ধে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক দুপুর-বেলায়। যখনই এমন ধড়াস করে দামাল ঝড় এসে পড়ে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝুটোপুটি কবতে কবতে ঘব-দোব ভিজিয়ে দিয়ে যায়, তোমার জন্যে তখন মন কেমন করে। তোমাব জন্যেও তখন মন কেমন করে। আব তোমাবও জন্যে। মানুষেব মন কখনোই মনোগ্যামাস নয়। মন-কেমন-করার কোনো মনোগ্যামি নেই। অথচ, বিশ্বাস করো তোমরা, তোমাদেব প্রত্যেকেব জন্যেই আমার বৃকেব মধ্যে মোচড় দেয়। তোমরা পাঁচজনে পাঁচবকম ভাবে আমাকে কষ্ট দাও। কেউ জানো না, তোমরা কে-উ জানো না। সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছি। তোমাদেব এই গণতন্ত্র যে মোটেই গণতন্ত্র নয়, এ যে যৌথ সাম্রাজ্য, তা কোনোদিনও জানতে দেবো না, কাউকেই না। এ রাজ্যের সবটা জমি আমি একা চাষ করি। আব সবটা ফসল তোমরা ক’জনে ঘরে তোলা। অথচ তাও তোমাদের জানার মধ্যেই নেই।

তুমি যখন আমার দিকে তাকাও, তোমার তীব্র, গহন অভিমানের দৃষ্টি দিয়ে যখন আমাকে বিদ্ধ করো, আমি চোখ নামিয়ে নিই। স্বভাবত আমি নম্র, স্বভাবত অপ্রগলভা। এমন-কি লাজুকই। চট করে কথা ফোটে না আমার, জিবের আগায় এসে সব জট পাকিয়ে যায়। অথচ মনে মনে আমি কত বাচাল। সাবাক্ষণই তো কথা বলি। তোমাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলি। রাগ, দুঃখ, অভিমান এমন-কি প্রণয়েব কথাও। তোমাদের সবার সঙ্গেই। অথচ তোমাদের প্রত্যেকের অভিমানের অন্ত নেই আমার ওপর। আমি ঠাণ্ডা। আমি হিম। আমি তোমাদের প্রণয়বাক্য শুধু শুনে যাই। চুপ করে থাকি, সাড়া দিই না। কী জানি কী ভাবো তোমরা আমাকে। ভাবো নিজীব। ভাবো নিকৃৎসাহ। আমার মন সব সময়ে কথার উত্তরে কথা কয়, আমার মুখ থাকে বোবা হয়ে। যে শুনতে পাবার সে কি শুনতে পায় না? পাবে না কোনোদিন?

সে কি তুমি? তুমি সবার চেয়ে পাগল, সবার চেয়ে বাগী, নিঃসঙ্গ, আর সবার চেয়ে দুঃখী। তোমার বয়েস তোমাকে ঠেলছে তোমার সামাজিক দায়িত্বের দিকে, আব তোমার মন তোমাকে টানছে অন্য এক বিদিকে—যেখানে তুমি এখনো ষোলো বছরের অবাক চোখে মেয়েদের মনের সামনে থমকে দাঁড়াও। প্রত্যেকটি উষা তোমার কাছে নতুন, পবিত্র—প্রতি ব্যক্তি আনে যন্ত্রণা, আব প্রতিশ্রুতি। তোমার দিন যেমন, তোমার ব্যক্তিও তেমনি—নীরঙ্ক, পবিত্র। কর্মবাস্ত, নয়তো মর্মবাস্ত। তোমার মতো তাজা তরুণ ওবা কেউ না, কেউ নয়, এমন-কি ঙ পর্যন্ত না। তোমার যন্ত্রণা ফুটে বেবোয় তোমার তীব্র চাহনিতে, তোমার অকাবণ ক্রোধে, তোমার মান-অভিमानে। তুমি প্রচণ্ড ঈর্ষুক—অকাবণ ঈর্ষায় তুমি জীর্ণ, বিদীর্ণ হও—নিজের বয়স তুলে প্রায়ই আমাকে খোঁটা দাও। বয়স। তোমার আবার বয়স। অবকন্দ বয়ঃসন্ধির শিকার তুমি—কুড়ি পার হতে পাবোনি কোনোদিন। তোমার দুটি পুত্রই এখন বাবার সমবয়সী হয়ে উঠেছে। খ, গ, ঘ তো বটেই, এমন কি উনিশ বছরের ঙ-ও তোমার চেয়ে পবিত্র, হিসেবি,—তোমার পায়ের তলার মাটি তোমার ঝগড়ুটে স্ত্রী, তোমার দুই নয়নের মণি তোমার পুত্রদুটি। অথচ চিবটাকালই তুমি পথের নেশায় পাথের করেছ হেলা। অন্যরা কেউ তোমার মতো না। ওরা বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে। ওবা গুছোতে জানে। কেবল খ ছাড়া। খ অন্যকর্ম। খ গুছিয়ে নিতে চায় না তা নয়, কিন্তু ঘোঁ-ঘাঁত জানে না। পাবেও না। আত্মবিশ্বাস নেই যে খ'ব—খ কনুইয়ের গুতো মাঝেতে শেখনি, জীবনে এগোবে কেমন করে। সবুতেই খ-র রুচিতে বাধে। ওর অহংকারটা বিপরীতমুখী—কাজ গুছোতে অহংকারে বাধে। খ পিছিয়ে থাকে, হাত বাড়ায় না কোনোদিকে। তোমার মধ্যে জোব আছে। এখনও গোঁ আছে ব্রহ্মপুত্রের মতো—এখনও বান ডাকানোর ক্ষমতা আছে তোমার উদ্দাম নাড়িতে। অথচ ইচ্ছে করলেই তুমি শান্ত হতে পাবো। সেখানে উঠে আসে তোমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাকি বছরগুলো, ওইখানে এসে কাঁধ লাগায় অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা। খ'ব মধ্যে

জোব কম। সে যেমন কাডতে জানে না, তেমনি ভেসে গেলে ভাসান ঠেকাতেও জানে না। খ আমাব মতোই লাজুক। আমার ওপবেই ছেড়ে বাথে সব। অথচ আমি জানি এই ধবনের মানুষরা যেই পাষের নিচে মাটি পায়, অমনি চেঙ্গিজ খান। দুর্বলব অত্যাচার সবলেব অনাচাবেব চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক। খ এতটুকু পেনেই আব ছেড়ে দেবে না। লুটে-পুটে ভরিয়ে নিতে চাইবে নিজের অপুষ্টি সর্বস্ব। আঁকড়ে ধববে—ডুবন্ত মানুষে যেমন আঁকড়ায়, তাতে যদি তুমিও ডোবো, ডুববে। তবু ছাড়বে না। আঁকড়ে ধরবে না কেবল গ। গ খেলোয়াড়। তুমি খেলোয়াড় নও। তুমি প্রেমিক। খ-কে প্রেমিকের পাটে মানায় না, কিন্তু ছাপোষা স্বামীর পাটে দিবা মানাবে—বেবীফুড, ব্যাশনেব থলি হাতে ওকে সহজেই ভাবা যায়। ভাবা যায় না গ-কে, কিংবা তোমাকেও। তুমি তো পঁচিশ বছর ধবে স্বামীর পাটে ধেড়িয়ে আসছ। আব গ? গ তো ওস্তাদ খেলোয়াড়। সে অলরাউণ্ডার। স্ট্রাইকাবও হতে পারে, গোলকীপাবও হতে পাবে।—তাব মনে সীমার ধাবণাটা খুব স্পষ্ট—ভূমিকাগুলো চমৎকাব অভ্যেস হয়ে গেছে—সর্বদা অনুশীলনেব দ্বারা নিজেকে ফিট রাখে, বোজ নিয়ম কবে মাঠে নামে। বোজ জোটে তার নতুন প্রেমিকা—তা বলে স্বামীব ভূমিকায় সে মোটেই বেখাপ্লা নয়। সেখানেও সে জয়ী, সার্থক খেলুড়ে।

তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজেব মতো সফলতাব সীমায় পৌঁছেছ। তবুও কোথাও রয়ে গেছে একটা ফাঁক—সেখানে আমার জায়গা।—খ আমাব পাণিপ্রার্থী—মোটামুটি যোগ্যতা তার আছে—বিশ্বস্ত, সৎ, উপার্জনশীল। তুমি কি সৎ? আমার সঙ্গে সৎ। কিন্তু তোমাব স্ত্রীব সঙ্গে? তুমি কি বিশ্বস্ত? তুমি কি নির্ভরযোগ্য? তোমাব স্ত্রীবি কি বাতের পব রাত একা কাটে না, চোখের জলে ডুবে কাটে না? মাসেব পুরো মাইনে তুমি রেসের মাঠে উড়িয়ে দিয়ে আসো, স্ত্রীবি গহনা বাজি ধবে তাস খেলো। সন্তানজন্মের মুহূর্তে স্ত্রীকে হাসপাতালে বেখে দিয়ে নিজে বেশ্যাপাড়ায থেকেছো বলে অহংকাব কবো। তোমার মন্দপনাব তুলনা হয় না। কলসীব কানাব মতো তীক্ষ্ণ, হিংস্র প্রণয়ে তুমি আমাকে বন্ধান্ত কবে দাও, আমার স্নায়ু ক্ষতবিক্ষত কবে দাও। কিন্তু আমাকে তুমি ঘব দিতে পাববে না। সেখানে তোমাব দোবে ট্যাড়চিহ্ন। তুমি আমাকে দিতে পারবে শুধু বুনো ঘোড়ার মতন কিছুটা নেশা-ধবানো দৌড়। তুমিই ববং আশ্রয়েব প্রত্যাশী—খ যেমন। খ হাত বাড়তে পাবে না, অথচ নিজেকে ছিঁড়েও নিতে পারে না—ত্রিশংকুর মতো ঝুলে আছে নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে। খ আব আমি দুটো রেল লাইনেব মতন চিরদিন প্যারালাল চলব—সমাস্ত্রবাল জীবনে—যদি না কোনো জংশনে পৌঁছুই। ওর সঙ্গে প্রণয় হয় না—ওকে দেখলে বৃকের বন্ধ ছলকে ওঠে না কিন্তু বৃক ভবে যায়। তোমাব দিকে চাইলে কিংবা গ-এব স্রটুকু শুনলেও আমার শবীবের মধ্যে তাড়াহড়ো পড়ে যায়, কিসের একটা ব্যস্ততা লাগে, একটা প্রস্তুতি শুরু হয়। আর ও? তোমারই ভাঞ্জে—তাকে তুমি আডালে “উত্তীয়” বলে আমাকে খ্যাপাও। কিন্তু সে আদতেই উত্তীয় নয়। কোনোদিন হবেও না। কাবো

জন্যেই নয়। এই উনিশ বছরেই সে দিবা হিসেব শিখে ফেলেছে। প্রাণ নিতে শিখেছে, প্রাণ দিতে নয়।

কেউ কেউ হয় শিকাব, কেউ হয় শিকারী। খ হল শিকাব। কিন্তু গ-এর মতই ঙ হচ্ছে জাত-শিকারী। আব তুমি? তুমি আমার মতন। কখনো শিকাব হও, কখনো বা শিকারী। আমার সঙ্গে ঙ-র সম্পর্ক তোমরা কেউ বোঝ না। ঙ নিজে কী যে বোঝে তা সেই জানে। তাব প্রাত্যহিক দর্শনেচ্ছা, তার আকুলতা, তার নরম চাউনি—যাই বলুক না কেন আমি তাতে কান দিইনে। কিন্তু আমার মন কেমন করে। ঙ-ব কচি গলাব পাকা কথা শুনতে, তোমাব পাকা গলাব কচি কথা শুনতে, গ-ব ভবাট গলাব মিঠে বলি শুনতে, খ-ব লাজুক তোতলামিব স্নগ্ন কথা শুনতে—আমাব খুব ভালো লাগে। আমার খুব মন কেমন কবে। গ-ব মতন করে কথা বলতে তোমরা কেউ পাবে না, কেউ না। সে বাকচাতুরীতে ওস্তাদ—কথাব পবে কথা সজিয়ে তাজমহল গড়তে পাবে সে। তুমি পারো কেবল চিঠি লিখতে, আর তোমাব চেয়েও ভালো চিঠি লিখতে পারেন তোমাব ভাগ্নেটি—ঙ। সে কবি। দেখো—তাব একদিন খুব নাম হবে। সাহিত্যকে তো তোমরা মূল্য দাও না,—দেখো একদিন সাহিত্যই তোমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে। তুমি যেমন চিঠিতে পাগল কবতে পারো, তেমনি পাগল কবে গ-ব কথা, আর ঘ-ব স্পর্শ। স্পর্শ? হ্যাঁ, সেও তো অনেকদিন হলো। খ-ব শান্ত উপস্থিতিতে পাগল কবাব মতো কিছু নেই—কিন্তু ঙ যখন চূপ করে চেয়ে থাকে, ওর চাউনির মধ্যেই একটা কী যে জিনিস আছে, আমি ওকে না ছুঁয়ে পাবি না। যে হাতে-তুলে কিছুই নেবে না, তাকে তো হাতে তুলে কিছু দিতে হয়। ঙ চুবি ডাকাতি কবে না, গ-এব মতো, কিংবা তোমাব মতো। গ-ব আছে লোভীপনা। আর তোমাব হলো দস্যুবৃত্তি। পুরুষেব পরম আত্মবিশ্বাস (“আমাব মতো প্রেমিক আব কে আছে ভুবনে?”) আমাব মেয়ে বন্ধুদেব নাকি ভালোই লাগে। কিন্তু আমাব ভালো লাগে না। গ সুপুরুষ, সে ধনী, হাইকোর্টে এখন বোধহয় তাব মতন পশাব আর কাবো নেই—চতুর, বিচক্ষণ, পবিশ্রমী সে। মদে ডুবে থেকেও মাতাল হয় না, প্রণয়িনী পবিরেষ্টিত বত্রিয়াপনেব পবে বাড়ি ফিরে গ বউয়েব কোমর ধবে শন্যে দু’পাক ঘুবিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে উদ্দাম প্রেম কবে। তাব আদবেব ঠেলায় বৌয়ের সব মান-অভিমান বাষ্প হয়ে উবে যায়। ভয়ানক মাপ চায়। পায়ে ধবে। বৌয়ের কান্নাব সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কাঁদে। তাব ওপব বাগ কবে থাকা যায় না। বৌও পাবে না, সহকর্মীবাও পাবে না, প্রণয়িনীবাও পাবে না। একনিষ্ঠতাব বড়াই সে কবে না—তাব লুকাছাপা নেই। ক্লাবে, কোর্টে, বাড়িতে, সর্বত্রই সে তাব উদ্দাম প্রাণশক্তিব জোয়াব বইয়ে দেয়। সাবাদিন কোর্টে প্রচণ্ড খাটনিব পব বাড়ি এসে ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে ঘোড়া হয়ে ঘরময় হামাগুড়ি দেয়। গ ভুলেও চিঠি লেখে না। তাব আছে টেলিফোন। ‘শতং বদ মা লিখ’ পলিসিতে বিশ্বাসী, আইনজীবী সে। এক প্রচণ্ড ঝড়ের বাত্রি শেষে তাব ফোন এসেছিল—

এই আজকের মতোই সৃষ্টি ডোবানো বৃষ্টি পড়ছিল সেই সময়ে—“কী, ঘুম ভাঙালাম? কী সুন্দর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তোমাব জন্য মন কেমন কবল। তোমাদের বাড়ির সামনে কি নৌকো চলছে? কী কবছিলে? স্বপ্ন দেখছিলে? নিশ্চয় রত্নীন স্বপ্ন? —তুমি তো একটা মুনীয়া পাখি, নিশ্চয় পাখিদের স্বপ্ন দেখছিলে? নাকি ঝর্ণাব? নাকি গোলাপবাগানেব? তুমি কি কোনোদিন আমার স্বপ্ন দেখবে না, সোনা? আমি যে এদিকে বোজ তোমাকে স্বপ্ন দেখি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও, জেগে-জেগেও। তোমার চোখ দেখি, তোমাব ঠোঁট দেখি, তোমাব বুক—এাই, দেখি তো চোখ দু’খানা একবার? এই তো দেখতে পাচ্ছি—বাগী-বাগী ফুলো-ফুলো। পরনে শাদা বত্রিবাস। হল না? এই যাঃ। তবে? তবে তুমিই বল। নীলশাড়ি? মেঘেব সঙ্গে মিলিয়ে? হলো? দেখলে তো, কেমন পাবি? তুমি তো তবুও করুণা কবো না সুন্দরী। এই দ্যাখো না খালি বাড়িতে একা একা পড়ে আছি—আজ ববিবার, কোট নেই, দু’দিন হলো মনিলাও বাপেব বাড়ি গেছে—একটু এসো না? আসবে গ্লীইজ? লক্ষ্মীটি? সোনাটা?”—এইবকম কবে ডাকবে। আমি যাইনি। সেও জানতো আমি যাবো না। হয়তো আমার আগে আবে দু’জনকে, আব পবেও অন্তত সাতজনকে ওই একই ভাষায় ফোন কবেছে, আহ্নান জানিয়েছে, আদব কবেছে। নিজেও তো কই আসেনি। হয়তো আর কাউকে নিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। একদিকে তো বউ অন্ত প্রাণ—আবাব এদিক-ওদিকে প্রেম-ট্রেমও কবা চাই।

তোমাবও তাই। সেই ঝড়ের দিনে তুমিও ফোন করেছিলে। “কী কবছ? যাই কবো, বন্ধ কবো। কোথাও বেবিও না। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে কবছে, এক্ষুনি দেখতে চাই”—পাঁচ মিনিটও হয়নি, কড়া নড়ে উঠল। কাকভেজা ভিজে তুমি এসেছিলে। ঘবেব মধ্যে ঢুকেই চেষ্টা কবেছিলে আমাকে জড়িয়ে ধবতে। যথাবীতি পিছলে গিয়ে তোমাকে এড়িয়ে আমি বসে পড়লাম চৌকিতে—ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তোমাব ভিজে জামাকাপড নিষে। ও-ঘব থেকে বাস্ত্র খুলে বেব কবে আনলাম ঘ-ব পাজামা, পাঞ্জাবি। তুমি ছুঁলে না।—“ছিঃ। আমি পববো ওব জামা?”—আমি কিছুই বলতে পাবলাম না। তোমাব এই অযথা পাগলামি, এই শুচিবাই আমি বুঝি না। গামছা এনে চুল মুছে দিলাম—তুমি শান্ত হয়ে আমার হাতে আত্মসমর্পণ কবলে, আস্তে আস্তে বুকেব ওপব হেলিয়ে দিলে মাথাটা। আমি সংযত বাখলাম নিজেকে প্রাণপণে—যদিও ইচ্ছে কবছিল—যাই ইচ্ছে কবক না কেন, ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সেব মতো আমি নিজেকে সুদূব রেখে তোমাব চুল শুকিয়ে দিলাম, জানতে দিলাম না ওই মুহূর্তে তুমিই ছিলে সশ্রুট। রুমালে চশমাব কাচ মুছতে মুছতে তুমি চোখ তুললে, অবব শিশুর চোখ—যা ওই কাঁচাপাকা পরচুলোর নিচে বড়ই বেমানান।—আমি চায়েব জল বসাতে ভেতবে গেলাম, নাকি চোখেব জল মুছতে? বাইবে-ভেতবে সমানভাবে তখন ঝড়ের মাতামাতি। ওই ঝড়ের সন্ধ্যায় খ-ও এসেছিল। জল জমে যানবাহন তখন বন্ধ—সে এল হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট জলকাদায়

মাখামাখি কবে—ভবানীপুর পর্যন্ত হেঁটে তিন মাইল পথ। এসে লাজুকভাবে শুধু বলল—“চলে এলাম!”—আমাব মায়া হচ্ছিল ওব প্যাণ্টের অবস্থা দেখে—মুখে আর কী বলবো। “কফি খাবে?”—“খেতে পারি।” খ তো কিছুই করে না, কেবল চেয়ে থাকে। আব এই চোবা চাউনিব জোবটাও খুব কম নয়। আমি জানি, একদিন না একদিন হয়তো ওব কাছেই আমাকে ঠাঁই নিতে হবে। ওই কেবল আমাকে ঘব দিতে পাবে, শিশু দিতে পাবে। ওব ধৈর্য দেখে আমাব মায়া হয়, শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু প্রণয় আসে না।

ঙ সেদিন আসেনি। ওব ঠাণ্ডা লেগে জ্বব হয়েছিল। শুয়ে শুয়ে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল আমাকে। দুদিন পবে ডাকে এসেছিল সেই চিঠি। ঙ পাগল নয়, সে কবি। মথাসাধ্য সংহত, সংযত, মার্জিত, কাব্যিক ভাষায়, নানা বসিকতা, নানা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাব ফাঁকে মূলভাব—‘বৃষ্টিতে তোমাব জনা একা লাগছে—’ তার বলাব কথা ছিল এইটুকুই। কিছু চায়নি। সে যে চায় প্রাণটাই। হয় সর্বস্ব, নতুবা কিছুই নয়। এই হলো তার বাজি। একটু সুদূব, একটু বিধূব আমাব ঙ। বডো একলা। তার কৈশোব-যৌবনেব পীড়িত সন্ধিস্থলে আমি বোধহয় জবা-বান্ধসীব মতো জোড়া দেওয়াব কাজ কবছি।

আব ঘঃ ঘ-এব কথা ভাবতেও আমাব বুক কাঁপে। ঘ-এব কখনো মনে পড়ে কি আমাকে? একটা সময় ছিল যখন আমবা এমনি বৃষ্টি পডলে দুজনে মিলে খালি পায়ে পথে বেকতাম। কেবল জল ভাঙবো বলেই। মফঃসল শহব থেকে পালিয়ে দুজনে চলে এলাম কলকাতায়—ঘ একটা কাপডেব দোকানে কাজ পেয়ে গেল। চেতলাব সেই টিনেব চালেব ঘবে যখন বৃষ্টি পডতো—সাবা বাত তার বাজনা শুনতাম, যেন অঙ্গবীদেব ঘুঙুব বাজতো ছাদে—আমবা ঘবে বসে তেলমুড়ি খেতাম আব ঘন ঘন চা, আব জডাজডি, হুডোহুডি ফুবোতে চাইত না। দেশে ওব মা বলতেন এমনি একটা বাদলা-দিনে আষাঢ় মাসে ঘ-ব জন্ম। আঁতুড় ঘবে নাকি প্রদীপ নিবে গিয়েছিলো ঝোড়ো হাওয়াব ঝাপটায়, আব সঙ্গে সঙ্গে ট্যা শব্দে ঘ এক অন্ধকার পৃথিবীব বিকল্লে প্রতিবাদ জানিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলো। ঘ-এব মধ্যে ছিল সেই ঝোড়ো হাওয়াব ঝাপটা। সেই বাতি-নেবা ঘবেব নিবিড অন্ধকাব।—অসহ্য, উন্মত্ত সুখে কেটেছিল কয়েকটা মাস—তারপব ঘ-ব বাবা তাকে খুঁজে বেব কবে ধবে নিয়ে গেলেন।—আমি ফিবতে পারিনি। আব ফিবতে পারিনি পিসিমাব আশ্রয়ে। শুনতে পাই ঘ এখন মস্ত অফিসাব হয়েছে। তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বৃষ্টিব ঝামঝমানি পৌছয় না। টিনেব চালেব ওপব মেনকা-বস্তাব নৃপুব নিকুণ সে আব শুনতে পায় না। তার কানে এখন কেবল হিম-যন্ত্রেব গোঙানি, কাংবানি। ঘ, তুমি এখন কী কবছো? তুমি কি এখন বৌয়েব কোলে মাথা বেখে সেই কথাগুলো বলছো, যা আমাব এখনও কণ্ঠস্থ? সেই আদবগুলো পেয়ে তোমাব বৌ কি এখন গদগদ হচ্ছে, আমাকে যা ঘরছাড়া কবে এনেছিল। কলকাতাব অজানা ভিড়েব মধ্যে

ছুঁড়ে দিয়েছিল? তুমি এখন কী করছো গো? এই ঝড়ে, এই বৃষ্টিতে? আমার যে মন-কেমন কবছে। আমার যে ঝড়-বৃষ্টিতে কান্না পায়, সোনা, আমাব সোনা, আমার মগি!

আজ সেইবকম বর্ষা। আজ আমি কাঁদছি—ঘ-এর সঙ্গে হাবিয়ে যাওয়া আমাব প্রথম যৌবনের জন্যে কাঁদছি। তোমার জন্যেও কাঁদছি। তোমাকে যা দিতে পারিনি, তাব জন্যে কাঁদছি। কাঁদছি গ-এব জন্যে—ইচ্ছে করছে, ফোন বেজে উঠুক—ওপাশ থেকে শুনতে পাই—“কী কবছিলে সোনা? নিশ্চয় আমাব কথা ভাবছিলে না? দেখি, চিবুকটা তোলো তো, দেখি কাব কথা ভাবছো?” ইচ্ছে কবছে ডাকবাক্স খুলে ঙ-ব একটা বাদামী খাম পাই—“তোমার জন্যে একা লাগছে”—ইচ্ছে কবছে খ এসে চপচাপ তাকিয়ে থাকুক—তাব সেই প্রায় বমণীসূলভ প্রতীক্ষাব চোখে। খ-ব শান্ত চাহনি আমাব মনে বল দেয়, ঙ-ব চিঠির শিল্প আমাব শিবায শিবায আগুন ধবায়, গ-এব দৃশ্য আত্মবিশ্বাস, তাব চতুর্ভালি বোমে রোমে শিবশিবিয়ে খেলে বেডায, তোমাব উচ্ছ্বাস, তোমাব লক্ষ্মীছাড়া হিসেবছাড়া আবেগ আমার চোখে জল আনে,—আব ঘ-এর সেই স্পর্শ, ওব হাতে যেন তাব বাঁধা, যন্ত্রের মতো শত তাবে সুরেলা বেজে উঠতো আমাব অণু পরমাণু, ঘ-এর সেই মাতাল-করা ছোঁওয়া আমাকে স্মৃতিতে পাগল কবে দেয়, খ-বেচাবীব এসব কিছুই নেই, তাব আছে শুধু দুর্বলব প্রধান অস্ত্র, বলহীনতাব বল। কিন্তু বলহীনেব তো আত্মায অধিকার নেই! সে পেতে পাবে স্বপ্ন। সে পেতে পাবে শুধু দু'একটি খণ্ড মূহূর্তই। কিন্তু চিরকালের উপব অধিকার বর্তায না বলহীনেব। আমাব আত্মার পূর্ণ অধিকাব, আমার চিবকাল, আমি তাই দিয়ে দিয়েছি যীশুকে—যীশুই একমাত্র বলীয়ান পুরুষ, যীশুই প্রকৃত শক্তিমান, আমি কেবল তাঁবই।

কিন্তু তোমাব আমাব নিযত সঙ্গী, আমার স্বপ্নে, আমাব স্মৃতিতে, আমাব ইচ্ছায তোমাদেব নিতা বাজুক—এমনি বর্ষা হলে মনে হয় ঙ-র ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা টেনে নিই বৃকেব মধ্যে, ইচ্ছে করে গ-এব সব ছিচকে চুবিকে আজ লাইসেন্স দিয়ে দিই, ইচ্ছে করে তোমাব তৃষ্ণার্ত, লোভী ঠোটেব মধ্যে উষ্ণ পানীয় হয়ে গলে যাই, ইচ্ছে করে খ-এব ভীরা হাতটা পাখিব মতো আশ্রয নিক আমাব আবৃত শবীবব কোথাও, মনে হয় ঘ-এব ভাবি ওজনেব তলায পিষে যাক আমাব সর্বস্ব, আব টিনেব ছাদে নৃপব বাজুক.. নৃপব বাজুক, অনন্তকাল... এ ভালোবাসায পাপ নেই, শুধুই পুণ্য... শুধু পুণ্যান্ন। আমাব শরীর আমি তুলে রেখেছি, এবং আমাব আত্মাও, পবিত্র যীশুব সম্পত্তি তারা, আমি আছি মাত্র প্রহরায়।

সকালে এই এক ঘণ্টা আমাদের নানারি-তে কেউ কথা বলে না। এটা সন্ন্যাসিনীদের মৌন ধ্যানের সময়। ওই যে ঘণ্টা পড়ছে, মঠেব মেডিটেশন আওয়াব শেষ। এবার যাবো গির্জাতে, এখন মন্দিব বসবে। এখন উপাসনা। এখন যীশুব কাছে যাওয়া। এই লগ্ন যীশুব লগ্ন। Husband, I come, I am fire and air/the



baser elements I give to baser life... হে প্রভু, হে পবনপতি, হে পবনগতি।  
আমি তোমারই, কেবল তোমারই।

এই একান্ত শবণাপন্ন, নিতান্ত অবলা প্রাণীর পাপতাপ তুমি হরণ করো প্রভু।  
বিভ্রান্তি ও বিনষ্টি থেকে আমাব আত্মাকে তুমি বক্ষা করো প্রভু। তোমাব পবিত্র  
প্রণয়েব আকাঙ্ক্ষায় আমি পিপাসার্ত, আমায় তোমাব কৃপাদৃষ্টিব প্রাণজল দাও! এই  
শবণাগত এই দীনার্ভেব প্রতি প্রসন্ন হও। প্রভু, প্রসাদ, প্রসাদ, প্রসাদ।